

সম্পাদক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

ইঙ্গিত কার্য্যালয়—মেহেরপুর—গোপসেনা পোঃ, যশোহর।

প্রবন্ধাদি পাঠাইবার ঠিকানা—১৪৬ডি, মাণিকতলা রোড, কলিকাতা।

সূচী

		পৃষ্ঠা
১।	পত্রাবলী—(এক)—শ্রীধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২২৯
২।	„ (দুই)—শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ	২৩১
৩।	বরষে বরষে (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার রায়	২৩২
৪।	মিলন পথে (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৩৩
৫।	বিশ্বামিত্র (কবিতা)—শ্রীনন্দগোপাল সেন গুপ্ত	২৩৮
৬।	কুটীর শিল্প—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী	২৪০
৭।	প্রার্থনা (কবিতা)—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়	২৪২
৮।	গল্প, গল্প নয়—শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক	২৪৩
৯।	জ্ঞানযোগ—বেদপন্থী	২৪৬
১০।	দু' ফোঁটা আঁখিজল (কবিতা)—শ্রী নিখিল নিয়োগী	২৪৬
১১।	উদয়তারা—শ্রীসুনীলকুমার দত্ত	২৪৭
১২।	আমার পৃথিবী—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	২৫০
১৩।	বঞ্চিত (কবিতা)—শ্রীসুকুমার সরকার	২৫২
১৪।	পাথেয় (গল্প)—শ্রীফণীন্দ্র পাল	২৫৩
১৫।	অনির্ব্বচনীয় (কবিতা)—শ্রীমন্মথনাথ দাশ	২৫৯
১৬।	প্রবোধকুমারের ছোট গল্প—শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬০
১৭।	বাঙ্গালার কাব্য সম্পদ—শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্তরায় সাহিত্য সরস্বতী	২৬৩
১৮।	পুরবাহার (কবিতা)—শ্রীপ্রণব রায়	২৬৫
১৯।	বাতায়ন	২৬৬
২০।	পুস্তক পরিচয়	২৬৮
২১।	ইঙ্গিতের অভিনব প্রস্তাবের জের	২৬৯

ইঙ্গিতের নিয়মাবলী

১। কার্ত্তিক হইতে ইঙ্গিতের বর্ষ আরম্ভ।

২। বৎসরের যে কোন মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। যিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই মাসের পূর্ব্বমাস পর্য্যন্ত কাগজ দেওয়া হইবে।

৩। ইঙ্গিত প্রতিমাসের ২য় সপ্তাহে বাহির হইবে। মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টারের সার্টিফিকেট সহ লিখিলে অপ্রাপ্ত সংখ্যা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দুই আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে যে কোন এক সংখ্যা নমুনা পাঠান হয়।

৪। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে ইঙ্গিত কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য।

৫। অমনোনীত প্রবন্ধাদি ডাক টিকিট দেওয়া না থাকিলে ফেরত পাঠান হয় না। উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধাদি গৃহীত হয় না।

৬। প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। লেখক লেখিকারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন; নতুবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত লইতে কিম্বা সম্পাদকের নিকট হইতে কিছু জানিতে হইলে প্রবন্ধের সহিত ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে। নূতন লেখক লেখিকাদের সাহিত্যানুশীলনের সুযোগ দেওয়া ইঙ্গিতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইঙ্গিত-কার্য্যালয়—মেহেরপুর, গোপসেনা পোঃ. (যশোহর)

১৪৬ ডি, মাণিকতলা রোড্, কলিকাতা।

সূচী

		পৃষ্ঠা
১।	যোগাসনে অরবিন্দ—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	৩৮৫
২।	কালী—শ্রীদিলীপকুমার রায়	৩৮৬
৩।	অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—রবীন্দ্রনাথ	৩৮৭
৪।	সুভাষিত—সম্পাদক	৩৮৮
৫।	শুভদৃষ্টি—শ্রীদিলীপকুমার রায়	৩৮৯
৬।	শ্রীঅরবিন্দের বাণী	৩৯০
৭।	আমন্ত্রণ (কবিতা)—শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৯২
৮।	অশেষের কথা—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু	৩৯৩
৯।	শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীঅবনীনাথ রায়	৩৯৬
১০।	শ্রীঅরবিন্দের সেবায়—শ্রীরতিকান্ত পালিত	৩৯৭
১১।	শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে ফ্রান্সের মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁ্যা লিখিয়াছেন	৪০০
১২।	রসবোধ—শ্রীনিবারণ চৌধুরী	৪০১
১৩।	তাঁতিরাম—আশালতা দেবী	৪০৪
১৪।	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্ররায়—শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায় সাহিত্য সরস্বতী	৪০৭
১৫।	শ্রাবণ (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪১০
১৬।	উদয়তারা—শ্রীসুনীলকুমার ধর	৪১১
১৭।	গান	৪১৮
১৮।	বাতায়ন—	৪১৯
১৯।	পুস্তক পবিচয়—শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ	৪২০
২০।	জীবন বীমা	৪২২

সূচী

		পৃষ্ঠা			পৃষ্ঠা
১।	শেষপ্রশ্নের জের— শ্রীআশালতা দেবী	৪২৫	৬।	বৈকালী ভোগ (কবিতা)— শ্রীকালিদাস রায়	৪৪৫
২।	মায়া—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত	৪৩৩	৭।	তাঁতিরাম—শ্রীআশালতা দেবী	৪৪৬
৩।	জন্মান্তর (কবিতা)—শ্রীমনোহর মৈত্র	৪৪০	৮।	'আমির' ঋণ্বাণী (কবিতা)— শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু	৪৪৭
৪।	মনো-মর্ম্মর—শ্রীহিমাদ্রিনারাণ বসু	৪৪১			
৫।	অপ্রত্যাশিত—শ্রীহাসিরাশি দেবী	৪৪৩	৯।	বাতায়ন	৪৪৮

ইঙ্গিতের অযথা বিলম্বের কৈফিয়ৎ

নূতন মাসিকের ক্ষেত্রে নামিয়া, বিশেষতঃ তাহাতে আবার যদি থাকে আনাড়িপনা, তাহা হইলে তাহার পরিচালকমণ্ডলীকে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গকেও যে কতরকম অসুবিধা, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া যাইতে হয়—তাহা ভুক্তভোগীর অবিদিত নাই। অধিকন্তু যদি থাকে অর্থাভাব, তাহা হইলে "মধুরেণ সমাপয়েৎ !!" আমাদের এ সকল ত্রুটীর সবগুলিই ন্যূনাধিক বর্ত্তমান। পাঠকবর্গও প্রতিমাসে তাহার নিদর্শন পাইতেছেন।

কিন্তু এরূপ অত্যাচার তাঁহারা আর কতদিন সহ্য করিবেন! শুধু তাঁহাদেরই নিকট হইতে চিরদিন ত্যাগ, সহানুভূতি ও উদারতা চাহিয়াই দিন কাটাইলে আমাদের চলিবার নয়—আমাদেরও হইতে হইবে সেগুলি পাওয়ার উপযুক্ত।

তাই পুরাতন বৎসরের অনিয়মের জের টানিয়া আমরা নূতন বৎসরের প্রথম মাসটীকে (কার্ত্তিক) আর গ্লানিগ্রস্ত করিতে চাহিতেছি না। পুরাতন বৎসরের ভাদ্র সংখ্যাটীকে আশ্বিন সংখ্যায় পরিবর্দ্ধিত ও পরিসমাপ্ত করিয়া আমরা পুরাতন বৎসরকে অতীতের ত্রুটী ও গ্লানিভার হইতে মুক্তি দিতে চাই। অতঃপর ইঙ্গিতের নূতন বৎসরের প্রথম মাস, অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস হইতে প্রতি মাসেই কাগজ যাহাতে নিয়মিত ভাবে প্রথম সপ্তাহে এবং পরিবর্দ্ধিত আকারে পান তাহার সবিশেষ বন্দোবস্ত করা হইল।

ছাপাখানার বিষম বিভ্রাটই ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা অযথা বিলম্বে ও একসঙ্গে প্রকাশিত হইবার প্রধানতম কারণ।

ইঙ্গিতের গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন

এইমাসে ইঙ্গিতের বৎসর পূর্ণ হইল। দীর্ঘ একবৎসর ধরিয়া ইঙ্গিত তাহার পাতায় পাতায় কি সাহিত্য পরিবেষণ করিল তাহা ইঙ্গিতের গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের অবিদিত নাই। তাঁহারা ইঙ্গিতের সাহিত্য-সম্পদ, কিম্বা বর্ণপটের ভাবাভাবের মানদণ্ডে যে ইঙ্গিতকে গ্রহণ করিয়া আছেন—তাহা মনে করিবার আমাদের কোনই কারণ নাই। তাঁহারা ইঙ্গিতকে গ্রহণ করিয়াছেন উদার সহানুভূতির দৃষ্টিতে; ইঙ্গিতের সাহিত্যিক মণ্ডলী যাহাতে বাণীর সেবা করিতে সুযোগ পায়, সেই জন্যই তাঁহাদের এই অপার ত্যাগ ও মহানুভবতা। আমরা এবৎসরও পুনরায় তাঁহাদের গ্রাহক থাকিয়া আমাদের এই সাহিত্যিক সার্থকতাকে সমৃদ্ধতর করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। নূতন বৎসরে ইঙ্গিতের আকার পরিবর্দ্ধিত হইল—প্রচ্ছদপট ও নানারূপ চিত্রের সম্ভারে পত্রিকাখানি পরিপুষ্ট করা হইল। দাম পূর্ব্ববৎ রহিল। গতবৎসরের চাঁদাটী যাঁহারা আজও দেন নাই, তাঁহাদের আশ্বিনের মধ্যেই আমাদের অফিসের ঠিকানায় চাঁদাটী পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করি।

একান্তই যদি কেহ আমাদের প্রতি বিমুখ হয়েন, কিম্বা নূতন বৎসরে গ্রাহক থাকিতে নিতান্তই অসুবিধা বোধ করেন—তাহা হইলে কার্ত্তিকের পূর্ব্বে একখানি কার্ডযোগে আমাদের জানাইবেন। এ বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া কেহ যেন এ গরীব প্রচেষ্টাটীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। ইতি—

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ

সূচী

		পৃষ্ঠা
১।	রবীন্দ্রনাথ—"নিরুদ্দেশ যাত্রায়" শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু	১
২।	বনাম—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মল্লিক	৬
৩।	বিংশ শতাব্দী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র— শ্রীপ্রণব রায়	১১
৪।	কত দূরে ?—শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ	১৩
৫।	বার্ত্তাবাহী— শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর বি, এ	১৭
৬।	বেকার সমস্যা— শ্রীআশুতোষ সান্যাল	২৩
৭।	"তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাতিয়া" (কবিতা)— শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য বি, এ	৩০
৮।	উদয়তারা—শ্রীসুনীলকুমার ধর	৩১
৯।	চাষার ছেলে— শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩৭
১০।	ভূপর্য্যটক (কবিতা)—শ্রীলতাদেবী	৪২
১১।	শক্তিযোগী পীলসুড্‌স্কী— শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী	৪৩
১২।	'গতি মোর পূর্ণতার পানে' (কবিতা)— শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র	৪৬
১৩।	নারীসাহিত্যের মর্য্যাদা— শ্রীকালিদাস রায়	৪৭
১৪।	ন্যায়দর্শন— শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম, এ	৪৮
১৫।	সঙ্কলন—	৫১
১৬।	বাতায়ন—	৫৪
১৭।	প্রাপ্তিস্বীকার—	৫৬

ইঙ্গিত

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা	বৈশাখ	১৩৩৯ সাল

পত্রাবলী *

এক

শ্রীধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবি বাবু সেদিন আমার এক বন্ধুকে বলেছেন, "আমাদের দেশের লোকেরা আমার কাছে দাবী করতে জানে না। এখানে দাবী মানে সভাপতি হ'তে কিম্বা ছেলে মেয়ের নাম রাখতে অনুরোধ করাই বোঝে। য়ুরোপে কিন্তু এমন চাইতে জানে যে আমি না দিয়ে থাকতেই পারি না। এ দেশে দিলীপ শুধু খুঁচিয়ে কথা বাহির করতে জানে।" ছোট মুখে যদি বড় কথা শোন্‌বার দুরাশা পোষণ করেন তাহ'লে বলি আমার বন্ধুদের মধ্যে কেবলমাত্র আপনিই শুধু provoke কোরতে জানেন, সেই জন্য আপনার চিঠি পড়তে আমার ভাল লাগে। চিঠির উত্তর দিতে আমার আরো ভাল লাগত, যদি আমার স্বাস্থ্য আরো ভাল হ'ত। কাছে থাকার এই গুণ, মুখে তর্ক চলল, কাগজ কলমের বালাই নেই, সময় খুঁজে নেবার অজুহাত নেই, শক্তি অপচয়ের আশঙ্কা নেই। আজ চিঠি লিখ্‌তে ভাল লাগ্‌ছে—তাই লম্বা চিঠি লিখ্‌ছি।

মানুষ সন্তানের কাছে ঠিক কি চায় বলা শক্ত, কিন্তু মাত্র দুই দিন দেখে সন্তানের কাছে 'স্মৃত' হ'তে চায় এ কথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি না। পরে সেই বয়সে হয়ত চাইব, যে বয়সে গ্রে সাহেব Elegy লিখেছিলেন। উক্ত কবিতাটি আপনি উল্লেখ কোরেছেন তাই বল্‌ছি। কবিতাটির মর্ম্ম হয়ত আপনি যা লিখেছেন তাই, কিন্তু সৌন্দর্য্য হচ্ছে অন্য ধরণের। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শুধু পরকালের কথা ভাবে এই দেশে, ও-দেশে পূর্ব্বকালের কথাই মনকে বিষাদে ডুবিয়ে দেয়। এ বিষাদ গোমতী নদীর কিনারায় শীতকালের সন্ধ্যায় কুয়াসার মতন, অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট, অথচ আবেশময় এবং সুন্দর। এই অনির্দ্দিষ্ট আবহাওয়া হচ্ছে ভূত জগতের স্মৃতির আবেষ্টনী, ভবিষ্যতের নয়। আমি অন্ততঃ এই বুঝেছি। সে যাই হোক, মার ভালবাসাতে স্মৃত হ'বার লোভ ও আকাঙ্ক্ষা নেই। অতএব বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে সন্তানের প্রতি স্নেহ পিতা ও মাতার কাছে স্মৃতির সূত্র ধরে চলে না।

* পত্র দুইখানি শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়ের নিকট লিখিত

আমার বিশ্বাস আপনার বিশ্লেষণের গোড়ায় একটা মস্ত ভুল আছে। জীবজগতে হয়ত Continuation of species নিয়তির মতন কাজ করে—তাও করে না। কিন্তু মনোময় জগতে এই Continuity-কে মনের ভাষায় তর্জ্জমা করলে ব্যক্তির নিজের গড়া মনের সত্ত্বাকে অবমাননা করা হয়। Behaviouristরা এই ভুল কোরেছেন। আমার বক্তব্য এই যে মন, দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও নিজের সত্ত্বায় গর্ব্বিত, সেই জন্য জীবজগতের নিয়মগুলিকে হুবহু মনোময় জগতে খাটান যায় না। এই ধরুন জড়ের প্রকৃতি আকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণ, কিন্তু তাই বলে প্রেমের সংজ্ঞা কি নর নারীর আকর্ষণ হবে? প্রেম হচ্ছে একটি সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ জড়, জীব, মন, আত্মা সবই মিলে সৃজন করে। আমাদের কি অধিকার আছে সৃজনী শক্তির একত্ব, অখণ্ডত্ব ও সম্পূর্ণত্বকে বিশ্লেষণ কোরে তার একটি মাত্র ধারার দ্বারা শক্তির সমস্ত বিকাশকে বোঝা? অনেক কথা মনে আসছে—লিখ্‌তে পারছি না।

"পতিতার পত্র" সত্য ঘটনা হ'তে পারে। accomplished fact-কে অস্বীকার করি না—কিন্তু fact এর সাহিত্যিক মূল্য নেই। তার রূপই মূল্যবান—কিন্তু নাম ও রূপ আলাদা। নাম ঠিক করার মানে সমস্যার প্রকৃতি নিরূপণ করা অর্থাৎ সমস্যা নির্দ্ধারণ করা। আপনি লিখেছেন প্রথমে, পত্রটি problem নয়, তার পরেই লিখেছেন, 'সাফাইটা সত্য কিনা, অর্থাৎ যে রকম ঘটনার মধ্যে পড়েছিলেন তাতে তাঁর ঘরে থাকাই সাহসিকতা হ'ত, কি চলে যাওয়াই উচিত হ'ত এই বিচার্য্য—এইটাই crucial point—পরে লিখেছেন controversial point. Controversy আর আমার কথিত problem এ তফাৎ কোথায়? আমার বিশ্বাস লেখক রূপ দিতে গিয়ে সমস্যার নাম নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন যেটা আমার কাজ ছিল—রূপস্রষ্টার ছিল না। নারী হৃদয়ের অজানা বেদনা, একটা অকথিত বিদ্রোহ, পুরুষ-সমাজের উপর একটা সুতীব্র অভিশাপ—বক্তৃতার বিষয় হ'ত পারে, তাও Bethune College-এর মাঠে। কিন্তু ওরূপ abstract argument, কিম্বা abstract emotion সাহিত্যের বস্তু নয়। ব্যক্তি থেকে চ্যুত, বিচ্ছিন্ন কোরেছেন কি সব মাটি। "পতিতার পত্র" একটি সমাজতত্ত্বের বক্তৃতা মাত্র। যদি fact হয় তা হ'লে গল্পাংশ লোপ পেত না।

আমি কতটা বিবাহ-বিদ্বেষী বৈশাখের "কল্লোলে" পাবেন। লেখাটির বাইরে থেকে মনে হবে স্ত্রী সাম্যের বিপক্ষে। তাই দেখে যেন ভাববেন না যে আমি "পতিতার পত্রের" মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম। সেখানে বামাকান্ত বাবুর গল্প এক জায়গায় লিখেছি। "পতিতার পত্রে" যা বল্‌বার কথা আমারও তাই অর্থাৎ বিবাহের সার্থকতা নেই, তবে হরিসাধন বাবু লিখেছেন নারী সমাজের তরফ থেকে, আর আমি লিখেছি মাত্র একটি ব্যক্তির (সে ব্যক্তিটি পুরুষ) তরফ থেকে—tragedy একই। আমার রূপ দেওয়া আশা করি সাহিত্যিক হয়েছে। হরিসাধন বাবুর লেখার সঙ্গে আমার লেখার তুলনা করছি দেখে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হবেন না, কেননা আমি যাকে রূপ বুঝি তারই প্রমাণ মাত্র দিচ্ছি, তুলনা করছি না। আর মনে মনে চটে না গিয়ে আমার লেখাটিকে নিরপেক্ষ ভাবেই দেখ্‌বেন।

আপনার বন্ধুর ভাষা একটু ফেনিল, কিন্তু ভালই। সত্য কথা এই যে আপনার চিঠির ভাষা ওর চেয়েও ভাল। আমার concrete লেখা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। ভাবপ্রবণ লেখা তত পছন্দ আর হয় না, বোধ হয় বয়সের দোষে।

হরিমোহন আমাকে চিঠি দেয় নি, সেই জন্য উত্তর দিতে পারি নি। সে সভাপতি হয়েছে শুনে সুখী হলুম—তার depth আছে, enthusiasm আছে যদি ইতিমধ্যে অধ্যাপনা করে উচ্ছন্ন না গিয়ে থাকে। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি—আপনারও বোধ হয় ভাল লাগ্‌বে। সে আজকাল গান গায় কি?

দেরী হয়ে গেল, হাত ভেরে আসছে। "সবুজপত্রের" জন্য আজ একটা লেখা পাঠাচ্ছি।

আমার ভালবাসা নেবেন—এখানে বড় গরম। ইতি

—

দুই

শ্রীশরৎ চন্দ্র ঘোষ

তোমার ২০শে তারিখের পত্র পাইয়াছি। এ কয়দিন এত ব্যস্ত ছিলাম যে ইচ্ছা থাকিলেও তোমায় পত্র লিখিতে পারি নাই। তোমার পত্র পাইয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। মনে হইতেছে আমি বুঝি সেই দৌলতপুরের অধ্যাপক আছি। পুরাতন জীবন একরকম ভুলিয়া গিয়াছি তুমি এবং তোমার পত্র আমাকে অতীতের কোলে টানিয়া আনিয়া আমার বর্ত্তমান ভুলাইয়া দিতেছে। বাস্তবিক দৌলতপুরের স্মৃতি ভুলিবার নহে। যতদিন যে অবস্থায় থাকি না কেন সে জীবন আর ফিরাইয়া পাইব না। আজও দৌলতপুরের কাহাকেও পাইলে আমার সব কাজ ভুলিয়া সেখানকার কথা জিজ্ঞাসা করি। তাহার কারণ কি জান— সেখানে আমরা আদর্শের সন্ধানে আদর্শ জীবন পাইবার জন্য গিয়াছিলাম। মানুষ যতটা তাহার আদর্শের নিকট থাকিতে পারে এবং সেটাকে বাস্তব মনে করে এবং মনে করিয়া তাহার প্রতি নিজেকে চালিত করে ততটা সে সুখী ইহাই আমার মত। দৌলতপুরে পার্থিব সুখ ও আরাম কিছুই ছিল না এবং সেগুলি স্বেচ্ছায় বিদায় দিয়া সুখী ছিলাম তাহার কারণ এই যে সেখানে জীবনের সামনে একটা জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া তাহাকে পূজা করিতাম। আজ সব আছে—সুখ বলিতে সাধারণ মানুষের যাহা বুঝায় সব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান—কিন্তু শান্তি নাই; যেন কিসের অভাব প্রতিক্ষণ অনুভব করি। যাহা হউক দর্শনের চর্চ্চায় প্রয়োজন নাই, অন্যকথা বলি।

সত্য সত্যই তোমার স্মৃতিপ্রসঙ্গ পড়িলে মন বেদনায় ভরিয়া উঠে। স্ত্রীজাতি চিরদিনই আমার আদর্শ ছিল। সেই আদর্শ রাখিতে পারিব না ইহা আমার বিবাহ না করিবার অন্যতম কারণ ছিল। শাস্ত্রকার হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজবেত্তারা স্ত্রীলোকদের জন্য সংখ্যাতীত অনুশাসনের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন কিন্তু পুরুষের জন্য কিছু নাই বলিলে চলে। আজও "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" "বিবাহিতা নারীর কর্ত্তব্য" প্রভৃতি নীতিগর্ভ পুস্তক ও পুস্তিকা বাহির হইতেছে কিন্তু পুরুষের সম্বন্ধে কি কিছু বলিবার নাই? এই যে—স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়া ইহজগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল তাহার মৃত্যুর অন্তরালে কি গভীর দুঃখ, হতাশা, বেদনা হয়ত নির্ম্মমতা লুকান আছে সমাজ কি তাহা দেখে? পুরুষ কি কখন আত্মবিশ্লেষণ করে? হয়ত ঐ হতভাগিনীর স্বামী বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে আর একটী ক্রীতদাসী আনিয়া সাংসারিক সুখভোগের উপায় করিয়াছে বা করিবে। কিন্তু তা' বলিয়া কি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণকারিণীর মর্ম্মকথা বিশ্বপিতার নিকট পৌঁছিবে না এবং সমাজ কিছু করুক আর না করুক তাহার অমোঘ শাস্তি অলক্ষ্যে সমাজকে ভোগ করিতে হইবে না? প্রকৃত বলিতে কি আমি যখন আমাদের নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুরতার কথা ভাবি তখন আমাদের মানুষ বলিতে ঘৃণা হয়। আমি আমাদের স্ত্রীজাতিকে কোন দোষ দেই না। কারণ শিক্ষা দীক্ষা না দিয়া দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে যাহাকে এক সংসার হইতে অন্য সংসারে আনিয়া সমাজ, ধর্ম্ম, সাংসারিক ও ব্যক্তিগত রীতিনীতির মধ্যে ফেলিয়া সর্ব্বপ্রকারে পেষণ করি তাহার নিকট হইতে আমরা কি আশা করিতে পারি? আমাদের হউক বা অন্য জাতির হউক যে সমাজের রীতিনীতি আইন কানুন মানবধর্ম্মকে ক্ষুদ্র করে, মনুষ্যের হৃদয় দেখে না—সংস্কার ও আচার লইয়া ব্যস্ত থাকে, সে সমাজ চাই না—ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাউক। আমি যত দিন বাঁচিব এই সমাজ ধ্বংশ করিতে সাহায্য করিব।

তুমি ধান ভানিতে শিবের গীত মনে করিও না। সমাজ সম্বন্ধে আমার মতামত তোমায় জানাইলাম।

দৌলতপুরের "দেবায়তন" উঠিয়া যাইবার কারণ লেখকের অভাব নহে, উৎসাহের অভাব। হয়ত এখনো যদি আমি

সেখানে যাই,জলধর প্রভৃতি নূতন কবির সৃষ্টি করিতে পারি। আর অন্য কেহ গিয়া কবি এবং কাব্য বধ করিতে পারে। তাই বলি সেখানে আজ প্রাণ নাই—উৎসাহ নাই—সুতরাং চেষ্টা নাই—গতানুগতিক ভাবে সব 'কাজ চলিতেছে—তাই "দেবায়তন" উঠিয়া গেল।

তোমার পত্র পড়িয়া আমার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের পদতলে বসিয়া জীবনের খাদ্য আহরণ করিয়াছিলাম—তাঁহাদের আশার কিঞ্চিৎ পূর্ণ করিতে পারিলে আমি অনেক বড় হইতাম—পার্থিব হিসাবে নহে, মনুষ্যত্ব হিসাবে। কিন্তু তাঁহারা শিব গড়িতে চাহিয়াছিলেন—আমি বাঁদর হইয়াছি। যৌবনের প্রারম্ভে যখন দৌলতপুর যাই তখন বিশ্বপ্রেমিক হইব এই দুরাশা ছিল—তাই সকলকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলাম। জগতে মানুষ যাহা চায় বিধাতা আমায় পূর্ণভাবে দিয়াছিলেন। পিতামাতা ও ভ্রাতা বন্ধুদের অকৃত্রিম ভালবাসা, তোমাদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত ভালবাসা ও পূজা আমি অজস্র পাইয়াছি। সে আকাঙ্ক্ষা নাই। আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি—তোমাদের প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতাম। যৌবনের যে ভালবাসা মানুষ স্ত্রী পুত্রদিগকে ও নিজ সংসারকে দেয় আমি উহা তোমাদের দিয়াছিলাম। তাই পরিপূর্ণ যৌবনে বিবাহ করিয়া ক্ষুদ্র সংসারে তাহা দিতে পারিলাম না। ইহা আমার দুর্ব্বলতা কিন্তু ইহা সত্য।

আমি ভাল আছি। আমাদের বাড়ীর ঠিকানা ৩১ রামরতন বসুর লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। তোমার স্ত্রী কবে আসিবেন জানিতে পারিলে আমি মটর পাঠাইতে পারি। শীঘ্র আমার অংশীদার অমরবাবু দিল্লী যাইবেন। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিব।

আমার ভালবাসা জানিবে। পত্রের উত্তর দিও।

বরষে বরষে

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

বরষে…বরষে…আজি…অভ্রান্ত ঝর্ঝরে তপ্ত অশ্রু বরষায়,
দীর্ণ মর্ম্মতলে হায়, শোণিতে উথলে লোর…বরষে বিধুর,
উর্দ্ধলোক হ'তে ওই নামে…আজি নামে…হিম করুণা নিঠুর !
সীমাহারা তার সেই শূন্য ব্যাপ্তি মাঝে হৃদি আপনা হারায়।

অল্পের পরিধি-ঘেরা প্রিয় দুঃখ সুখ মোর ! মেদুর মধুর—
চির পরিচিত ওগো হারানো দিনের স্মৃতি ! আজিকে বিদায়।
আজি মোর যেতে হবে উদার দুরভিসারে…বেদন যাত্রায়…
বেলা হারা ঘর ছাড়া…উত্তাল তরঙ্গ চূর্ণ দলিয়া…সুদূর।

মহান্ জীবন ! তব মহানন্দ স্ব'জ' প্রাণ বৈরাগী আমার.
বারেক চাহিব তবু ফিরে মোর মুহ্যমান্ মর প্রেম 'পরে,
যারে বিসর্জ্জিতে হবে চুম্বিব বারেক সেই বিদায়-অধরে,
পরে একা—হবে সুরু উদ্দেশে মোর—চির অভিসার।

বরষে…বরষে…আজি…নিখিল ভুবন শুধু তপ্ত আঁখিধারা
দেবতা ফিরায় মুখ…যাহে হায়, মর্ত্ত্য হৃদি হয় আত্মহারা।

শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্তের ফরাসী সনেট হইতে অনূদিত।

Il plent……Il plent……

Nalini Kanta Gupta.

Il plent…il plent…il plent sans fin des
pleurs amors
Il plent du sang an fond demon un fendue
La grace sans merci du Haut est descendue ..
Et dans son infini, je me perds ! je me perds !

Petits plaisivs cheris ! O les gentils mouillages
Demes jours envotes, il me faut vous quitter,
After an large exfin chercher les apretes
Des embruns vagabonds sur les mars sans vivages !

Bonheur do vie en grand ! jen ai lesoin toujours
Mais un dernier regard, Amours en agonie !
Un sent baiser d'adieux anx levres que je nic,—
Et je pars a jamais et vers toi sent jaccaurs !

Il plent…il plent…le monde enfier nist que
des larmes
O les dieux si jaloux des aises qui nous
charment !

মিলন-পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

সে দিন বেড়াতে যাওয়া আর তার হ'ল না। কত কি চিন্তা আসিয়া তাহাকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল। সেই তার বহু আশা আকাঙ্খার পাঠ্য জীবনের কাল অবধি—জীবনের অসীম ব্যর্থতা—দুঃখ দৈন্যের শত শত নগ্নমূর্ত্তি—ক্ষুদ্র উপজীবিকা—পিতামাতার অকালমৃত্যু, সব মিশে যেন একটা বড় তাল পাকাইয়া তাহার মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। আজ চিন্তার তার অবধি নাই। তবুও সেই বিশৃঙ্খল চিন্তার স্রোতের ঘূর্ণিপাক এড়াইয়া একটা অননুভূত ভাব তার ক্লান্ত মনকে স্পর্শ করিতে লাগিল। সে রাত্রিতে ভাল করিয়া তাহার ঘুম হইল না।

পর দিন সকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া ছেলে পড়াইতে যাইবে এমন সময় দু'জন ভদ্র লোক আসিয়া উপস্থিত। দু'জনই তার পরিচিত। একজন হরপ্রসাদ রায়ের সদর নায়েব কৃষ্ণ কমল বাড়ুজ্জে ও অপর ব্যক্তি তার পাশের বাড়ীর এক জ্ঞাতি খুড়া প্রসাদ মুখুজ্জে। বিজয় উভয়কেই সমাদরে ঘরের ভিতর লইয়া আসিল এবং খাটের উপরের বিশৃঙ্খল বিছানার স্তূপ একটু বিছাইয়া দিয়া বসিতে অনুরোধ করিল। কুশল জিজ্ঞাসার পালা শেষ হইলে, কৃষ্ণ কমল বাবু ধীরে ধীরে আসল কথা পাড়িলেন। বিজয় অনেক ভাবিল, অনেক আপত্তি তুলিল—তার সাংসারিক ও আর্থিক অবস্থা দেখাইয়া; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই টিকিল না। কৃষ্ণ বাবু সেই মেসে বসিয়াই ছেলে আশীর্ব্বাদের কার্য্য সারিয়া আবার দশটার ট্রেণেই দেবীপুরে ফিরিলেন।

(৫)

আজ বিজয়ের বিয়ে। পাড়ার বধূরা সব মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় রত। বিজয়কে স্নান করাইয়া, কপালে তার চন্দন এঁকে বর সাজাইয়া দিল। আর বৌদিদিকে করিতে হইল বিজয়ের মায়ের সব কাজ। বিজয় বৌদিদিকে প্রণাম করিয়া বিয়ে করিতে বসিল।

খুব ঘটা করিয়া বিবাহ হইল। বর দেখিয়া কেহ সুখ্যাতি বই নিন্দা করিল না। তবে গরীব বলেই যা সবার একটু আফশোষ রয়ে গেল। প্রবীণা প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কেহ কেহ অনাদৃতভাবে জমিদার গৃহিণীকে এ সান্ত্বনা দিতে ভুলিল না যে—"জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধেতা নিয়ে। কপাল ছাড়া আর পথ নেই। তবে মেয়ের ভাগ্যে যদি সুখ থাকে তবে এই ছেলের হাতেই হবে। তা বলে আর দুঃখু কর না মা।"

বর কনের হাত ধরিয়া বাসরে যাইতেছে এমন সময় বাহিরের জনতার মাঝে একটা মৃদু কোলাহল উত্থিত হইল—"ঐ ভবেশ এসেছে", ঐ ভবেশ এসেছে"।

শত বিস্মিত চক্ষুর মধ্য দিয়া ভবেশ হন্ হন্ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল, এবং নিকটে দণ্ডায়মানা বিস্মিতা ভবতারিণী দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল—"জ্যাঠাই মা, আজ দশটায় জামিনে খালাস পেয়েছি। বেরিয়েই এখানে চলে এসেছি—আমার অমিয়ার বিয়ের উৎসবে যোগ দেবার জন্যে"। সে যেন আরও কিছু বলিতে যাইতে ছিল, কিন্তু গলা ভারী হইয়া উঠিল।

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সেই ঝুল বারান্দার সম্মুখস্থ রেলিং ধরিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে সানাইয়ের বেহাগ রাগিণী যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার অন্তরের সহিত সমতা রক্ষা করিতেছিল। শ্যামাপ্রসাদ ধীরে ধীরে পাশে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

(৬)

বিজয় বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিল। এয়ো দলের

হুলুধ্বনি ও ঢোল সানাইয়ের বাজনায় ছোট বাড়ীটী আজ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বৌদিদি বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। বুকে তাঁর আনন্দ ধরে না, কেবল চোখ দুটিই তাঁর মাঝে মাঝে ভিজিয়া উঠিতেছে। আজ সোনার সংসার, কিন্তু সংসার যাঁরা করিলেন তাঁরা সব আজ কোথায়! বৌ দেখিয়া সবাই বলিতে লাগিল—"এমন রূপ দশ গ্রামের মধ্যে আসে নাই।" বউ দিদি আরও দেখিলেন বউ যত না রূপ অলঙ্কার আনিয়াছে—গুণ আনিয়াছে তার শত গুণ। অত বড় জমিদারের একমাত্র আদরের মেয়ে; কিন্তু অহঙ্কারের লেশটুকু নাই তার অন্তরে। দু'দিন না যেতেই সে বৌদিদির হাতের কাজ কাড়িয়া করিতে যাইত—তাঁর শত বাধা নিষেধ সত্ত্বেও। অবশেষে বৌদিদির একটা কৃত্রিম ধমক না খাইয়া আর নিরস্ত হইত না। আনন্দে বৌদিদির চোখে জল আসিত। তিনি বলিতেন "আমার চাঁদে চাঁদে" মিলিয়াছে।

আজ বিজয়ের ফুল শয্যা! বর বধূর প্রথম মিলন রাত্রি। ফুলের মালা বরণ ডালা লইয়া পাড়ার মেয়েরা আসিয়া বর বধূকে মনের মত করিয়া সাজাইল। বৌদিদিদের মধ্যে কেহ কেহ গান বাজনা করিলেন। হাসি ঠাট্টার অবিচ্ছিন্ন বন্যা বহিল। শেষে কোলের ছেলে মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িতেছে দেখিয়া সবাই মিষ্টি মুখ করিয়া নিজ নিজ ঘরে ফিরিলেন।

বিজয় এখন মহা সমস্যা গণিল। কি বলিয়া বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিবে—কে প্রথমে কথা কহিবে—কি জিজ্ঞাসা করিবে—কি ভাবে তাদের নব জীবন যাপন পদ্ধতির একটা মোটামুটি খসড়া তৈরি করিয়া লইবে, এইরূপ কত অসংলগ্ন চিন্তারাশি তাহার অন্তরকে তোল পাড় করিয়া তুলিল।

বিজয় নীরবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, নিতান্তই যখন অপর পক্ষ হইতে কোন সাড়া আসিল না, তখন তাহাকেই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল। অমিয়ার বাম হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বিজয় আস্তে আস্তে ডাকিল—"আমার অমিয়া"—"ও অমিয়া"—"ও গো" কথা কওনা কেন?" কোন সাড়া নাই। তখন বিজয় নিতান্ত হতাশের স্বরেই বলিল "বুঝেছি, এ বিয়েতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারনি"। এতক্ষণে উত্তর আসিল "যদি বুঝে থাক তবে তাই"।

"যদি সন্তুষ্টই না হতে পেরে থাক তবে এ বিয়েতে তুমি মত দিলে কেন?" "অত কথা আমি জানিনে। আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, আমায় ঘুমাতে দাও।" বিজয়ের বুকে কে যেন একখানা পাথর চাপাইয়া দিল। তাহার শিথিল বন্ধন হইতে অমিয়ার হাত খানা আস্তে খসিয়া পড়িল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে সে পাশ ফিরিয়া শুইল। এইরূপে ব্যর্থ নিশীথিনি চুপে চুপে আসে চুপে চুপে যায়, সাহস হয় না—তার সুগভীর নীরবতা ভঙ্গ করিতে।

সকালে শুকনো মুখে বিজয় বিছানা হতে উঠে। বন্ধু বান্ধবের দল জিজ্ঞাসা করে—"কেমন বিজু, বৌয়ের সঙ্গে কেমন ভাব হচ্ছে?" বিজয় ম্লান ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলে "বেশ"! বৌদিদি জিজ্ঞাসা করে "ওকি! বিজু, অমন সব সময় মুখ ভার করে থাকিস কেন?" বিজয় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে "কই কিছু না।"

……বৌ পছন্দ হয়েছে ত?……বিজয় মাথা নীচু করে বলে "হুঁ।"

বাড়ীতে আর মন টিকিল না। বিজয় সে দিন সকাল বেলা হঠাৎ বৌদিদিকে তার কলিকাতায় যাওয়ার আয়োজন ঠিক করিয়া দিতে বলিল। বৌদিদি বেশ একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "আজই কলিকাতায় যাবি কেন? ছুটী ফুরবার ত এখনও অনেক দেরী আছে। অন্ততঃ বৌ যে কদিন এখানে আছে, সে কটা দিন থেকে যা"। বিজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না, আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে—আজ না গেলেই নয়।" বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া বিজয় সেই দিনই কলিকাতায় চলিল।

বিজয়ের আকস্মিক কলিকাতা গমনে বৌদিদির মনে কেমন একটা খট্‌কা রহিয়া গেল।

(৭)

অমিয়া শ্বশুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে কাছে পাইয়া বৃদ্ধা ঠাকুরমার ত আর আনন্দ ধরে না।

তাড়াতাড়ি খাবার খাওয়াইয়া কাছে বসাইয়া শত প্রশ্নে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। শ্বশুর বাড়ীর সকলের কেমন ব্যবহার, কেমন আদর যত্ন পাইল, কি কি গহনা পাইল ইত্যাদি............।

অমিয়া শত মুখে বৌদিদির প্রশংসা করিতে লাগিল। বলিল—"ঠাকমা, অমন লোক দেখা যায় না। যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমনিই মধুর ব্যবহার। একাধারে সবই মিলিয়াছে—শান্ত স্থির সতর্ক ভালবাসা—আনন্দের সরল পরিহাস ও সমবয়সীর সাহচর্য্য। অমুর যে শ্বশুর বাড়ীর আদর যত্নের কোন অভাব হয় নাই শুনিয়া তিনি অনেক আশ্বস্ত হইলেন। অমুকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া গালটা তাহার একটু টিপিয়া দিয়া বলিলেন "কেমন বর পছন্দ হয়েছে ত?" আসার সময় কি বলে দিলে সে?" "যাও অত আমি জানিনে। বলিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। বৃদ্ধার মুখখানি মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিবার পর অবধি অমিয়ার জীবনে একটা মস্ত পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। এই কয় দিনেই সে যেন কেমন একটু ভারিক্কি হইয়া উঠিয়াছে। তার সেই সকৌতুক চঞ্চল দৃষ্টি ও কারণে অকারণে হালকা হাসি আর নাই। একটা মস্ত গাম্ভীর্য্য যেন তাহার আপাদ মস্তক জুড়িয়া বসিয়াছে। সমবয়সীরা সব ঠাট্টা করিয়া বলিল "এত বড়লোক হ'লি ক'বে?" শুনিয়া সে শুধু মুখ টিপিয়া হাসিত।

সে দিন সকাল বেলায় এক ভিখারিণী আসিয়া গিন্নিমার নিকট একখানা কাপড়ের প্রার্থনা জানাইল। জমিদার গৃহিণী তখন নীচের ঘরে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, বঁটির উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই তিনি উত্তর দিলেন "দেওয়ার মত কাপড় ত এখন নাই বাছা।"

অমিয়া নিকটেই বসিয়া ছিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে ছুটিয়া উপরে গেল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই একখানি লাল পেড়ে সাড়ী আনিয়া ভিখারিণীর হাতে দিল। সে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আজকাল অমিয়ার দয়া দাক্ষিণ্য বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। পরোপকারই যেন তার জীবনের সব চেয়ে প্রিয় ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাড়ার গরীব প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও অসুখের কথা শুনিলে, সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া সেখানে যায়; দিন রাত সেখানে পড়িয়া থাকে ও সেবা শুশ্রূষা করে। গোপনে আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া যায়—ঔষধ পথ্যের অভাব দেখিলেই চুপে চুপে দিয়া আসে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। জামাই ষষ্ঠী। বিজয় নিমন্ত্রিত হইয়া দেবীপুরে আসিয়াছে। নূতন জামাই আসিয়াছে। মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। আদর যত্নের সীমা নাই। আমোদ প্রমোদ, খেলা ধুলা ও গান বাজনার মধ্যেই সারাদিন কাটিল, রাত্রিতে আহারের পর বিজয় শুইতে গেল, কিন্তু অমিয়ার সন্ধান নাই। ও পাড়ার টুনে শাঁখারির ছেলের জ্বর-বিকার তাই অমিয়া সারা রাত সেখানেই পড়িয়া আছে।

বৃদ্ধ টুনে শাঁখারি তাহার টিপ্‌টিপে লণ্ঠনটা হাতে লইয়া যখন অমিয়াকে পৌছে দিয়ে গেল, তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অমিয়া তার ঠাকুরমাকে আসিয়া চুপে চুপে ডাকিল, দরজা খুলিয়া দিতে। দরজা খুলিতেই তিনি বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন আর এখন এলে কেন? আসার আর কি দরকার ছিল?" অমিয়া কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে ঠাকুরমার বিছানার এক পাশে শুইয়া পড়িল। জমিদার গৃহিণীও অনেক বকাবকি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা টুনে ত ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে আস্তে আস্তে বলিল "গিন্নিমা, উনাকে আমার কিছু ব'ল না। উনি ত মানুষ নয়। সগ্‌গের কোন দেব্‌তা শাপ ভেষ্টা হয়ে এই মর্ত্তে এসেছে—আমাদের মত গরীব দুঃখীকে ত্রাণ করতে।" গৃহিণী রাগে গর গর করিতে করিতে দরজা আঁটিয়া দিলেন।

বিজয় দু'দিন থাকিয়া চলিয়া গেল। অমিয়ার সাক্ষাৎ মিলিল না। মা গালি পাড়িতে লাগিলেন। অমিয়া সহজ ভাবেই জবাব দিল "একটা জীবনের চেয়ে আমার আমোদ প্রমোদ বড় নয়।"

সে বার বড়দিনের সময় বাড়ী আসিয়া বিজয় জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তিন চার দিন পর্য্যন্ত জ্বর বিচ্ছেদ না হওয়ায় বৌ দিদি অমিয়াকে আনিতে দেবীপুরে লোক পাঠাইলেন,

কিন্তু আসিবে কে? তখন দেবীপুরের বাগ্দীপাড়ায় ভীষণ কলেরা দেখা দিয়াছে। অমিয়ার স্নান আহারের সময় নাই। কোন দিন বা একবার বাড়ী আসিতে পারিত—কোন দিন বা আসিতও না। তাহাকে ডাকাইয়া মা বিজয়ের অসুখের কথা সব বলিলেন। সে এককথায় উত্তর দিল "সেখানে দিদিমণি থাকিতে তাঁহার শুশ্রূষার কোন ত্রুটিই হবে না। এখানে শত শত মুমূর্ষুকে ফেলিয়া আমি যাইতে পারিব না।" মা ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আমার বাড়ীতে আর তুমি ঢুকতে পাবে না।" "না হয় নাই ঢুকিব'—বলিয়া দরজার মাথায় তাকের উপর হইতে কি একটা পুঁটুলী লইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে অমিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। দেবীপুর হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া সকল কথাই বলিল। বৌদিদি সব শুনিলেন, কিন্তু কোন কথাই বলিলেন না।

বিবাহের পর দীর্ঘ তিন বৎসর অতীত হইতে চলিল। ইহার মধ্যে অমিয়া অনেক বারই মুক্তগ্রামে আসিয়াছে কিন্তু বিজয়ের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। বিজয়ের ছুটীতে বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই অমিয়া মাকে চিঠি লিখিয়া কৌশলে দেবীপুরে চলিয়া যাইত। বিজয়ও ছুটীর সময় যে বার অমিয়া বাড়ীতে থাকিত, সেবার বায়ু পরিবর্ত্তনের নাম করিয়া অন্যত্র রওনা হইত। উভয়ের মধ্যে এই যে ছলনার অভিনয় চলিতেছিল, তাহা অন্য কেহ না জানিলেও বুদ্ধিমতী বৌদিদির বুঝিতে বাকী রহিত না। ব্যথায় তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিত।

(৮)

সেদিন অমিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া সোজাসুজি ফটিক বাগ্দীর বাড়ী আসিয়া উঠিল। ফটিকের স্ত্রী মানু দরজায় হাত দিয়া তাহারই অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অমিয়া আসিয়া দাওয়ায় উঠিতেই মানু ব্যাকুলকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"মা, তোমার ছেলে অমন করছে কেন?" অমিয়ারও চোখে জল আসিল। মানুর আকুল কণ্ঠের মধ্যে যে ব্যথা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল—তাহাই আজ তাহাকে সব চেয়ে বেশী আঘাত দিয়া গেল। "ভয় কি? এক্ষুনি সেরে যাবে।"—বলিতে বলিতে একটু অন্যমনস্ক ভাবেই সে ঘরে ঢুকিয়া ফটিকের শিয়রে বসিতেই মনে পড়িল—তাহার স্বামীও ত একদিন এমনি রোগে পড়িয়া তাহাকে লইতে লোক পাঠাইয়া ছিলেন। আর সেদিন সে উপেক্ষায় সেখানে যাইতে অস্বীকার করিয়াছিল। সেই কঠোর অবজ্ঞা কত ভীষণ ভাবেই না তাঁহার—পীড়িত বুকে বাজিয়াছিল। সেও ত তাঁর বিবাহিতা পত্নী। স্বামীর প্রতি কি তাহার কোন কর্ত্তব্যই নাই। হঠাৎ ফটিক অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—"উহুঃ—হুঃ মা একটু জল।" অমিয়ার চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি পাশের গ্লাসটা উঁচু করিয়া তাহার মুখে ধরিল।

রাত্রি প্রায় দশটায় অমিয়া উদাস প্রাণে বাড়ী ফিরিল এবং কাহারও সহিত আলাপ না করিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া অন্য কাহারও তাহার সঙ্গে কথা বলিবার সাহস হইল না। মা ভাত খাইতে ডাকিলেন। সে উত্তরে জানাইল—তাহার শরীর বড় অসুস্থ হয়েছে। ভাত খাবে না।

আজ বুকে তার শত চিন্তার ঝড় বহিতেছে। তার ব্যর্থ প্রেমের এতটুকু সান্ত্বনা খুঁজিতে সে আজ কোন পথে চলিয়াছে—নিমেষের সুখ স্বপ্নের একটা ক্ষীণ স্মৃতি বুকে লইয়া আজ সে কি করিতে বসিয়াছে—সে কি সেই ক্ষণিক ভুলের একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইতে পারিবে না? তারই জন্য কি আর একটা জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চির ব্যর্থতায় ডুবিতে বসে নাই? ব্যথা ও অনুশোচনায় তার অন্তর কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। আজ তার মনে হইতে লাগিল—যদি একটি বার তাঁর দেখা পাই—পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া লইব। তিনি ত দেবতার মত মানুষ—অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।

(৯)

দিন তিনেক হইল বিজয় প্রবল জ্বর ও বুকে পিঠে বেদনা লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। ডাক্তার দু'বেলা দেখিতেছেন ও ঔষধ দিতেছেন, কিন্তু রোগ

দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বে বুকের এক পাশে ব্যথা ছিল, এখন দুই পাশেই চাপিয়া ধরিয়াছে। বৌদিদি প্রাণপাত করিয়া রাত্রি দিন শুশ্রূষা করিতেছেন—আর তিন বেলা নারায়ণের মন্দিরে মাথা কুটিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না।

আজ দুপুর হইতেই বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ডাক্তারেরা তাহার জীবন সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন, বৌদিদি বিজয়ের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া অমিয়ার মায়ের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন।

মা পত্র পড়িতেছেন। অমিয়া কাছেই বসিয়া আছে। সে সব শুনিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "মা, এক্ষুণি বেহারা ডেকে আমার পাল্কী ঠিক করে দাও। আমি মুক্তগ্রামে যাব।" তিনি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "এখন সন্ধ্যে বেলায় কোথায় যাবি? কাল সকালে তখন সব ব্যবস্থা করা যাবে।" অমিয়া কিছুতেই শুনিল না। জিদ ধরিয়া বসিল—"আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে,—তাই পৌছাতে যত রাত হয়।" জমিদারগৃহিণী বাড়ীর চাকরকে বেহারা ডাকিতে হুকুম দিলেন। অমিয়া নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত সেখানেই বসিয়া রহিল।

বেহারা আসিলে অমিয়া পরণের কাপড়খানা পর্য্যন্ত ছাড়িল না, তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া পাল্কীর ভিতরে গিয়া বসিল। অমিয়া চলিয়া গেল। মা অবাক হইয়া পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মুক্তগ্রামে যখন পাল্কী হইতে বাহির হইয়া অমিয়া সোজা-সুজি বিজয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিল বিজয় তখন একটু স্থির হইয়া শুইয়াছিল। ধীরে ধীরে পাশে বসিয়া বিজয়ের মুমূর্ষু মুখ খানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একবার দেখিতেই, সে ভয়ে আঁৎকিয়া উঠিল। মৃত্যুর একটা কাল ছায়া তাহার সমস্ত চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অন্তরের উচ্ছ্বসিত আবেগ আর অমিয়া চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বিজয়ের বরফের মত হিম পা দু'খানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—"প্রভো! স্বামিন্! আজ দাসী তার ইহকাল পরকালের সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া তোমার পায়ে দিতে ছুটে এসেছে। একবার ক্ষমা কর, প্রভু।" বিজয় একবার তাকাইয়া দেখিল। তার পর অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিল "অমিয়া আজ আর আমার থাকার জো নাই। আমার ডাক এসেছে। তুমি পরে এস। আমি পরপারে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।" আর কিছু বলিতে পারিল না। দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তার চোখের কোণ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, বিজয়ের অবস্থাও তত খারাপ হইতে লাগিল। দু'জন ডাক্তার সারা রাত্রি পাশে বসিয়া জাগিলেন, বৌদিদি আকুল কণ্ঠে ঠাকুরের কাছে কত আরাধনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া গেল!

বিজয়ের মৃত্যুর পর প্রায় এক বৎসর কাটিয়াছে। অমিয়া আর দেবীপুরে যায় নাই। এখন তার জীবনের সম্বল হইয়াছে, ঐ দেওয়ালে ঝুলানো বিজয়ের ছোট ফটোখানা। সব সময় সেইখানাই কাছে লইয়া বসিয়া থাকে। চোখের জলে তার পা ধোয়াইয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া দেয়, তিন বেলা পূজা করে, রাত্রিতে শিয়রে রাখিয়া ঘুমায়। এক কথায় ওই ধ্যান লইয়াই আছে। এক বৎসর পূর্ব্বে যে অমিয়াকে দেখিয়াছে আজ সে তাহাকে দেখিলে চমকাইয়া উঠিবে। মৃত্যুর একটী স্পষ্ট আভাস যেন তার শীর্ণ মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উৎকট মানসিক চিন্তায় অন্তরের আগুনে অহরহ পুড়িয়া পুড়িয়া সে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

আজ ক'দিন হতে অমিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বৌদিদি ডাক্তার ডাকিবার প্রস্তাব করিতেই সে ত্যক্ত হইয়া পড়ে। বৌদিদি নীরবে অশ্রুমোচন করেন।

সে দিন দুপুরে অমিয়ার অবস্থা বড় খারাপ হইয়া পড়িল। প্রবল জ্বর, মাঝে মাঝে দুই একটা ভুল বকিতেছে। বৌদিদি শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছেন। তাহার মরণোন্মুখ মুখের পানে এক এক বার চাহিতেছেন, আবার অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছেন।

অমিয়া বৌদিদির পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। ইঙ্গিতে বিজয়ের ফটোখানা তাহার মাথায় একবার স্পর্শ করাইতে বলিল। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল—"দিদিমণি, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আমি আজ **মিলন পথে**। ঐ দেখ, আজ তিনি আমায় কত ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছেন। আনন্দের একটী ক্ষীণ জ্যোতি তাহার সমস্ত চোখে মুখে ভাসিয়া উঠিল। আকস্মিক মানসিক উত্তেজনার ফলে একবার রক্ত বমি হইল। পর-ক্ষণেই বৌদিদি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বিশ্বামিত্র

শ্রীনন্দগোপাল সেন গুপ্ত

দিবা অবসান প্রায়—পক্ষ প্রসারিয়া
আঁধার-বিহঙ্গী ওড়ে আকাশের বুকে,
পশ্চিম দিগন্ত প্রান্তে শেষ আলোটুকু
ঝিলিমিলি করে শুধু অস্ফুট ব্যথায় !
কানে বাজে অরণ্যের চকিত মর্ম্মরে
কার দীর্ঘশ্বাস মাখা বিষণ্ণ সঙ্গীত।
কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন, উদাস নয়নে
চেয়ে আছি দূরপানে যেন মনে পড়ে
একদিন এ জীবনে ছিল বহুকাজ—
ছিল শৌর্য্য, দম্ভ দৃপ্ত কঠোর প্রয়াস,
যার বলে উল্লঙ্ঘিয়া নিজ জন্ম-লিপি
গ'ড়েছিনু নব বিশ্ব, নব জন্ম-ধারা—
বিধাতা দিয়েছে বাধা, দিয়েছে সমাজ,
শৃঙ্খলা হেসেছে হাসি—দেখিনি চাহিয়া।
এই নিত্য সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু ভরা
কষ্টের সংসার হ'তে আরো পূর্ণতর,
আরো সুষ্ঠু, আরো উচ্চ, হবে মোর ধরা
এই ছিল অভিলাষ। সে দিনের সেই
আত্মবলে বলীয়ান বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ,
সেই উগ্র তপস্যার উত্তর সাধক,
এই আমি ? কোথা গেল সে দুর্দ্দম স্পৃহা ?
সে বিরাট কর্ম্ম শক্তি ? আজ চেয়ে থাকা
শুধু দূরে ব্যর্থ ক্ষোভে, বৃথা অভিমানে,
নিঃসাড় পঙ্গুর মতো—অগ্ন্যুৎপাৎ শেষে,
যেমন তুহিনাবৃত পাষাণের স্তূপ।
নিষ্ফল জীবন মম—তাই মনে পড়ে—
মনে পড়ে ফাল্গুনের প্রথম প্রত্যুষে,
ছায়াচ্ছন্ন বিন্ধ্যবনে, নর্ম্মদার তটে,
ব'সেছিনু যোগাসনে। বসন্ত আগমে
রোমাঞ্চিত বনাঞ্চল—বিহঙ্গ-কাকলী,
নির্ম্মল শিশির-স্নাত নূতন আলোক,—
নর্ম্মদার নিরলস মর্ম্মরিত ধ্বনি,
প্রস্ফুটিত কুসুমের শুভ্র সমুজ্জ্বল
নিষ্কলুষ স্নিগ্ধ হাসি, মধুপ গুঞ্জন—
মৃদুমন্দ গন্ধবহ, চঞ্চল পুলক
জলে-স্থলে—গিরিদরী উপত্যকা তলে,
প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল জাগরণ রেখা ;
তারি সাথে আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে,
মূর্ত্তিময়ী ঊষা যেন দিল দরশন—
নিদ্রাতুর নিশীথের যবনিকা ভেদি !
বিলোল অলকদাম, কুসুম মঞ্জীরে
শৃঙ্খলিত পদদ্বয়, অপাঙ্গের কোণে
ঈষৎ সলজ্জ হাসি, বিবশ-চঞ্চল
বাসন্তী শাটিকা সঙ্গে ; সুগৌর বরণ,
পীনোন্নত উরস্থল, সারঙ্গী-চপল—
ত্রস্ত পদে, স্রস্ত বেশে, দাঁড়াল' আসিয়া
কেকারব মুখরিত নীপ তরুতলে ;—
শিখিনী ভুলিল নৃত্য, হরিণ-হরিণী
ঊর্দ্ধে তুলি গ্রীবাদেশ, নবতৃণদল
সমাচ্ছন্ন বনভূমি হ'তে, অপলকে
রহিল চাহিয়া সেই মোহিনীর পানে।
তুমি কি বাসন্তী-সখি, আসিলে ভূতলে,
পরিপূর্ণ বসন্তের মাধুর্য্য লীলায়
উদ্বেলিত বনান্তের শোভা সন্দর্শনে,

অথবা জীবন্ত কোন স্বপনের ছবি
সহসা উঠিলে ফুটি প্রভাত আলোকে,
তপোবন ললামস্তুতা উষাঙ্গীর মতো— ?
কিংবা কোন দূরগত বিস্মৃত গীতের
সদ্যজাত সচঞ্চল মূর্চ্ছনার মতো,
ধীরে ধীরে নেমে এলে হৃদি-উপকূলে
অন্ধকার অনন্তের ছায়া-লোক হ'তে ?
শিহরিল বন-ভূমি অশোকে কিংশুকে,
মুকুলিত আম্রবনে বহিল সহসা
যৌবনের দীর্ঘশ্বাস ; ধ্যান ভঙ্গ হ'লো—
দেখিলাম বক্ষ হ'তে গিয়াছে খসিয়া
চীনাংশুক, সুপীবর বাম উরুদেশ
বায়ু-বেগ-হিল্লোলিত অঞ্চলের ফাঁকে
ঈষৎ পড়িল চোখে—যেন একখানি
কালো মেঘ আবরিয়া মেখলা প্রদেশ
লুটায়ে প'ড়েছে পায়ে। হায় রে সেরূপ
বৈশাখের দীপ্তিমান্ রবি-রশ্মি সম
ঝলসিল আঁখি মম, বল্কলের তলে
বক্ষ-রক্ত তালে তালে উঠিল নাচিয়া
মন্ত্রমুগ্ধ, গীতাসক্ত, ভুজঙ্গের মতো !
লক্ষকোটি বৎসরের বার্দ্ধক্য বিদারি,
অন্তরের গূঢ়তম অন্তর প্রদেশে,
অবলুপ্ত যে যৌবন, হ'লো জাগরিত
সহসা সে জীর্ণতার প্রাসাদ-শিখরে।

* * *

তারপর কেন হায় হ'লো না মরণ ?
না, এ বৃথা অনুতাপ ! আমার কি দোষ ?
আমি কি ক'রেছি ত্রুটি কোন দিন তরে,
রোধিয়া ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সংযম সাধিতে ?
যোগ-যাগ-ব্রহ্মচর্য্য নানা কৃচ্ছ্র ব্রত
ক'রেছিত আজীবন, লোকালয় ত্যজি
এসেছি নির্জ্জন বনে ; তবু যদি কোন
অসতর্ক বসন্তের উন্মাদ বাতাসে
সহসা ভাঙিয়া যায় সংযমের বাঁধ,
কারে তবে দিবে শাপ ? কার মূঢ়তার
ত্রুটি ল'য়ে বাধাইবে মিথ্যা হানাহানি ?
অন্তরের অন্তস্তলে শুধু একবার
দেখ' চেয়ে আপনার, দেখ কি ভীষণ
লোলুপ অতৃপ্তি ল'য়ে পিপাসা রাক্ষসী
ব'সে আছে নিশি দিন, ত্যাগের শৃঙ্খলে
যতই বাঁধনা তারে, যদি একবার
কোনরূপে মুক্ত পায় পাষাণ-পিঞ্জর
কদর্য্য নগ্নতা লয়ে হইবে বাহির
বীভৎস স্বরূপ তার। যত ঘৃণা কর'
যত তারে দাও গালি সকলই নিষ্ফল !
অন্তরে লুকায়ে রাখি ভোগের বাসনা,
শুষ্ক বৈরাগ্যের বেশে কারে দিবে ফাঁকি ?
আমি ত মানব বটে, মানবের মতো
গহন অরণ্য হ'তে কুসুম তুলিতে,
যদি বিঁধে থাকে কাঁটা, তারি গ্লানি ব'য়ে
কাটাব' কি এ জীবন ? নিমেষের ভুল,
চিরন্তন হ'য়ে রবে, আর মানবের
অন্তরের চিরন্তনী অতৃপ্ত পিয়াসা
দিবে আত্ম বলিদান বৈরাগ্যের পায়ে ?

কুটীর শিল্প

শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন শাস্ত্রী

কুটীরে বসিয়া যে নানাবিধ দ্রব্য অনায়াসে ও সহজ প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, কেবল তাহাই কুটির শিল্প বলিয়া ধরা হয় না, বরং সাধারণ গৃহস্থগণ, বিশেষতঃ রমণীরা তাহাদের গৃহস্থালীর নানা কর্ম্মের অবসরে যে প্রয়োজনীয় ও মনোরম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন কুটীরে বসিয়াই হউক আর অট্টালিকায় বসিয়াই হউক, তাহাকেই কুটীরশিল্প বলা যাইতে পারে। কুটীর শিল্প বলিতে আমরা উল্লিখিত প্রকারের দ্রব্য উৎপাদন পদ্ধতি বুঝি বলিয়া দরিদ্রের কুটীর হইতে ধনীর অট্টালিকা পর্য্যন্ত সকল স্থান হইতেই আমরা তাহার আশা করিতে পারি।

আমাদের দেশে এককালে কুটীর শিল্পের যথেষ্ট সমাদর ছিল। এমন কি, শুক্রনীতিকার ইহাও বলিয়াছেন যে পূর্ণাঙ্গ যুবকদিগকে বাদ দিয়া বিকলাঙ্গ, হীনাঙ্গ অন্ধ আতুর দিগের দ্বারাও তখন অনেক শিল্পানুশীলনের সুব্যবস্থা করা হইত। প্রাচীনকালের ত কথাই নাই মধ্যযুগেও কুটীর শিল্পের আদরের অবধি ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কুটীর শিল্প অট্টালিকাবিহারিণীদের অবসর বিনোদন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের কথঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়ের উপায় ও দরিদ্রের জীবিকা নির্ব্বাহের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল, এবং কার্য্যতঃ প্রাসাদ হইতে কুটির পর্য্যন্ত ইহার অবাধ স্বচ্ছন্দ প্রসার দেখা যাইত। বর্ত্তমান কালে স্বাধীনজাতি সমূহের মধ্যে কুটীর শিল্পের যথেষ্ট প্রচলন ও প্রভূত সমাদর থাকিলেও আমাদের দেশে তাহা প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কুটীর শিল্প ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম সহায়, কারণ ইহাতে অধিকার থাকিলে অন্যের অধীনতা স্বীকার না করিয়াও গৃহে বসিয়াই লোকের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হয়। যাহার জীবিকা নির্ব্বাহের কোন প্রকার উপায় আছে ইহাতে ক্ষমতা থাকিলে সামান্য অর্থের জন্য তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

প্রাচীনকালে নানাবিধ শিল্পে অধিকার না থাকিলে কেহই প্রকৃত শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না। শিল্পে অধিকার থাকা তখন বিশালরাজ্যের অধিপতিদেরও গৌরবের পরিচয় ছিল, এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতের রাজন্যবৃন্দও কোনও না কোনও শিল্পে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নিপুণ শিল্পী বলিয়াও পরিচিত ছিলেন তাঁহাদের অর্থের বা অন্য কোনও প্রকার দ্রব্যের অভাব ছিল না। তথাপি তাঁহারা স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগী বিদ্যার অতিরিক্তও কিছু শিখিয়া রাখিতেন; এমন কি সেই কার্য্য তাহাদের পদ ও প্রতিষ্ঠার উপযোগী না হইলেও হতাদর হইত না। সেই জন্যই দেখিতে পাই মহারাজা নল পাচকের ও অশ্ব চালকের কার্য্য, অর্জ্জুন নৃত্যগীত, ভীম পাচকের কার্য্য, যুধিষ্ঠির অক্ষকৌশল, নকুল ও সহদেব গো চিকিৎসা ও অশ্ব চিকিৎসা এবং বৎসরাজ উদয়ন বীণাবাদন ও তিলক রচনা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অদৃষ্টের বিপর্য্যয়ে তাঁহারা যখন বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের উক্ত বিদ্যাসকল কাজে লাগিয়া ছিল। যদি নল যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরও শিল্পকার্য্যে নৈপুণ্য অগৌরবের পরিচয় না হয় তবে সামান্য মানবের শিল্পশিক্ষায় অপমান বোধ না হওয়াই উচিত। ইংরাজীতে যাহাকে Liberal Education বা উদার শিক্ষা বলে তাহারও প্রকৃত অর্থ এই যে, শিক্ষনীয় যে কোনও বিষয় অবজ্ঞা না করিয়া শিক্ষা করা। দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল আমাদের দেশে তথা কথিত অনেক শিক্ষিত নর ও নারী শিল্পশিক্ষাকে গৌরবজনক বলিয়া মনে করেন না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ইহা একপ্রকার দাসোচিত মনোবৃত্তির পরিচয়; কারণ মানব স্বাধীনতা হীন হইয়া দাস হইয়া পড়িলে তাহার কতকগুলি অলীক অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শিল্পকার্য্যে

অনাস্থা সেই অলীক অভিমানেরই কাজ। এই অলীক অভিমান আমাদের অনেক দুঃখ ও দুর্দ্দশার কারণ, আর এ কথাও সত্য যাহারা অবসর কালে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাধীনতা লাভে উদাসীন জাতিগত স্বাধীনতা ও সৌভাগ্যের অধিকারীও তাহারা কখনই হইতে পারে না।

বাৎস্যায়ন ঋষি প্রভৃতি প্রণীত প্রাচীন শাস্ত্রে চতুঃষষ্টি কলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কাহার কাহারও মতে কলা বা শিল্পের সংখ্যা চারিশত আশি। প্রাচীন কালে জন সমাজে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে সকলকেই এই সকল কলায় নৈপুণ্য লাভ করিতে হইত। পূর্ব্বে নল প্রভৃতির যে সকল কলানৈপুণ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহাও এই সকল কলার অন্তর্গত। চতুঃষষ্টি কলা অতিবিস্তীর্ণ, নিম্নে তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি কলার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। বলা বাহুল্য বর্ত্তমানে কুটীর শিল্প বলিতে যাহা বুঝায় ইহারা তাহার অন্তর্গত।

(১) আলেখ্য বা চিত্রশিল্প—চিত্রশিল্প যে কত মনোরম তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে যেমনই চিত্তবিনোদন হয়, তেমনি আবার নৈপুণ্যলাভ করিতে পারিলে খ্যাতি ও অর্থলাভ উভয়েরই সম্ভাবনা আছে, যে দেশে এক একখানা উত্তম চিত্র এরূপ অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় যে তাহাকে কুবেরের ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আমাদের দেশে তত অধিক মূল্য দিবার লোক না থাকিলেও চিত্র উৎকৃষ্ট হইলে যথেষ্ট অর্থলাভ হইতে পারে।

(২) রঞ্জন শিল্প—অথবা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিবার বিদ্যা। বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতেও অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন। সূত্র, রেশম এবং পশম নির্ম্মিত বস্ত্রাদির রঞ্জন বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে ও বিভিন্ন প্রণালীতে করিতে হয়। বস্ত্রাদির উপরে ফুল, লতাপাতা প্রভৃতির ছাপ দেওয়াও এই বিদ্যার অন্তর্গত। বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশে রঞ্জিত বস্ত্রের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, ইয়োরোপীয়েরাও রঞ্জিত বস্ত্রের আদর করিয়া থাকে। রঞ্জনশিল্পেও প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে।

(৩) ভুষণ-যোজন অর্থাৎ মুক্তা, পুঁতি প্রভৃতি যোগে বিচিত্র ভুষণ রচনা। বস্ত্রাদির উপর শলমা ও চুমকির কাজ করাও ভূষণ যোজনের অন্তর্গত, অনেকে এই কার্য্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকেন।

(৪) গন্ধযুক্তি—সুগন্ধ তৈল, সুগন্ধি সাবান, চুলের কলপ, জুতারকালি প্রভৃতি প্রস্তুত করা ইহার অন্তর্গত।

(৫) ভক্ষ্যবিকার—নানাবিধ চাটনী, মোরব্বা, জাম, জেলী প্রভৃতি প্রস্তুত করা।

(৬) কর্ণপত্র ভঙ্গ—অথবা হস্তিদন্ত, শঙ্খ, প্রবাল, ঝিনুক প্রভৃতিদ্বারা নানাবিধ অলঙ্কার ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করা।

(৭) সূচীবান কর্ম্ম—এই শিল্প তিন ভাগে বিভক্ত যথা (ক) সীবন অথবা জামা প্রভৃতি প্রস্তুত (খ) উতন বা রিপু কর্ম্ম এবং (গ) বিরচণ অথবা শাল ইত্যাদির উপর সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য কিংবা বুটি তুলিবার কার্য্য।

(৮) পট্টিকাবেত্রবান—অর্থাৎ বাঁশ, বেত, নারিকেল পত্রের কাটি প্রভৃতির সাহায্যে টেবিল, চেয়ার, আল্না ফুলের সাজি, ধামা, ডালা, কুলা প্রভৃতি প্রস্তুত করাও এই বিভাগের অন্তর্গত। ব্রহ্মদেশ ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই সকল কার্য্যে যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। ইহা করিতে পারিলেও বিলক্ষণ অর্থাগম হয়।

(৯) ধাতুবাদ—স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তর ও মণিমুক্তাদির যোজনা, মীনার কাজও এই বিভাগের অন্তর্গত।

(১০) তর্ক্ কর্ম্ম—অথবা কুঁদের সাহায্যে কাষ্ঠ ও ধাতুময় দ্রব্যাদির মসৃণতা ও উজ্জলতা সাধন।

(১১) পুষ্প শকটিকা—অথবা কাগজ, টিন, কাষ্ঠপ্রভৃতির দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকট ও অন্যান্য ক্রীড়নক প্রস্তুত।

এইরূপ আরও অনেক শিল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যেই আরও বহুশিল্প অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ 'আলেখ্য' বলিলে মাত্র পটের উপর চিত্রাঙ্কন নহে, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর গালার সাহায্যে ফুল ফল প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন, ভিত্তিগাত্রে চিত্র অঙ্কন প্রভৃতিও এক আলেখ্য বলিতে বুঝিতে হইবে। কাঁথা সেলাই প্রভৃতি সূচীবান কর্ম্মের অন্তর্গত। বলা বাহুল্য কন্থা বা কাঁথা একটি উত্তম শিল্প। এ যুগেও

সূক্ষ্ম শিল্পের জন্য একখানা কাঁথা পঞ্চাশ কি ষাট টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইতে দেখা গিয়াছে। মৎস্যশল্ক বা মাছের আঁসদ্বারা নানাবিধ দ্রব্যপ্রস্তুত কর্ণপত্রভঙ্গের মধ্যে পড়িয়াছে। তক্ষুকর্ম্মের মধ্যে কাষ্ঠদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলিকা ক্রীড়নক নির্ম্মাণ পুস্পশকটিকার অন্তর্গত। ধাতুর উপর নাম খোদাই করা, ব্লক্ নির্ম্মাণ ও স্বর্ণকার দিগের নিমিত্ত ছাঁচ প্রস্তুত করাও ধাতুবাদের অন্তর্গত।

একটু চেষ্টা করিলে অনেক পুরুষ ও রমণী বহু কুটীর শিল্পে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন, যে সকল দেশ ব্যবসায় বা বাণিজ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে সেই সকল দেশেই কুটীরশিল্পের যথেষ্ট প্রচলন আছে। জাপান আমেরিকা ও জার্ম্মাণীর আমদানী যে সকল বালকদের ক্রীড়নক, অথবা গৃহসজ্জার উপকরণ আমরা ক্রয় করিয়া থাকি তাহার অধিকাংশই তদ্দেশবাসিনীগণের কুটীর শিল্প ব্যতীত আর কিছু নহে। ব্রহ্মদেশ যে চুরুটের জন্য বিখ্যাত তাহাও ব্রহ্মমহিলাদের হস্তে প্রস্তুত। কলিকাতার সহরে অনেক ভদ্র মহিলা সলমা, চুম্‌কী ও জরীর কার্য্য করিয়া বিলক্ষণ আয় করিয়া থাকেন। ঐরূপ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক ভদ্র মহিলা বস্ত্রের উপরে রেশমের বা সুতার ফুল তুলিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ইয়োরোপের অতি উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রমহিলারাও মোজা, গলাবন্ধ ও লেশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। তবে যে সকল দেশে কুটীর শিল্প প্রচলিত আছে সে সকল স্থানে তাহাতে উৎসাহ দান করিবারও বহু ব্যক্তি আছেন। সে স্থানের বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই সকল কার্য্যে সাধারণকে উৎসাহ দান করেন ও তাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় করিয়া পৃথিবীময় বিক্রয় করেন আর আমরা আমাদের দাসোচিত মনোবৃত্তির ফলে বিদেশের কুটীর শিল্প জানিয়া ও না জানিয়া ক্রয় করি কিন্তু স্বদেশজাত দ্রব্যের জন্য মৌখিক উৎসাহ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য করি। কুটীর শিল্প প্রদর্শনের জন্য আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী হয়, কিন্তু বিদেশীয় ব্যবসায়ীরাই তাহাতে লাভবান হয় বলিয়া মনে করি। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে আমরা যাইয়া মাত্র দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিয়া চলিয়া আসি, পক্ষান্তরে বিদেশীয়েরা সে স্থানে আগমন করিয়া তাহাদের নক্‌সা লইয়া যায় ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবগত হইতে চেষ্টা করে এবং পরে তাহাদের দেশ হইতে ঐরূপ জিনিষ কুটীরে কুটীরে প্রস্তুত হইয়া আমাদের দেশে আগমন করে ও অর্থব্যয় করিয়া আমরা তাহা ক্রয় করি। ফলে এক একটী প্রদর্শনীতে আর কিছু লাভ হউক বা না হউক আমাদের দেশে এক একটি শিল্প যেন লোপই পাইতে থাকে।

শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইলেও আমরা যদি তাহার অন্তর্নিহিত সদভিপ্রায় বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে এইরূপ প্রদর্শনীর কোনও সার্থকতা থাকে না। যেদিন আমরা কুটীর শিল্পের উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের বহুল প্রচারে সাহায্য করিব সেদিন দেশের প্রভূত উন্নতি হইবে। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতিসাধনে যদি কেহ আগ্রহবান হন তবে তিনি যে স্বদেশীয় কুটীর শিল্পের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্গ কবি যথার্থ ই বলিয়াছেন :—

* * *

যে দেষের কৃষীবল শিল্পে দিবে মন,
পূজিবে বাণীর বীণা যাব সেই দেশে।"

প্রার্থনা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

বর্ণ যাঁহার কুন্দকুসুম
তুষার এবং চন্দ্র রে,
শুভ্র শুচি ভূষণ যাঁহার অঙ্গে
হস্তে যাঁহার পায় শোভা ঐ
বীণার বরদণ্ড রে,
শ্বেত শতদল আসন গড়ে রঙ্গে।

বিষ্ণু বিধি মহেশ্বর
যাঁরে করেন বন্দনা
দেব্‌তারা যাঁর ধ্যানে মগন নিত্য,
নিঃশেষেতে নষ্ট করেন
সব জড়তার লাঞ্ছনা,
সেই বাণী মোর শুদ্ধ করুন চিত্ত।

গল্প, গপ্প নয়

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

আজ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না—তখনও না—এখনও না—যে কি করে শৈলেন সেদিন অত বড় ভুলটা করে ফেল্ল! কেননা মেডিকেল কলেজের সে একজন মেধাবী ছাত্র বলেই সকলে মানতো—অবশ্য মৃত পিসিমার লক্ষাধিক টাকা পাবার আগে।

সে দিন দু'জনে এক ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলাম। ফেরবার পরে কাপড় বদলিয়ে সে এলো আমার রুমে—শোবার আগে একটু গল্প করতে। আমি পাশের ঘরেই "নলিনের সঙ্গে একটা কথা বলতে কয়েক মিনিটের জন্য গেছি এমন সময় সে বলে উঠল—

"মণি, আমার মনে হচ্ছে জ্বর আসবে—তোর কুইনিনের শিশিটা কোথায় বলত,—চার গ্রেণ খেয়ে ফেলি—" আমি পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বল্লুম—"বাঁদিকের তাকের উপর আছে—এক একটা পিল্ চার গ্রেণ করে—।"

গল্প গুজব চলছিলো কি একটা বিষয় নিয়ে। মিনিট্ কতক যেতেই শৈলেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার চেয়ারে ঢ'লে পড়লো। আমি চম্‌কে উঠে এসে দেখি—সে প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে গ্যাছে।

কি রকম? এই কথা বলছিলো আর হঠাৎ? একটু ভেবে দেখি—ঠিক্ ঠিক্, এবার হয়েছে।

সোজা তাকের কাছে গিয়ে দেখি—মহা মুস্কিল।

তাকের উপর কুইনিনের শিশি কোথাও নাই। মর্ফিয়ার শিশিটা সামনেই খোলা পড়ে আছে। উপরের তলায় আর একজন এম্-বি ছিলো, তাকে পাঠিয়ে দিলুম বৃদ্ধ ডাক্তার কৃষ্ণরতন সরকার মশায়কে আনতে। দুটো মোড়ের পরেই তাঁর বাড়ী। টাকার বিষয় চিন্তার দরকার ছিলো না—কারণ শৈলেন অগাধ টাকার মালিক।

*　　*　　*　　*

সরকার মশাই এলেন; খরচ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা না ক'রে আমরা নবাবী চালে তার চিকিৎসা সুরু করতে বল্লাম। সীট্রেট্ অব্ ক্যাফেইন্ ঘন ঘন ডোজ্ হিসাবে এবং পেয়ালার পর পেয়ালা কড়া কফি খাওয়ানো চলতে লাগল শৈলেনকে দাঁড় করিয়ে দুজনে দুদিকে ধ'রে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করান হ'ল। বৃদ্ধ সরকার মশায় কল্পনানেত্রে অদূরবর্ত্তী মোটা রকমের লাভের আশায় শৈলেনকে চিম্‌টী কাটা থেকে সুরু ক'রে গোটাকতক চড় পর্য্যন্ত বসিয়ে দিলেন নিশ্চিন্ত চিত্তে! Eand তমার এম—ডি মনের সাধে বেশ গুছিয়ে তাগ্ করে মিলিটারী মেজাজে বসিয়ে দিলে এক লাথি। এবং আমাদের বুঝিয়ে দিলে—"কি করব ভাই, জীবনে লক্ষপতিকে লাথি মারবার সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে কখনও?"

ঘণ্টা দুই ধরে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করার মতো অবিরত প্রশ্বাস-প্রণালী চলবার পর শৈলেন একটু চোখ্ খুলতে সরকার বললেন,—"আর ভয় নেই। কিন্তু অন্ততঃ আরও ঘণ্টা দুই একে জাগিয়ে রাখতে হ'বে। কথাবার্ত্তা, হাসি-তামাসা আর মাঝে মাঝে দু একটা ধাক্কা দিতে পারলেই ওটা হ'বে'খণ। যখন দেখবে—এর পল্‌স্ আর রেস্‌পিরেশন্ বেশ নরম্যাল তখন ঘুমুতে দিও। আমি চল্লুম।"

*　　*　　*　　*

আমি জেগে বসে আছি—।

শৈলেন বাবা শিব ঠাকুরের মতো আধ-খোলা আঁখিতে ঢুলছে দেখে আমি আবার কাজ সুরু কল্লুম।

"খুব যমের বেড়া ডিঙ্গিয়েছ বাবা—যে কাণ্ড ক'রে বসেছিলে—। যাই হোক্, এ যাত্রা নমঃ নমঃ ক'রে উঠে বস দিকিনি গোপাল—, আচ্ছা শৈলি—প্রফেসর মৈত্র কি একবারও বলেনি যে এম—ও—আর—পি—এইচ—আই —এ" এর উচ্চারণ কুইনিন নয়? ধন্য জন্মগ্রহণ করেছিলে বাবা। যাই হোক সে সব কথা কাল হ'বে—কিন্তু তোর বাপু হওয়া উচিত ছিলো তাই—"

শৈলেন একটা হ্যাব্‌লা ক্যাবলার মতো ফ্যাল ফ্যাল্ করে তাকিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লো—"ম—ন্নি, আমার মন্—নে, হচ্ছে—মোম্—মাছি হ'য়ে গুন্‌নন্ গুন্‌ন্—ন্ করে—বি-বি বিরক্ত করিসনে, ঘুমগে—"

ব্যাস্—। দু'পলকের মধ্যেই শৈলেন একেবারে ন্যাতা। ওর ঘাড় ধরে আচ্ছা করে নাড়া দিয়ে বললুম—"ওই মর্কটের বাপ কর্কট কোথাকার—ওসব চল্‌বে না বলে দিচ্ছি—"

শৈলেনের ওজন হচ্ছে দু'মণ তেরো সের। একলা ওকে উঠিয়ে বাঁদর তাড়ানো খেলা করাবার আশাটা আমার পক্ষে বুনো হাতীর পায়ের কাছে সাওলা গোছের, কাজেই চিন্তা করতে লাগ্‌লুম—"কি করে ওকে জাগিয়ে রাখা যায়……।

…ঠিক্ ঠিক্। রাগিয়ে দেওয়ার চেয়ে বড়ো ব্যবস্থা আর নেই। কিন্তু কি ক'রে? ওর ত' কোনো খুঁত নেই। একেবারে আদর্শসূচক চরিত্র—"ঘোড়ামার্কা" চুণের মতো সাদা। বিনয়-নম্রতায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। নারী সম্বন্ধেও একেবারে শঙ্করাচার্য্য! তবু মনে মনে একটা মতলব ভাঁজলুম। প্ল্যানটা বেশ গুছিয়ে নিয়ে দেখি—একেবারে ওয়ারটালু যুদ্ধজয়ের নক্সা!!

* * * *

মুখে চোখে দারুণ ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে শৈলেনের ঘাড় ধরে খুঁটী-তোলা-গোছ নাড়া দিতে লাগ্‌লুম। আলস্যস্তিমিত নেত্র মেলে সে তাকাল। আমাদের গাঁয়ের কালাপিসির মতো কাংসবিনিন্দিত স্বরে আমি বললুম—"শোনো শৈলেন, তোমাতে আমাতে খুবই বন্ধুত্ব আছে মানি, কিন্তু যে দুর্ণাম তোমার শুন্‌লাম, এর পরে আমার দোর তোমার কাছে চিরকালের মতো বন্ধ হ'ল আজ থেকে। নীচ-মনা, হীন, বিশ্বাসঘাতক কোথাকার।"

এবার যেন শৈলেনের চেতনা আস্‌ছে ব'লে বোধ হ'ল। —"মণ—ই ভ্যাপার কি ভল্‌তো? গায়ে চামচ্ছিকে ভসেছে নাগি? নাগ্যের ভেতর মশা?

ভোঁ—বৃর্‌র্—!"

—"হয়েছে হয়েছে থাক্। পিসির অগাধ সম্পত্তি পেয়ে দুর্ব্বুদ্ধির প্যাঁচ আল্‌গা হয়ে গ্যাছে—না?—শয়তান্, ডাষ্টবিন্ কোথাকার। টাকা পাওয়ার আগে যার হৃদয়ে গিয়ে খেলা করেছো—সে এখন গরীব—পাড়াগেয়ে—না? ভীরু বন-হরিণীর মতো সরলা যেই পল্লীবালিকার সঙ্গে গিয়েছিলে ফ্লার্ট করতে? লজ্জা করে না তোমার সে অভাগী কি ভাব্‌ছে বলোতো—? সমস্ত ধনীদের উপর তার কেমন ঘৃণা হচ্ছে বলতো?"

হতভাগ্য শৈলেন। কিন্তু—"কি করা যাবে—? নিরুপায়। ওর ওঠ্‌বার চেষ্টা দেখে বুঝতে পারলুল—চটেছে। আর এ অমূলক অপবাদে চটাই স্বাভাবিক; কারণ নারী সম্বন্ধে ও নির্জ্জলা-চরিত্র বলে সমস্ত জানি, প্রেম করা দূরে থাক্, তার বানানই বোধ করি ও জানে না! একে বলিষ্ঠ গুণ্ডাকৃতি, তায় নাগপুরে বাড়ী;—উত্তেজনায় ওর চোখ যেন জল্‌ছিলো। কাঁপতে কাঁপতে সে বল্‌লে—"মাথা ঘুড়োঁ করে দেব জানিস্—?" উঠ্‌তে চেষ্টা করল সঙ্গে সঙ্গেই অতবড় জোয়ান হলেও এখন একেবারে ভিজে ব্লটিং এর মতোই দুর্ব্বল। আমি এক হাতেই ধাক্কা মেরে ওকে বসিয়ে দিলুম।

আমি উঠে একটা চুরুট ধরালুম। আমার যে এমন অপূর্ব্ব অভিনয় শক্তি আছে, আগে তা জান্‌তুম না। মনে মনে অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠ্‌লুম।

একটু পরেই শৈলেনের নাসিকা ধ্বনি কানে আসতেই ফিরে দেখি স্যাকরার হাপরের মত ওর উদরটি নামা ওঠা কচ্ছে; কাছে গিয়ে টেনে মেরে দিলুম ঘাড়ের ওপর মেছো বাজার মার্কা এক রদ্দা! কিন্তু কোথায় গেল তার রাগ! সে আমার দিকে হাসিমুখে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার ভাবে ফুর্ত্তিবাজ ছোক্‌রার মতো চেয়ে রইল। শৈলেন—তুমি যতো শিগ্‌গির পারো আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। আমি ত বলেই দিয়েছি—তোমায় আমি এখন কি চোখে দেখি; এখনও যদি তোমার মধ্যে আত্মসম্মানের এক কণাও থাকে তবে আর কখনও ভদ্র সমাজে ঐ মুখ দেখাবার আগে বারকতক চিন্তা করো।

সেই সরলা বালিকা—যাকে অনেক সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে ভুলিয়েছ, সে এখন তোমার কাছে কলসী কাঁখে ময়লা

শাড়ী পরা নিতান্তই গেঁয়ো মেয়ে—কেমন? সে আর এখন বিডনষ্ট্রীট দিয়ে তোমার পাশে হাট্‌বার উপযুক্ত নয়? নাগরা, হাত কাটা ব্লাউজ, হেয়ার ক্লিপ এসব পরতে জানে না বলে—না? এতোই টাকার গরম হয়েছে তোমার নির্লজ্জ, নীচ মনা, নষ্টচরিত্র কোথাকার! অসহায় অভাগিনী বালিকা সে—তুমি কি বলে তার কচি বুকখানা ভেঙ্গে দিচ্ছো এরকম অবহেলা দেখিয়ে? দূর হও, তোমার সঙ্গ ছাড়তে পার্‌লে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচবো!"

অনর্গল ব'কে ব'কে একটু দম নেবার জন্য থামতে হল। পেছন ফিরে আরসীতে দেখি শৈলেন নড়চে—চকিতে ঘুরে দাঁড়ালুম—কেননা, ঘাড়ের উপর দুমন তের সের ওজনের কোন বস্তুকেই আচম্বিতে পড়তে দিতে রাজী নই।

এবারে আগের চেয়ে একটু স্পষ্ট করে বল্‌তে লাগল "আমি তোকে ও রকম করে বলতে পারতুম্ না মণি, হাজার অপরাধ করলেও না—

"আচ্ছা ঘাবড়াস নে—আমি উঠতে পাল্লে হয় একবার। জানলা গলিয়ে তোকে যদি ট্রামের ছাদে না ফেলে দিই তখন বলিস্।"

আর বাস্তবিক পক্ষে আমারও বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল একটা নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষীকে এরকম কল্পিত অপবাদ দিতে।

যাই হোক—কাল এ কথা নিয়ে একচোট হাসা যাবে মনে করে নিজেকে বোঝালুম।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই শৈলেন আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ওর পাল্‌স আর রেস্‌পিরেশন দিচ্চে বেশ নরম্যাল মনে হওয়াতে আমিও ক্লান্ত দেহে পাশের রুমে গিয়ে শয্যাশ্রয় গ্রহণ করলুম।

*   *   *

সারা রাত জাগরণের পর উঠতে একটু বেলা হয়ে গেছল শৈলেনের ঘরে ঢুকে দেখি ও আগেই জেগেছে। চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে চুরুট টান্‌ছে; প্রকৃতিস্থ মূর্ত্তি দেখে আশ্বস্ত হলুম বটে, কিন্তু শঙ্কা জাগল ওর চিন্তারেখাকুটিল ললাট আর স্তব্ধ গম্ভীর মুখ দেখে! ভাবলুম, কাল রাতের কথা ও বোধ করি ভুলতে পারে নি। আমার অপবাদ আর অপমানের কথা স্মরণ করে ওর অভিমানী মন নিশ্চয়ই আহত হয়েচে।

অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চাইব ব'লে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলুম। আমাকে দেখেই সে নিতান্ত অপ্রতিভভাবে ব'লে উঠল, "এই যে মণি, এসো। তার পর খানিক নীরব থেকে কুণ্ঠিত লজ্জিত স্বরে বল্‌তে লাগল "ভাই মণি, কাল্‌কে রাতের অপমানের জন্যে তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ! তুই আমাকে আত্মচেতনা ফিরিয়ে দিয়েচিস। ভাই স্বীকার করছি যে রেণুর ওপর আমি ইদানীং অবিচার করে ফেলেচি কিন্তু ভালো তাকে সত্যিই বেসেছিলুম,—নৈলে আজও তাকে ভুলতে পারি নি কেন? যাই হোক ভাই, আমি স্থির করেছি রেণুকে আমি সত্যিই বিয়ে করব—হোক্ না সে গাঁয়ের মেয়ে, গরীব অল্পশিক্ষিতা—"

হতভম্বের মতো শৈলেনের দিকে আমি চেয়ে রইলুম। তবে কি এই বিংশ শতাব্দীর শঙ্করাচার্য্যটি সত্যিই—?

জ্ঞান-যোগ

বেদপন্থী

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং।" (গীঃ ১২।১২)

শাস্ত্র বলিতেছেন অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান বড়। পড়াটা মুখস্থ করা অপেক্ষা get by heart করাটা নিশ্চয়ই বড়। যে সকল ক্রিয়াকর্ম্ম আমরা প্রায় চোখ বুজিয়া সারি, জ্ঞান পাইলে সে গুলি আলোকিত হয় এবং অন্তরের অন্ধকার দূর হয়। তাতে আত্মশুদ্ধি ঘটে এবং সেই শুদ্ধচিত্তে সত্যের আবির্ভাব সুস্পষ্ট হয়। আবার সমস্ত জ্ঞানকে নিজের করিয়া নেবার জন্য ধ্যান দরকার জ্ঞান ও ধ্যান জীবনলাভের দুটি পরম বন্ধু।

আগে জ্ঞানের সাধনা মহৎ বলিয়া বিঘোষিত ছিল, এখন যেমন বৈজ্ঞানিক সাধনা। আদর্শ ছিল সমগ্র জীবনকে একটী পরিণতি দান করা। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এগুলি সেই সাধনারই অঙ্গ, যে সাধনায় আত্মার বন্ধন মোচন হয়, মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়, মস্তিষ্কে উদ্ভাবনীশক্তি জাগে—এ সেই সাধনা।

পরবর্ত্তী যুগে জ্ঞানের কথাগুলি গাঁটবন্ধ করা কাপড়ের মত মাড়োয়ারী, ভাটিয়ারূপী ধর্ম্মবণিকদের হাতে পড়িয়া সর্ব্বনাশের সূচনা করে, আজ বৈজ্ঞানিক যুগ তার ব্যবসা সভ্য সমাজে প্রায় মারিয়া গিয়াছে ইহাতে ধর্ম্মের ব্যবসাদারিটা কমিয়াছে কিন্তু অন্যপ্রকারের মূঢ়তা আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে। ধর্ম্ম যে জীবনের ভূমিকা—ইহা বক্তা ও শ্রোতা জানেন কি, যদিও জানেন মানেন কতটুকু?

উপনিষদের কথাটি সত্য—ততো ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ। অজ্ঞানের অন্ধকার অপেক্ষা চেতনার অন্ধকার গাঢ়তর, কারণ তাহা জ্ঞানের অর্থাৎ অতি-জ্ঞানের অন্ধকার!

দু'ফোঁটা আঁখিজল

শ্রীঅখিল নিয়োগী

লিপিকার সাথে পাঠালে যে প্রিয়া দুই ফোঁটা আঁখিজল
একি শুধু সখি ভোলাতে আমায়, একি শুধু তব ছল!
দুই ফোঁটা আঁখিজল।
না গো তা' সত্য নহে—
দুই ফোঁটা বারি অভিমানিনীর কত কথা কানে কহে—
এ দুই ফোঁটার ইতিহাস প্রাণে বয়ে আনে পরিমল!

লিপি যদি তব শুভ্র থাকিত, থাকি ত না কোনো রেখা—
দুই ফোঁটা জল শুনাইত মোরে তোমার প্রাণের লেখা!
তোমারই আমি প্রাণ—
এই কথা লিখে আঁখিজলে তব করিয়াছে অপমান!
শুধু দুই ফোঁটা জল—
তোমার মনের সকল কথাই করে তাতে টলমল।

উদয়-তারা

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)

শ্রীসুনীলকুমার ধর

নরেন বুঝিল না এ মমতার বঞ্চিত-চিত্তের অভিশাপ না নারীর স্বভাবগত ঈর্ষা, ঈর্ষা হওয়াই স্বাভাবিক কেন না একটু পূর্ব্বে ও যে প্রেমের জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল নরেন সে স্রোতের মুখে কেবল পাথর চাপা দেয় নাই, স্রোতের গতি বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। ঘরের মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা। এরি মধ্যে একরাশ কাল মেঘ জানালার বাহিরের আকাশ ফালিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, একটি তারাও আর দেখা যায় না। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের কোলে শীতার্ত্ত রাত্রি যেন ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে! র‍্যাগ্‌টা মাথা পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া মমতা ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম কি আর আসে, যাহাদের সে একান্ত অবহেলায় পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে আজ এই নিশীথ রাতে স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া অতীত জীবনের সেই সব তুচ্ছ ঘটনা, ছোট কথা তাহার মনের সামনে আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহার এই বাইশ বছরের জীবনের সে কি বিচিত্র ইতিহাস! কৈশোরের প্রথম বসন্তে যে পথিক তাহার ফুলবনে আসিয়া বাঁশী বাজাইয়াছিল সে প্রকাশও নয় নরেনও নয়। সুন্দর একটি কিশোর বালক, তাহাকে সে ভালবাসিয়াছিল কি না তাহা আজ স্মরণ হয় না কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের নিরবিচ্ছিন্ন পরিচয়ের পর যেদিন সে ছেলেটী চলিয়া গেল সেদিনের কথা আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে! সারারাত্রি সে কাঁদিয়াছিল এবং সেই না-জানা কারণে কান্নায় এমন একটা মাদকতা ছিল যে বহুদিন পর্য্যন্ত মনে হইয়াছিল এজীবনে বুঝি ঐ ছেলেটিকে ছাড়া আর কাহাকেও সে ভালবাসিতে পারিবে না। একদিন দুপহরে তেতালার ঘরে বসিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ঐ নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটির উদ্দেশে যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহাতে প্রেমনিবেদন ছিল না বটে কিন্তু তাহাকে একবার আসিবার জন্যে যে মিনতি সে পাঠাইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি অক্ষর সে আজও মুখস্থ বলিতে পারে। মমতা মনে মনে একবার সেই বহুদিন-আগে লেখা ছোট একটুকরা চিঠির তিনটি লাইন আবৃত্তি করিল—"তুমি চলে গেলে কেন। আমার বুঝি দুঃখ হয় না। তুমি আবার কবে আসবে? আসছে সোমবার এস—মীনা মাসির বিয়ে। তোমার জন্যে আমার কেবলই কান্না পায়। তোমার পেন্সিলটা আমার কাছে আছে। সোমবার দিন টেবি দাদাদের ট্রেণে এস—আমি তোমার জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব।

শেষ পর্য্যন্ত চিঠিখানা ডাকে পাঠানো হয় নাই, ঠিকানা জানা ছিল না—তা ছাড়া লেখা শেষ হওয়ার পর আগাগোড়া চিঠিখানা পড়িয়া ও নিজেই এমন লজ্জিত হইয়াছিল যে কুচি কুচি করিয়া ছিড়িয়া তবে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। মমতা যেন এগার বছরের সেই কিশোরী মেয়েটি, ফ্রক পরিয়া বেণী দুলাইয়া বেড়ায়—দিনের অর্দ্ধেক সময় স্কিপ করিয়া কাটে—

নিজের আত্মীয় পরিচিতদের গণ্ডীর বাহিরে পরের জন্যে ভাবিতে শেখা মমতার সেই প্রথম। মমতা যেন এগার বছরের উজান ঠেলিয়া যৌবনের প্রথম জোয়ারের তীরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে ভুলিয়া গেল তাহার একটু দূরেই অপর খাটে নরেন শুইয়া আছে এবং এখনও হয়ত ঘুমায় নাই। কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য অনেক চেষ্টা করিয়াও মমতা ছেলেটির নাম কিছুতেই মনে করিতে পারিল না, কেবল একখানা সুন্দর মুখের অস্পষ্ট ছায়া তাহার চোখের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার জীবনের পরের অধ্যায়ে দেখা গেল পলাশকে। মমতার মনের স্বপ্নময়ী রাজকন্যা যখন এমনি করিয়া হারানো রাজপুত্রের সন্ধানে স্মৃতির মণিকোঠায় ঘুরিয়া ফিরিতেছে বাহিরের আকাশে তখন ঝড় উঠিল। ভয়ার্ত্ত শীতের রাত্রির সে কি করুণ-আর্ত্তনাদ! ঝড়ের ঝাপ্‌টায় আলোর শেড্‌টি দুলিতেছে, আলনা হইতে কয়েকটি জামা-

কাপড় উড়িয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, মমতার বিছানার চাদর খানিকটা উল্টাইয়া গেছে। তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া চমকাইয়া উঠিয়া মুখের আবরণ খুলিতেই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রচণ্ড একটা ঢেউ তাহার মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল। মমতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শার্সি বন্ধ করিয়া দিতে গেলে বাধা দিয়া নরেন বলিল, থাক্ মমতা—

দুই মুহূর্ত্তের জন্যে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া মমতা ধীরে ধীরে জানালার নিকটে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দুর্য্যোগের দুরন্তপনা বাড়িয়াই চলিয়াছে, অসহায়া পৃথিবীর করুণ বিলাপ কানে আসিতেছে—জানালার ধারে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মমতা ফিরিয়া আসিয়া নিজের খাটের উপর বসিল। বৃষ্টির ঝাপ্টায় তাহার পরণের কাপড়ের অনেকখানি ভিজিয়া গেছে।

নরেন বলিল—সত্যি সত্যিই জানালাটা বন্ধ কোরে দিলে না?

খাটের ধারে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মমতা বলিল—না।

—বৃষ্টির ছাটে সব ভিজে গেল যে—

—যাক্-গে

কোন কথা না বলিয়া নরেন নিজে উঠিয়া একটি একটি করিয়া চারিটি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

চোখে আলো লাগিতেই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মমতা বলিল—আঃ, আবার আলো জ্বাললে কেন, নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো না—

ধীরে ধীরে মমতার দিকে আগাইয়া আসিয়া নরেন বলিল—আমি এখনি চলে যাচ্ছি, মমতা—

মমতা একথা শুনিয়া মনে করিল নরেন বুঝি তাহার সঙ্গে এই ছুতায় একটা আপোষ করিতে চায়, তাই মুখ না ফিরাইয়াই অকারণ অহঙ্কারের সঙ্গে বলিল—বেশ্—

নরেন মিনিটখানেক মমতার পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, একবার কি যেন বলিতেও গেল কিন্তু মমতাকে অমনি ভাবে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে ওদিকে গিয়া নিজের স্যুটকেসটা গুছাইতে লাগিল! সে হয়ত বলিত—আমাকে বাধ্য হয়েই যেতে হচ্ছে মমতা—কিন্তু তোমাকে যে আমি ভুলব না শুধু এই কথাটী বোলে যেতে চাই।

কিন্তু নরেন যখন সত্য সত্যই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া মমতার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল নরেনের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আচরণে মমতা ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেছে! তাহাকে এখানে একাকী রাখিয়া নরেন চলিয়া যাইতেছে! সম্বন্ধের বন্ধন না থাকিলেও চক্ষুলজ্জাও কি নাই! আর মমতা ত তাহাকে যাচিয়া মুক্তি দিয়াছে তবে নরেনের এত ভয়ই বা কেন!

এই একটু পূর্ব্বে মমতার মুখের উপর অহঙ্কারের যে ছায়া পড়িয়াছিল তাহা অপসারিত হইয়া বেদনায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। দুটি চোখে যেন অশ্রুর জোয়ার! অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—তোমাকে বাধা দিতে চাই নে কিন্তু আমাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে গেলে কি কাজের এতই ক্ষতি হোত—

—আমার একটু অন্যায় হ'য়েছে, মমতা—কিন্তু কি জানি কেন আমার যাওয়ার কথা কিছুতেই আগে বোলতে পারি নি। তা ছাড়া যাওয়ার আগে আমাদের মধ্যে একটা মীমাংসা হওয়ার দরকার ছিল।

—মীমাংসা যখন হয়েই গেছে তখন ত আর কোন দ্বন্দ্বই নেই।

—মীমাংসার ধারা ঠিক সোজা পথে আসে নি বলেইত যত দ্বন্দ্ব, তা নইলে একটু আগেও তোমার সঙ্গে কলকাতায় না যাওয়ার কথা ভাবতে পারিনি—

—তোমার অনুকম্পা প্রত্যাখ্যান কোরে যদি কোন অপরাধ কোরে থাকি, ক্ষমা চাচ্ছি এবং এই অনুকম্পার দোহাই দিয়ে বলচি আমাকে এত বড় শাস্তি দিও না, অন্ততঃ—

বাধা দিয়া নরেন বলিল—কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো মমতা যার জন্যে আমি নিজেকে পর্য্যন্ত বিপন্ন কোরতে যাচ্ছিলাম সে একটু আগে আমার নাগালের বহু দূরে সরে গেছে! লোহা আর আগুন নিয়ে যাদের কারবার ছায়াকে অনুসরণ করা তাদের পোষায় না—

অপরূপ ভঙ্গীতে নরেনের মুখের দিকে তাকাইয়া মমতা বলিল—সে কি সত্যি কেবল ছায়া—

এর উত্তরে নরেন যদি কোন কথা না বলিত তা হইলে এই পরিচ্ছেদের যবনিকা এইখানেই বেশ নির্ব্বিবাদে টানিয়া দেওয়া যাইত এবং বলা চলিত পুরুষের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য নিষ্ঠার চেয়েও নারীর একটুকরা হাসি, ছোট একটা কথার দাম অনেক বেশী। কিংবা এও বলা চলিত নরেন মুখে যাই বলুক না কেন মমতার মোহ আজও সে কাটাইতে পারে নাই। নরেনকে নীরব দেখিয়া মমতাও মনে করিল তাহার এতদিনের স্বপ্ন ও আশা বুঝি একেবারে মিথ্যা নয় এবং নরেন তাহার কথার উত্তরে পুনরায় কোন ওজড় আপত্তি করিলে সে কি বলিবে তাহাও সে ইতিমধ্যে ভাবিয়া ফেলিল। আর নরেন যদি সত্যিই একটি কথাও না বলিয়া নীরবে চলিয়া যাইত তাতে মমতা দুঃখিত হইত বটে কিন্তু ছোট একটু আশার আশায় অকারণ পুলকে যে দুর্ব্বলতা সে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার জন্য এমন লজ্জায় পড়িতে হইত না।

নরেন মৃদু হাসিয়া বলিল—এ যেন আমাদের ধরে বেঁধে ওষুধ গেলনর মত হয়েছে, মমতা। তবে আমাদের এ ভাল-বাসার অভিনয় ও ওষুধে এই তফাৎ যে, ওষুধ ঠিক হ'লে রোগের উপশম হয় আর আমাদের হয়েছে এক কূল যখন ভাঙ্‌লই তখন অপরের কাঁধে চড়ে কোন রকমে অন্য কূলে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া—

মমতা যে ঠিক এই ভাবিয়া কথাটা বলিয়াছিল তা নয়—তা ছাড়া সে এমন অবলা নয় যে নরেন আজ তাহাকে ছাড়িয়া গেলে কাল সে কলিকাতায় যাওয়ার কোন উপায় করিতে না পারিয়া এই ঘরে বসিয়া বসিয়া কাঁদিবে কিংবা কাহারও নিকট গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করিবে। কিন্তু কথার ধারা যখন এমনি ঘুরিয়া দাঁড়াইল তখন আর কিছু বলিয়া বেশী অপদস্থ হওয়ার চেয়ে নীরব থাকাই ভাল মনে করিয়া মমতা আর কোন কথা বলিল না। বলিলে, মমতা হয়ত অনেক কথাই বলিতে পারিত—অন্ততঃ এও বলিতে পারিত, এক সঙ্গে দুই কূলই যদি না ভাঙ্গে সে কি নদীর অপরাধ! আর যে কূলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে সেই কূলে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাটির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নদীর জলে বিসর্জ্জন দিলে হয়ত দার্শনিকতার খুব বড় পরিচয় দেওয়া হয় কিন্তু কোন স্বাভাবিক ও সুস্থ প্রকৃতির মানুষই তা পারে না, বিশেষ করিয়া অনিবার্য্য মৃত্যুর সময় ছাড়া মানুষের জীবনে দার্শনিকতা যখন অচল! আরও হয়ত অনেক কথা বলিতে পারিত।

মমতার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা কহিবার জন্য নরেন স্যুট্‌কেসটা নামাইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু মিনিট দুই-তিন অপেক্ষা করিয়াও মমতা যখন কথা কহিল না, স্যুট্‌-কেশটা পুনরায় উঠাইয়া লইয়া বলিল—চল্লাম, মমতা।

নরেন চলিয়া গেল। কিন্তু নরেন যে কোন আড়ম্বর না করিয়া এমনি ভাবে বিদায় লইবে এ কথা মমতা ভাবিতেও পারে নাই।

আকাশের অপর পারে তখন সন্ত্রস্তা রাত্রির কালো অঞ্চল ধরিয়া ঊষা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—

মমতার মনের আকাশে ঘনাইয়া উঠিয়াছে একখানা কালো মেঘ আর তারই সজল আভা ওর একটি মাত্র চোখে!

পাঁচ

প্রকাশ হইল সেই ধরণের ছেলে যাহারা কোনদিনই ভবিষ্যতের আশায় বর্ত্তমানকে অবহেলা করে না, অতীত তাহাদের নিকট মৃত আর বরুণা সেই শ্রেণীর মেয়ে যাহারা অতীতকে বড় করিয়া দেখে, বর্ত্তমান লইয়া করে খেলা আর ভবিষ্যৎ তাহাদের স্বপ্ন রচনার জন্যে। তাই এই এক মাসের পরিচয়ে প্রকাশ মনে করে বরুণাকে সে বুঝিয়াছে বরুণা মনে করে প্রকাশকে করিয়াছে বন্দী।

একটু আগে প্রকাশ চলিয়া গেছে, কাল বরুণা পশ্চিমের কোন এক সহরে বক্তৃতা দিতে যাইবে। ঘরে আর কেহ ছিল না। আপনমনে একটি গানের দুইটী লাইন আবৃত্তি করিতে করিতে পায়চারি করিতে লাগিল

এবার উজাড় করে লও হে আমার
　　যা কিছু সম্বল
ফিরে চাও ফিরে চাও
　　হে চঞ্চল—

গানের এই কয়টী লাইন বারকতক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিয়া অত্যন্ত অবসন্নের মত ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল। যে অতীতকে ভুলিবার সে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে আজ এই নিঃসঙ্গ রাত্রির প্রতি মুহূর্ত্তটী যেন তাহারই স্মৃতিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা বরুণার পক্ষে অসম্ভব. বিশেষ করিয়া আজিকার রাত্রে। প্রকাশের কথাগুলো যেমন সমস্ত অনুভূতিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া তাহার মনের আকাশে এক প্রচণ্ড ঝড় তুলিয়াছে। 'অতীতে যারা তোমার কাছ থেকে ফিরে গেছে বরুণা, আমার মনে হয় তারা তোমাকে ভুল বুঝেই গেছে। দেহকে ঘিরেই পুরুষ ও নারীর প্রথম ভালবাসা একথা সত্যি এবং এইজন্যেই আমাদের বহু পুরণো বিয়ের প্রথাটা আজও কোনরকমে বজায় আছে,কিন্তু ভালবাসার সবটুকুই দেহকে ঘিরে নয় বলেই অমরেশ তোমার ভালবাসা পেলেনা এবং সে আরও ভুল কোরেছে তোমাকে স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে—আরও বলিয়াছিল—'তুমি ভুল বুঝনা, বরুণা, প্রকারান্তরে তোমাকে ভালবাসা জানাবার কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই, ও জিনিষটা কাগজ কলমের সাহায্যে বেশ নির্ব্বিবাদে সেরে নেওয়া যেত, শুধু এইটুকু বলতে চাই তোমার বিদ্রোহের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে—

প্রতিবাদ করিতে গেলে বাধা দিয়া প্রকাশ বলিয়াছে—তর্ক থাক, মমতা, কাল তোমাকে আমার সঙ্গে পাটনার যেতে হবে, সাতদিনের জন্যে তারা একটা স্বদেশী মেলা বসিয়েছে, সেখানে তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। তৈরী হ'য়ে থেক, কাল সাড়ে নটার এসে তোমাকে নিয়ে যাবে...

না, বরুণা আর ভাবিতে পারে না! সহসা দেহ মনের একি অবসন্নতা! বরুণা শ্রান্তভাবে ইজিচেয়ারে চোখ বুঝিয়া শুইয়া রহিল! কিন্তু এমনিভাবে বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতেও পারিল না—কে যেন অলক্ষ্যে আসিয়া তাহার মনের চারি পাশে আগুন লাগাইয়া গেছে। সে চেয়ার ছাড়িয়া আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল—কেমন করিয়া প্রকাশকে নিজের অতীত দিনের কথাগুলো জানান যায় কেমন করিয়া সে প্রকাশকে বুঝাইবে...কিন্তু কিই বা বুঝাইবার আছে—আর প্রয়োজনই বা কি, কাল প্রকাশের সঙ্গে দেখা হইলে সে স্পষ্ট তাহাকে বলিবে—তুমি আমার পথ থেকে সরে যাও প্রকাশ—

কিন্তু প্রকাশ ছেলেটি এমনি, একথা তাহাকে বলিলে হয় ত বেশ নিঃসঙ্কোচেই বলিয়া বসিবে—আমি যে তোমার দৃষ্টিপথ আড়াল কোরে আছি, এত আমি জানতাম না, বরুণা, সত্যি কি লজ্জা!

তাহার পর আর একটি কথাও ত বরুণা বলিতে পারিবে না— (ক্রমশঃ)

আমার পৃথিবী

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

অনেক দিন আগেকার কথা —

বিধাতার মনে একদিন একটী সুন্দর কল্পনা দেখা দিল। সেদিন স্বর্গের পারিজাত সুরভি অতিরিক্ত সৌগন্ধে বুঝি বাতাস মন্থর করিয়া তুলিয়াছে, বিধাতা লীলায়িত হাতে যে সুরা-পাত্র ধরিয়াছেন, উহা ফেন-হাস্যে ছলছল করিতেছে, সুর-বালিকাদের চরণ-ছন্দে পদে পদে মূর্ত্তিহীন সুরের মূর্চ্ছনা জাগিতেছে।

বিধাতা সৃজনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, অনেক নীচে অনেক সমুদ্র ও নদী ধৌত পর্ব্বত-বেষ্টিত এক বিপুল পৃথিবী, সূর্য্য এবং চন্দ্র সেখানে দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন আসিতেছে; বলিষ্ঠ মানব মানবী নিঃশঙ্কচিত্তে পরস্পরের হাত ধরিয়া প্রান্তর ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। চোখে তাহারা সূর্য্যের আলো জ্বালিয়াছে, তাহাদের ওষ্ঠের হাসি প্রভাত আকাশের মত শুভ্র।

স্বপ্ন-ঘোরেই বিধাতা ঠিক করিয়া লইলেন, এই কল্পনাকে রূপ দিতে হইবে। সুধার ঘোর হয়ত তখনও কাটে নাই, সুর-বালিকাদের পায়ে পায়ে তখনও সুর কাঁদিয়া মরিতেছে। কিন্তু বিলম্ব করিবার কথা বিধাতার নহে; বিধাতা বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন।

প্রকাণ্ড আগুনের একটা পিণ্ড নীচের দিকে গড়াইয়া আসিল। নীচে ছিল শুধু জল, সেই জলে আগুন নিভিল। মাটি জাগিল, আলো আসিল; জীবের জন্ম সুরু হইল। এক বহু হইল।

শোনা যায়, পৃথিবীর বহু লক্ষ বর্ষ লইয়া দেবতাদের এক একটি দিন। যদি তাই হয়, তবে আজ হয়ত বিধাতার চোখ হইতে মোহ মত্ততা কাটিয়াছে। আজ নীচের যন্ত্র কুৎসিত, সভ্যতা পঙ্কিল কলঙ্কিতা ধরিত্রীর দিকে চাহিয়া তিনি হয়ত আবার চোখ মুদিয়াছেন। নিজের বীভৎস সৃষ্টির দিকে চাহিয়া বিধাতার আজ আর লজ্জার অন্ত নাই—সেই সঙ্গে মানুষেরও।

বিধাতার মত আমিও একদিন স্বপ্ন দেখিতাম; মানুষের মাঝখানে সুন্দরকে খুঁজিতাম; ভাবিতাম, এই ক্লেদকীর্ণ পৃথিবীতে নন্দনের ছায়ালোক রচনা করিব। সেদিন আমার চোখেও সুধার বিহ্বলতা। জীবনের সেই কৈশোর-লগ্নে আমারও চোখের সামনে দিবারাত্র সুরবালিকাদের নৃত্য হইত। দশদিক বাহু বিস্তার করিয়া আমায় কাছে টানিত। মানুষকে আমি চাহিতাম। আমার চোখের মোহের মশাল জ্বালিয়া আমি প্রত্যেক নর নারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেবতাকে খুঁজিতাম; রমণীর কেশগন্ধ আমার সেই কৈশোর স্বর্গলোককে পারিজাতের সুগন্ধ দিয়া অবাস্তব করিয়া রাখিত; মানুষকে আমি ভালবাসিতাম।

অভিধানে মানুষের যতগুলি সৎপ্রবৃত্তির উল্লেখ আছে—যেমন, পবিত্রতা, দয়া, স্নেহ প্রেম, ধর্ম্ম, ভীরুতা সেই সব দিয়া কল্পনায় একটি কল্পলোক সৃষ্টি করিয়াছিলাম।

পৃথিবীকে সে দিন একখানি সুমধুর কাব্যগ্রন্থ বলিয়া মনে হইত—প্রত্যেকটি দিন ও রাত্রি যেন সেই গ্রন্থের এক একখানি পাতা, প্রত্যেকটী ফুল যেন তার একটি কবিতা। সেদিন আকাশকে আত্মীয়ের মত মনে হইত; ছায়া-পথে কাহার আঁচলের আভাস মিলিত এবং আরও কত কি!

তার পর বাস্তবের রূঢ় আঘাত লাগিয়া আমার সেই ধ্যানলোক একদিন কোন্ রসাতলে নামিয়া গেল। মনে হইল যে বিরাট পিণ্ড হইতে এই পৃথিবীর উৎপত্তি উহার আগুন বুঝি আজও নিভে নাই; নহিলে আজ আর পৃথিবীতে ভূমিকম্প জাগিত না; নিদ্রাহীন রজনীতে মানুষ দুঃস্বপ্ন দুর্ভাবনায় ঈশ্বরকে অভিশাপ দিত না। ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম, এই পৃথিবীর প্রত্যেক তৃণ তরুতে, ধূলাও কঙ্কর অনাদ্যন্ত এক লজ্জার ইতিহাস; সে ইতিহাস যেমন নিষ্ঠুর তেমনি শোচনীয়। দেখিলাম, দয়ার দাম নাই; স্নেহ বিড়ম্বনা এবং প্রেম পাপ।

অনন্তকে ধরিবার স্বপ্ন যেদিন ভাঙ্গিল সে দিন ক্যাটোর মত আত্মহত্যা করাও আমার পক্ষে কঠিন ছিল না; কিন্তু ক্যাটোর আদর্শ বোধ করি আমার চেয়ে বৃহৎ ছিল। তাই ধীরে ধীরে আমারও একদিন অপমৃত্যু ঘটিল, তবে ক্যাটোর মত গলায় ছুরি দিয়া নয়।

আমার বিস্তীর্ণ আকাশকে আমি অন্ধকার ঘরের চতুঃসীমানার মধ্যে বন্দী করিলাম। গভীর রাত্রে আমার শয়ন শিয়রে যাহাদের কেশপ্রবাস আমাকে উতলা করিত তাহারা কে কোন্ দিকে গেল তার কোন হিসাবই রহিল না।

পাপের আবেগে আমার শিরার শোণিত চঞ্চল হইয়া উঠিল। বর্ব্বর বীভৎসতার মূর্ত্তি দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলাম।

আমার অভিধান হইতে সুন্দরের নাম আজ তুলিয়া দিয়াছি।

———

বঞ্চিত

শ্রীসুকুমার সরকার

হৃদয় চলিছে তনুর শ্মশান ছাড়িয়া
নিদয় জগৎ পেছনে ফিরিয়া হাসিছে !
মৃত্যু আমার জীবন নিতেছে কাড়িয়া
নয়নের আলো আঁধার আসিয়া গ্রাসিছে !
ধরণীরে আমি দিয়েছিনু গান উপহার
সে আমার সাথে তবু কোনো কথা কহে নাই ;
হাসি দিয়ে আমি কিনিয়াছি শুধু আঁখিধার
আমার প্রেম সে হৃদয়ে তাহার বহে নাই !
নদী চলিয়াছে ভাব-মন্থর গতিতে
আমি বালুপরে গণিয়াছি শুধু শুধু ঢেউ ;
কালিমা কেবলি ঘনায়েছে আঁখি-জ্যোতিতে
সলিলাঙ্গনা এলো না, আমার কাছে কেউ ;
আমি শেফালীর ঝরার বিদায় বাঁশীতে
দিয়েছি আমার চোখের শিশির ছিটায়ে ;
সে মুখ লুকালো তৃণের শ্যামল হাসিতে
মরণেও মোরে দিলোনা তিয়াসা মিটায়ে !
বনানীর স্নেহে হৃদয় উতলা হয়েছে
পল্লব-করে তবু সে আমারে ডাকে নাই,

মুদিত দু' আঁখি আলোকেতে কথা কয়েছে
অরুণ তবুও ললাটে আশীষ রাখে নাই !
ফুলের পরাগে আমার দৃষ্টি-ভ্রমরা
কত শতবার উড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে ;
রূপের স্বপনে সৃষ্টি করেছে অমরা
কুসুম তবুও কপোল ফিরায়ে নিয়াছে !
মেঘের তড়িৎ-নয়নের পরে আমি গো
দেখেছি আমার মনের বনের রাণীরে ;
শ্রাবণ-আকাশে তবু কোনো দিবা যামি গো
দিলোনা সে তার সজল সোহাগ-বাণীরে।
হেরি বাসন্তী অনন্ত ফুল-শয়নে
নিথর নয়নে জেগেছে মুখর তিয়াসা ;
মালিকা গাঁথিয়া কুসুম-কলিকা চয়নে
জানিতে চাহেনি তবু সে এ বুকে কি আশা !
আমার কল্প-অলকায় আমি বারে বার
পাঠাতে চেয়েছি আমারি বিরহ-মেঘেরে ;
হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে শুধু হাহাকার
কেহ নাহি সেথা আঁখি দীপ জেলে জেগেরে।

পাথেয়

শ্রীফণীন্দ্র পাল

মোড়ের মুখটায় ভীষণ রকমের একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে, এমন কি পান্নু গোঁসাই পর্য্যন্ত হাতের কল্কের সুখটানটা না দিয়েই, দোকান খুলেই বসন শাসন করতে করতে ছুটে এসেছে ভিড়ের মাঝখানে। ব্যাপারটা এমনিই!

কোন কথা নয়, যে যেখান থেকে পারছে, বেচারাকে কিলটা, চড়টা বকশিস্ দিচ্চে। যে নাগাল পাচ্চেনা, সে দূর থেকেই খোয়াগুলো নির্ম্মমভাবে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আপন আপন পৌরুষ জাহির করছিল। কর্ম্মকর্ত্তা নন্তুখুড়ো, লোকটীর লম্বা লম্বা রুখু চুলগুলো প্রাণপণ শক্তিতে টান্‌তে সুরু করেছেন। বিশেষ পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠেছেন খুব কিন্তু কর্ত্তব্য ভোলেননি একটুও।

ভিড়ের মাঝখান থেকে শিবু সামন্তের মেজ ছেলে বিশু চেঁচাচ্চে: চুরি করবার জায়গা পেলে না শালা? তোমায় এক্কেবারে আধমরা কোরে দশটী বছরের জন্যে কালাপানির ঘানি না টানাই তবে আমার—ভীষণ একটা দিব্যি নিঃসঙ্কোচেই করে ফেললো।

কিন্তু কালাপানির ঘানি টানবার আগেই শীগ্‌গীরই যে সে দক্ষিণদিকের কালপুরীর অতিথি হ'তে চল্‌লো বলে'—বোধ করি একথাটী বিশ্বনাথ উত্তেজনার ঝোঁকে খেয়াল করেনি—কেউ কেউ আবার লোকটার অসীম দুঃসাহস দেখে দুঃসহ বিস্ময়ে একেবারে যেন বোবা হয়ে গেছেন। কারুর বা হাতের বিড়ি হাতেই নিভে গেল।

লোকটীর কিন্তু পরমায়ুর জোর আছে বল্‌তেই হবে। অকস্মাৎ অসিত ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়েই জিজ্ঞেস করলো: ব্যাপার কি?

অত্যন্ত আশ্চর্য্য উপায়ে নন্তুখুড়োর হাত লোকটীর কেশপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল এবং জনতার লঘুত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনমণ্ডলীর সুর এমন নেমে গেল, যে মনেই হয় না কিছুকাল পূর্ব্বে এখানেই বিংশ শতাব্দীর মহাযুদ্ধের মহলা মহা সমারোহেই চলছিল।

বিশু কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে জোর গলায় বল্লে: ও কি করেচে জানেন?···অসিত জান্‌তো না, তা সে বেশ ধীরভাবেই স্বীকার করলে। বিশু একটু গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বল্লে: আমরা পান্নু গোঁসায়ের দোকানে গল্পো কচ্চি হঠাৎ ভুলো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্লে, টেঁপী গোঁসাইজীর দোকানের দিকেই আসছিল এমনি সময় এই শূয়ার ওকে ছেলেমানুষ পেয়ে ডোবাটার পেছন দিকের বাদাড়টার ভেতর ওকে নিয়ে ঢুকে পড়েছে—টেঁপীর গলার হার আর হাতের বালা জোড়াটার লোভে। আর যায় কোথায় আমরা তক্ষুণি এসে পড়েচি। অসিত বল্লে: হাঁ তা' বেশ করেছ কিন্তু লোকটা মারা গেলে দায়ী হ'তে তোমরা...কৈ টেঁপী কোথা? টেঁপী তখন একপাশে দাঁড়িয়ে লোকটার মার দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে। অসিত তাকে টেনে কোলে তুলে নিয়ে বল্লে: হাঁরে টেঁপী এ তোর হার খুলছিলো?

টেঁপী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠ্‌লো: না কাকা, বিশুদা-ওরা শুধু শুধু মারছিলো, এ আমায় আদর কর্‌লে, ঠিক তোমার মতন। এই দেখনা আমায় কেমন লজেনচুষ দিলে—

বাস্তবিক টেঁপীর দু'হাতে দুটো বড় বড় লজেনচুষ আর ওর লাল কচি ঠোঁট দুটী দিয়ে 'লাল' গড়াচ্চে।

অসিত তাড়াতাড়ি সস্নেহে লোকটীকে মাটি থেকে টেনে তুলে বল্লে: আমার কাঁধটা ধরে আসুন—বেশীদূর যেতে হবে না এই কাছেই—

লোকটী একবার আপনার জর্জ্জরিত পা দুটোয় কোনো রকমে ভর দিয়ে অশ্রুম্লান, বিষণ্ণ চোখ দুটী তুলে অসিতের দিকে তাকালো। সে দৃষ্টি যেন মানুষের নয়—তার কোন অভিব্যক্তি নেই। অসিত সামনের মেঠো পথটার দিকে মুখ ফেরালে—

টেঁপী তখন কাকার কোলে পরমানন্দে লজেনচুষ খাচ্চে আর লোকটীর তালি দেওয়া ছেঁড়া জামাটার আড়ালে রক্তের ছোপ্ আর কালশিরের দিকে ছল্‌ছল্‌ দৃষ্টিতে ঘন ঘন তাকাচ্চে। শিশুর বোবা ব্যথিত মনটা সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না হয়তো।

অসিত টেঁপীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো: তুই কি কর্‌তে এসেছিলিরে? কে তোকে পাঠিয়েছিলো?

টেঁপী ভারী গলায় জবাব দিলে: মা!—আমি মুড়ী কিন্‌তে যাচ্ছিলুম।

ওদিকে বিরাট প্রহারপর্ব্ব এই রকম মধ্যপথে থেমে যাওয়াতে জনতা অসিতকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল না।

সহর বল্লে সহর, গ্রাম বল্লে গ্রাম।—তা থাকেন সেখানে অনেকেই। উকিল, ডাক্তার, পুলিস এবং বনিয়াদি অভিজাত সম্প্রদায়েরও অভাব নেই। এমন কি পোষ্টাপিস, হাট বাজার, ইস্কুল থেকে সুরু করে মায় মনোহারী দোকানটী পর্য্যন্ত। নেই শুধু কলেজ, গোলদীঘি, সেনেট-হাউস আর রাইটার্স বিল্ডিং।

অসিত কলকাতারই এক কলেজে ফোর্থইয়ারে পড়ে। বাপ-মা আগেই বিদায় নিয়েচেন। এখানে থাকেন অসিতের বৌদি এবং একমাত্র অগ্রজের একমাত্র সন্তান টেঁপী। আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে বুড়ো বিশ্বস্ত চাকর বেহারী। ভাল নাম হয়ত ওর আছে একটা কিছু, কিন্তু টেঁপী এখনও ভালো নামে ডাকার গৌরব পায়নি।

শনিবারের ক্লাস করে বাড়ী ফেরবার মুখে এই বিষম বিভ্রাট।

সেই অবস্থায় বাড়ী ফিরেই বাইরের ঘরটায় অতিথিটীকে বসিয়ে এগোতেই সামনের দরজায় বৌদির সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই অসিত বল্লে: খুব জোর বকুনি একটা তোমার রিসার্ভড্ রইল বৌদি।

কতক শুনে এবং বেশীর ভাগই না শুনে সুরমা বিশেষ উদ্বেগে ওদের প্রতীক্ষা করছিলেন। অকস্মাৎ টেঁপীকে কাছে পেয়ে যুগপৎ আনন্দে এবং ক্রোধে তাকে ধম্‌কান সুরু কল্লেন: ধন্যি মেয়ে যাহোক বাবা তুই, তোকে দৌড়ে নিয়ে আসতে বল্লুম, আর তুই পোড়ারমুখী এতক্ষণ—

অসিত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্লে: ধমকানটা এখন কিছুক্ষণ মুলতুবী থাক্ বৌদি, সে ধীরে সুস্থে পরে হবে। তুমিও একটু জোর কোরে নাও, ও-ও একটু জিরিয়ে নিক্। এখন আপাতত বেহারীর কাছে ওকে রেখে বাইরের ঘরটায় একটু গরম জল—

সুরমা ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করলে: কেন ঠাকুরপো কি সেই চোরটাকে বাড়ী এনে আপ্যায়িত করবে নাকি? অসিত ধীর ভাবে বল্লে: চোর কিনা তা জানি না বৌদি, কিন্তু আমি না এসে পড়্‌লে আজ এমন একটি নিরীহ মানুষ মারা পড়ত—কিন্তু সে যাক্ সে পরে শুনো এখন যা বল্লুম একটু শীগ্‌গীর কোরে দাও আর ত' দেরী করবার সময় নেই, আমি বরফ আনতে চল্লুম। অসিত উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়লে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ পশ্চিম আকাশের পানে চেয়ে সুরমার মনে কি জানি কেন কান্নার সাগর ফেনিয়ে উঠ্‌লো। দিনান্তের মূর্চ্ছিত আকাশ যেন তখন মৃত্যু বাসরের পৌরহিত্যে বসেছেন। গোধূলির ম্লান রক্তারুণ যেন তার কামনা-হোমের শেষ অর্ঘ্য।

শেষকে নিঃশেষ করবার সে কী বিপুল সাধনা!

বেহারীর কাছে মেয়েকে রেখেই সুরমা তক্ষুনি বিছানা-পত্তর নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকেই চম্‌কে দাঁড়াল।

লোকটি জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে উষর বন্ধুর, মেঠো পথ্‌টার ওপারে বিদায়ের শেষ সূর্য্যের পানে চেয়েছিল। তার ইসারায় সাড়া দিচ্ছিল বোধ করি তারপর; হঠাৎ মুখ ফেরালে।

ওর ব্যথাতুর, ক্লান্ত, চোখ দুটো হঠাৎ খুসীর আলোয় হেসে উঠল যেন। ওর সুরমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকার মধ্যে কি যেন মধুর বেদনা গুমরে উঠ্‌ছে।

সুরমা কিছুক্ষণ বিমূঢ়বিহ্বলের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর সুদূরাগত গীত রেখার মতো অস্ফুটধ্বনি উচ্চারণ করলে: সুরেশদা তুমি!

কি জবাব দেবে সুরেশ! এইটুকু শুধু বোঝা গেল সন্ধ্যার আবছা, ধূসর আলো-আঁধারির মধ্যে তার বিক্ষত

পাংশু মুখটা আরো বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ! গভীর লজ্জায় অপরিসীম বেদনায় সে অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে বসেই রইল্। অথচ চোখ তার ছল ছল কোরে উঠেছে।

মানুষের চেনা মনটার আড়ালে যে আর একটা মন চুপি চুপি ঘুমিয়ে থাকে সেই মনটারই বিকৃত রূপটা আজ সুরেশের সামনে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌তেই, সে ভয়ে, লজ্জায়, বিস্ময়ে, একেবারে অধীর হয়ে উঠলো। কোন রকমে সে যেন বল্‌তে পারল: চল্‌লুম সুরমা! শুধু আমার এই কথাটা তুমি বিশ্বাস করো যে এখানে আস্‌বো বলেই আমি আসিনি।

সুরমা তখন কঠোর হয়ে উঠেছে। এ যেন সেই শুচি স্নিগ্ধা বেদনাময়ী নারী নয়, যেন বিদ্যুতের জ্বালাময়ী অগ্নি-শিখা ; তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিলে : তা জানি কিন্তু এত শীগ্‌গীর যাবার জন্যেও ত' আসো নি ? তোমাকে চলে যেতে দিলে আমার যে আতিথেয়তার ত্রুটি ঘটবে।

নিরুপায় সুরেশ এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের উত্তরে কিছু বল্‌তে না পেরে রুদ্ধ অভিমানে জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। সুরমার মুখে চোখে তখন মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি, দাঁত দিয়ে কম্পিত ঠোঁটদুটো চেপে ধরে বল্‌লে : মাপ করো সুরেশদা। অকস্মাৎ সে ঘর থেকে চলে গেল।

সুরেশ তখন ভাবচে—"স্মৃতিকে পঙ্কিল করতে কি সে আবার জড়িয়ে পড়লো ?" তার মনে পড়লো—কতখানি পরিবর্ত্তন আজ সুরমার হ'য়েছে ? কিন্তু সে কি শুদ্ধ বাইরের।

অর্থের কোন অভাবই ত সেদিন তার ছিল না। সুরমার মেজদা' সমীরের সঙ্গে তার যে বন্ধুত্ব তার খাতিরেই সে তার বোন্ সুরমাকে ছোট বোনটীর মতোই ভাল বাসতো। কিন্তু সুরমা তার উন্মুখ যৌবনের সমস্ত কামনা দিয়ে মনে মনে সুরেশকেই বরণ করেছিলো সে তা ঘুর্ণাক্ষরেও জানেনি ! সুরমার স্বরূপমূর্ত্তি যে দিন তার চোখে পড়লো সেদিন সে আত্মঅহঙ্কারের বশে তাকে রূঢ় প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপর নিঃস্ব বৈরাগীর মতই জীবনের বৈচিত্র্য জালে বন্ধনমুক্ত মানবশিশুর মতোই ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়েছে।

পল্লীতে পল্লীতে মুসাফের হয়ে ঘুরে বেড়ায়—রাতের নিস্তব্ধতায় ভাঙা খোড়ো ঘরের ফাটাল দিয়ে তৃতীয়ার শীর্ণ ব্যথিত পাণ্ডুর চাঁদটার পানে চেয়ে চেয়ে ওর মনে হয় সুরমার ম্লান ছায়া যেন ওরই মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

এইত সেদিন একটা সাপুড়ের জাতহীন অস্পৃশ্য মেয়ের বিছানায় বসে তার শেষনিঃশ্বাসের স্পন্দনটুকুর মধ্যেও সুরমার নিঃশ্বাস অনুভব করে তার সমস্ত দেহের অনুপরমাণু পর্য্যন্ত হিম হয়ে গেছে। মনে মনে বলেছে—নিজেকে ঠকিয়ে আর কতদিনই বা চলে। কিন্তু নিজের আসল রূপটা তো এখন চোখে পড়লো।

তার পর খেয়ালের ঝোঁকেই একদিন সহরতলীটায় এসে পড়েছে এবং তার—তার চেয়ে অভাবনীয়রূপে যখন দেখলে সুমুখের জানলাটায় একখানি বিষণ্ণ বিধবার অশ্রুম্লান আতুর চোখদুটী সন্ধ্যাতারার মতোই স্নিগ্ধ, আর সে সুরমা তখন সে একেবারে বিহ্বল হ'য়ে পড়লো। পরিবর্ত্তনের অনেক রূপই তার চোখে পড়েছিল।

অনুভূতির প্রত্যেকটী রক্তবিন্দু যাকে কামনা করেছে তার সঙ্গে লুকোচুরি আর চলে না।

সুরমা আবার ঘরে এসে বল্লে : সুরেশদা উঠে মুখটা ধুয়ে ফেল ! বিমূঢ়ের মতো সুরেশ বসে বসে ভাবছে—সে এখন কি করবে ? ওকি ছুটে গিয়ে বল্‌বে : সুরমা আমি ফিরে এসেছি, আমায় মাপ করো, নিজেকে চিন্‌তে পারিনি সেদিন। সুরমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লে নির্ব্বিকার কঠিনভাব, কোনো গ্লানির রেখাও সেখানে নেই।

টেঁপী সব সময়েই তার নতুন কাকাবাবুর রোগশয্যার পাশে বসে থাকে। অনর্গল বকুনি তার থাম্‌তেই চায় না। সেদিন বসে সুরেশকে তার পুতুল বিবাহের আয়োজন পর্ব্বের ফর্দ্দ শোনাচ্ছিল। পাকা গিন্নি আর কি !

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। বাইরের বাতাসকে ঘরের ভেতর মনে হচ্ছিল যেন কার তৃষিত দীর্ঘশ্বাস।

আস্তে আস্তে সুরমা ঘরে ঢুকলো। বিগত দিনের লীলাময়ী মেয়েটী কঠিন সংযমের আড়ালে নিজেকে এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেচে যে মাঝে মাঝে সুরেশের বিস্ময় লাগে

এ কি অভিনয় না সত্য ? সুরেশের দিকে তাকিয়ে সে বল্লেঃ যা টেঁপী তোকে তোর ঠাকুমা খেতে ডাকৃচে।

ছোট্ট মেয়ের অভিমান থাকতে নেই এমন কথা কোন অভিধানেই লেখে না। ঠোঁট উল্‌টিয়ে টেঁপী বল্লেঃ যাবো না যাও! দেখ দিকিনি কাকা আমায় সক্কলে খারাপ নামে ডাকে।

সুরেশের বিছানায় টেঁপীর কাঁচের পুতুলটা পড়েছিল সেটা তুলে নিয়ে মাকে ধমক দিয়ে বল্লেঃ আমার মেয়ের সামনে আবার টেঁপী বলে ডাকৃলে সাড়া দেবো না বলে দিচ্ছি কিন্তু।

সুরেশ তাকে নাম জিজ্ঞেস করাতে সুরমা বল্লেঃ ওর নাম অশ্রুমতী। অশ্রুর গালটা সস্নেহে টিপে দিয়ে সুরেশ বল্লেঃ আর কেউ তোমায় অশ্রু বলে নেই ডাকুক, আমি ডাকবো।

টেঁপী তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে এই সুসংবাদটা ঠাকুমাকে দেবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সুরেশ নিষ্পলক মমতামাখা চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। তার পর সামনের খোলা জান্‌লাটার দিকে মুখ ফেরালে। নীল আকাশটার গায়ে ভাঙা চুড়ির মতো কাটা চাঁদটি পড়ে আছে, আর মেঠো বাঁকা পথটা বনরেখার ধারে এসে নিঃশব্দে থেমে গেছে। ওখানে কতখানি রহস্য, কী মায়া!

সুরমা বিছানার পাশে বসে পরমস্নেহে ওর লম্বা রুক্ষ চুলগুলোর জট ছাড়াতে লাগলো। ক্লান্ত ম্লান দৃষ্টিতে সুরেশ একবার ওর দিকে তাকালে। এই অবিশ্রাম সেবাতৎপরা বিধবা মেয়েটীর ভেতর কী যেন মধুর প্রেরণা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—সে মমতার তীব্রতাকে রূপ হয়ত দেওয়া যায় কিন্তু সে স্বপ্নাতীত।

বিকেল হয়ে এসেচে। পড়ন্ত রোদের ঝিলিমিলি গাছপালার চিকণ পল্লবের বুকে আলোর ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে।

নন্তুখুড়োর বৈঠকখানায় জমাট মজলিস অর্থাৎ নরক গুলজার। পাড়ার যেকটি নিষ্কর্ম্মা প্রবীন ব্যক্তি আছেন, সকলেই জমায়েৎ হয়েছেন। মশলাদার পান আর তাওয়াদার তামাকের বিনামূল্যে বিতরণ হয় এখানে তার সঙ্গে আবার পরকুৎসার মুখরোচক চানাচুর। সুতরাং এহেন আকর্ষণ ছেড়ে বাড়ীতে কি আর মন টেঁকে? আজকের আসরে এক নতুন চানাচুর বিতরিত হচ্ছে—তার ঝালও যেমন উগ্র, স্বাদও তেমনি অপূর্ব্ব।

গাঁয়ের গেজেট পান্নু গোঁসাই তার বিন্ধ্যাচল তুল্য বিরাট বপুভার তাকিয়ায় ন্যস্ত ক'রে বেশ র'সিয়ে র'সিয়ে এতক্ষণ বল্‌ছিলোঃ আরে শুনেছ হে আড্ডি খুড়ো অসিতদের বাড়ীতে যে আজকাল কেষ্ট-লীলে চল্‌চে। বাজারের সেই সেদিনকার চোরটাকে নাকি অসিত বাড়ীতে পুরেচে! বৌ-ঠাকৃরুণের সে কী সেবার ঘটা···কী দরদ।......

নন্তু আড্ডি হাড্ডিসার শুষ্ক মানুষ, রস কসের বড় একটা ধার ধারেন না। বড় বড় ঝাঁপালো গোঁপের তলা থেকে কাঠ ঠোকৃরার আওয়াজের মত অদ্ভুত স্বরে বলে উঠ্‌লেনঃ দরদ না হয়ে!.........ছোঁড়াটাও ডব্‌কা জোয়ান আর ছুঁড়িটাও বিধবা সোমত্ত......হুঁ চুলে পাক্ ধরলো ও সব কিছু জান্‌তে কি আর বাকী আছে বাবাজী? ব'লে বার্দ্ধক্যের শ্বেত পতাকার গর্ব্বে চারিদিকে সবজান্তা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

শিবু সামন্ত হেঁপো রুগী। বারমাসই ফ্লানেল শার্টের দুর্গের আড়ালে ঠাণ্ডার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করেন। শুনে বল্লেনঃ পাড়ার মধ্যে একি ব্যভিচার (খক্ খক্) এর এর একটা বিহিত (খক্ খক্ খক্ খক্) কাসির ধমকে কথার খেই হারিয়ে গেল।

পান্নু গোঁসায়ের অকস্মাৎ নজর পড়লো উঁচু নীচু পায়ে-চলা মেঠো পথের পানে। অসিত হাতে বাজারের থলের মত কি একটা ঝুলিয়ে ব্যস্তভাবে হন্ হন্ করে যাচ্ছিল।

"—অ—অসিত, শুনচ"—গোঁসাই ডাকৃলেন।

নন্তু খুড়ো কেমন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে অপ্রসন্ন মুখে বল্‌লেনঃ কেন আবার ওই অলক্ষুণে ই-য়েটাকে ডাকলে বাবাজী? একে কলিকালের ছোঁড়া তায় দু'পাত ইংরিজি পেটে ঢুকেছে বাপ্ খুড়োর মান রেখে আর কথা কয় না। ধরাকে সরা জ্ঞান করে.........

—এই যে অসিত এসো বসো। হাঁ বলছিলুম যে আমা-

দের অসিতের মতো বিদ্বান্ ছেলে পাড়ায় বিরল—হ্যাঃ হ্যাঃ—

খুড়োর কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ অত্যাশ্চর্য্যরূপে কড়ি থেকে একেবারে কোমলে নেমে এলো।

গোঁসাই একটু ভণিতা করার পর শুধুলেন : হ্যাঁ অসিত, শুন্‌লুম তুমি নাকি সেই চোর ব্যাটাকে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছ ?

নম্রভাবেই অসিত জবাব দিলে : আজ্ঞে হ্যাঁ। বেচারার তখনকার অবস্থা দেখ্‌লে আপনাদেরও দয়া হতো।

খুড়ো এতক্ষণ পড়্ পড়্ করে ঘন ঘন হুঁকো টান্‌ছিলেন। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর আড়াল থেকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন কিন্তু শুন্‌লুম যে তোমার বৌঠান্ তার শুশ্রূষা করছেন সেটা কি ভালো দেখায় বাবাজী ? হাজার হোক সে পরপুরুষ, আর বিধবা ই-যে—

দপ্ করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অসিতের প্রশান্ত চোখ দুটো থেকে ঠিক্‌রে এলো যেন। রুখে উঠে বল্লে : খবরদার, আপনারা বয়ঃজ্যেষ্ঠ নিজেদের সম্মান বাঁচিয়ে কথা কইবেন।

তারপরই ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গ্যালো।

—কেমন আছেন আজ সুরেশ বাবু। বল্‌তে বল্‌তে অসিত এসে ঘরে ঢুক্‌লো।

অদূরে ফসল ক্ষেতের বুকে অস্তারুণের অন্তিম চুম্বন তখন বিহ্বল আবেশে লুটিয়ে পড়েচে—জান্‌লার ধারে ব'সে ব'সে সুরেশ আনমনে তাই দেখ্‌ছিলো। ভাবনার অথই পাথারে মন তার নিরুদ্দেশেই পাড়ি জমিয়েছিল বোধ করি।—অতীত স্মৃতির ব্যাকুল হাতছানি।

অসিতের ডাকে এই স্মৃতি দেয়ানী মানুষটির চমক্ ভাঙ্গলো।—কে ? আপনি।……হ্যাঁ, ভালোই তো আছি। ঘা গুলোও শুকিয়ে এসেছে। জরটাও বোধ করি নেই।

—কিন্তু আপনার দেহের দুর্ব্বলতাটুকু এখনও ঘোচেনি। আরো কিছুদিন আপনি বলকারক পথ্য খান্—

একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে সুরেশের কণ্ঠ সহসা প্রায় রুদ্ধ হয়ে এলো। গাঢ়স্বরে সে বলে উঠ্‌লো : মানুষকে আজো আমি বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না অসিত বাবু! কখনো মনে হয় হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাই তার আপন রূপ—পরমুহূর্ত্তে সুশীতল স্নেহে আমার সে ধারণা বদ্‌লে যায়……আপনি কেন সেদিন আমায় ঘৃণা করে চোর ব'লে ধরিয়ে দিলেন না ? এই পথে কুড়িয়ে পাওয়া অচেনা ছন্নছাড়াটাকে কোন্ সাহসে বাড়ীর মধ্যে ঠাঁই দিলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে অসিত জবাব দিলে : মানুষকে আমি তা'র দুর্ব্বলতা, গ্লানি সত্ত্বেও শ্রদ্ধা করি। আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি বলে পাড়ায় কুৎসিৎ একটা আন্দোলন চলেচে কিন্তু নিন্দুকের বিষোদ্গারকে আমি ভয় করিনে।

ঘরের মধ্যে ঘনায়মান আবছায়ার দরুণ অসিতের মুখ দেখতে পাওয়া গেল না। শুধু দুটী জ্বল্‌জ্বলে চোখ জ্যোতিষ্কর মতোই জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেচে।

আলো থাকলে আরও দেখা যেত, যে সুরেশের ক্ষতাঙ্কিত মুখখানা অকস্মাৎ হেমন্তের পাণ্ডু আকাশের মতো রক্তহীন হয়ে গেছে।

……পাড়ায় আন্দোলন চলেছে।

খানিকবাদে অসিত উঠে গেল। যাবার আগে বল্‌লে : কাল কল্‌কাতায় যাচ্চি। কলেজ কামাই করবার আর দরকার নেই। দেখ্‌বেন রুগ্নদেহের ওপর কোনরূপ অত্যাচার কোরবেন না যেন!

জরটা আবার বেড়েচে।

ডাক্তার বল্‌চেন : অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার ফলেই নাকি এ জরের উৎপত্তি। রোগীকে নিরুদ্বেগে রাখা দরকার।

সুরমার সেবাকুশল স্নেহকোমল হাত দুখানির যেন ক্লান্তি নেই। সুরেশের শুশ্রূষায় সদা তৎপর।

টেম্পারেচার নেওয়ার পর একবাটী গরম দুধ এনে সুরমা বোল্‌লে : খেয়ে নাও তো, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

সুরেশ মুদিত চোখে নিঝুম হ'য়ে প'ড়েছিল। চোখ না মেলেই বললে : ফুলের বদলে যে তোমায় কাঁটা দিয়েচে, যে তোমায় নির্ম্মমভাবে প্রত্যাখ্যান কোরেচে, তার প্রতি তোমার কেন এ সেবা ? পুরাণো স্মৃতি কি আজো ভুলতে পারো নি, সুরমা ?"

প্রশ্ন শুনে সুরমার চোখের তারায় ব্যথার ঘনিমা ছেয়ে এলো। তবু অবজ্ঞা মেশানো স্বরে বোল্‌লে: ব'য়ে গ্যাচে আমার সে সব কথা মনে করে রাখ্‌তে।—সহসা রাঙা চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি ওর মুখের পানে নিবদ্ধ করে সুরেশ অস্বাভাবিক আবেগের সঙ্গে বলে উঠ্‌লো: ছলনা কোরোনা সুরমা!....:.আজ কেবলই মনে হচ্চে তোমার দেওয়া বরণ-মালা সেদিন গলায় না পরে আমি নিজেকেই বঞ্চিত করে-ছিলুম বুঝি! সে ভুল কি আজ শোধরানো যায় না?

সুরেশের মনে হোল, সুরমা বুঝি প্রাণপণে একটা উদ্বেলিত দীর্ঘশ্বাস চেপে ফেল্‌লে। কিন্তু মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌লে সেখানে প্রভাত আকাশের নির্ব্বিকার নির্ম্মলতা।

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে সুরমা বল্লে: আর বাজে বোকো না বাপু! দুধটা খেয়ে নাও। আমি ভাতের হাঁড়ীটা নাবিয়ে আসি।

ওর অকস্মাৎ চলে যাওয়াটাও হয়ত ছল!

সুরমা চলে গেলে সুরেশ একলা শুয়ে নিজের মনটা তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কোর্‌তে লাগ্‌লো। দেখ্‌লে তার আত্ম-অহঙ্কারের উদ্ধত প্রাসাদ আজ ধুলিসাৎ হ'য়ে লুটিয়ে পড়েচে। শুধু বুকজোড়া মরুভূমি বিপুল তৃষ্ণায় হা হা কোর্‌চে। আপনমনেই সে বোলতে লাগলো: ওরে কাঙাল্! ওরে সর্ব্বনেশে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মত এ কী সর্ব্বগ্রাসী তোর বুভুক্ষা!

সুরেশ আজ বুঝ্‌তে পারলে—সে মানুষ—দুর্ব্বল মানুষ! শঙ্কায় সে শিউরে উঠ্‌লো।

নিশুপ্ত নিশীথ! বাইরে শুধু ঝিঁঝিঁর ঝুনুঝুনির এক-টানা সুর। সুরেশের চোখ দুটো বিনিদ্র। জ্বরের তাড়সে মাথার মধ্যে অসহ্য যাতনা। পাশে লুণ্ঠিতা লতার মতো তন্দ্রাতুরা সুরমা! এতক্ষণ সুরেশকে পাখার বাতাস কোরতে কোরতে ওর জাগরণ-ক্লান্ত চোখ দুটো ঘুমের নেশায় জড়িয়ে এসেচে।

সুরেশের নজর পড়্‌লো ওর অনাবৃত অকুণ্ঠিত ঘুমন্ত মুখখানির ওপর। নিশান্তের নিষ্প্রভ চন্দ্রমার মতোই ঈষৎ ম্লান বোধ হয় উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগার শ্রান্তির দরুণই।

ওর পানে চেয়ে চেয়ে সুরেশের মনে হোল, এ যেন উদ্‌গতযৌবনা কামচঞ্চলা কুমারিটি নয়—অপূর্ব্ব মহিয়সী মমতাময়ী এক নারী!

রজনীগন্ধার গোপন-গন্ধের মতোই সুরমার প্রচ্ছন্ন অথচ পবিত্র প্রেমকে শুধু অনুভব করা যায়—উপভোগ নয়। উপভোগ কোর্‌তে গেলেই বুঝি কলুষিত ক'রে ফেলবে!

কিন্তু, ওর বুক-ভরা উপভোগের তৃষ্ণা!

অসিতের প্রশান্তোজ্জ্বল মুখখানি সহসা মনে পড়লো। কি উদার বিশ্বাসের সঙ্গেই ও নিজের বাড়ীতে তাকে আশ্রয় দিয়েচে। ওর সেই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের মর্য্যাদা যদি সে কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে রাখতে না পারে?

নিন্দুকের বিষোদ্‌গারকে ওই তরুণ নীলকণ্ঠ হয় ত ভয় করে না। কিন্তু এই নির্দ্দোষিণী নারীটি একটা ছন্নছাড়ার জন্যে কুৎসা-বিষের জ্বালায় কেন মরবে?

সুরেশের মন অশান্তিতে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

ধীরে ধীরে সে জান্‌লার কাছে সরে গেল।

সুমুখে পথ—অনন্ত, উদার, তারার অস্ফুট আলোয় মায়াময়। পথিকের মনে আবার পথের নেশা লাগে।

সুরেশ ভাব্‌লে যে পথ দিয়ে সে একদিন সুরমার কাছে এসেছিল সেই পথ দিয়েই আবার ফিরে যাবে। যে মান-সিক দ্বন্দ্ব তার অন্তরকে বিক্ষত কোরে তুলেছে এমনি কোরেই তার অকাল অবসান হোক্—

কিন্তু যাবার আগে একটী স্মৃতি?

নিদ্রিতা সুরমার ললাটের ওপর সুরেশের তৃষিত ওষ্ঠ ঝুঁকে পড়লো——পরক্ষণেই মনে হোল সুরমাকে কাপুরু-ষের মত অপমান করবার অধিকার তা'র নেই!

সর্ব্বস্ব হারিয়ে যে কাঙাল পথিক ফিরে চলেচে, যাবার—যাবার বেলায় একী তার দুর্ব্বলতা? সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে আলোয়ানটা বেশ করে জরতপ্ত দেহে জড়িয়ে সুরেশ নিঃশব্দে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

আবার চলা সুরু—

মাথার ওপর অসংখ্য তারা।

ওগুলো যেন যুগে যুগে চলে যাওয়া সুরেশের উদ্দেশে বিরহিনী সুরমার অশ্রু।

অনির্ব্বচনীয়

শ্রীসখানাথ দাশ

বলার মাঝে না বলা যে কথা,
সেই কথাটি শুন্‌তে তোমার এমন ব্যাকুলতা,
কেন হল শুনি,
মূর্চ্ছনা যার বুকের মাঝে উঠ্‌ছে রণরণি।
ভাষায় তারে বুঝিয়ে দেওয়া
প্রাণে যাহায় নিবিড় করে যায়না কভু পাওয়া
সে যে কঠিন বড়ো
মানসী মোর সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করো।

আমার হৃদয় নদী
স্রোত-হারা সে চলৃত বহি শুধুই নিরবধি,
বাতাস তারে দোল দিতনা হায়!
কোনমতে রইতো বেঁচে শীর্ণকায়া বালুর কিনারায়।
আজকে হঠাৎ নতুন জোয়ার জলে
তীর ভাঙ্গি' সে গর্জ্জি' উঠি ছুটছে বিপুল বলে।
কেমন করে ঘট্‌লো এমন তাই—
নিজেই আমি বুঝতে নারি তোমায়
আমি কি বুঝাবো ছাই।

আঁধার রাতে কুহেলিকা ছিন্ন ক'রে ফেলি
ঝড় ঝাপ্টা দীর্ণ করা দীপ্ত পাখা মেলি
রক্তারুণের আলো উজল পাখী
দীপ্ত ভয়াল বিপদ-নাশন মেলি তাহার আঁখি,
চিরদিনের বন্ধ করা বুকের পাষাণ কারা
মুক্ত করে তুল্‌ল গানের ধারা;
সে গানখানির রেশ
বোঝা তাহার হয়নি প্রিয়া আজো আমার শেষ।

তোমার মাঝে এইটুকু সে বুঝি
আজ বুঝি তার মৃদুল পরশ পেলাম আমি খুঁজি।
অন্ধ নয়ন দুটি—
যে অরূপের দরশ আশে বেদন ভরে পড়েছিল লুটি,
তাহার রূপের রেখা,
আলো ছায়ার পরদা ভেদি দিল ক্ষণিক দেখা।
চিত্ত দিল ভবে
হৃদয়খানি ভরিয়ে দিল সুধায় পূর্ণ ক'রে

সঞ্চিত যা' প্রাণে,
ওগো আমার ব্যথার সাথী! তোমার কানে কানে
বল্‌তে আমি যাই—
নীরব হ'য়ে চেয়ে থাকি বলার ভাষা খুঁজে নাহি পাই
পরম অভিমানে
মুখ ফিরায়ে থাকো তুমি চাও না আমার পানে।
কেমন করে বোঝাই ওগো হায়!
অনির্ব্বচনীয় সে যে বলাই নাহি যায়।

প্রবোধ কুমারের ছোট গল্প

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবোধ কুমার সান্যাল মনে প্রাণে সত্যকারের সাহিত্যিক। তাঁর গল্প মাসিক-পত্রে চোখে পড়লে না পড়ে কিছুতেই পারা যায় না। বিদেশী গল্প-লেখকদের যথা মোঁপাসা, বালজাক সোহুভ, ও'-হেনরী প্রভৃতির গল্প চুরি করে যে সব প্রবীন ও নবীন লেখক সাহিত্যের পোষাক পরছেন প্রবোধ কুমার তাঁদের কেউ নয়। প্রবোধকুমার ভূমিষ্ঠ হয়েছেন লেখক হয়ে। চিন্তার মৌলিকতা, জীবনের গভীর উপলব্ধি. ষ্টাইলের নূতন ঢং, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, নিখুঁত চরিত্র-চিত্রণ, প্রবোধকুমারকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে উচ্চাসন দিয়েচে, এই গুণ এঁর মত আরো কয়েকজন অতি আধুনিক সাহিত্যিকের অল্প বিস্তর আছে, যথা প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, বিভুতিভুষণ।

প্রবোধকুমারের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে কিছুদিন আগে। উত্তরপাড়ায় আমি তখন ছিলাম। সেই সময় একখানি 'নবশক্তি' আমার হাতে এসে পড়ল। দেখলাম একটি মাত্র গল্প সেই সংখ্যায় রয়েছে। ঠিক গল্প নয়, চিত্র। নাম 'তেপান্তর' লেখাটি পড়ে একেবারে মুগ্ধ হোয়ে গেলাম। দুঃখ দৈন্য নিপীড়িত বাংলার এক নগণ্য ভাড়াটে বাড়ীর চিত্র কী আশ্চর্য্য সুন্দর অভিনব ভাবেই না লেখকের অনাড়ম্বর ভাষায় ফুটে উঠেছে। গল্পটি পড়ে পড়ে একেবারে মুগ্ধ হোয়ে গেলো। সেদিন মনে হোয়েছিল নব্য বাংলার উদয়াচলে এই যে শিল্পিটি আত্মপ্রকাশ করেচে একদিন এই শিল্পী সাহিত্য-রসিকদের প্রীত করবে, তৃপ্ত করবে, বিস্মিত করবে। প্রবোধকুমারের সঙ্গে পরিচয় সেই থেকে, জন-বিরল এক পথের প্রান্তে তাঁর দেখা পেয়ে তাঁকে উৎফুল্ল হোয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম।

অতি-আধুনিক সাহিত্যের সুর দুঃখের সুর। জীবনের নগ্ন বীভৎস দারিদ্র্যের প্রকাশ এই অতি আধুনিক সাহিত্যে, এই জীবনের এই দিকটাকে অতি আধুনিকেরা চিত্রিত করেচেন বলে তাঁদের কত গালিগালাজ, নিন্দা ব্যঙ্গোক্তি কটুকথা শুনতে হোয়েছে, জীবনের নগ্ন নিষ্ঠুর দারিদ্র্য পাগলামি মানুষের জীবনকে কী ভাবে ধ্বংস ব্যর্থ করে তার জাজ্জল্য প্রমাণ শৈলজানন্দের "অতসী" "ধ্বংস পথের যাত্রী এরা," প্রেমেন্দ্রের "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে," অচিন্ত্যকুমারের "দুইবার রাজা" এবং প্রবোধকুমারের 'দূতী' এবং 'তেপান্তর'। সমস্ত সংস্কার-মুক্ত হোয়ে এগুলি পড়লে বোঝা যায় অতি-আধুনিকরা মর্ম্মে মর্ম্মে দারিদ্র্যকে কী ভাবে উপলব্ধি করেচেন। "তেপান্তর" গল্পের সেই দুঃখ দারিদ্র্য ক্লিষ্ট অসহায় মেয়েটির আর্ত্তকণ্ঠে সব ছাপিয়ে এখনও যেন আমাদের কানে এবং প্রাণে নির্ম্মম ভাবে বাজচে "মরে গেলাম ভাই বড় তৃষ্ণা একটু জল।" কিন্তু তার বুকের সেই অনির্ব্বাণ পিপাসা কি মিটেচে? এক-বিন্দু জল কি সে পেয়েচে?

'নিশিপদ্মে' লেখক দেখিয়েছেন একদিকে নরনারীর মিথ্যা জঘন্য আত্ম-প্রবঞ্চনা, অন্যদিকে সুন্দর হোয়ে এই পৃথিবীতে দশ জনের মত হাসি অশ্রু আনন্দ আশা নিয়ে বেঁচে থাকবার অসীম অনির্ব্বাণ পিপাসা। সংসারের বোঝার তারা নুইয়ে পড়েচে, পাঁকের ভিতর দিন দিন একটু একটু করে অসহায় ভাবে ডুবচে, তাদের চারিদিকের আবহাওয়া পঙ্কিল পুতিগন্ধময়, নীচতা শাঠ্য পাগলামী জঘন্য কদর্য্যতা, তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে এক হোয়ে গেছে, অবিচারে অত্যাচারে তারা জর্জ্জর, তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে তারা পরস্পরে মাপামারি কামড়াকামড়ি ক'রে তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়। আমাদের সমাজের কোন অন্ধকার গিরিগহ্বরে যে সব হতভাগ্য দিনের পর দিন জীবন্মৃত হোয়ে নামে মাত্র বেঁচে ছিল প্রবোধকুমার তাদেরকে আমাদের চোখের সামনে তুলে দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি শুধু তাদের দেখিয়ে দিয়েই যদি ক্ষান্ত হোতেন তাহোলে হয়তো তাঁকে সাধারণ

লেখকের একটু উপরে স্থান দিয়ে ক্ষান্ত হোতাম। কিন্তু এসব হতভাগ্য নীচ মুমূর্ষু নরনারীর অন্তরের গভীরতম প্রদেশে আলোকপাত করে যা দেখিয়েছেন তাতে আমরা বিস্মিত ব্যথিত হোয়ে পড়ি। দেখি তাদের অন্তরের সমস্ত নীচতা পাপ-গ্লানি পাঁকের তলায় একটু ফুল ফুটে রয়েছে আর রয়েচে সুন্দর হবার দশজনের ভেতর মানুষের মত বেঁচে থাকবার একটা, স্বাভাবিক ইচ্ছা, এই যে কামনার সুন্দর ফুলটি তাদের অন্তরের সমগ্র আবর্জ্জনার নীচে অর্দ্ধশুষ্ক হোয়ে ফুটে রয়েচে এ খবর তারা জানে না। দৈবাৎ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে এই সত্যটির সন্ধান তারা পায় কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে। তারপর জীবনকে সমস্ত পাপগ্লানী কদর্য্যতা অনেক মুক্ত করে পবিত্রভাবে সুন্দর ভাবে জীবনকে চালিত করবার চেষ্টা করে. মানুষ যাইহোক, যত গলদই তার থাকুক না কেন তবু সে মানুষ সমগ্র নিশিপদ্মে প্রবোধকুমার এই সত্যটিই আমাদের কানে কানে গুঞ্জন করেচেন।

নিশিপদ্মের প্রথম গল্পটি ত দেখি একটী বিধবা মেয়ে কাল্পনিক নীড় বেঁধে তার স্বামীর সঙ্গে দিন কাটাচ্চে। নিম্নলিখিত লাইন কটি পড়লেই পাঠক গল্পের মর্ম্মকথার পরিচয় পাবেন, মেয়েটির নাম পার্ব্বতী, পার্ব্বতীর এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, সুখী নবদম্পতী ভ্রমণ করে ফিরছিল। দুজনের ঘর সংসারের কথা আরম্ভ হোল—

পার্ব্বতী বল্লেঃ কালকেই চলে যাবে? ইস্ আমি ভাবছিলাম তোমাকে একদিন নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাবো, দেখতে তোমার ভগ্নীপতিটী কেমন সৌখিন. দুজনে মিলে কেবল ঘরই সাজাচ্ছি ঘরটি আমাদের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী; সামনে ফুল বাগান দিনরাত গন্ধে ভুর ভুর করে। তাঁর পাগলামি শুনলে তুই হাসবি ভাই, রোজ একটি করে বকুলের মালা তাঁর জন্যে গাঁথা চাই, বিছান হবে রোজ ফুলশয্যা। এমন জায়গায় হবে যেন চাঁদের আলো এসে পড়ে, জানলার ধারে নীমগাছ তার তলায় রজনীগন্ধার বন...

নিশিপদ্মের এই গল্পটিতে একটি বঞ্চিত নারীর বুকে স্বামী-সংসারের একটি অতৃপ্ত তৃষাকে কী সুন্দর করেই না লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনে যে নারীর সুন্দর হবার মহীয়ান হবার কোন উপায় নেই মধুর মিথ্যার কল্পলোকে স্বামী সংসার রচনা করে যে জীবনটা সুখে কাটাতে চায় প্রবোধকুমারের অনুভূতির নিবিড়তা সুদূরপ্রসারী কল্পন এই লেখাটিকে আশ্চর্য্য সুন্দর করে তুলেচে। এই গল্পে তাঁর চিন্তার মৌলিকতার পরিচয় আছে।

তারপর তাঁর অন্য গল্পগুলির কথা ধরা যাক্। 'মর্ম্ম-কামনা' 'প্রসাধন' 'কঙ্কাল' প্রভৃতি গল্পের সুর এক হোলেও প্রথমটীর সঙ্গে শেষোক্ত গল্পগুলিতে মানব জীবনের কুশ্রীতম দিকগুলিই লেখকের তুলিতে ফুটেচে। এই গল্পগুলিতে লেখব দেখিয়েচেন মানুষেরর দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় যতই পঙ্কিল কদর্য্যতা থাকুক না এর অন্তরালে একটী কামনার ফুল অগোচরে ফুটে রয়েচে। এই কথা আমি প্রথমেই বলেচি। এই কামনাটি তাদের অন্তরে হঠাৎ সত্য হোয়ে ওঠে এবং সমস্ত পাপগ্লানী পঙ্কিলতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিষ্পাপ জীবন যাত্রার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়, ব্যর্থতার এই অসহ্য মর্ম্ম-স্পর্শী ট্র্যাজিডি আশ্চর্য্য ভাবে ফুটে উঠেছে 'মর্ম্ম-কামনা' গল্পটিতে। মানুষ সুন্দর হবার চেষ্টা করলেই সে সুন্দর হোতে পারে না এই কথাটী প্রবোধকুমার বার বার বলেচেন।

রচনা সব দিক দিয়ে সত্য হয় লেখকের সত্য অনুভূতির নিবিড়তায় সুদূর-প্রসারী কল্পনার নিখুঁত চরিত্র চিত্রণে এবং লেখকের রচনার ঢঙের এইসবগুলি গুণ থাকলে লেখকের রচনা সার্থক হয়। কিন্তু প্রবোধকুমারের এসবগুলি গুণ একত্রে থাকলেও সব গল্পে তার পরিচয় পাইনি। 'নিশিপদ্ম' 'প্রসাধন' 'মর্ম্ম-কামনা' 'কঙ্কাল' প্রভৃতি গল্পে আর্টিষ্ট প্রবোধকুমারের অসমান্য শিল্প চাতুর্য্যের পরিচয় থাকলেও 'ছন্দপতন' গল্পটি ব্যর্থ হোয়েচে। এই গল্পে লেখক যা বলতে চেয়েছেন তা না বল্লেও কিছুই এসে যেত না, আর আমার মনে হয় প্রবোধকুমার যেন পাঠককে চমক দেবার চেষ্টা করেচেন। 'বাতাস দিল দোল' গল্পটি মিষ্টি হোলেও প্রবোধকুমারের অসামান্যতার পরিচয় পাইনি কিন্তু কবি প্রবোধকুমারের পরিচয় পেয়েচি।

"শুধু কেবল অশোক আর শিমুলের বনে বনে যখন আগুন লাগে রজনীগন্ধার সকরুণ ইঙ্গিত যখন চন্দ্রালোকের দিকে উদ্ধায়িত হোয়ে ওঠে বন মর্ম্মর যখন ছায়া পথের সঙ্গীত

রচনা করে আর দিশেহারা দক্ষিণের হাওয়া যখন ঘরের ভিতর সকল কোণ বিশৃঙ্খল করে যায়—

মধ্যরাত্রে পক্ষিরাজের আগমন সংবাদে চকিতা ও ত্রস্তা রাজকন্যার ঘুম ভাঙে।

কিন্তু আশ্চর্য্য রস-সৃষ্টি হোয়েছে 'গভীর' এবং 'নারায়ণ' গল্প দুটীতে। নিতান্ত সাধারণ দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ দুটি লেখা হোয়েছে। এ যেন সন্ধ্যা আকাশের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

'গভীর' গল্পটি রোমান্টিক। 'নিশিপদ্মের' মধ্যে খাঁটি ফেরিওয়ালার জীবনের একটি রাত্রের ঘটনা। কয়েক ঘণ্টার জন্যে যে একটি কিশোরী বধূর সম্পর্কে এসেছিল গল্প পড়া শেষে হোলে দেখি কিশোর ফেরিওয়ালার করুণ দীর্ঘশ্বাস আকাশে বাতাসে ব্যপ্ত হোয়ে পড়েচে। এই সামান্য ঘটনাটুকু নিয়ে এই রকম উচ্চ শ্রেণীর রস সৃষ্টি-শুধু প্রবোধ কুমারের দ্বারাই সম্ভব। এবং আমরা রসগ্রাহি পাঠক গল্পের এইখানে দেখি ভাদ্রের ভরা নদীর মত রস দুলে দুলে উঠচে—

সামান্য কিশোর ফেরিওয়ালার সঙ্গে যখন কিশোরী বধূটির আলোচনা একটু গভীর হোচ্চে তখন সে এই বলচে কথা—

বদ্রি অনেকক্ষণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে বল্লে: আমি তোমাকে চিনি।

মেয়েটি বল্লে, দূর কোন দিন দেখেচো না কি যে চিনবে!

অভিভূত হোয়ে বদরি বলল: হ্যাঁ চিনি, নিশ্চয় চিনি আমি তোমাকে দেখেছি এর আগে।

—কোথায় দেখেছিলে?

ঘাড় ফিরিয়ে বদরি একবার রেল পথের দিকে তাকালো, কোথায় দেখেচে তা সে কেমন করে বলবে? স্মরণের পর-পার পর্য্যন্ত সে একবার হাতড়ে দেখল। সসাগরা ধরিত্রী আর নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশ সে মনে মনে তোলপাড় করে এলো। তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে বল্লে হুঁ ঠিক আমি চিনি তোমাকে—দেখেছি যে আগে।

কী সুন্দর কী অনির্ব্বচনীয় এই কথা কটা। হতভাগ্য সামান্য ফিরিওয়ালা সে, জীবনে কোন সুন্দরী মেয়ের অতো কাছে সে কোন দিন আসেনি, তাই মেয়েটির সঙ্গে ক্ষণিক হাসিতে কথাতে তার মনে হোল তার বৈচিত্র্যহীন অতীত জীবনে একদিন এই মেয়েটী যেন মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে বিলিয়ে গেছে কোন দাগ কাটেনি, এবং ধরাও দেয়নি।

'নারায়ণ' গল্প একবার পড়লে কখনো ভুলতে পারা যাবে না। নিশিপদ্ম প্রবোধকুমারকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

—

বাঙ্গালার কাব্যসম্পদ

(মৈমনসিংহ গীতিকা)

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্তরায় সাহিত্য-সরস্বতী

এক টাকা বেতনের মুদীখানার কর্ম্মচারী দীন সাহিত্য সেবী চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত মৈমনসিংহ গীতিকা কাব্য সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ, আমরা এই পুস্তকের ১ম ভাগ ২য় খণ্ড পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। পুস্তকখানি দেখিলে আপাততঃ 'এক ঘেয়ে' বলিয়া মনে হয় এবং পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির যথেষ্ট সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু একবার পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া শান্তি পাওয়া যায় না, পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়। চন্দ্রকুমার বাবুর অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয় শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুর ছেঁড়া পুথি ঘাঁটা সার্থক হইয়াছে। যে সমস্ত পালা গান, পল্লীগাথা ইত্যাদি একদিন নিরক্ষর ছোটলোকেরা গাহিত আর শত শত চাষা নাঙ্গলের উপর বাহুভর করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিত, সেই গান আজ ইংরাজী শিক্ষা-গর্ব্বিত সমাজকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে, ইহা দীনেশচন্দ্রের অল্প কৃতিত্ব নহে। বাস্তবিক পক্ষে বাঙ্গালী ঘরের যে সমস্ত শোভা শতদলের মত ফুটিয়া জগৎকে সুষমা বিতরণ করিয়াছিল—আমাদের--পোড়া দেশের সেই অমর আলেখ্য এতকাল আমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়াছি। মহুরা মহুয়া, লীলা প্রভৃতি আমাদের হৃদয়ে যে সুর লাগাইতে সমর্থ ই হইয়াছে মিসেলেণ্ডা, ডেসডেমোনা প্রভৃতি সে সুর আমাদের মধ্যে জাগাইতে পারিবে না।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক উপাখ্যান বিষয়ক কাব্যে কথার অভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার উল্লিখিত মহুয়া, মহুয়া, কঙ্কলীলা প্রভৃতির ন্যায় কাহিনী বা উপাখ্যানের অভাবে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবিকই শ্রীহীন হয়। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন দিকের উপর আলোপাত করিয়াছে। এই প্রকার গাথা বা পালা গান ছন্দের শব্দৈশ্বর্য্যের বা তাল-লয়ের মাপ কাটিতে হয়ত দীন হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কারুণ্যে ও কবিত্বে উৎসের যে অফুরন্ত স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন তাহা আদৌ দীন বা হীন নহে। ডাক্তার দীনেশ বাবু তাঁহার সুদীর্ঘ ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছেন;—"এই অপূর্ব্ব জিনিস বঙ্গ-সাহিত্যে সুদুর্ল্লভ। বঙ্গসাহিত্য পৌরাণিক উপাখ্যান-গুলিতে সংস্কৃত শব্দের সোনালী চুমকি দেওয়া বেণারসী চেলী পরিয়া ঝলমল্ করিতেছে—কিন্তু পাঁড়া গাঁয়ের এই সরল কথা, যাহাতে সংস্কৃতের একটুকুও ধার করা শোভা নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক রূপে অপূর্ব্ব সুন্দর,—তাহার নমুনা আমরা কোথায় পাইতাম। নানা দিক্ দিয়া এই সকল পল্লী গাথায় খাটি বাঙ্গালী জীবনের অফুরন্ত সুধা অচিন্তপূর্ব্ব মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃতভাণ্ডার নহে, ইহা আমাদের দেশের আম গাছের মৌচাক এজন্য এই খাটি মধুর আস্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে। চন্দ্রকুমার বঙ্গসাহিত্যের নিজ ভাঁড়ার ঘরের সন্ধান দিয়াছেন, উহা হোটেলের মসলা দেওয়া মুখরোচক বিলাস খাদ্যসম্ভার নহে উহা আমাদের পল্লী—অন্নপূর্ণার শ্রীকর কমলের দান—জীবনদায়ী অন্নব্যঞ্জন।" বাস্তবিকপক্ষে অবজ্ঞাত অশিষ্ট (?) ভাষার অনাড়ম্বর সরলতায় পল্লীলক্ষ্মীর দরদভরা প্রাণের খোঁজ মিলিয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে ১০টি উপাখ্যানের মধ্যে এক কাজল রেখা (রূপকথা) ব্যতীত সবগুলি যথার্থ ঘটনা ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত। পল্লী কবিগণ কাল্পনিক আজগুবী ঘটনার অবতারণা করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের নিকট উপাখ্যান সম্বলিত ঘটনার

দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। সময় ক্রমে সে সব দৃষ্টান্তের অভাব হইয়াছে এবং তৎসম্বলিত গানও গাহিবার লোকের অভাব হইয়াছে। কবিগণ আখ্যায়িকার প্রতিমার দর্শন ও সন্ধান যে তাঁহাদেরই কুটীরে পাইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গ্রামের অনেক প্রভাব প্রাচীন কবিদের মধ্যে দেখা যায়। চিত্রকর যেমন চিত্র-শালের আদর্শ লইয়া অঙ্কন ও নয়নরঞ্জন স্বাভাবিক বর্ণ সন্নিবেশ ও উহার প্রতিফলনে কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কবিগণও সেইরূপ এক একটি ঘটনা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া স্বরচিত গ্রন্থে সেই সমস্ত ভাব পরিস্ফুট করিয়া থাকেন। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র তাঁহার সুদীর্ঘ ভূমিকায় উপাখ্যানগুলির কাল ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এমন কি প্রথম খণ্ডে মানচিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ঐ সমস্ত ঐতি-হাসিক নিদর্শনের অধিকাংশগুলি এখনও লোকচক্ষুর অন্তরাল হয় নাই।

নিরক্ষর কবিগণ সরল বাঙ্গালা কথার উদ্দীপনার ছন্দে হিন্দুসমাজের যে আনন্দময় মর্ম্মস্পর্শী অভিনব চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা শ্রাবণের নদীপ্রবাহের ন্যায় শক্তি ও স্ফূর্ত্তিতে ভরপুর হইলেও তাহার মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা ছিল না। এই গাথার মধ্যে নারী ধর্ম্মের যে জীবন্ত মূর্ত্তি গুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের পাতি-ব্রত্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিপদে ধৈর্য্য উপায় উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠতায় তুলনা কোথায়? প্রত্যেকের চরিত্র সমাজের উপর অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই। মহুয়া জীবনে শত দুঃখ অকাতরে সহ্য করিয়া যে প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে সে নির্ভীক প্রেমের তুলনা মিলে না। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি মলুয়া সুখে দুঃখে সমভাবে থাকিয়া শাপগ্রস্তা লক্ষ্মার ন্যায় অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া আমাদের অন্ধ অনুদার পল্লীসমাজের চক্ষু যেভাবে ফুটাইয়া গিয়াছে তাহা যেমন প্রাণস্পর্শী সেইরূপ আদর্শমূলক। কঙ্কের অদর্শনে লীলার শোকোচ্ছ্বাস ও লীলার লীলাবসানে কঙ্কের শোকাবেগ কঠিন পাঠকের হৃদয়েও গভীর রেখাপাত করে। প্রেম প্রত্যাখ্যাতা চন্দ্রাবতীর চিরকুমারীব্রত পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল হইলেও তার মধ্য থেকে প্রেমের পবিত্র মন্দাকিনী বারির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কমলার উপাখ্যান অনেক লেখকের মনে মসলার (plot) সন্ধান দিয়াছে। দস্যু কেনারামের কাহিনী পাঠে দস্যু রত্নাকরের কথা মনে উদিত হয় এবং অশ্রুবেগ সংবরণ করা যায় না। প্রত্যেক উপাখ্যানের চরিত্রগুলি এতই প্রাণস্পর্শী ও মনোমোহকর হইয়াছে যে কোনটির বিষয় উল্লেখ না করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না। এইরূপ সংক্ষিপ্ত আংশিক আলোচনা দ্বারা এইরূপ মূল্যবান কার্য্যের যথোপযুক্ত প্রশংসা করা ত হয়ই না, অধিকন্তু তাহার খর্ব্বতাসাধন করা হয়। বাহুল্যের ভয় ও লেখকের যোগ্যতার অভাব বিস্তৃত আলোচনার পরিপন্থী।

গাথা বর্ণিত উপাখ্যানগুলির মধ্য দিয়া তাবৎকালীন হিন্দু সমাজের অনেক রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের যে অন্ধ, অনুদার পল্লীসমাজের কর্ত্তারা আজ অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ, অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রভৃতির কথা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন এবং তাঁদের সাধের কৃত্রিম জীবন্ত প্রাচীন হিন্দুসমাজ অতল জলে ডুবিয়া যাইবে বলিয়া ক্ষোভে দুঃখে বর্ত্তমান শিক্ষার ও প্রবৃত্তির প্রতি দোষারোপ করেন তাঁহাদিগকে কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বের পল্লীজীবনের আদর্শ ও রীতিনীতি এই সব গাথাবলীর মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। তখন গৌরীদান আচার বিচারের চুলচেরা হিসাব এরূপ ছোঁয়াচে ছিল না যার জন্য আজ সমাজ ও জাতিরক্ষা কল্পে সর্দা আইন (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন) প্রণয়ন কর্ত্তে হয়েছে। এই সকল গীতিকার নায়ক নায়িকাদের কাহারও বাল্যকালে পরিণয় হয় নাই। চৌদ্দ পনের এমন কি সতের বৎসর পর্য্যন্ত মেয়ে অবিবাহিতা ছিলেন। হিন্দু নারী আজন্ম কুমারীব্রত অবলম্বন করিলেও জনক জননী পিতৃপুরুষের নরক গমনের আশঙ্কা মনে স্থান দিতেন না। কুমারী ব্রত ধারিণী চন্দ্রাবতীকে তাঁহার পিতা "শিব পূজা কর আর লেখ রামায়ণ" বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকি সমাজগর্হিত ছিল? তখন সমাজে অস্পৃশ্যতা এরূপ কঠিন ও কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ হয় নাই। যে কঙ্ক এক বৎসর বয়স হইতে

পুরো পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চাঁড়াল মায়ের স্তন্য পান করিয়া চাড়ালের ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণকুলতিলক গর্গ নিজের গায়ের নামাবলী দিয়া সেই অস্পৃশ্য বালকের গা মুছাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণসমাজে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ছুৎমার্গের যুগে তাহা সম্ভবপর হইত কি ? চাড়াল মাতাকে ব্রাহ্মণসন্তান শতকোটীবার প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গঙ্গা যমুনার ন্যায় পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করা ও বর্ত্তমান যুগের পিতৃপুরুষের তকমাওয়ালা আভিজাত্য রোগগ্রস্ত সমাজের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। বেদের মেয়ে মহুয়ার রাঁধাভাত খাইয়াও নদের চাঁদ জাতি রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। দেওয়ান সাহেবের হাকুনিতে মহুয়া হিন্দুর যে আদর্শ ব্রহ্মচর্য্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শত শত আচারবিচার ও দুরন্ত আইন কানুনে বাঁধা বর্ত্তমান যুগের কয়জন স্বেচ্ছাচারহীন (?) ব্যক্তি পারেন ?

ক্রমশঃ

সুরবাহার

শ্রীপ্রণব রায়

আজ এসেচে ফাগুন রাঙা করবীকানন,
এই রঙিন ভোরে নীড় রচিবার ক্ষণ।
ফুল শাখায় হের পাখী বাঁধিচে বাসা,
মুখে মধুর গীতি বুকে নবীন আশা :
তবে রচনা কর মধু বাসর মিলন।

হায় মোদের এ-নীড় জানি দু'দিন পরে
ভেঙ্গে লুটাবে ধূলায় কাল-বোশেখী ঝড়ে !
তবু গাহ লো গীতি, ঢাল ক্ষণিক সুরা,
হোক্ দু'দিন তরে প্রাণ-পাত্র পূরা :
ওই কাজল চোখে সখি ঘনাক্ স্বপন ॥



জানিনি মিলিয়ে যাবে এই ফাগুনের ফাগ,
তোমার হৃদয় রাঙাবে ফের নবীন অনুরাগ।
আজকে যে চাঁদ অস্ত যাবে,
আর কি তা'কে খুঁজ্‌লে পাবে ?
কাল্‌কে ভোরেই শুকিয়ে যাবে স্মৃতির গোলাপবাগ।

তোমার প্রাণের পান্থশালায় অনেক মুসাফির
নতুন ফোটা কুসুম নিয়ে নিত্য করুক ভীড়।
না-ইবা মোরে রাখলে মনে,
থাকুক শুধু একটি কোণে
নীড়-বিবাগী এই পথিকের চ'লে যাওয়ার দাগ ॥

বাতায়ন

সালতামামি। পাঠক পাঠিকাদের আমাদের নব বর্ষের সম্ভাষণ জানাই।

কালপুরুষের অক্ষমালায় আর একটি বৎসরের আবর্ত্তন শেষ হইল—১৩৩৮ সাল তার লাভ ক্ষতির বেসাতি লইয়া অতীতের গর্ভে চলিয়া পড়িল। এই এক বৎসরে জাতির জীবনের উপর দিয়া অনেক আশা ও নৈরাশ্যের আলোছায়া আনাগোণা করিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস ও সরকারে একটা সাময়িক সন্ধির ফলে গতবৎসর এমনি সময়ে একটা স্বস্তি ও ভরসার ভাব সর্বত্র জাগিয়া ছিল, দেশের বাতাস যেন একটু লঘু হইয়া আসিয়াছিল। দেশবাসীর আশা ভরসার পেটিকা হস্তে মহাত্মা যেদিন শেষ মুহূর্ত্তেও গোলটেবিলে যোগ দিবার সঙ্কল্পে যাত্রা করিলেন সে দিন অনেক আশঙ্কার মধ্যের একটু ক্ষীণ আশার রশ্মি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ বর্ষশেষে শান্তির কোন সম্ভাবনাই আর দূরদিগন্ত-রেখাতেও দেখা যায় না।

স্বয়ং মহাত্মা ও তাঁহার সতীর্থগণ তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত কারাগারে মৌন তপস্যায় দুর্দ্দিনের রাত্রি জাগিয়া কাটাইতেছেন। কারার বাহিরেও সারাদেশ জুড়িয়া একটা নিস্ফল ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের গুমোট চাপিয়া বসিয়াছে। দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সম্ভাবনায় আমরা ভাবিতেছিলাম যে বুঝিবা আবার একটা বোঝাপড়ার পথ সেখানে উন্মুক্ত হইবে, কিন্তু সরকার অন্যরূপ আশঙ্কা করিয়া সেপথ আইনের বলে বন্ধ করিয়া দিলেন। এ আঁধারে পথ কে দেখাইবে?

স্বাধীন ফিলিপাইন। ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার পাশাপাশি নজরে পড়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিচিত্র ও করুণ কাহিনী। প্রশান্তমহাসাগর ও চীনসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এই দ্বীপপুঞ্জ অশেষ প্রাকৃতসম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু এই সম্পদই তাহার কাল হইয়াছে। সভ্যতার অনুপাতে মানুষের লালসা যে কত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার প্রমাণ পাই হতভাগ্য ফিলিপাইনদের ইতিহাসে। উহার লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক এককোটি। ষোড়শশতকের শেষ চতুর্থাংশে ইহারা স্পেনের বণিকদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও দেশের শাসনরশ্মি ধীরে ধীরে স্পেনীয়দের হস্তগত হয়। স্পেনীয়দিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ফিলিপাইন বীর আইন্যালডো বৈদেশিক শাসন পাশ হইতে দেশকে মুক্ত করিবার প্রয়াসে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন. কিন্তু এই বীর ১৯০১ সালে আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের হস্তে বন্দী হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্পেনীয়দের গ্রাস হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কবলে পড়ে। এতদিনে আগুইন্যালডোর স্বাধীনতার স্বপ্ন বুঝি সফল হইল, কারণ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সুমতি হইয়াছে—এখন হইতে আট বৎসরের শেষে তাঁহারা ফিলিপাইনোদের সুদীর্ঘ সাধনার বরস্বরূপ স্বরাজ্য দিতে সম্মত হইয়াছেন। স্বাধীনতার যথার্থরূপ যাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এই বস্তু একজাতি আর একজাতিকে ভিক্ষামুষ্টির ন্যায় দান করিতে পারে না। ইহাকে অনেক ত্যাগ ও তপস্যা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। ফিলিপাইনের অধিবাসিগণের ব্রত উদ্‌যাপন হইতে চলিল—কিন্তু "ভারত তবু কৈ?"

বীরপূজা—মানবমনের শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য যে ভূগোলের ও সংকীর্ণ জাতীয়তার জবরদস্তী শাসনকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিয়া চলে তাহার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই বাঙালীর গ্যয়টে স্মৃতিপূজায়! এই সকল নাম গোত্রাতীত মহামানবের রাজচ্ছত্রতলে বিশ্বের মানব মানবী যে একত্ব উপলব্ধি করে, একদিন হয়ত প্রাচী, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ তাহারই স্বর্ণসূত্রের রাখিবন্ধনে বাঁধা পড়িবে। সেই দিনই গান্ধী রোল্যাঁ রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন কায়া লাভ করিবে। সেদিন আর জাতিসঙ্ঘ গড়িয়া পরস্পর—বিবদমানজাতির মধ্যে সখ্যতা স্থাপনের বিড়ম্বনা থাকিবেনা বিশ্বমানব সেই দিনটিরই প্রতীক্ষায় উন্মুখ চাহিয়া আছে?

চীন-জাপানে। অনেক অগ্রপশ্চাতের পর চীন জাপানে একটা আপোষের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই ব্যাপারে গত কয়েকমাস ধরিয়া জাতিসঙ্ঘের কতচেষ্টা ও নির্দ্দেশই না ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে যা হোক এতদিনে যে শেষরক্ষা হইল ইহাতেই আমরা আশ্বস্ত হইলাম। জাতিতে জাতিতে যখন স্বার্থের দ্বন্দ্ব তুমুল হইয়া উঠে তখন সকল ন্যায়বুদ্ধি ম্লান হইয়া পড়ে আশা করি জাপান এতদিনে তাহার সহজ বুদ্ধি ফিরাইয়া পাইয়াছে।

এসিয়ার এই দুইটি স্বাধীন দেশই একদিন গৌতমের শান্তি ও অহিংসার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, আজ সে প্রেম ও সাম্যের দৃষ্টি হিংসাধূলিতে আচ্ছন্ন হইল কিসে ও কেন?

"জয়যাত্রায় যাও গো"—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিমানযোগে পারস্য যাত্রা করিলেন। শাস্ত্রকারের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া এই সুপরিণত বয়সেও তিনি যে তরুণ-সুলভ সাহস ও উদ্যমের পরিচয় দিতেছেন তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময় ও গর্ব্বের উদয় হয়। জরা মুক্ত চির নবীন মন এমন করিয়াই দেহের অপটুতাকে অগ্রাহ্য ও জয় করে। হাফিজ ও ওমারের কাব্যকুঞ্জে বাঙ্গালার ও বিশ্বের কবি আজ অতিথি —এ এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। যাত্রার পাক্কালে কবির কণ্ঠে যে শেষবিদায়ের মূর্চ্ছনা জাগিয়াছিল তাহা মর্ম্মস্পর্শ করে সন্দেহ নাই। জয়ন্তী উৎসবেও তিনি এই সুরে কথা কহিয়াছিলেন আমরা কিন্তু কবিবরকে এখনও অনেক দিন ধরিয়া দিকে দিকে ভারতীয় কৃষ্টি ও আদর্শের বাণী বহন করিতে দেখিব এই আশাই করি, তাই তাঁহারই কথায় পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি:—

"জয় যাত্রায় যাও গো,
ওঠো ওঠো জয়রথে তব!"

শোকসংবাদ যশোহরের যশস্বী সন্তান রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে যশোহর বাসী আজ শোকবিহ্বল। তাঁহার কর্ম্মজীবন দেশসেবার একটী অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। মৃত্যুমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বহুবৎসর ধরিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত প্রথমে জেলা বোর্ডের সহকারী সভাপতি ও পরে সভাপতি হিসাবে দেশসেবা করিয়াছেন। উচ্চপদবী ও খ্যাতির সহিত এরূপ অনাড়ম্বর অমায়িকতার সমাবেশ আমরা কচিৎ দেখিয়াছি। আইনজীবি হিসাবেও তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। মক্কেলগণের মুখে তাঁহার সদাশয়তা, বিচক্ষণতা ও সরলতার কথা ধরিত না। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভ্রাতৃবিয়োগ প্রভৃতি কয়েকটি পারিবারিক দুর্ঘটনার ব্যথায় তাঁহার দেহমন তিলে তিলে ক্ষয় হইতেছিল, মিত্রমহাশয়ের পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠসেবায় বঞ্চিত হইয়া যশোহরের ক্ষতি ও আক্ষেপের অন্ত নাই। আমরা ভক্তিনতচিত্তে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করি এবং তাঁহার সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

সাহিত্যের ভুরিভোজ—কথাশিল্পের যাদুকর শরৎচন্দ্র রসিক সমাজকে পুলকিত করিয়া বিচিত্রার মারফত বহুদিন পরে আবার তাঁহার সুপরিচিত রসের পরিবেশন করিতেছেন। পথেরদাবী ও শেষপ্রশ্নে উদ্দেশ্যের গন্ধ পাইয়া যাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন শ্রীকান্তের এই নব পর্য্যায়ে তাঁহারা সকল ক্ষতি উশুল করিয়া লইবেন এ আশা করিতে পারি। আশঙ্কা শুধু এই যে শেষ প্রশ্নের ন্যায় শ্রীকান্তের পালা শেষটা মাসিক না হইয়া "কালে ভদ্রের" কোঠায় না নামিয়া পড়ে!

বে-পরোয়া—শুনিয়া পুলকিত হইলাম শীঘ্রই 'প্রবাহ' নামে একটি মাসিকের অভ্যুদয় হইবে। আধুনিক সাহিত্যের কয়েকজন তরুণ শিল্পী হইবেন "প্রবাহের" ভগীরথ। "প্রবাহের" বিশেষত্ব এই যে কোনো মতের গণ্ডী বা বন্ধন দিয়া ইহাকে বাঁধা হইবে না। ইহার উদার বুকে সকল শ্রেণীরই উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা স্থান পাইবে। আমরা এই "বে পরোয়া" সহযোগীর আগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম।

স্বাগতম্—শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় আর এক বৎসরের জন্য কালিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন। কংগ্রেসবিরোধী ইউরোপীয়ানগণও যে তাঁহার পক্ষে ভোট দিয়াছেন, রায় মহাশয়ের যোগ্যতা সম্বন্ধে ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ সম্পর্কে যে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ হয় যে এখনও সেই পুরাতন মনোমালিন্যের জের চলিয়াছে! আমরা আশা করি যে রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে এই রেষারিষি নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া যাইবে।

পুস্তকপরিচয়

কাজললতা—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত। ১৫নং নয়ানচাঁদ দত্তষ্ট্রীট, কলিকাতা মেটকাফ প্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীশশীভূষণ পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা, ছাপা ও কাগজ ভাল।

এই লেখকের রচিত যাযাবর, নিশিপদ্ম প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠক মহলে সুপরিচিত।

আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা সুলতা অখ্যাত কোনো গাঁয়ের নিতান্ত নগন্য গৃহস্থের মেয়ে, মা বাপ ছিল না। বাল্যকালে গ্রামান্তরের একটি কিশোরকে সে ভাল বাসল, কিন্তু ঐ প্রথম ও শেষ ভালবাসার চঞ্চল কিশোর একদা কোথায় উধাও হয়ে গেল—আর সে এল না—সমাজ পরিত্যক্ত আশ্রয়হীন একটি লোকের সঙ্গে সুলতার বিয়ে হল, কিন্তু সন্যাস রোগে স্বামীটি একদিন ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। তার পর বিধবা সুলতা উকিল সত্যেনের অবিবাহিতা স্ত্রীরূপে পরে সত্যেনের আত্মহত্যার পর তাহার বন্ধু উপেনের সাহায্যে সন্যাসীর এক আশ্রমে ও তৎপরে দেবদত্ত নামক এক যুবকের আশ্রয়ে চলে গেল। পুস্তকখানি এই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

সুলতার একরাস রূপ—যে রূপ প্রশংসায় বলা যায় না, বর্ণনায় বোঝানো যায় না, যেরূপ দেখিয়া রূপাভিমানিনী সন্যাসিনী হিংসাপরায়না হয়! এক কথায় সুলতা অপার্থিব সুন্দরী, স্বল্পভাষিণী, করুণাময়ী, পরদুঃখ কাতর, সেবাপরায়না ও অপরিসীম কৃতজ্ঞ। দুর্নীতির বোঝা, কলঙ্কের কালিমা এ মেয়েটির শুভ্র নিষ্কলুষ মুখখানিকে মলিন করতে পারেনি, কিন্তু নিজকে বাঁচাবার মত মেরুদণ্ড তার নাই। বাইরের ঝড়-ঝাপটা থেকে ঢেকে রাখবার জন্যে কোনো না কোনো একটা আশ্রয় তার চাইই। সে কারণে প্রথমে স্বামী পরে সত্যেন ও আশ্রমের মধ্য দিয়া লতিয়ে দেবদত্তর কাছে গিয়ে সে নিজের সুলতা নামের সার্থকতা দেখিয়েচে। তাই মনে হয় বই খানির নাম কাজল-লতা না হয়ে সুলতা হলেও মন্দ হ'ত না। কাজললতার অঞ্জন চোখে লাগার চেয়ে সুলতার লতানে ভাব মনে লাগে ঢের বেশী।

লেখক দেখাতে চান যে নারীত্বের সঙ্গে সতীত্বের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য নয়। পাপ যার মধ্যে নেই, দরকার হলে সে দুর্নীতি সবাই মাথাপেতে নেবে এই ধারণায় লেখক তাঁর নায়িকাকে অশেষ গুণসম্পন্না ক'রেও সতী করবার চেষ্টা করেন নি। নারী শুধু নারী—তার জাত নেই, ধর্ম্ম নেই, সমাজ নেই, নীতি নেই, শুধু ফোটবার জন্যেই সে ফুটে উঠেচে। মোট কথা এই যে নারীসুলভ অন্য গুণ থাকলে সতীত্বর ও অসতীত্বর কোনো আলোচনাই চলতে পারে না। এই কথাগুলি মনে রাখলে লেখকের চিত্রিত নায়িকাকে সকলেরই ভাল লাগবে। কিন্তু সাধারণে বিশেষতঃ নীতিবিদেরা এ সকল কথা স্বীকার করবেন না তাঁহারা বলবেন দুর্নীতিই পাপ এবং সতীত্বও নারীর একটি বিশেষ গুণ এবং বাঙালী সমাজে তার প্রয়োজন আছে নচেৎ সমাজ চলে না বাঙালী সমাজের এই সংস্কার সম্বন্ধে লেখকও বেশ সচেতন তা না হলে তিনি সুলতাকে অজ্ঞাত কুলশীলা আর তার স্বামীকে ভবঘুরে, সমাজ পরিত্যক্ত ও আশ্রয়হীন রূপে অঙ্কিত করলেন কেন?

আলোচ্য বইখানিতে উপেনের চরিত্রও বেশ ফুটে উঠেচে। উপেন সত্যেনের মক্কেল ও বন্ধু দুইই। উপেন সৌখিন, ঋণী অবিবাহিত, নারীজনোচিত ভঙ্গী করে শিস্ দিতে দিতে রাস্তায় চলে সে এমন একটা কিছু চায় যা কোনো দিন ফুরাবে না, এমন একটা আনন্দ যার বৈচিত্র হারাবে না, পুরাণো হবে না! উপেন রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে সুলতাকে ভালবেসেছিল। নিজের সম্বন্ধে উপেন বলেছে যে কোনো রকম সত্যের ধারণা তার নেই, কোনো ধর্ম্মবোধ নেই, সেই ভাল লোক হয়ত সে নাও হতে পারে কিন্তু মেয়েদের চোখের জল তাহাকে চিরকাল চঞ্চল

করে তোলে। সে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়, দুরাশাগুলোকে নিয়ে মনে মনে মালা গাঁথে—সত্যেন কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা সুলতাকে দেখে একদিন সে বলল "আমার অনেক দোষ আছে বুঝলেন, কিন্তু অন্দরে বীরত্ব করবার ইত্‌রোমো আমার নেই।' উপেন জানে বাঙালীর মেয়ের মেরুদণ্ড ভয়ানক দুর্ব্বল, সে তাদের একটুও বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই প্রণয়-বুভুক্ষু দুশ্চরিত্র উপেন ঝড়ের রাতে পাড়াগাঁয়ের নিভৃত পাঠশালা ঘরে সুলতার সঙ্গে একত্র থেকেও যে ভাবে সংযম রক্ষা করেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই ভাব বজায় রেখে সুলতাকে কাশীতে পৌঁছে দিয়ে আখ্যায়িকা থেকে চিব বিদায় নিয়েছিল তা সত্য সত্যই প্রশংসার বিষয়।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে শীতলা, মান্তুর মা প্রভৃতি বেশ ভাল হয়েচে।

বই খানির ভাষা ও লিখনভঙ্গী সুন্দর, কিন্তু লেখকের কল্পনা উদ্দাম, লেখনী অসংযত এবং বর্ণনা স্থানবিশেষে অশ্লীলতাব্যঞ্জক ও অস্বাভাবিক। তিনি যে ভাবে গ্রন্থের অবতারণা করেছেন এবং উপাখ্যানের ঘটনাবলী যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেন নি। কুসংস্কারমুক্ত গুণগ্রাহী বন্ধুর মুখেও শুনেছি যে তিনি বইখানি প্রথমবার পড়তে আরম্ভ করে কয়েক পাতার বেশী পড়তে পারেন নি এবং বারান্তরে পাঠ করে মোটের ওপর তাঁর ভাল লাগে নি। মেদিনীপুরের মেয়েদের সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত আমাদের খুব খারাপ লাগল।

বইখানিতে অনেকগুলি ছাপার ভুলও আছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসাক

ইঙ্গিতের অভিনব প্রস্তাবের জের

চৈত্র সংখ্যায় "ইঙ্গিতে"র অভিনব প্রস্তাবের কথা পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন। মাসিক পত্রে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ নূতন এবং ইহা "ইঙ্গিতের" গ্রাহক হইবার পক্ষে কতদূর সুবিধাজনক তাহা সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের বিবেচ্য।

গ্রাহক হইলে আপনি নিয়মিত কাগজ ত পাইবেনই অধিকন্তু আর একটী জীবনবীমার সুবিধাও ভোগ করিতে পারিবেন।

সাধারণের অবগতির জন্য নিয়মাবলী পুনরায় দেওয়া গেল :—

বৈশাখ ১৩৩৯ হইতে যাঁহারা "ইঙ্গিতে"র বাৎসরিক গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহাদিগকে একটী নির্দ্দায় জীবন বীমার সুবিধা দেওয়া হইবে।

আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বাৎসরিক গ্রাহক হইতে হইবে। গ্রাহকগণকে নিয়মিত কাগজ পাঠান হইবে কিন্তু যে জীবনবীমার সুবিধা দেওয়া হইবে তাহার জন্য কোন অতিরিক্ত চাঁদা বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে দিতে হইবে না।

বাৎসরিক গ্রাহকগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার বৈধ ওয়ারিশগণই এই বীমার সুবিধা পাইবেন। বীমার টাকা দশ টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।

কিরূপ ভাবে "ইঙ্গিত" কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ অতিরিক্ত চাঁদা না লইয়া এই সুবিধা দিতে সক্ষম হইয়েন, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদার এক তৃতীয়াংশ এই বীমাফণ্ডের জন্য জমা থাকিবে, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ মাত্র ইঙ্গিতের কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

উক্ত সঞ্চিত অর্থের এক চতুর্থাংশ বীমার হিসাব ইত্যাদি রাখার খরচস্বরূপ ব্যয়িত হইবে বাকী টাকা মৃত গ্রাহকের ওয়ারিশগণকে দেওয়া হইবে। গ্রাহক যত অধিক হইবে দাবীর টাকার পরিমাণও তত বাড়িবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আলোচ্য বর্ষে যদি আমরা গ্রাহক সংখ্যা এক হাজার ধরি, তাহা হইলে আমাদের চাঁদা আদায় হইবে তিন হাজার টাকার কিছু কম। উহা হইতে বীমা শাখার জন্য একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ এক হাজার টাকা রিজার্ভ রাখা হইবে।

উক্ত এক হাজার টাকা হইতে বীমাশাখার খরচ বাবদ এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ দুই শতটাকা বাদ আমাদের হাতে মোট আটশত টাকা থাকিবে। ইহাই মৃত গ্রাহকগণের বৈধ-ওয়ারিশগণের মধ্যে সমানাংশে বণ্টন করা হইবে।

সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বৃদ্ধ, শিশু রুগ্ন, ধরিয়া হাজার করা মৃত্যু সংখ্যার হার ২০ জন মাত্র। অতএব আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে হাজার করা ১৫ জনের অধিক মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই।

তাহা ধরিলে এক হাজার গ্রাহকের মধ্যে যদি বৎসরে ১৫ জনের মৃত্যু হয় তবে উক্ত আটশত টাকা এই পনের জনের ওয়ারিশান সমানাংশে পাইবেন এবং একাংশে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া পড়িবে।

কালে গ্রাহক গ্রাহিকা সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বীমার টাকাও বেশী হইতে পারিবে। ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক গ্রাহক গণই মাত্র এই বীমা—সুবিধা পাইবেন।

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে চাঁদার টাকা একত্রে না দিলেও চলিবে। প্রথমে গ্রাহক হইতে গেলে মাত্র এক টাকা দিলেই চলিবে পরবর্ত্তী দুই মাসে বাকী চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে।

নিম্নে একটী কুপন দেওয়া হইল, এই কুপন সহ একটাকা পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হইবে *

মহাশয়! "ইঙ্গিতের" বাৎসরিক গ্রাহক হওয়ার ইচ্ছায় আংশিক চাঁদা এক টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।

নাম——————————————

পোঃ——————————————

গ্রাম——————————————

জেলা——————————————

* সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট অনুরোধ যে তাঁহারা অভিনব প্রস্তাব পড়ার পর যেন তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে পড়িতে দেন এবং ইহার উপকারিতা বুঝাইয়া দেন কারণ ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।—ইঃ সঃ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসের "ইঙ্গিত" "প্রফুল্লচন্দ্র সংখ্যা" করা হইবে। ঐ সংখ্যায় আচার্য্যদেবের অসংখ্য ছাত্র এবং ভক্তগণ তাঁহাদের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এবং মানকুমারী বসু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণও ভক্তি-অর্ঘ্য উপহার দিবেন।

ইঙ্গিত

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ | ১৩৩৯ সাল

শেষপ্রশ্ন

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সেন আই-সি-এস্

হায়দ্রাবাদ, সিন্ধ
২৬শে মার্চ্চ, ১৯৩২

প্রিয় শরৎ বাবু,

আমাকে বোধ হয় আপনার মনে আছে। আশা করি ভালই আছেন। আমি সম্প্রতি এই মরুভূমের দেশে বদলী হ'য়ে এসেছি। তিন বছর বম্বেতে ছিলুম, ছেলেপিলের অসুখ বিসুখে বড় দুঃখেই ছিলুম। ছুটী নিয়ে তাদের বিলেতের স্কুলে রেখে এসে এই মরুভূমির মাঝখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসেছি। সকলে জিজ্ঞেস করেন, য়্যাঁ, আজ কালকার দিনে বিলেতে পড়াচ্ছো? বলি, আজকালকার দিন বলেই ওদের বিলেতে রেখেচি। অথচ সিবিলিয়ান হলেও শপথ করে বল্‌তে পারি আমি দেশদ্রোহী নই।

যাক্ সে কথা। সম্প্রতি আপনার 'শেষপ্রশ্ন' পড়লুম। পড়্‌তে ভারি দেরী হয়ে গেল। লোকে যাকে বলে সাহিত্য-চর্চ্চা তা আর করি না। বিলেতে একবার বাঙ্গালী ছেলে-দের কাছে আপনার এ বই খুঁজেছিলুম কিন্তু পাই নি। শ্রীমান অন্নদা শঙ্কর আপনার এই বইখানি নিয়ে অতি তীব্র এক সমালোচনা করেচেন, বলেচেন আধুনিক বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে নাকি আপনার পরিচয় নেই, আর এই বই গল্প নয়, শুধু তর্কের ম্যুজিয়ম, এ কথা শুনেচি। তার সমালোচনা পড়িনি, তবে সংবাদ পেয়েচি এ নিয়ে তার আর তার বন্ধু মণ্টুর বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেচে।

আমি কত কুঁড়ে মানুষ তা বোধ করি আপনি কতকটা জানেন। কারু চিঠির জবাব দিতে গেলে আমার দু'চার মাস লাগে। আপনার খবর অনেক দিন নিই নি, কুঁড়েমি তার অনেকটা কারণ নিশ্চয়। তবু আপনার বইখানা পড়েই আপনাকে লিখ্‌তে বসেচি, তার কারণ ওটা পড়তে পড়তে মনটা বিশেষ রকম নাড়া খেয়েচে, শুধু তাই নয়, একটা গভীর আনন্দও পেয়েচে। আপনার এ-বইখানিতে যেমন অদ্ভুত শক্তি দেখলুম, কমলের চরিত্র গড়বার কাজে আপ

নার সৃষ্টি-প্রতিভাও তেমন অপ্রতিহত মনে হ'ল। সত্যি বটে বইখানার আগাগোড়া তর্কেতে ঠাসা। গল্প হিসেবেও একে বোধ হয় আপনি নিজেই খুব উঁচু স্থান দেন না। আর আপনি আধুনিক বাঙ্গালী মেয়ের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন এ কথা কে বল্লে? আপনি যার চিত্র এঁকেছেন সে তার চেয়ে অনেক বড়, আমাদের সমাজ ও তা' নিয়ে আমাদের আত্মপ্রসাদ ও আত্মগৌরবের বিরুদ্ধে সে এমন একটা ঐকান্তিক বিদ্রোহ যার অন্তর্মুখিতা শুধু মেয়ে চরিত্রেই ফুটে উঠতে পারে এবং যার সত্যতাই তার শক্তির উৎস। শরৎ বাবু, বিদেশে থেকে থেকে আর রায় লিখে লিখে বাংলা লেখবার শক্তি হারিয়েচি, আমাকে উদ্ধার করুন। নিজের মনের ভাব ত প্রকাশ করতে পারলুম না। কমল ত শুধু তর্ক আর কথা কাটাকাটির সমষ্টি নয়, ওকে এত জ্যান্ত করলে কিসে? খুব শক্ত কাজে হাত দিয়েছিলেন আপনি। "নারীর মূল্যে"র লেখক বলেই আপনি এ কাজটা নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত করতে পেরেছেন। অনেক দিন চলে গেচে, কিন্তু যে নারী সেদিন আপনার লেখার ভেতর দিয়ে নিজের দাবী জানিয়েছিল মনে হয় কমলের দেহে তারই পুনর্জ্জন্ম হয়েচে। কতকগুলি মতামত নিয়ে একটা চরিত্র, বিশেষ করে স্ত্রী চরিত্র গড়া যায় না, একথা সহজেই বলা যায়। তা' গড়তে যাওয়া যতটা কাঁচা কাজ হ'ত, এক্ষেত্রে এ-রকম সমালোচনা যে তার চেয়েও কাঁচা। তবে শ্রীমান অন্নদা শঙ্কর যে 'সবুজ পত্রের মতই কাঁচা ("ওরে তরুণ ওরে আমার কাঁচা) তা' ত ভোলা যায় না। যাক্, আপনার সুমুখে আপনারই ওকালতী করতে এ চিঠি লিখতে বসি নি।

কমলকে আপনি আশ্চর্য্য সুন্দর করে গড়েচেন। তার বিদ্রোহ আশ্চর্য্যরকমের সুন্দর! আমাদের সমাজের আত্মপ্রসাদের স্বচ্ছ জলাশয়ের জলে যেন হেলার ভরে সে মাঝে মাঝে মৃদু পদাঘাত করতেই সে জল ঘুলিয়ে যাচ্চে। এ দৃশ্য চমৎকার। তার কথাগুলো নিষ্ঠুর ঠেকে কিন্তু অত দরদ, মনুষ্যত্বের জন্যে অত বেদনা, অন্য কার বুকে আছে? জানি আপনারই দরদ দিয়ে তার এ সৌন্দর্য্য ফুটিয়েছেন। আপনার সমস্ত বিদ্রোহ এ দরদেরই ও-পিঠ। জানি উচ্ছৃঙ্খল ব'লে আপনার এক দুর্নাম আছে; যারা একথা বলে তারা আপনার বিদ্রোহ বুঝবে কি করে?

পার্সন্যাল কথা এসে পড়ল, ক্ষমা করবেন। শুধু আপনাকে জানাতে বসেছিলুম আপনার এ বইখানা আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েচে। মনে হয় ইচ্ছে করেই বইখানা লেখবার সময়ে নভেল লেখার কোনো নিয়মকানুন মানেন নি। তাই সে কমলের মত বিধিব্যবস্থার বাইরে গড়ে উঠেচে। সংস্কারের দাঁড়ি টানতে চায় নি বলেই এ শেষ পর্য্যন্ত একটা প্রশ্ন চিহ্নই থেকে গেচে। এ পড়ে যদি আমাদের তরুণ তরুণীদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের জীবন এমন প্রশ্নচিহ্নে পরিণত করতে পারেন তা হ'লে আনন্দের কথা হবে। আমার বিশ্বাস 'পাঙ্কচুয়েশন মার্কগুলোর' মধ্যে দাঁড়িটাকে আমরা বড় বেশী সম্মান দিয়ে ফেলেচি; ওদের যে রাজা সেটা প্রশ্নচিহ্নের ছদ্মবেশ পরে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। *

---

* পত্রখানি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত। শরৎচন্দ্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য আমরা দায়ী। ইঃ সঃ



অবিদ্যার ধারা

শ্রীঅরবিন্দ

জীবনের যত সমস্যা মানুষের চিন্তাকে বিব্রত করিয়াছে এবং বহুবিধ ও বিরোধী মীমাংসার জন্ম দিয়াছে, অমঙ্গলের সমস্যাও তাহাদের অন্যতম। যাহারা জড়াতিরিক্ত কোন বস্তুকে বিশ্বাস করিতে চাহেন না সেই যুক্তিবাদীদের নিকট এই সমস্যার কোন অস্তিত্বই নাই। তাঁহারা বলেন প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা বিবর্ত্তনের চালে উদ্ভূত। প্রকৃতি অন্ধ ও নির্ব্বোধ; সুতরাং ভাল মন্দের কোন ধারণা তাহার নাই। মানব মনই এই ধারণার অধিকারী—ভাল মন্দের বোধ সামাজিক বুদ্ধি প্রসূত এবং সুখ দুঃখের ধারণাও সম্পূর্ণ স্পষ্ট স্বাভাবিক রীতিতে মানুষের মধ্যে বিকাশলাভ করিয়াছে। তবে যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে একটা সজ্ঞান শক্তিই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, তাঁহাদেরই এই সমস্যা—অশুভের অস্তিত্ব কেন, উদ্দেশ্য কি?

ভগবানের মধ্যেও অমঙ্গল থাকিতে পারে ইহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে ভক্তসুলভ ভাব তাহা হইতেই Maninean তত্ত্বের নানা রকমফের সৃষ্টি হইয়াছে; এই মতানুসারে এত যুগ্মশক্তি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে—কল্যাণশক্তি ভগবান আর অকল্যাণ-শক্তি শয়তান। জগতের মূলে আছে একটা সজ্ঞান অশুভশক্তি এই বিশ্বাসকে যাঁহারা কুসংস্কারাত্মক বলিয়া মনে করেন তাঁহারা মানুষের আপন স্বাধীনতার অপব্যবহারের মধ্যে অমঙ্গলের মূল নিহিত দেখিতে পান—মানুষই তাহার ভগবৎ বিদ্রোহের ও স্বেচ্ছাচারিতার বশে পাপের জন্ম দেয়। কিন্তু এই মীমাংসার কিছুই মীমাংসা হয় না, কারণ ইহাতে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা যায় না যে জগতে মন্দের সম্ভাবনা আদৌ হইল কেন? বিশ্বের উৎস ও স্রষ্টা ভগবান, তাঁহা হইতেই জগতের সমস্ত পদার্থ উদ্ভূত—ভগবান সম্বন্ধে এই ধারণাটি যদি আমরা কাটিয়া সঙ্কীর্ণ না করিয়া ফেলি, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে জগতের সুব্যবস্থায় ঠিক শুভেরই মত অশুভও ভগবান হইতে উদ্ভূত। আর যদি আমরা ঈশ্বরের অখণ্ড বিশ্বজনীনতাকে জোরজবরদস্তি করিয়া খণ্ডিত করি এবং আরও একজন স্রষ্টাকে স্থাপন করি, তাহা হইলে আমাদের মানিতে হইবে সে অমঙ্গল নিবারণ করার সামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি ইহার সমর্থন করেন বা সম্মতি দেন। কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান—তাঁহার সর্ব্বজ্ঞানময় ঐশী-বিধানের নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে এ সংসারে কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। আর যদি আমরা তাঁহার অনন্তশক্তিমত্তাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে তিনি কেবল একজন দেবতাবিশেষ (Demimrgus), একজন বড় শিল্পীমাত্র—জগতের বিভিন্ন শক্তিনিচয়ের মধ্যে চিরদিন দ্বন্দ্বরত; কিন্তু তাহাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত একান্তই অদার্শনিক এবং সমস্ত মানবজাতির সকল অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিরোধী। এখানেও সেই প্রশ্ন, সেই সমস্যাই থাকিয়া যায় যে, যদি তিনি সৃষ্টি না করিয়া থাকেন তবে তাহাকে অনুমোদনই বা করিবেন কেন? ভগবান যদি আদৌ থাকেন তাহা হইলে তিনিই সব—আমাদের মতে, এ বিশ্বাস হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। সবই তাঁহা হইতে উদ্ভূত—দ্বিতীয় আর কোন উৎস হইতে আসিবে

---

* এই প্রবন্ধটী স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত সাপ্তাহিক "কর্ম্মযোগীনের" "The Principle of Evil" নামক মূল প্রবন্ধের একটা অদক্ষ অনুবাদ। "The Principle of evil" প্রবন্ধটী বর্ত্তমানে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের "The need in nationalism" পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত। জীবনে সুখদুঃখ সমস্যার যে অপূর্ব্ব সমাধান ইহাতে আছে তাহা বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আন্তরিক এবং জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেই ইহাতে নূতন আলোকের সন্ধান পাইবেন।

সমস্তই তাঁহার মধ্যে অবস্থিত—আর দ্বিতীয় কোন সত্ত্বায় বা আশ্রয়ে থাকিতে পারে? সুতরাং অমঙ্গলও তাঁহা হইতে সঞ্জাত এবং তাঁহাতেই বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সমুদয় জ্ঞানই তাঁহাতে নিহিত; এই অবিদ্যাশক্তিও তাঁহাতে কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রহিয়াছে। তিনি প্রেমময়, সুতরাং কল্যাণের পরিপন্থী কোন জিনিষের সেবায় নহে—তাহা মঙ্গল সাধনের জন্যই রহিয়াছে। তবে কথা এই, তাঁহার জ্ঞান অনন্ত, আমাদের সান্ত, তাঁহার সম্পূর্ণ, আমাদের অপূর্ণ। তাঁহার প্রেম অসীম জ্ঞানময়, আর আমাদের প্রেম সঙ্কীর্ণ ও অজ্ঞানাত্মক; মায়াচ্ছন্ন জ্ঞান আর সাময়িক সুখের, তৃপ্তির উপর আসক্তিই আমাদের এই অন্ধ অবোধ প্রেমকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ভগবানের প্রেম দেশকালাতীত, সুদূরপ্রসারী, আর আমাদের দৃষ্টি ক্ষণিকের মধ্যে নিবদ্ধ।

সাক্ষাৎ অনুভবই সকল খাঁটী জ্ঞানের ভিত্তি হওয়া উচিত, কিন্তু সে অনুভব আবার খাঁটী উপলব্ধির দ্বারা আলোকিত হওয়া চাই—ভাসাভাসা ইন্দ্রিয় স্পর্শের দ্বারা পরিচালিত অনুভব হইলে চলিবে না। যে মন সর্ব্বতোভাবে শান্তিকে আলিঙ্গন করিয়াছে, জীবনের রূঢ়তম আপদে সন্তাপ দুর্ভোগে আপন স্থৈর্য্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, কেবল তাহার অনুভবই বরণীয়। যে মন ধীর নয়, দুঃখ শোকের অধীন, যাহা আবেগ আসক্তির প্রভাবে চিন্তা করিয়া চলে সে আবেগ আসক্তি যত উচ্চাঙ্গের হোক না কেন—এরূপ মন কোনদিনও সম্যক্‌জ্ঞানে উপনীত হইতে পারে না। ভাবাবেগ হৃদয়ের ধর্ম্ম—ইহা বুদ্ধিকে যেন অভিভূত না করে; বুদ্ধির প্রকৃত কাজ লক্ষ্য করা, বুঝা—সংস্কার অথবা আবেগের দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও আচ্ছন্ন হওয়া বুদ্ধির পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। "ধীর" ব্যক্তি প্রত্যেক ঘটনাটীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেন এবং ঘটনার চরম উদ্দেশ্য ও পরিণতি কি তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে না পাইলে, সেইজন্য ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করেন। এইরূপ প্রতীক্ষায়, ধীরভাবে এইরূপ বিবেচনার ফলে তাহার মনে জীবনের অর্থ ফুটিয়া উঠে—তিনি দেখেন ভালমন্দ; ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ঘটনা ও বস্তুর মধ্যে এক অনন্ত উদ্দেশ্য আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে। সহস্র সহস্র প্রাণীকে নিরাশ্রয় নিঃস্ব করিতেছে যে বন্যা তাহার মধ্যে, নগর পত্তন বিধ্বস্ত করে যে ভূমিকম্প তাহারও মধ্যে এমন কি ক্ষুদ্র পক্ষীটির পতনের মধ্যে এবং পিপীলিকাটীরও মৃত্যুর মধ্যে এক সর্ব্বজ্ঞ বিধাতার বিধান প্রকটিত। একাধারে রুদ্র ও শিবের প্রকাশ চলিতেছে। যোগী সর্ব্ব বস্তুতে কেন, সর্ব্বঘটনায় ঈশ্বর দর্শন করেন। ভগবান বন্যা, তিনি ভূমিকম্প, উচ্চতর জীবনে উন্নীত হইবার যে মৃত্যু তাহা তিনি বৃহত্তর আনন্দ লাভের উপায়স্বরূপ বেদনাও তিনি। ইহা যুক্তি তর্কের বিষয় নহে—ইহা দেখিবার, বুঝিবারই বিষয়—পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। এই দৃষ্টি ধীর স্থির অন্তঃকরণের এবং অবিক্ষুব্ধ বুদ্ধির পক্ষেই সম্ভব।

জড়বাদী যখন বলেন যে, ভালমন্দ দুইই প্রকৃতির ক্রিয়া, প্রকৃতি নিরপেক্ষভাবে কোন প্রভেদ না করিয়া উভয়কেই তাহার কাজে ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে, এই প্রভেদ ক্রমপরিণামের ফলে মানব মনে উদ্ভূত—তখন তিনি ভুল করেন না। মহত্তর কল্যাণকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যে কল্যাণ ভাঙ্গিয়া গড়িতেছে (Evil is good Dne gsbeue ao dis integrating for higher good) তাহারই নাম অকল্যাণ এখন যাহাকে আমরা বলি অত্যাচার, মানব সমাজকে দৃঢ় গঠিত করিবার জন্য এক সময়ে তাহারই প্রয়োজন ছিল। সমাজের যে অবস্থা এক সময়ে আদর্শোচিত ছিল, এখন আবার তাহাই হয়ত অকল্যাণকর ও অশিষ্ট সুলভ বলিয়া পরিগণিত। মানবজাতির মধ্যে দিব্য ও ভাগবত ভাবের পূর্ণতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীতির উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্মেরও প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতেছে। অমঙ্গল মঙ্গলে নিঃশেষ হইয়া মঙ্গলই হইয়া উঠিতেছে; ক্ষুদ্রতর কল্যাণকে পরিবর্জ্জন করিয়া যাহাতে মানুষ বৃহত্তর কল্যাণে উঠিয়া যাইতে পারে সেই জন্যই অকল্যাণের আবির্ভাব—এই সত্যটি ব্যষ্টির পক্ষেও যেমন, একটা জাতি ও জগতের পক্ষেও তেমনই প্রয়োজন।

তবুও কিন্তু দুঃখ সমস্যাটি থাকিয়া যায়। মহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যষ্টির জীবনে দুঃখ যন্ত্রণা কি একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল? এক সময়ে দুঃখ যন্ত্রণাবোধের ক্ষমতা মানুষের জীবনে বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা লক্ষগুণ কম ছিল—এত কম

ছিল যে তাহাকে "কিছু না" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মানুষের আধার তাহার গঠনে যতই একটা সৌকুমার্য্য লাভ করিতেছে, মার্জ্জিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রোগ শোক, যন্ত্রণার অনুভূতিও ততই তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ ইহা প্রগতির একটা সাময়িক ধাপ মাত্র—একটা উচ্চতর জাতিকে দুঃখ যন্ত্রণাতীত অবস্থায় উন্নীত করিয়া একটা উচ্চতর সুখ শান্তিলাভের সামর্থ্য দিবার নিমিত্ত ইহার প্রয়োজন। নিম্নতরস্তরে মানুষের আধার ছিল রূঢ় উপাদানে নির্ম্মিত—এই রূঢ়তার কল্যাণেই দুঃখ শোকের সংস্কার গুলিকে প্রতিরোধ করিত, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া জানিত না বলিয়াই সে দুঃখ হইতে মুক্তি পাইত। কিন্তু ভবিষ্যতে মানবজাতি পাইবে যে উচ্চতর পদবী তাহা এইরূপ ব্যবস্থার নিম্নে থাকিবে না—ইহার একধাপ উর্দ্ধেই উঠিবে। ভালমন্দের জ্ঞানই ত সংসারে শোক ও পাপ আনিয়া দিয়াছে; সেই জ্ঞান অতিক্রম করিয়া গেলে তবে মানুষ শোক পাপের অতীত হইতে পারিবে। জ্ঞানফল আস্বাদনের পূর্ব্বে মানুষ ছিল পশুর ন্যায় নিষ্পাপ; আবার যখন সে-ফল আস্বাদনে বিরত হইবে তখন সে লাভ করিবে দেবতার নির্ম্মলতা। বস্তুতঃ কথা কি ইহা নয় যে সৃষ্টির মধ্যে দুঃখ একটা সম্ভাবনা এবং তাহার ক্ষয়সাধন প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে মানুষকে গ্রহণ করা হইয়াছে আশ্রয়, অস্ত্ররূপে যাহাকে ধরিয়া ব্যাধিটি সঙ্কীর্ণ দেশকালের মধ্যেই প্রকাশ পাইতে পারে ও ভোগের অবসানে সমস্ত সৃষ্টিকেই পূর্ণ নিরাময় করিয়া দিয়া যাইতে পারে। এইভাবে দেখিলে "ক্রুশের উপর মানবপুত্র" এই খৃষ্টানতত্ত্ব এক নূতন অর্থ গ্রহণ করে; এবং স্বয়ং মানুষই হয় বিশ্বের খৃষ্ট।

আর একটা প্রশ্ন স্বতঃই উঠে। দুঃখটা প্রকৃত না, ছায়া। বৈদান্তিকের বিশ্বাস যে আত্মা ভগবানের অর্থাৎ পরমাত্মার একটা অংশ, কিম্বা, ভগবানের সহিত এক-অভিন্ন, সেই জন্য আনন্দ, কেবল আনন্দ ব্যতিরেকে দুঃখ শোক অনুভব করিতে পারে। জীব বা আত্মা সকল দ্বৈতের রস—হর্ষ গ্রহণ করে এবং উহাই তাহার স্বভাবে আনন্দে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু আত্মার এই ক্রিয়া অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছাদিত; অজ্ঞানই জীবের স্বরূপকে হৃদয় মন হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। দুঃখটা হইতেছে অভাবাত্মক (negative) বিকার—মনের মধ্যে আসিয়া সত্য উপলব্ধি যে রকমে দূষিত হইয়াছে; আর সুখ হইতেছে ভাবাত্মক (Positive) বিকার। আসল সত্য হইল আনন্দ কিন্তু এই জ্ঞানের জন্য মানবজাতি আজও প্রস্তুত হয় নাই। কেবলমাত্র যোগীরাই এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন এবং সুখে দুঃখে, ভালমন্দে, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে সম-নির্ব্বিকার থাকিয়া থাকেন। উভয়ের স্পর্শ হইতেই ইঁহারা রস গ্রহণ করিয়া থাকেন, উভয়েই তাঁহাদিগকে দেয় আনন্দ; কারণ তখন মন ও আত্মার অন্তর্বর্ত্তী আচ্ছাদনটা অপসৃত হইয়াছে; বাহ্য মানুষটি তাহার স্বরূপের সহিত এক হইয়া যায়। সমগ্র মানবজাতি যদি এই জ্ঞানের সহিত অকালে পরিচিত (Come too early by that knowledge) হইত, তাহা হইলে পূর্ণ মাঙ্গল্যের গতি হইত বিলম্বিত। তাহা হইলে দয়া ও প্রেমের চরম মাধুর্য্য বিশ্বলীলা হইতে কোন দিনও নিঃসৃত হইতে পারিত না।



প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণনাথ মিত্র

হয়ত' কখন মধুর হেসে
দাঁড়িয়েছিলে পথের পাশে,
তাইতে কি গো পরশ তোমার
ছড়িয়ে গেছে মলয় শ্বাসে ?
হয়ত' কখন কথার ছলে
ভ্রান্ত আমায় গেছ ছু'লে—
না-জানা মোর সেই অপরাধ
হবে কি শোধ নয়ন জলে ?
ভবের হাটের বেচা কেনা
পাওনা যে মোর শুধু দেনা।
এবারকারের বেসাতি মোর
হবে শুধুই তোমায় চেনা।
ঐ ত শুনি তোমার বাঁশী,
কই গো তবে তোমার আলো
অন্ধকারেই যেতে হবে—
সেই ভাল মোর সেই ত ভাল।
দিশা হারা, সীমা হারা,
স্তব্ধ গভীর মলিন সাঁঝে,
মোহন বাঁশীর রেশটি শুধু
বাজিয়ে যেও প্রাণের মাঝে।
নাও কেড়ে নাও চোখের নেশা
যাক্ নিভে ঐ সূর্য্যভাতি,
পথ দেখাবে আমায় আবার
অনুরাগের রঙীন বাতি।
শুনতে দিও মোহন বাঁশী
আলো না হয় নাই বা দেখাও,
বারেক তোমার পরশ দিও
বসতে কাছে যদিই না দাও।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কথায় বলে "চাষার আদর কাস্তের ঠোকর।" নিতান্ত গ্রাম্যলোকের কাছে অপরের প্রতি উপদ্রব করে তাকে বিব্রত করাটা খুবই হাস্যোদ্দীপক হতে পারে বটে, কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে হাস্যরস সৃজন করা হয় সে বেচারার দুরবস্থার আর সীমা থাকে না। পিচ্ছিল রাস্তায় যদি কেউ চিৎপাত হয়ে পড়ে যায় তা হলে ব্যাপার চারদিকের লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হতে পারে কিন্তু যে বেচারা পড়ে গেল তার পক্ষে যে মোটেই উপভোগ্য নয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই স্বীকার করবেন।

আলঙ্কারিকেরা বলেন বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব প্রভৃতি কয়েকটি ভাবের সমষ্টির নাম রস। রস কথাটার কোনও ভিন্ন অর্থ নাই। রস আবার নয় রকমের—হাস্য-রস সেই নব রসের একটি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে হাস্য রস সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে হাস্যরস বলতে আমরা কি বুঝি তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া আবশ্যক। যা হাসির উদ্দীপক তাই কি হাস্যরস? বাস্তব জীবনের হাস্যরস এবং সাহিত্যের হাস্যরস এক নয়। গোপালভাঁড়ের ভাঁড়ামী হাসির উদ্দীপক সন্দেহ নেই কিন্তু তা বলে কি সেই ইতর ভাঁড়ামীগুলোকে সাহিত্যের আসরে স্থান দেওয়া যেতে পারে? প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দেখি যে অশ্লীল রচনাকে হাস্যরস বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে ফাঁকি বেশীদিন চলে না। প্রাচীন সাহিত্যিকদের ফাঁকিও ধরা পড়ে গিয়েছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দরের রাজসভায় বক্তৃতাতেও এই ফাঁকি দেবার চেষ্টা চলেছে। সুন্দরের—

"শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার পিতার নাম বিদ্যার শ্বশুর॥"
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম!
বিদ্যাধর জাতি মোর বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥"

প্রভৃতি ভঙ্গ পয়ারে রচিত রসিকতা অথবা রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের রাণী ও গর্ভবতী বিদ্যার শ্লেষপূর্ণ বাগ্‌বিতণ্ডা হয়ত সপার্ষদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রাণ খুলেই উপভোগ করে ছিলেন। বঙ্গভাষার প্রথম উপন্যাস প্যারিচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালের মূল্য যতই থাকুক না কেন তার হাস্যরসকে প্রকৃত হাস্যরস আখ্যা দেওয়া যায় না। এই সমস্ত অশ্লীল গ্রাম্য রসিকতাগুলি পড়ে আজকাল আমাদের হাসতেও লজ্জা করে। অশ্লীলতাকে হাস্যরসের আড়ালে ঢাকা আর আজকাল সম্ভবপর নয়। আগেই বলেছি যে কতগুলি ভাবের সমষ্টি নিয়ে রস। একলা ছানার কোন আদর নেই কিন্তু যেই ছানার সঙ্গে চিনি মিশল অমনি সেটা সন্দেশে রূপান্তরিত হল। সব জায়গাতেই তার আদর কিন্তু চিনির মাত্রা যদি একটু বেশী হয়ে গেল অমনি সন্দেশের যা মাধুর্য্য সব চলে গিয়ে সেটা আবার রূপান্তরিত হল চিনির ড্যালাতে। নিমন্ত্রণের আসরে তার আদর নেই। কিন্তু চিনি ও ছানা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। সেরকম হাসি রস দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কিন্তু সমান মাত্রায় যেখানে দুটো মিশল সেখানেই প্রকৃত হাস্যরসের সৃষ্টি হ'ল। এই জিনিষটাকে সবাই প্রাণভরে উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু যদি হাসির মাত্রা রসের চাইতে বেশী হয়ে পড়ে তা হলেই হাস্যরসের মাধুর্য্যটুকু চলে যায়। সাহিত্যিকের আসরে অধিক হাস্যমিশ্রিত রসের কোনও আদর নেই।

কিন্তু প্রশ্ন উঠচে সাহিত্যে হাস্যরসের কোনও প্রয়োজন আছে কি? হাস্যরসের প্রয়োজন কি কেবল মাত্র পাঠককে হাসাবার জন্যই? পাঠককে হাসিয়েই যে রচনার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল তা হাস্যরসই নয়—তা ভাঁড়ামী। ভাঁড়ামীর স্থান সাহিত্যে নেই। যে রচনা পাঠকের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে না পারবে তার স্থান সাহিত্যের ইতিহাসে নেই। তাই গোপালভাঁড়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভারত

চন্দ্র প্রভৃতির হাস্যরসাত্মক রচনার স্থান স্থায়ী বঙ্গসাহিত্যে চিরকালের নয়।

পাগলা-ঝোরা, ফোয়ারা, সাহারা প্রভৃতির কথাই ধরা যাক্। জিজ্ঞাসু পাঠক প্রশ্ন তুলবেন এই পুস্তকগুলি পাঠকের কোনও প্রয়োজনে আসবে কি?

উত্তর হল আসবে। কেননা এগুলি কেবলমাত্র পাঠককে হাসাবার জন্যই রচিত নয়। এগুলির ভিতর শিক্ষনীয় বিষয় এবং চিন্তা করবার খোরাক অনেক আছে। হাসি ও কান্না যেন দুইটি যমজ বোন—তারা এক সঙ্গে চলে। ললিত কুমারের রচনার ভেতরও এই জিনিষটির সন্ধান পাই। শক্তিশালী লেখক হাসি ও কান্না এক সঙ্গে গেঁথে গেঁথে তার কল্পনাকে এই কয়টি মালায় পরিণত করেছেন। গভীর বিষয়গুলিকেও তিনি হাস্যরসাত্মক রচনার ভেতর দিয়ে অতি নিপুণ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখানে হয় ত একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ললিতকুমারের এবং Jerome K. Jeromeএর রচনার মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়! কিন্তু ললিতকুমার এবং Jerome K. Jerome সমসাময়িক। অতএব ললিতকুমারের লেখা Jerome K. Jerome-এর লেখার দ্বারা প্রভাবান্বিত একথা বলা ভুল হবে। ললিত-কুমারের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছে তা দুরপনেয় ললিতকুমার ছিলেন হাস্যরসের ফোয়ারা। পাগলা ঝোরার জলোচ্ছ্বাসের মতো তাঁর হাস্যরসের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। ললিতকুমারের হাস্যরস উদ্দাম না হলেও বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে ললিতকুমারের রচনার মূল্য আছে। কেননা যে ধরণের রচনা তাঁর লেখনীর ভেতর দিয়ে বেরিয়েছে তা বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। তাঁর হাস্যরস অফুরন্ত বটে কিন্তু ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাসের মত উচ্ছৃঙ্খল নয়, তা গঙ্গার প্রশান্ত বক্ষের মত ধীর স্থির ও শান্ত। প্রথম দৃষ্টিতে হয় ত পাঠক তাঁর রচনার কোনও রস পাবেন না। কিন্তু একাগ্রচিত্ত পাঠক তার ভেতরকার রূপটুকুর সন্ধান পাবেন। ফোয়ারার প্রথম প্রবন্ধটি যাতে গরুর গাড়ীর সঙ্গে বাষ্পীয় যানের তুলনা করা হয়েছে—তা সত্য সত্যই উপভোগ্য। অনেককে বলতে শুনেছি যে ললিতকুমার নিজে ছিলেন মাষ্টার, তাই তাঁর রচনাতে মাষ্টারী ফলানোর চেষ্টা খুবই স্পষ্ট। এ কথা আংশিক সত্য হতে পারে বটে কিন্তু মনোযোগী পাঠকের নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে যে তাঁর রচনায় জিজ্ঞাসার অভাব নেই।

ককারের অহংকার, ব্যাকরণ বিভীষিকা, অনুপ্রাসের অট্টহাসি, ফোয়ারা, পাগলা-ঝোরা, সাহারা প্রভৃতি হাস্য-রসাত্মক পুস্তকগুলির ভেতর দিয়া তার উদার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত হাস্যরস ঠিক্‌রে বেরিয়ে এসেছে। শিশুসাহিত্যও তার কাছে কম ঋণী নয়। শিশু সাহিত্যে হাস্য রসের প্রবর্ত্তন বলতে গেলে তিনিই করে যান। তাঁর 'রসকরা' 'সাতনলী' প্রভৃতি ছেলেদের জন্য লেখা বইগুলি পাবার জন্য এখনও ছেলেদের মারামারি করতে দেখেছি। শিশুসাহিত্যে হাস্যরসের উন্নতির পরাকাষ্ঠা আমরা দেখতে পাই সুকুমার রায়ের লেখায়। তাঁর লেখা আবোল তাবোল হ য ব র ল! লক্ষণের শক্তিশেল প্রভৃতি পড়ে শিশুদের বাবাকেও হাসতে দেখেছি। তাঁর অকাল মৃত্যুতে শিশু সাহিত্যের যে কতদূর ক্ষতি হয়েছে তা বলে শেষ করবার নয়। সুকুমার বাবুর অনুসরণে কাজী নজরুল ইসলাম 'ঝিঙ্গেফুল' নামে এক শিশুদের উপযোগী কবিতার বই প্রকাশিত করেছেন। কিন্তু একথা বলা বাহুল্য যে সুকুমার বাবুর লেখার সঙ্গে তার লেখার তুলনাই হয় না। সে বইটির রচনা অত্যন্ত কষ্টকল্পিত, তা ছাড়া স্থানে স্থানে ছন্দের গোলমালে রচনার মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুও এই দিকটা সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাও যে খুব সার্থক তা নয়। কিছুদিন হল তিনি "ছেলেদের তেরসিকা" নামে এক কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমাদের মনে হত যে এই কবিতার সংগ্রহটার নাম যদি "বড়দের চয়নিকা" হত তা হলেই বইখানির নাম এবং গিরিজাবাবুর পরিশ্রম সার্থক হত। শিশু সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রশেখর বসু। তাঁর "লাল কালো" বইখানা বঙ্গসাহিত্যের গৌরব।

বঙ্গসাহিত্যে নির্ম্মল হাস্যরসের প্রবর্ত্তন করে যান বঙ্কিম চন্দ্র। তাঁর রচিত লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতিতে হাসতে কোথাও আটকায় না—কোথাও জোর করে হাসি আনতে হয় না। কিন্তু সে হাস্যরসাত্মক রচনা চিন্তনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ। সে হাস্যরস বঙ্কিম-পূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্যের

অসহ্য ন্যাকামী এবং অশ্লীলতা হতে মুক্ত। লোকরহস্যের প্রত্যেকটী প্রবন্ধে, বিশেষত মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে তৎকালীন বঙ্গসমাজ এবং বাঙ্গালীর যে চিত্র পাই—তা অতুলনীয়। কমলাকান্তের দপ্তরে হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে আলোচ্য প্রসঙ্গ অবতারণা করা হলেও তা পাঠককে ভাববার যথেষ্ট অবসর দেয়। তাঁর আলাচ্য প্রবন্ধগুলিও গভীর। কমলাকান্তের দপ্তর এবং De Quinceyর Confessions of an Opium-eater একধরণের। হয়ত বা শেষেরটির অনুসরণে প্রথমটি রচিত।

বাস্তব জগতের মত সাহিত্য জগতও ভিন্ন ভিন্ন যুগে এবং স্তরে বিভক্ত। এক যুগের ভিন্ন ভিন্ন লেখকদের রচনার ভাবভঙ্গিতে প্রায়ই একের সঙ্গে অন্যের কিছু না কিছু মিল থাকে। বাস্তব জগতের মত সাহিত্যজগতেও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হতে পরবর্ত্তী যুগ উৎপন্ন—তাই পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ পরবর্ত্তী যুগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইন্দ্রনাথের ভারত উদ্ধার নামক ব্যঙ্গ কাব্য এবং পঞ্চানন্দ মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধাবলী, দ্বিজেন্দ্র লালের হাসির কবিতা এবং গানগুলি এবং বঙ্কিমের লোক-রহস্য প্রভৃতি প্রায় একই স্তরের। তাদের আলোচ্য বিষয়ও প্রায় একই। তারা প্রত্যেকেই তদানীন্তন সমাজের গলদগুলি নিয়ে আলোচনা এবং তাদের তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

দীনবন্ধু মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের হাস্যরসাত্মক রচনা যদিও অশ্লীলতা মিশ্রিত তবুও তাদের রচনার প্রশংসা না করে পারা যায় না। দীনবন্ধু বাবুর নিমচাঁদ চরিত্র বঙ্গ-সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এ পর্য্যন্ত নিমচাঁদের মতো চরিত্র বঙ্গসাহিত্যের আর কোনও সাহিত্যরথী সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি। কালীপ্রসন্ন বাবুর 'হুতুম পেঁচার নক্সা' যদিও স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট তবুও তৎকালীন বঙ্গসমাজের এমন নিখুঁত চিত্র এবং এরকম তীব্র সমালোচনা আর কোনও লেখক দিতে পারেন নি। বঙ্গসাহিত্যে নক্সার প্রবর্ত্তন তিনিই করে যান! নক্সা-রচয়িতারূপে আজও তার জুড়ি মিলল না। কিন্তু আজকাল কেদার বাবুর রচনায় নক্সা যত সাফল্য লাভ করেছেন কালীপ্রসন্ন বাবুর পর আর কারও লেখায় তত সাফল্য লাভ করে নি।

গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্য-কারেরাও তাদের নাটকের মধ্যে হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাদি যোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলি স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না। কেন না সেগুলির প্রয়োজন অনেকটা চাটনীর মতো। নাটক যাতে করে এক ঘেয়ে হয়ে না যায় তার জন্য ঐ সব দৃশ্যগুলি মধ্যে মধ্যে ছাড় দেওয়া হয়েছে। অতএব এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবার কোনও প্রয়োজন নেই।

বঙ্গসাহিত্যের এই অনাদৃত দিকটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এবং শরচ্চন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নি। কিছু দিন আগে ভারতবর্ষে শরচ্চন্দ্রের হিউমার নামে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়ে ছিল। এবং সে প্রবন্ধের বিরুদ্ধে আলোচনাও অন্য কোনও কোনও পত্রিকাতে হয়েছিল। এখবর মাসিকপত্র-সেবী শ্রোতামাত্রেরই জানবার কথা। প্রবন্ধকার হিউমার নমুনা রূপে শরৎ সাহিত্য থেকে যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন তা আর যাই হোক হিউমার নয়। কিন্তু সে অবান্তর প্রসঙ্গ এখানে অবতারণা না করাই উচিত। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে আলোচনা ইতিপূর্ব্বে যতদুর জানি হয়নি। তাই এই বিষয়টী সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্রও নানাবিধ উপন্যাস নাটক কবিতা এবং প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে বঙ্গসাহিত্যের এই দিকটা সমৃদ্ধ করেছেন এবং করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কৌতুক চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা, শোধবোধ প্রভৃতি নাটিকা এবং ক্ষণিকা মানসী প্রভৃতি কবিতা পুস্তকের সেকাল ও একাল, হিং টিংছট, দুরন্ত আশা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের যে বইখানা বেরিয়েছে তার মধ্যেও হাস্যরসের প্রাচুর্য্যের সন্ধান পাই। কিন্তু সে হাস্যরস আর চিরকুমার সভা প্রভৃতির হাস্যরস এক প্রকৃতির নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের খোলটা ঠিকই আছে কিন্তু নলচেটা একেবারে নোতুন। অতি আধুনিক ফ্রেঞ্চ জার্ম্মাণ আমেরিকান সভ্যতার এক জাগা-খিচুড়ি বাঙ্গালী যুবক যুবতী সমাজের যে চিত্র তিনি আমাদের দিয়েছেন তার জুড়ী মেলে না

শরৎচন্দ্রের হাস্যরসাত্মক কোনও ভিন্ন বই না থাকলেও তাঁর হাস্যরস সমস্ত উপন্যাসের ভেতর ছড়িয়ে আছে। তার হাস্যরস কেবল মাত্র পাঠককে হাসাবার জন্য নয়। তাদের মধ্যে একটা দুঃখ, ক্ষোভ, দিনযাপনের গ্লানি এবং নির্য্যাতিতের বাঁধন ছেড়ার প্রয়াসের সন্ধান পাই। সুরেশ, কিরণময়ী, রমেশ, শেখর, ইন্দ্র, শ্রীকান্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্যে হাস্যরসের ভেতর দিয়ে এই বিষয় গুলিই আমাদের সব চাইতে আকৃষ্ট করে। শরৎচন্দ্রের হাস্য রস নিজেকে লুকয়ে রাখে। তাকে খুঁজে বার করে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস দুই রকমের। এক রকম হাস্যরস নিজকে গোপন রাখে না। তা পাঠকের কাছে আপনি ধরা দেয়। তা পাঠককে হাসায় বটে কিন্তু তাকে চিন্তা করবার খোরাক খুব বেশী যোগায় না। আবার আর এক রকমের হাস্যরস নিজেকে এমন ভাবে গোপন করে রাখে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাকে খুজে বার করা সব সময় সম্ভব হয় না। প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসের প্রাচুর্য্য নাটক নাটিকাগুলির মধ্যে এবং তার মূল্যও যে খুব বেশী তা নয়। কিন্তু শেষের শ্রেণীর হাস্যরসের দৃষ্টান্ত তার উপন্যাস এবং পঞ্চভূত কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলির মধ্যে এবং চতুরঙ্গ প্রভৃতি কোনও কোনও গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় এবং এইগুলিই সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে মূল্যবান, কেননা এইগুলিই ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকের মূলধন। এই খানেই রবীন্দ্রনাথের এবং শরচ্চন্দ্রের হাস্যরসের পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথ এবং শরচ্চন্দ্রের পরই যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজ শেখর বসু (পরশুরাম), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এবং হরিদাস হালদারের নামই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে পড়ে। হরিদাস বাবুর গোবর গণেশের গবেষণাকে ললিত কুমার এবং রাজশেখর বাবু এবং কেদার বাবুর রচনার সংযোজক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রাজশেখর বাবুর গড্ডলিকা কজ্জলী এবং অন্যান্য মাসিক পত্রে প্রকাশিত ছেলেধরা, হনুমানের স্বপ্ন প্রভৃতি গল্পগুলি, কেদার বাবুর কোষ্ঠীর ফলাফল, আমরা কি ওকে কবুলতি এবং নানা সাময়িক মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ, নক্সা এবং গল্প গুলির স্থান বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে অমর। কোন্‌টি বাদ দিয়ে কোম্‌টির নাম করব ভেবে পাই না। কিন্তু রাজশেখর বাবু এবং কেদারনাথ বাবুর রচনার ভেতরও পার্থক্য আছে। কেদারনাথ বাবুর লেখনী সামাজিক গলদগুলির বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই উদ্যত। ধর্ম্মের নামে সমাজপতিদের অত্যাচার অবিচার জর্জ্জরিত পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত জনসাধারণের দুঃখে তার প্রাণ যে সত্যসত্যই কাঁদে তার প্রমাণ আমরা তার প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে পাই। এই দিক দিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে কেদার বাবুর রচনার মিল আছে। এ কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কেদার বাবুর রচনায় Lamb এর প্রভাব বেশ স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে।

রাজশেখর বাবুর শক্তি অতুলনীয়। যে ভঙ্গীর রচনা তাঁর লেখনীর ভেতর দিয়ে বেরোচ্চে তা বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। তার প্রত্যেকটি রচনা ভাষার মাধুর্য্যে বক্তব্য বিষয়ের অভিনবত্বে নিজের মনের ভাবটি ফুটিয়ে তুলবার অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতায় সমৃদ্ধ। তার রচনার একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে যেগুলিতে কোথাও ইচ্ছে করে অথবা জোর করে হাসাবার চেষ্টা মাত্র নেই অথচ জিনিষগুলি এমন ভাবে লেখা যে পাঠক না হেসে পারে না। সাহিতেরে আসরে রাজশেখর বাবু খুব বেশীদিন হল আত্মপ্রকাশ করেন নি কিন্তু প্রতিভা কখনও গোপন থাকে না। রাজশেখর বাবুর মত এত অল্প সময়ে এত সাফল্য লাভ করতে খুব কম লেখককেই দেখেছি। এঁদের সঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নামও উল্লেখ যোগ্য। অধুনা-বিলুপ্ত সবুজপত্রে প্রকাশিত সুরেশবাবুর লেখা 'হাসি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ মূল্যবান সন্দেহ নাই। হাসি প্রবন্ধটিতে তিনি হাসির যে প্রকার ভেদ এবং বিশ্লেষণ করেছেন তা সত্যসত্যই উপভোগ্য।

রাজশেখর বাবুর অনুকরণে আজকাল অনেক লেখক লেখনী চালনা করবার প্রয়াস পাচ্চেন। তাদের প্রয়াস যে কতদুর সার্থকতা লাভ করেছে তা বলতে পারি না। খুব যে সার্থকতা লাভ করেছে তা নয়। এই নবীন লেখকদের নিরুৎসাহিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেন না বঙ্গসাহিত্যের এই একটি বিশাল ক্ষেত্র প্রায় অনাদৃত

অবস্থায় পড়ে আছে। আংশিক সাহিত্য মহারথীরা এই দিকটা এতদিন অবজ্ঞা করেই এনেছেন। কিন্তু আজ তাদের এ কথা বোঝবার সময় এসেছে যে সাহিত্যের এই শাখাটি অন্যান্য শাখা হতে কম প্রয়োজনীয় নয় এবং শাখাটি যত সমৃদ্ধ হয় ততই মঙ্গল, কেন না হাস্যরসাত্মক রচনা যত কার্য্যকরী হয় আর কিছুই তত হয় না—অবশ্য তা যদি প্রকৃতই হাস্যরসাত্মক হয়। নইলে কতগুলি ভাঁড়ামীর সৃষ্টি করে জঞ্জাল বাড়াবার কোনও দরকার নেই।

নবশক্তি, বাংলার বাণী প্রভৃতি সাপ্তাহিক গুলিতে হাস্য কৌতুক অথবা রঙ্গরস নাম দিয়ে যে চুট্‌কিগুলি বার হয় সে গুলি আর যাই হোক হাস্যরস নয়। সেগুলি ভাঁড়ামীর উচ্চে স্থান পেতে পারে না এবং তাদের প্রয়োজনও সাময়িক। সেই তথাকথিত হাস্যকৌতুকগুলি দিয়ে চাট্‌নীর কাজ চল্‌তে পারে বটে কিন্তু তা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করে না।

নবীন লেখকদের দৃষ্টি আমরা এই দিকে আকর্ষণ করছি, তাঁরা এক ঘেয়ে ন্যাকামীপূর্ণ প্রেমের কবিতা লিখে অথবা লিখবার চেষ্টা করে যতটা সময় এবং শক্তির অপব্যয় করেন তার কিছুমাত্র অংশও যদি সাহিত্যের এই শাখাটির পরিপুষ্টি সাধন কল্পে ব্যয় করেন তা হ'লে বঙ্গ-সাহিত্যের একটী স্থায়ী অভাব পূরণ হয়।

(হস্তলিখিত 'তরুণ' পত্রিকার সৌজন্যে)

বাধা

শ্রীরাখাল বন্ধু নিয়োগী

বাধা যদি কোথাও থাকে মনেই সে তোর রয়,
পাঁজির পাতের বিধান বিহিত মিথ্যা যত ভয়।
টিকটীকি আর হাঁচির পিছে
সময় দেওয়া ভাবনা মিছে,
মন যদি তোর মুক্ত থাকে সদাই হবে জয়।

যেদিক পানেই যাসনা কেন ইচ্ছা যে পা
বাড়াস্‌ আগে,
শুধু দেখিস যেন মনে অরুণ কিরণ পরশ লাগে,
তুচ্ছ যত পাঁজির বাধা
মিথ্যা হত অন্ধ আঁধা
অশ্লেষা ও মঘায় যত দুর্ব্বলেরি ভয়।

অশুভ আর শুভ যত পঞ্জিকা তার বিধান দাতা,
অর্থবিহীন আচার পায়ে গোটা জাতি নোয়ার মাথা
বক্ষ মাঝে কূর্ম্ম সম
ঢুকিয়ে মাথা ও অক্ষম,
অন্ধকারের বিভীষিকাই দেখিস্‌ জগৎময়?

মুক্ত আলো মুক্ত হাওয়া জগৎ জুড়ে বইছে ওই,
মুক্ত মানব আকাশ পাতাল উর্দ্ধ অধঃ বিশ্বজয়ী;
মৃত্যু সনে দ্বন্দ্ব রণে
রক্ষা করে আপন পণে,
জয়ের মালা হাস্যমুখে হেলায় কেড়ে লয়।

মোক্ষদা

শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট বড় সকলের সঙ্গে এমনি অমায়িক ভাবে মেলা-মেসা করিত যে মোক্ষদাকে বাদ দিয়া ছোট গ্রামটিকে কল্পনা করা যাইত না।

সেই মোক্ষদা আজ মারা গিয়াছে তাই তাহার প্রাঙ্গনে আজ আর লোক ধরে না—

বৃদ্ধ গ্রামবাসীদের জীবনের কোন সময় যে মোক্ষদা এই গ্রামে আসিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

গ্রামের সে বাড়ীটিতে মোক্ষদা এতদিন তাহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছে তাহা মোক্ষদার কাকার। কাকার মৃত্যুর পর আর কোনও আত্মীয় না থাকায় মোক্ষদাই ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া একলাই কাকার সম্পত্তি ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছিল।

মোক্ষদার টাকা কড়ি আছে কি না এই লইয়া গ্রামের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিলেও ঐ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার মধ্যে শৃগাল-কুকুরের অবাধ গতায়াত দেখিয়া কেহই এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিত না। অথচ এ পর্য্যন্ত কেহই মোক্ষদার গৃহ হইতে কোন দিন কোনও প্রার্থীকে বিফল হইয়া ফিরিতে দেখে নাই।—যে যখনই দুরবস্থায় পড়িয়া মোক্ষদার কাছে সাহায্য চাহিয়াছে, মোক্ষদা তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে। উপরন্তু যাহারা মোক্ষদার শয়ন গৃহে গিয়াছে তাহারা সযত্ন রক্ষিত একটি তোরঙ্গ দেখিয়াছে এবং তোরঙ্গটির প্রতি মোক্ষদার যত্ন দেখিয়া ভাবিয়াছে যদি টাকা কড়ি নাই থাকিবে তো অত সাবধানে রাখিবার কারণ কি?

মোক্ষদর বয়স কত জানিবার বাসনা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু মোক্ষদার মুখের দিকে দেখিয়া তাহার বয়েস কল্পনা করা কঠিন।

গ্রামের মেয়েরা প্রত্যেকেই প্রায় মোক্ষদির কাছে তাহাদের বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প করিয়াছে; মোক্ষদার বিবাহিত জীবনের কোন গল্পই কিন্তু কেউ জানে না। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে মোক্ষদা গম্ভীর হইয়া যাইত—বলিত আমার বিয়েই হয়নি।

সে দিন অলকাকে দেখিতে আসিয়াছিল! পাত্র পক্ষীয়েরা চলিয়া গেলে—ঘাটের মজ্‌লিসে—নিভা জিজ্ঞাসা করিল—যে তোর বর হবে, সে এসেছিল নাকি?

অলকা মুখ রাঙা করিয়া বলিল—হ্যাঁ—

নিভা বলিল—পছন্দ হোল?

'দ্যুৎ' বলিয়া অলকা নিভার পিটে একটি কিল লাগাইয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা ভাই, মোক্ষ'দিকে যখন দেখ্‌তে এসেছিল তখন উ'নি কেমন সেজেছিলেন বল্‌তো?··· ঐ ফাটা-ফাটা পায়ে আল্‌তা পোরে, উল্টো দিকে চুল টেনে খোঁপা বেঁধে, চওড়া কপাল খানাকে আরও চওড়া কোরে, পানখেয়ে ঐ মোটা ঠোঁট দু'খানাকে লাল কোরে, মোক্ষ'দি যখন তাদের সাম্‌নে গিয়ে বসেছিলেন, তখন তারা কেমন কোরে উঠেছিলো বল্‌ দেখি?

নিভা সুন্দরী এবং নববিবাহিতা, এই সেদিন শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে—অলকার ও-কথার কোন জবাব না দিয়া বলিল: আচ্ছা মোক্ষদিকে কি ওঁর বর ফুল শয্যার রাতে আদর কোরেছিলো?

মোক্ষদার স্বামী মোক্ষদাকে ভালবাসিত কিনা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু পুরুষ জাতটার উপর মোক্ষদার যে একটা রাগ ও ঘৃণা ছিল তাহা বলিতে পারি।

ছোট ছোট মেয়েদের মোক্ষদা অত্যাধিক স্নেহ করিত আদর করিয়া এটা-ওটা খাইতে দিত কিন্তু ছোট ছোট ছেলেদের দেখিলে সে 'দূর' 'দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিত।

ছোট ছেলেদের প্রতি মোক্ষদার এই রূঢ় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মোক্ষদা বলিত ওরা আমার পুষিকে মারে যে।

গ্রামে এমন কোনও জননী নাই যাহার প্রসববেদনার সংবাদ পাইয়া মোক্ষদা আঁতুর ঘরে উপস্থিত হয় নাই। নবাগত যদি ছেলে হইত তো মোক্ষদা তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া তৎক্ষণাৎ কোননা কোন কাজের অছিলায় সে স্থান ত্যাগ করিত; আর যদি মেয়ে হইত তো মোক্ষদা তাহাকে কোলে তুলিয়া, ধোয়াইয়া মুছিয়া—তাহাকে লইয়াই সমস্ত দিন কাটাইয়া দিত, স্নান-আহারের কথা মনেও থাকিত না, এবং যাইবার সময় চুপিচুপি ছোট্ট হাত দু'টির মধ্যে চারি টাকা পুরিয়া দিয়া বিদায় লইত।

তাহার পক্ষপাতিত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন জবাব না দিয়া প্রশ্নকারিকে ধমক দিয়া বলিত এ আমার খুসী।

মোক্ষদার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইবার ঘণ্টাখানেক পরেই তাহার এক দুরসম্পর্কের ভাই আসিয়া হাজির হইল—নাম হরেন। অদ্ভুত প্রকৃতির এই লোকটি জগতের কিছুই যেন ইহাকে স্পর্শ করে না। চোখে জল নাই, মুখে হাসি নাই' সর্ব্বদাই শ্রাবণের আকাশের মত গম্ভীর দেখিলে মনে হয় ওর মত নিষ্ঠুর লোক জগতে খুব কমই আছে।

হৃদয় যেন পাষাণে গড়া। সকলই হরেনের আগমনের কারণ বুঝিল। মোক্ষদার যখন আর কোথাও আত্মীয় নাই তখন, সম্পত্তির মালিক ইনি হইবেন বইকি! তবুও সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল এতদিন এ ভাইটি ছিলেন কোথায়?

হরেন তাহাদের কাণাঘুষা শুনিতে পাইয়া উল্টা চাপ দিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল; কি বেয়াদপ্ এই গ্রামের লোক গুলো, আমাকে একটা খবরও দিলে না, একটা ডাক্তার দেখাবার সময় পেলাম না—বোনটা আমার বেঘোরে মারা গেল...

ভট্চায্যি খুড়ো বলিলেন—কেউ কি আর জানতে পেলে যে মোক্ষদার অসুখ হ'য়েছে! কাল দেখলাম দিব্যি মানুষ, ঘুরে বেড়াচ্ছে...আহা! হাঁ, তা ছাড়া ডাক্তার কি আমাদের গাঁয় আচে ভাই, ডাক্তার বোলতে ত হরিসপুরের ঐ জ্ঞান ঘোষ কিন্তু...তারপর তিনি হরেনকে বুঝাইয়া বলিলেন—

ডাক্তারের নাম শুনিলেই মোক্ষদার কেন গাত্রদাহ হইত তাহা বলিতে পারেন না। ডাক্তারের নাম শুনিলেই মোক্ষদা সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে কে একজন যৌবনে ডাক্তারের এক কেলেঙ্কারীর কথা মোক্ষদার কছে গল্প করে: ডাক্তার নাকি যৌবনে একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া পরিত্যাগ করে; পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, কারণ বাপ মার অজ্ঞাতেই বিবাহ করে।

গল্প শুনিয়া মোক্ষদা জলভরা চোখে সে স্থান ত্যাগ করে।

মেয়েদের প্রতি মোক্ষদার পক্ষপাতিত্ব ঐ চোখের জলের—যাক্ সে কথা—

জীবিত অবস্থায় মোক্ষদা, ডাক্তারকে তাহার গৃহের কাছে না আসিতে দিলেও, মৃত্যুর পর ডাক্তারকে মোক্ষদার বাড়ী আসিতে হইয়াছিল—বাধ্য হইয়াই।

মোক্ষদার গৃহে প্রবেশ করিয়া, মোক্ষদাকে দেখিয়া ডাক্তার চম্‌কাইয়া উঠিল। তাহার পর, বোধ হইল বহু-কষ্টে দেওয়াল ধরিয়া মোক্ষদার মৃতদেহের পাশে গিয়া বসিয়া মোক্ষদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় বেশ স্পষ্টস্বরে ডাকিল—'মোক্ষদা মোক্ষদা'। ডাক্তারের ভাব কেহই লক্ষ্য করিল না, কারণ সকলেই তখন দাহ করিবার তোড়জোড় করিতে ব্যস্ত।

অন্য সকলে যখন নানা কাজে ব্যস্ত হরেন তখন মোক্ষদার সেই যত্ন-রক্ষিত তোরঙ্গটি খুলিতে ব্যস্ত। দাহ করিবার একটা খরচ আছে তো? হরেন ভাবিল—টাকা পয়সা খরচ করার দরকার কি? তার বাক্সর মধ্যে কত আছে তাও তো দেখার দরকার।

বাক্স খুলিয়া দেখা গেল ভিতরের জিনিষ পত্তর একটি কাগজে মোড়া। মোড়ক খুলিয়া হরেন তো অবাক! বাক্সর মধ্যে সদ্য-বিবাহিত নববধুর পোষাক পরিচ্ছদ। চেলীর জোড়, খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে একতাড়া চিঠি মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল—প্রত্যেকখানিই প্রেম-পত্র।

প্রত্যেক রহস্যই হরেনের কাছে জলের মত সোজা বলিয়া বোধ হইল। মনে পড়িল, যৌবনে মোক্ষদা পাড়ার এক যুবক ডাক্তারকে ভালবাসে। মোক্ষদার পিতামাতা উহাদের

প্রণয় ব্যাপার জানিতে পারিয়া, যুবকটিকে, মোক্ষদাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করে। যুবকটিও আর কোনও উপায় না দেখিয়া, পিতামাতার অজ্ঞাতে, মোক্ষদাকে বিবাহ করে। কিন্তু ঐ বিবাহ করা পর্য্যন্তই। বিবাহের পর ডাক্তারের আর কোনও খবরই পাওয়া যায় নাই।

মোক্ষদার জীবনের গত ইতিহাস কল্পনা করিতে করিতে হরেন হাতের চিঠিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল হঠাৎ মনে হইল যে কক্ষে মোক্ষদার মৃতদেহ ছিল সেই কক্ষে কে যেন বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল,—মোক্ষদার গলার স্বর।

ভীত হরেন দৌড়াইয়া মোক্ষদার গৃহে গিয়া দেখিল মোক্ষদা ঠিক সেই ভাবেই আছে।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া, হরেন নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া একে একে একে সমস্ত জিনিষ পত্তর তোরঙ্গর মধ্যে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল।

মোক্ষদার মৃত দেহের সহিত চিতায় তাহার তোরঙ্গটি স্থান পাইল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় হরেন বলিল: ঐ রকম আদেশ ছিল।

উত্তর শুনিয়া সকলে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। আদেশ ছিল বলিয়া টাকা কড়ি সমেত তোরঙ্গটি চিতায় তুলিয়া দিতে হইবে?

একা

শ্রীসুকোমল বসু

একটি বিশাল আকাশের পরে একটি তারা
একটি চাঁদেরই পাশে কেঁপে কেঁপে হ'ল সারা।
নিশাচরী পাখী কেঁদে ফেরে বুঝি সেও বা একা
আজিকার রাতে পিয়ার তাহার পায়নি' দেখা।
জানালার পাশে ঝুমকো ফুলের ঘন সে ঝাড়ে
একটি সে ফুল আপনারে ধরি' রাখিতে নারে!
বিকাশোন্মুখ একটি যে কুঁড়ি—তাহারই পাশে
নূতন জীবন লভিয়া বুঝি বা গরবে হাসে।
একা আমি জাগি তাহাদেরই সাথে জানালা পরে
কি জানি একটি ব্যথা দহে মোরে—নয়ন ঝরে।

প্রেমের তালিম

শ্রীউৎপলাসনা দেবী

শরৎকাল। বেলা সবে সাতটা। মনীশ তাহার মেসের ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল ও এক একবার, জানালা দিয়া বাহিরে চাহিতেছিল। হঠাৎ হাতের বইখানি টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিয়া, কোণ হইতে এসরাজটি লইয়া গাহিতে লাগিল,—

"শরতে আজ কোন্ অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গারে হৃদয়, আনন্দ গান গারে।"

এমন সময়ে কে আসিয়া তাহার হাত হইতে বাজনাটি কাড়িয়া লইয়া বলিল, "কি গো ভাল ছেলে, সকাল বেলা পড়া ছেড়ে গান গাওয়া হচ্ছে যে!"

মনীশ চাহিয়া দেখিল তাহার পাশের সিটের ছাত্র শিশির।

মনীশ অমনি এক লাফ দিয়া গলা টিপিবার ভঙ্গী করিয়া থিয়েটারি, কায়দায় বলিল—

"তবেরে পাষণ্ড নরাধম! এই তোর—"

শিশির ছাড়্ ছাড়্ বলিয়া কৃত্রিম চীৎকার করিয়া উঠিল।

মনীশ তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, শিশির হাসিয়া বলিল, "হঠাৎ এত স্ফূর্ত্তি কেন?"

ঘরের মধ্যে অন্য ধারে অন্য একটি যুবক পড়িতেছিল; সে শিশিরকে বলিল, "তুমি একটি আস্ত বোকা; বুঝ্তে পারছনা? ২০শে তারিখে পূজোর ছুটি আরম্ভ হবে, মোটে আর ১২ দিন যে!"

ইত্যবসরে আর একটি যুবক মনীশের তেলের শিশি হইতে তেল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "ওরে লাভ নেই, লাভ নেই।"

শিশির হাসিয়া বলিল "কার?"

তেলের শিশিটি রাখিয়া যুবকটি বলিল, মনীশের।

পাশের যুবকটি বলিল, "আপাততঃ তোমারই লাভ নেই দেখ্ছি যে। ছুটির কথা নয়, তোমার তেল চুরীর কথা বল্ছি।"

সেই জাত গেল, পেট ভরল না।

শূন্য শিশিটিতে তেল না পাইয়া ছেলেটি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি করি বল্! মনীশ হতভাগা আমার জন্য তো দু দিন অন্তর তেল কিন্‌বে না!"

আরও গুটি কয়েক যুবক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, তোমরা এত কিসের হল্লা কর্‌ছ?

শিশির তাহার মুখখানিকে যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া কহিল; এই মনীশকে নিয়ে আমরা বড় গুরুতর সমস্যায় পড়েছি।"

তাহার মধ্যে একজন বলিল, "তার মানে! মনীশ কি পড়েছে? প্রেমে না বোমারুর দলে ভিড়েছে।"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "দুটো কাছাকাছি বটে।"

শিশির বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, প্রেমে পড়াইতো চাই আমরা, ও যে পড়ছে না, এই তো হয়েছে মুস্কিল।"

"কেন তোমার বোন টোন কিছু আছে বুঝি?

"তা কেন হবে, মনীশ ওর স্ত্রীর প্রেমে পড়ুক।"

ঘরের মধ্যে কয়েকটি যুবক তাহাদের চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল; "ওরে মার পাজীটাকে মার্! ফেলুক ও তিরিশ টাকা, নইলে, আজ ওকে খুনই কর্‌ব। কবে চুপে চুপে বিয়ে করে এসে, বেড়ালতপস্বী হয়ে বসে আছে; আমাদের একটুও জানায় নি।"

একজন বলিল, এই মনীশ হতভাগা। এইবার পূজার ছুটিতে আমারা তোর ওখানে যাবো, আর পাত পেতে বসে তোর বিয়ের নেমন্তন্ন আদায় করবো আর তোর বোয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিবি; বুঝলি!"

মনীশ বলিল, "তা বটে, আমার বৌকে আমিই বড় দেখেছি কিনা তা তোদের দেখাব !"

তার মানে !

মনীশ চুপ করিয়া রহিল।

শিশির বলিল, "মনীশটার বিয়ে একটা নূতন রকম।"

কি রকম! কি রকম! যেন ভীমরুলের চাকে কে যেন খোঁচা দিলে। সকলে মনীশের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিল।

শিশির বলিল; "মনীশের বাবা মনীশের জীবন মরুময় ক'রে দিয়েছেন।"

"অর্থাৎ ?"

অর্থাৎ কিনা ব্যর্থ! ব্যর্থ! একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়ের সঙ্গে মনীশের বিয়ে দিয়েছেন।

"কেন মনীশ বিয়ে কর্‌লে।"

মনীশ বলিল, "কি করি বল! বাবার কাছে আপত্তি কর্‌তে, বাবা রেগে বল্লেন তোমায় তেজ্য পুত্র ক'রব, মা কাঁদ্‌তে বসে গেলেন। পরে শুন্‌লাম আমার বিয়ে দিয়ে তাঁরা যা পাবেন, তাতে আমার বোন্ শোভার বিয়ে হয়ে যাবে। কাজেই, আমি তাঁদের সব পাইয়ে দিলাম। কিন্তু দিলে হবে কি ? আমি সেই জংলীটার মুখ দেখিনি।

একটি যুবক বলিল, "তবে সে যে অশিক্ষিতা তাই বা কি ক'রে জান্‌লে ?"

"বাঃ, যখনিই শুনেছি, তাদের বাড়ী গফরগাঁও, তখনই আমি তার সব পরিচয় পেয়ে গেছি।"

"তুমি একটি হস্তিমূর্খ। সকলেরি জীবন অত কবিত্বময় হয় না। সে যদি সত্যই অশিক্ষিতা হয়, তবে, তাকে তুমি শিক্ষিতা করে তোল না কেন ? একটা ভুলের মধ্য দিয়ে দুটো জীবনই ব্যর্থ করে দেবে"

মনীশ বলিল, সে আমি পারব না। তাকে গড়ে তোলা শক্ত জানতো, হেমবাবু বাঙ্গালী মেয়েদের কি পরিচয় দিয়ে গেছেন ?

"ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ পড়া
পেটের ভিতরে গজে দাশুরায়ের ছড়া।"

তার সঙ্গে আমার মিশ্‌তে হবে ? সে হ'ল গিয়ে একটা আস্ত গরু ; আর তার সঙ্গে মিশ্‌লে"—সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনীশ বলিতে লাগিল, জীবন পথের সঙ্গিনী যদি সমান তালে পা ফেলে না চল্‌তে পারে, তা হ'লে সে মিলন সুখের হয় না। আর এর ফলে এই হয় যে, সন্তানেরা তাদের মায়ের কাছে যা শিক্ষা পায় তাতে বংশের অসম্মান হয়। সেই পাড়াগেঁয়ে নোলোকপরা মলপায়ে ঘ্যান্ ঘেনে প্যানপেনে মেয়েগুলোর কথা মনে হলে আমার পিত্তি জলে উঠে, বলিয়া মনীশ এমন মুখভঙ্গী করিল যে তাহা দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

মনীশ শিশিরকে বলিল, "আজ শরতের সকালটা আমার চোখে বড়ই সুন্দর লেগেছিল, তা তুই এসে রসভঙ্গ কর্‌লি"। শিশির বলিল, এদিকে যে শরৎরাণী ওদের ওই ছাদে বেড়াচ্ছেন। শিশিরের কথায় সকলে সম্মুখের বাড়ীর ছাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, মনীশ চাহিয়া চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। দেখিল একটি তরুণী আলিসার উপরিস্থ টবের গোলাপ গাছ হইতে গোলাপ ফুল তুলিতেছে। তরুণী তন্বী রূপসী! গোলাপ ফুলের মতনই যেন তাহার গায়ের রং ও গোলাপ ফুলের মতনই গঠনটি কমনীয়।

কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটি তরুণী তাহার ফ্যান্সি সাড়ীর আঁচলটি দোলাইতে দোলাইতে আসিয়া প্রথমার জাপানী ফ্যাসানের খোঁপাটি নাড়িয়া দিয়া মনীশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। তরুণী ঘাড় ফিরাইয়া মনীশকে দেখিল। অমনি তাহার সুন্দর মুখখানিতে কে যেন একমুঠো ফাগ ছিটাইয়া দিল। সে বিদ্যুৎ রেখাটির মতন ছাদের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। দ্বিতীয় তরুণীও হাসিতে হাসিতে প্রথমার অনুসরণ করিল।

মনীশ মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল। উহারা চলিয়া গেলে সে ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সকলে হাসিতেছে।

সে লজ্জিত হইয়া শিশিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, ও বাড়ীতে কারা এসেছে ?

শিশির বলিল, "তোর মনে আছে আমাদের সঙ্গে বি, এ, ক্লাশে পড়তো, সুধীর ? এটা তাদের বাড়ী। আগে

ভাড়া খাটতো ; সম্প্রতি এখন ওরা নিজেরা বাস করছে। আমার সঙ্গে সেদিন এসে কত আলাপ কর্‌লে ; আর তোকেও নিয়ে যাবে বলেছে।'

(২)

সন্ধ্যা বেলা সুধীর আসিয়া মনীশ ও শিশিরকে তাহাদের বাড়ী লইয়া গেল ও তাহার ভগ্নী দুটির সহিত আলাপ করাইয়া দিল।

বড়টি আজ যাহাকে মেসের ছেলেরা ফুল তুলিতে দেখিয়াছিল, সে সুধীরের কোন নিকট আত্মীয়ের কন্যা, নাম মণিকা। ছোটটি সুধীরের সহোদরা, নাম রমলা।

মণিকা এই বছরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে, আর রমলা এইবার ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠ্‌বে।

মণিকার আঁকা ও ইংরাজিতে কেমন ব্যুৎপত্তি ও সে শিল্প গান বাজনায় কেমন সুদক্ষ এবং রন্ধনে কি রকম সুনিপুণ তাহাই সুধীর মনীশের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল, মনীশ একাগ্রমনে তাহা শুনিতেছিল ও এক এক বার মণিকার লজ্জাবনত মুখের দিকে চাহিতেছিল।

রমলা বেশ সপ্রতিভ ভাবে উহাদের সহিত আলাপ করিতেছিল ; কিন্তু মণিকা তাহা পারিতেছিল না, সে একটা চেয়ারে বসিয়া একটা মাসিকের পাতা উল্টাইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুধীর বলিল, "হ্যাঁরে মণি ! আমার অতিথিদের তোর তৈরী কিছু খাবার এনে দে ; সেই পানতোয়া, ক্ষীরের কচুরী, স্যাণ্ডউইচ চপ্, কি কি যে তুই করেছিস্? সেই গুলো এনে দে।"

রমলা বলিল, "সবই তৈরী আছে দাদা। আমি আন্‌ছি" রমলা খাবারগুলি টেবিলে সাজাইয়া চা আনিতে গেল।

মনীশ বলিল, "আমি দুবারের বেশি চা খাইনা। চা আর দেবেন না আমাকে।"

তখন সুধীর বলিল, "বেশ ; তাহ'লে ওকে আইস্‌ক্রিম এনে দাও।"

এইরূপে মনীশ ও শিশিরের সান্ধ্য আসরটা সুধীরদের বাড়ীতে জমিতে লাগিল।

এই যাওয়া আসা নিয়া মেসের কয়েকটি যুবক মনীশকে একদিন উপহাস করিল। মনীশ লজ্জিত হইয়া মনে মনে ভাবিল "দূর ছাই আর সুধীরদের বাড়ী যাবনা ;" কিন্তু দুদিন না যাইতে সুধীর আসিয়া তাহাকে বলিল, "দেখ মনীশ তুমি আমার বন্ধু ! তাই তোমায় জোর করে বল্‌ছি যে, মণির পরীক্ষা কাছে এসেছে ; এই সময় যদি তুমি ওকে একটু আধটু সাহায্য কর, তাহলে বড় ভাল হয়।"

মনীশ সানন্দেই রাজী হইল।

মণিকার পরীক্ষা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। এইবার তাহাদের বাড়ীতে মনীশের সম্মুখে মণিকার বিবাহের কথা উঠিল।

মনীশ শুষ্কমুখে বলিল "এখন কেন বিয়ে ? আই-এটা পড়ুক।"

সেদিন রাত্রে মনীশ মনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া মেসে ফিরিল। অনেকদিনের একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, তাহার কাছে আজ যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সেই প্রথম দিনই তাহার মন অজ্ঞাতসারে মণিকাকে তাহার হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছিল। এতদিন যেন তাহাকে একটা নেশায় পাইয়া বসিয়াছিল ; কিন্তু এতো তাহার ভাল নয়।

মণিকে পাওয়ার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা তাহাকে যাতনা দিতে আরম্ভ করিল। মনকে অনেক যুক্তি দেখাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু আকাঙ্ক্ষার প্রবল স্রোতে তাহার সকল যুক্তি ভাসিয়া গেল।

তখন একদিন নির্জ্জনে সুধীরকে তাহার বিবাহের আমূল ঘটনা বলিয়া বলিল, "সে স্ত্রী নিয়ে আমি কখনই সংসার কর্‌বনা ; কাজেই তোমরা যদি মণিকাকে আমায় দাও, তো আমার সমস্ত জীবন মন ধন্য হয়। মণিকে না পেলে আমার সকল জীবন ব্যর্থ হবে।"

সুধীর গম্ভীর হইয়া বলিল "তোমার আর্জ্জি আমি মণির বাবার কাছে পেশ কর্‌ব, আর মণিও বড় হয়েছে ; কাজেই তার মতটাও নিতে হয়।"

মণিকা পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল ! গ্রীষ্মের ছুটির পর মনীশ আবার মেসে আসিল। সুধীর এই দু'মাসের মধ্যে আর কোনও খবর মনীশকে দেয় নাই।

ইহাতে মনীশ তাহাদের অমত বুঝিতে পারিয়া, সুধীরদের বাড়ী আর যাইবে না ঠিক করিল।

কিন্তু তিন দিন থাকিয়া চার দিনের দিনই প্রত্যুষে মনীশ সুধীরদের বাড়ী গেল।

সুধীর তখন দৈনিক সংবাদপত্রখানি মাত্র হাতে করিয়াছে। এমন সময়ে, এই প্রত্যুষে মনীশকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল "কি মনীশ, এত সকালেই যে, কিছু দরকার আছে?"

সুধীরের এই প্রশ্নে মনীশ যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। সুধীর ডাকিল, "মণি!"

মনি আসিলে সুধীর তাহাকে বলিল, "মনীশের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করো।"

মণি চলিয়া গেলে সুধীর বলিল, "তারপর মনীশ, তোমার কি কোন অসুখ করেছে? চেহারা তোমার অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে যে!"

মনীশ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সুধীর, ভাই, তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে পারবে না?"

সুধীর কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "ও সেই কথা! হাঁ তা মণির বাবা প্রথমে রাজী হন্‌নি বটে সেই প্রস্তাবটায়; পরে আমি অনেক বোঝাতে বললেন, মণির মত থাক্‌লে, আমার অমত নেই।"

সুধীর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে আবার বলিল, "আচ্ছা আজ বিকেলে মণিকে নিয়ে আমাদের মোটরে বেড়াতে যেও, বুঝলে?"

মনীশ লজ্জামিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি যদি অনুমতি দাও ও আমায় সহায় হও, তা', হ'লে তো যাই-ই।"

সুধীর বলিল, "মণির মতটা তোমার জিজ্ঞাসা করা ভাল; বুঝলে কিনা! আচ্ছা তা'হলে আজ বিকেলে এস।"

(৩)

বৈকালে মনীশ মণিকাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। চৌরিঙ্গীতে আসিয়া শোফার জিজ্ঞাসা করিল. "কোন্ দিকে যাব?"

মনীশ মনিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে যাবেন?" ইডেন্ গার্ডেন?"

মণি একটু ভাবিয়া বলিল, "না, আমার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানটা বেশ ভাল লাগে।" মনীশ সোফারকে হুকুম দিল "মেমোরিয়ালের বাগানে চল।"

দু'জনে মেমোরিয়াল হলের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল। মনীশ মণিকে যাহা বলিবে, তাহা পূর্ব্বেই ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়'ছিল। কিন্তু এই নির্জ্জনে এই তরুণীকে সে সব কথা বলিতে মনীশের লজ্জা বোধ হইতেছিল। কোন্ জায়গায় কথাটা আরম্ভ করিবে তা মনীশ ঠিক্ করিতে পারিতেছিল না।

মনীশ বারান্দায় বসিতে যাইলে, মণি বলিল, "আপান কি এই বারান্দায় বস্‌বার জন্য এই বাগানে এলেন? চলুন, ওই পুকুরের ধারে গাছের তলায় বসিগে।"

সূর্য্যদেব তখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন সত্য! কিন্তু তাঁহার বিদায় বেলার শেষ চুম্বনের দাগ বাগানের গাছগুলি হইতে তখনও মুছিয়া যায় নাই। আশে পাশের মেঘগুলি সোনার রং এ সাজিয়া সূর্য্যদেবকে বিদায়কালের অভিনন্দন জানাইতেছিল।

সূর্য্যাস্তের রাঙা আভা আসিয়া মণির মুখের উজ্জ্বলতা আর একটু বাড়াইয়া তুলিল, মিষ্ট ঝিরঝিরে হাওয়া আসিয়া তাহার কাল রেশমের মতন চুলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

মনীশ মণির মুখের দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়াছিল। একটা ফুলের পাপ্‌ড়ি ছাড়াইতে ছাড়াইতে মনীশ ডাকিল "মণি!"

এই ডাকে মণিকার গণ্ড দুটি ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল। সে উত্তর করিল "কি বল্‌ছেন?"

মনীশ। "তুমি বোধ হয় সব শুনেছ?"

মণি লজ্জিত হইয়া আস্তে বলিল, হঁ্যা।

মনীশ "তাহ'লে তোমার কি মত? আমায় বলবে?" বলিতে বলিতে আবেগে মনীশের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; সে মণির নিটোল হাত দুখানি ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বল মণি বল আমার হবে? বল!"

আস্তে আস্তে তাহার হাত দুটি মনীশের কাছ হইতে ছাড়াইয়া মণি যখন মনীশের দিকে চাহিল, তখন তাহার মুখখানিতে একটি দুষ্ট হাসির আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল "আজ আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন; কিন্তু বিয়ের পর বলবেন, তুমি একটি গরু, তোমায় আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারব না।"

মনীশ মরিয়া হইয়া বলিল, বল কি মণি!

"না আপনার উপর আমার আর বিশ্বাস নেই; আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে আমার কাছে রাখেন, অর্থাৎ তাকে আপনি স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করেন; তবেই আমি রাজি আছি। কিন্তু সে কি আমার সঙ্গে সংসার করতে রাজি হ'বে?"

মনীশ কিছুক্ষণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, মণির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মণি তুমি দেবী! তুমি বুঝতে পারছনা যে, তোমার কতখানি ক্ষতি হবে! সে অবশ্যই রাজি হবে, আর সে জংলীটাকে কি আর আমি রাজি করাতে পারব না। কিন্তু এরকম আমি চাই না। আর আমার মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে রহস্য করবার জন্য তুমি আমায় এই কথা বলছ; নয় কি?"

মোটেই নয়। এই ব্যবস্থা না করলে আমি আপনার কথায় রাজি হতে পারব না। সে এই সর্তে রাজি আছে, এই মর্ম্মে তার নিজের হাতের লেখা চিঠি আমি চাই। তার হাতের লেখা আমি চিনি।"

"তুমি তার হতের লেখা কি করে চেন? তুমি কি তাকে চেন?"

"হ্যা, আমার মামার বাড়ীর দেশে তাদের বাড়ী।"

মনীশ বলিল, "আচ্ছা তাকে লিখবো। সেটা হলো একটা গেঁয়ো ভূত; তাকে লিখতে ঘৃণা হয়, কিন্তু কি করব! তোমার কথাতেই লিখব, কিন্তু তুমি ভাল ক'রে ভেবে দেখ!"

"আমার ভেবে দেখা আছে। চলুন এইবার বাড়ী ফেরা যাক্!" দুজনে গিয়া গাড়িতে উঠিল।

মনীশ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্ত্রীকে এই মর্ম্মে পত্র দিল যে, তোমায় নিয়ে কোন দিন সংসার করব এ কল্পনা আমি কোন দিনই করিনি, কিন্তু এই মহিলাটির জন্যই আমি রাজি হ'লাম। আর এতে ভাল বই মন্দ হবে না; কাজেই তুমি আমার এ বিবাহে অমত করবে না ও তোমার ইহাতে মত আছে, ইহাই তুমি আমায় শীঘ্র জানাও।

কিন্তু মাস খানেকের মধ্যে কোন উত্তর আসিল না। উপরন্তু আরও দু'খানি পত্র দিল, তাহারও কোনই উত্তর আসিল না।

মনীশ এইবার প্রমাদ গণিল।

জংলীটা যে তাহাকে এই রকম জব্দ করিবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। এখন কি করিয়া বা সে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে।

শ্বশুর বাড়ীর কত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ সে উপেক্ষা করিয়াছে, ও তাহার পিতার কাছ হইতে সেজন্য কত তিরস্কার গঞ্জনা সহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নিজের বাড়ীতে তাহার স্ত্রী আসিলে সে কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াছে।

এখন তাহার স্ত্রী পিত্রালয়ে। মনীশ সেখানে বিনা আমন্ত্রণেই বা কি করিয়া যায়? কিংবা দেশে গিয়া, লজ্জার মাথা খাইয়া কি করিয়াই বা পিতাকে বলে তাহার স্ত্রীকে আনিতে। মনীশ মহা সমস্যায় পড়িয়াছে।

এদিকে সুধীররা কি একটা উপলক্ষ্যে তাহাদের দেশে গিয়াছে, এখন যে মণির আজগুবি প্রস্তাবটা কোন রকমে বদলাইবার চেষ্টা করিবে, তাহারও যো নাই।

(৪)

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে ঘন ঘটা করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল। মনীশ ঘরের মধ্যে বসিয়া রবিবাবুর বর্ষার একটা কবিতা পড়িতেছিল। এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু আপনার একটা তার আছে।"

মনীশ রসিদে সই করিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার খুলিয়া ফেলিল। পড়িয়া একটু আশ্বস্ত হইল।

টেলিগ্রাম তাহার শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে; তাহার একটি শ্যালিকার বিবাহ। হঠাৎ বিবাহ স্থির হওয়ায় তাঁহারা মনীশকে পূর্ব্বে জানাইতে পারেন নাই।

অন্য সময় হইলে মনীশ রাগ করিয়া সেখানা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত; কিন্তু আজ ইহাকেই সে অমূল্যধন ও পরম বান্ধব মনে করিল।

(৫)

বিবাহ বাড়ী মহা হৈ চৈ। তাহার মধ্যেও মনীশের মনের

ত্রুটি হইল না; বরং এতটা যত্নে মনীশ কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। পরদিন বিবাহ।

মনীশ একটা ইজি চেয়ারে শুইয়া একখানি বই হাতে করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা তো মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। বাড়ীর সকলের ভাব দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, ঘুমাইতে যাওয়ার পূর্ব্বে ছাড়া তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। কি বিপদেই না পড়িয়াছে!

১১টা বাজিলে গৃহকর্ত্তা মনীশকে শুইবার ঘরে লইয়া যাওয়ার জন্য বাড়ীর লোকেদের হাঁক ডাক দিলেন ও 'বাবাজীর বড়ই কষ্ট হ'ল' বলিয়া নানা রকম আফশোষ করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া মনীশকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। ঘরের দরজার কাছে আসিয়া যেন মনীশের আর পা উঠিতেছিল না। মনীশের রকম দেখিয়া তাহার এক আত্মীয়া বলিলেন, "আপনি কি আপনার অপরিচিত স্বামীর ঘরে যাচ্ছেন? যেমন ছুড়কো মেয়েরা করে." বলিয়া তিনি মধুর হাসি হাসিলেন।

মনীশ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই, বাহির হইতে কাহারা শিকল টানিয়া দিল।

মনীশ দেখিল, বিছানার উপর সাড়ী দিয়া আপদমস্তক ঢাকা একটি মানুষ বসিয়া আছে তাহাকে দেখাইতেছে যেন একটি পুঁটুলী।

মনীশ হাসিয়া মনে মনে বলিল, "আমি এই জন্যই তো তোমাকে ঘৃণা করি। যাক্ সারা গা ঢাকিয়া ভালই করেছ, এখন তোমার সঙ্গে কি করে এই ঘরে রাত কাটাব!" ভাবিতে মনীশের সারাটি গা ঘামিয়া উঠিল। পরে সে পুঁট্‌লীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নিশ্চয়ই আমার চিঠি পেয়েছ?"

পুঁটুলী কোন উত্তর দিল না। আবার জিজ্ঞাসা করিল, এবারও কোন উত্তর দিল না। বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া মনীশ বড় চটিল; কিন্তু পরক্ষণেই সাম্‌লিয়া লইল। সে বুঝিল এই পুঁটুলিতে শক্ত রকমের গিট দেওয়া আছে। পরে আবার জিজ্ঞাসা করিল "তবে তোমার মত নেই?"

পুঁট্‌লী স্থির।

মনীশের মনে হইল, তখনই সেখান হইতে চলিয়া যায়। কী! এই জংলীটার কাছে ভিক্ষা চাওয়া! তাহার উচ্চ মাথা এই জংলীটার কাছে নীচু করা! কিন্তু পরক্ষণেই মনীশের মনশ্চক্ষে মণিকার আনন্দিত মুখ খানি ভাসিয়া উঠিল। বুঝিল রাগিলে সব পণ্ড হইবে। যেমন করিয়াই হোক ইহার মত করিতে হইবে।

সে পুঁটুলীর হাত ধরিয়া অনুরোধ করিবে মনে করিয়া, হাত ধরিতে পুঁটুলীর পায়ে হাত দিয়া ফেলিল। পর মুহূর্ত্তে পুঁটুলী ঘোমটা খুলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনীশ সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল—সে মণিকা! ইত্যবসরে শিকল খুলিয়া আরও কয়েকজন প্রবেশ করিল। তাহারা সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া হাত তালি দিল। রমলা বলিল, "মনীশ বাবু দিদিকে ছুঁতেইতো আপনার মানুষ হ'তে ভেড়া প্রমোশন হ'ল? এখন সংসার কর্‌লে কি কি হবেন?"

সুধীর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে বলিল—"এবার হবেন বানর! বানর!"

মনীশ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহাদের দেখিতেছিল।

রমলা আবার বলিল

"মনীশ বাবু! দিদিকে এখন কি জংলী বলে ঘৃণা ক'রে চলে যাবেন?"

এই নিদারুণ প্রশ্নের মনীশ কোন উত্তর দিতে পারিল না; শুধু ছল ছল নেত্রে করুণ দৃষ্টিতে উহাদের মুখের দিকে চাহিল।

মণির বৌদি বলিলেন, "আর কেন বেচারিকে বাঁদর নাচ নাচাও? ওঁকে যদি এখন মণির চরণামৃত খেতে বল তোমরা, তাতেও রাজি হন বোধ হয়।"

"কি যে ব'ল বৌদি!" বলিয়া মণিকা মনীশের দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিল।

বাহিরে তখন উৎসবের সুরে নহবৎ বাজিতেছিল।

কবিত্ব কোথায়

শ্রীহরিপদ ঘোষাল এম. এ. এম. আর. এ. এস্.

সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কত জানা, কত অজানা কবি তাঁদের বিশাল হৃদয়রত্নাকর মন্থন ক'রে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভূষিত করেছেন। তাঁদের চিত্ত-বীণায় নব নব সুর ধ্বনিত হয়েছে, তাঁদের হৃদয়-কুঞ্জে নব নব ভাব মুকুলিত হয়েছে। এই সকল রসস্রষ্টাগণ কোন নূতন ভাব বা ভাষা স্জন করেন নি, কোন মৌলিক গবেষণার সাধনায় ব্যস্ত হন নি,—তাঁরা ছিলেন সুন্দরের উপাসক, মনুষ্য হৃদয়ের মণিকোঠায় লুক্কায়িত ব্যথা ও বেদনার প্রচারক।

কবি নূতন ভাষা সৃষ্টি করতে প্রয়াস পান না, ভাষা-তত্ত্বের জটিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন না। তারহীন বার্ত্তাবহ কাজ করে অদৃশ্যভাবে। অসীম ব্যোমের অনন্ত বক্ষে যে অগ্নি লুক্কায়িত আছে, তাহাই মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আকারে স্থানে স্থানে ঝিলিক মেরে চলে যায়, সমস্ত গগন আলোকিত হয়ে উঠে, অন্ধকারময় আকাশে যেন আলোর ঢেউ খেলে যায়। কবিহৃদয় সেইরূপ। বিশ্ব মানবের অস্ফুট বেদনা-রাশি, সুখ-দুঃখের স্পন্দন, প্রেম ও আশার রুদ্ধ বাসনা ঘনীভূত হয়ে প্রকাশিত হয় কবি-হৃদয়ের উজ্জ্বল আদর্শে। ভাব চিরন্তন, ভাষা সনাতন। এই চিরন্তন ভাবকে সনাতন সর্ব্বজন-ব্যবহৃত ভাষার রূপ দিয়ে কবি লোকলোচনের সামনে এনে দেন। কবি আলোকের দূত। তাঁর চিত্ত উদার মুক্ত পার্ব্বত্য-নিঝরের মত। সেই মধুস্রাবী ধারায় কর্দ্দমের আবিলতা নাই, বদ্ধজলের পূতিগন্ধ বা মলিনতা নাই—সে ধারা দর্পণের মত স্বচ্ছ, সহজ ও সুন্দর।

যথার্থ কবি মানবতার পূর্ণ বিকাশ। তাঁর হৃদয় আনন্দের লীলানিকেতন, সৌন্দর্য্যের বিকাশভূমি। বিশ্বের সমস্ত আনন্দ যেন জমাট হয়ে তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়।

প্রকৃতি চিরসুন্দরী। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্য কুলবধূর মত অবগুণ্ঠনে ঢাকা। লীলাময়ী প্রকৃতিরাণী দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার ক'রে নিজের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ বহির্দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত রেখেছেন। কবিপ্রতিভা তাঁর অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে, বিচিত্র ভঙ্গীতে "বিচিত্রের লীলাকে" বাহিরে লীলায়িত করে। ইহাই কবির কাজ,—তাঁর সাধনা—তাঁর তপস্যা।

রুদ্ধগৃহের কোণে বসে কাব্য রচনা করা কবির কাজ নয়—তাঁর কাজ হৃদয়ের চিরনবীনটিকে, চির সবুজটিকে রূপ-রস-বর্ণহিল্লোলে আন্দোলিত করা—অসাড় মৃতকল্প চিত্তে প্রাণের বিপুল স্পন্দন এনে দেওয়া,—সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রচণ্ড আঘাতে তাকে সজীব জীবন্ত ক'রে তোলা—আনন্দ ও সুষমায় পরিপূরিত ক'রে দেওয়া।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই তত্ত্ব, এই নিগূঢ় অথচ স্পষ্ট খাঁটি সত্য পরিস্ফুট হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবি, পূর্ণমাত্রায় কবি। কিন্তু বিরলে বসে ছন্দ-তান-লয় যোগে মধুর বাক্যবিন্যাস করা তাঁর প্রকৃতি নয়। কাব্যের সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে কবি মহামানবের মহামেলায় এসে দাঁড়িয়েছেন, অনন্ত রসের আধার তাঁর বিরাট্ হৃদয়খানি খুলে দিয়ে অনিন্দ্য-সুন্দর কবিজীবনের প্রভাব শতধা বিস্তার ক'রে বাঙ্গালীর সমগ্র জীবনটাকে সুন্দরের দিকে প্রধাবিত করেছেন। তাঁর শুভ্র সংযত মার্জ্জিত জীবনের মায়াকাঠিস্পর্শে সাধারণ বাঙ্গালীজীবন প্রস্ফুটিত হয়েছে—বাঙ্গালীর রসবোধ ও রুচি মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত হ'য়েছে।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনাবিল আনন্দরস পরিবেষণ ক'রে যাঁরা চিরবরেণ্য হয়েছেন—বিশ্বের কাব্য-উদ্যানে মধুচক্র রচনা ক'রে যাঁরা অমরতা লাভ ক'রেছেন—শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সত্যের পথে চলে যারা অমরাবতীর অম্লান দীপ্তিতে স্বীয় মহিমা-মুকুট গৌরবান্বিত ক'রেছেন—সেই কবিকুলচূড়ামণি-গণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উচ্চ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। হোমর ভর্জ্জিল, দান্তে, গ্যেটে, সেক্সপীয়র, ইস্‌কিলাস্, সফোক্লিস্, কালিদাস যে যজ্ঞের পৌরহিত্য করে গিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই যজ্ঞের হোতা ও উদ্গাতা। একাধারে অনন্তরসের

সমাবেশ রবীন্দ্রসাহিত্য ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না। তাঁর মহাপ্রাণতা·ভৌগোলিক সীমা দ্বারা আবদ্ধ হয় নি— হ'তেও পারে না। অনেকদিন পূর্ব্বে তিনি বলেছিলেন—

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ গান বাজে।

মহাকবি, তোমার স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত হ'য়েছে—তোমার আশা ও সাধনা সার্থক হ'য়েছে। বিশ্বজোড়া সুরের সহিত তোমার হৃদয় সত্যই নৃত্য ক'রছে। তাই বিশ্বের মুক্ত হাওয়ায় পুষ্টিলাভের জন্য বাঙ্গালী আজ মুক্তিকামী—মুক্ত হবার দুর্জ্জয় কল্পনা ও অনাস্বাদিত আনন্দ আজ বাঙ্গালীকে দুঃখবরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রযুগে জয়লাভ করা কম গৌরবের কথা নয়। জানিনা জগতের অন্য কোন কবি চিরসুন্দরকে এতখানি ব্যক্ত করেছেন কিনা। যে রূপ-রস তিনি মোহন তুলিকামুখে ফুটিয়ে তুলেছেন—যার প্রভাবে বাঙ্গলী-জীবন অধিকতর সৌন্দর্য্য ও গৌরবে অলঙ্কৃত হয়েছে—তার মাধুর্য্য শুধু বাংলার হাটে-বাটে পল্লীপথে নয়,—যান্ত্রিক সভ্যতার লীলানিকেতনে, "ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখেও" হতাদর হয় নি। বাংলার জাতীয় জীবনে ও বিশ্বমানবের কল্যাণচিন্তার প্রেরণায় তাঁর দান কিরূপ বিপুল ও গভীর তা' নির্দ্ধারণ করবার স্পর্দ্ধা আমার নাই, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যেই পরিস্ফুট রয়েছে। তাই তাঁর বাণী আজ ভারতের বাণী ব'লে জগতের মনীষীগণ সাদরে গ্রহণ করেছেন। এই স্থানেই তাঁর কবিত্বের সার্থকতা সৌন্দর্য্য অনুভূতির পরিণতি ও চরম মৌলিকতা।

বিচিত্র সুরের সমবেত সংঘাতে ঐক্যতানবাদ্যের সৌন্দর্য্য কত সূক্ষ্ম হয়, কত অভিনব বিচিত্র ছন্দের সমাবেশে তার মাধুর্য্য! সেইরূপ অনন্ত বিশ্বের সমবেত সুর সর্ব্বদা ধ্বনিত ও ঝঙ্কৃত হচ্ছে। যাঁর হৃদয় সেই অনাহত ধ্বনির অপরূপ তানে নেচে উঠে, যাঁর হৃদয়লহরীর উপর লহরী মিশিয়ে সেই নীরব নৃত্যের নূপুরনিক্কণের সঙ্গে নেমে চলে, যিনি সেই অপরূপ নৃত্যের ঝঙ্কার সুললিত শব্দে, বিচিত্র ছন্দে পরিস্ফুট ক'রে তোলেন, তাঁহারই ত শ্রেষ্ঠ কবির উচ্চ আসনে স্থান, তিনিই ত মহাকবি এবং সেই স্থলেই ত কবিত্বের চরম পরিণতি।

ঊষর মরুপথে

শ্রীতেজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঊষর মরু পথে যাত্রী দল চলে
বুকেতে ঘন ব্যথা; রক্তটীপ ভালে,
সমুখে আঁধার নামিছে ধরা পরে
দীঘল রজনী পথ কি পাবো নারে?
মুখেতে কথা নাই, তৃষ্ণা, ফাটে বুক
যাত্রীদল চলে উভয়ে চাহি মুখ।
এমনি সাঁঝে আজ সহরে প্রতি ঘরে
জ্বলিছে শত বাতি কতনা থরে থরে,
হাসিছে কত সুখে গাহিছে কত গান
এ ধারে যাত্রীর মরুতে অভিযান।

কতনা আশা করে এসেছি গৃহছেড়ে
জীবন বিনিময়ে পথ কি পাব নারে?
চোখের জল মুছে যাহারা আসিয়াছে
বলিতে হবে তারে শেষেতে পথ আছে।
ক্ষুধায় জ্বলে পেট, তৃষ্ণা, জল চাই
জল সে কোথা পাব? শূন্য পরিখাই!
তোমরা ঘরে ঘরে পুত্র জননীর,
দেউল চূড়ে বসি বাঁধিছ সুখ নীড়।
তোদের পাশে আজ কাঁপিছে বসুধরা!
তাইতো আমাদের কঠিন ব্রত করা।

সাহিত্যের কাজ

—বেদপন্থী—

সাহিত্যের আসল কথা যা তাহা ঠিক কাজের কথা নয়, সে কারণে অনেকে ইহাতে পেটের বা পিঠের সুতারটি ঠিক মনোনীত পান না বলিয়া মুখখানি ভার করিয়া বলেন, তা হইলে আর কি হইল! কি যে হইল ইহা বুঝাইয়া বলিবার নয়, ইহা বুঝিবার, ইহা শুনাইবার ততখানি নয় যতখানি শুনিবার। ইহা আস্বাদনের—সমক্ষে নয় অলক্ষ্যে, স্থূলে নয় সূক্ষ্মে, চক্ষে নয় বক্ষে।

পুরাণ ইতিহাস বা ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিবৃতি নয় বলিয়া সাধু সজ্জনও ইহাকে সহজ অবজ্ঞায় এড়াইয়া চলেন। ইহা লইয়া সবাক তর্ক বা সশস্ত্র যুদ্ধ চলেনা, তাই সাহিত্যিককে নির্ব্বাক ও পাঠককে অবাক হইয়া থাকিতে হয়, কালে-ভদ্রে কোলাকুলি চলে। লেখক-পাঠকের মিলন পথে-ঘাটে হোটলে-কেফে সত্যকার মিলন নয়, তাঁদের মিলনের নিবিড় বন্ধন সবাক নয় নির্ব্বাক জগতে, কথায় নয়, চিন্তায়। ইহাতে দেশ-কাল বাধে না, জাত-অজাত বাছে না, ছোট-বড়োর ভেদ নাই। মানুষের সহিত মানুষের মিলনের এমন সুচারু সেতু আর নাই, এবং নাই বলিয়াই সুশিক্ষার আদর সর্ব্বদেশেই এমন উপমাহারা।

সাহিত্যের কাজ মানুষকে মানুষের নিকটে আনা, সংযোগ ঘটাইয়া দেয়া। নর নারীর অন্তরে একটি আদিম প্রাথমিক ভাব আছে যাহা বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংলগ্ন, তার নিগূঢ় চেতনায় তেমনি আরো একটি সুমধুর বৃত্তি আছে, যথা রূপ হইতে রসে ও রস হইতে রসময়ের সহিত সংযোগ ঘটাইয়া দেয়, ঋতুর স্পর্শে যেমন তৃণতরুরাজি নব কলেবর ধারণ করে, রসের সংস্পর্শে অন্তরেরও তেমনি একটা পরিবর্ত্তন ঘটে, সে পূর্ণিমার কোটালের মত স্ফীত ও সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমার মত মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। সাহিত্য মানব-জীবনের সমগ্রতার ইতিহাস, সে দৃষ্টি যার নাই সে ইহার মধ্যকার সত্যটিকে সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পায়না, নিজের খণ্ড জীবনের শত বিখণ্ড পাতাগুলির সহিত টপ্‌ করিয়া মিলাইতে গিয়া হারাইয়া বসে।

ইহা সত্যই সৃষ্টিছাড়া কথার সমষ্টি। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে সংসারী মনটা বিকল হইয়া যায়, বৈরাগ্যে নয় বিরহে, বাহিরের তরে নয়, ভিতরের আহ্বানে। কর্ম্ম জগৎ ও কল্পজগৎ দুটিই পাশাপাশি চলিতেছে, দুটিরই স্রষ্টা এই মানব-মন। একটি সবাক, অপরটি নির্ব্বাক।

তরুণী

শ্রীসখানাথ দাস

স্নিগ্ধ শান্ত সুকোমল নয়ন-নীলিমা—
মধুর হাসিটি তব, অয়িমনোরমা!
বিশ্বের প্রবাসী যত ক্লান্ত পথিকেরে
আকর্ষণ করিতেছে তোমার দুয়ারে;
রক্তোৎপল ওষ্ঠ দুটি মৃদু শিহরণে
মায়া-স্বর্গ আনিতেছে প্রণয়ীর মনে;
তোমার উজ্জ্বল গালে ভালে আছে লেখা
বাসনার কামনার দীপ্ত রশ্মি-রেখা।

বাসন্তী প্রকৃতি মাঝে তব সিংহাসন
বক্ষের গোপন ঘরে তোমার আসন;
হাস্যে লাস্যে কটাক্ষের ছন্দে নিত্য তুমি
তৃপ্ত মুগ্ধ পুলকিত করিয়াছ তুমি।
তাই আজি দাঁড়াইনু বিমুগ্ধ অন্তরে
প্রথম পূজাটি মোর দিনু তব করে।

উদয়-তারা

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)

শ্রীসুনীল কুমার ধর

পুরুষের প্রতি একটা ছুর্নিবার আক্রোশ যেমন তাহাকে ঘরের মোহ কাটাইয়া বিদ্রোহিনী করিয়াছে তেমনি পুরুষের প্রিয়া হইবার জন্মগত মোহ ত' সে আজও কাটাইতে পারিল না। কিন্তু এত সঙ্কোচই বা কেন! বরুণা নিজেকে প্রশ্ন করিল। লজ্জাই বা কিসের ?

কৈশোর জীবনের রৌদ্রজ্জ্বল প্রভাত আকাশ লইয়া ভবিষ্যতের যে অপরূপ স্বপ্ন সে রচনা করিয়াছিল তাহাতে এতটুকুও নূতনত্ব ছিলনা বটে কিন্তু মাধুর্য্য ছিল—একটি সুস্থ সবল প্রিয়দর্শন পুরুষকে ঘিরিয়া তাহার নারীজীবন সার্থক হইয়া উঠিবে! একান্ত নিজের একটি সংসার! তাহার সে মধুর স্বপ্ন চিরকালের জন্য ব্যর্থ হইয়া গেছে, রাজপুত্রও আর ফিরিয়া আসিবেনা তবুও তাহার ভিতরে যে চিরন্তনী বুভুক্ষু নারী আছে সময় অসময় দুখানি ছোট হাতের কোমল স্পর্শ, ছোট একটি মধুর আহ্বানের জন্যে ব্যাকুল হইয়া ওঠে! বরুণা কোনরকমেই ভুলিতে পারে না যে, সে নারী!

কিন্তু এ দুর্ব্বলতা বরুণাকে কখনই বেশীক্ষণ তন্দ্রাগ্রস্ত রাখিতে পারে না, একটি শীতসন্ধ্যার বীভৎস দৃশ্যের দুর্ব্বহস্মৃতি তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। নির্জ্জন অরণ্যের মাঝে নিরীহ বালিকার অসহায় দেহ ঘিরিয়া কামাতুর পুরুষের সে কি বিকট উল্লাস! ভয়ে আতঙ্কে ও লজ্জায় অল্পে অল্পে কেমন করিয়া যে সে চেতনা হারাইয়াছিল তাহা মনে পড়েনা কিন্তু প্রভাতে যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল দেখিল তাহাদেরই পাছদুয়ারের আবর্জ্জনার মধ্যে সে পড়িয়া আছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবাসীর মধ্যে নানা রকম বচসা চলিতেছে। তাহারা যে এমন নিঃসঙ্কোচে পরস্পরের সামনে প্রকাশ্যভাবে এত কুৎসিত ও অভদ্র কথা উচ্চারণ করিতে পারে একথা বরুণা এর পূর্ব্বে কোনদিন ধারণা করিতে পারে নাই। লজ্জায় তাহার সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা, মাথার ভিতরে যেন আগুণ জ্বলিতেছে—কণ্ঠ শুকাইয়া শ্বাস বন্ধ হওয়ার মত। তবু কেহ তাহাকে ধূলিশয্যা হইতে উঠাইয়া ঘরে লইয়া গেল না, এতটুক তৃষ্ণার জল দিতেও নারাজ! সে একবার অতি কষ্টে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল অদূরে তাহার মা কুন্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিতেছেন, পিতা তাঁহার পিছনে গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার চেতনা ফিরিয়া আসায় মা ছাড়া কেহ একটু চঞ্চল হইল না সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহার নিকটে আগাইয়াও আসিলনা! সে সকলের অস্পৃশ্য! মানুষের আয়ু অপেক্ষা সংস্কারের মূল্য যাহাদের নিকট বেশী তাহাদের কাছে কোন দয়া ভিক্ষা করাই মূর্খতা। একটা মানুষকে এরা দাঁড়াইয়া তিলে তিলে মরিতে দেখিতে পারে তাহাকে উদ্ধার করিবার কিম্বা বাঁচাইবার কোন চেষ্টা ইচ্ছা করিয়াই করিবে না। তাহার জন্য যত সহানুভূতি মরণের পর! এই সমাজ আর এর উপর নির্ভর করিয়া সংসার করে বাঙ্গালী জাতি! তাহার মুখে একটুকু জল দিয়াছিলেন বলিয়া বরুণার মায়েরই বা কি লাঞ্ছনা! বরুণা সেদিন বার বার নিজের মৃত্যুকামনা করিয়া ছিল। তাহার পর বিদায়ের পালা।

শয্যাশ্রয় দূরের কথা অতবড় গৃহের এক কোনেও তাহার জন্য আর এতটুকু স্থান ছিল না। রক্তের সম্বন্ধের চেয়ে পিতার নিকটে সমাজ বড় কেননা সে সমাজ পুরুষের গড়া, তাই নারী বলিয়াই তিনি সেদিন কন্যাকে অমন মুমূর্ষু অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে পরলোকের দোহাই দিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বরুণা যদি তাহার কন্যা না হইয়া পুত্র বরুণ হইত তখন তাহার এ অপরাধ, অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত না, যদিই বা হইত তাহার প্রায়শ্চিত্তের মূল্য হইত কয়েকটি রজতখণ্ড। কেবল নারীর বেলায় বিধান দিয়াই

সমাজ দায় খালাস ! কিন্তু নারীর দেহ নিষ্ঠার উপর যদি সমাজের এতই শ্রদ্ধা তবে নিরীহ বালিকার দেহের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া অত্যাচারী কেন শাস্তি পায় না ? সমাজকে সে অবহেলা করিতে চায় নাই, পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যে যে সমাজের অস্তিত্ব, সে সমাজ নিরপেক্ষ নয় কেন ? কলুষিত-দেহ পুরুষের যদি বিবাহ করিবার, পিতা হইবার কোন বাধা বা বিপত্তি সমাজের না থাকে, অনিচ্ছায় অত্যাচারিতা নারীকে গৃহকোণে আশ্রয় দিতে এত কুণ্ঠিত কেন ? যত আইন-কানুন, শাস্ত্রের দোহাই কি কেবল তাহারই জন্যে ! পিতা হইবার অধিকার লইয়া পুরুষ তাহার অতীত ভুলিতে পারে, পাপ ভুলিতে পারে, আর নারী পারে না ! অথচ এই পুরুষই বারবনিতার চরণে প্রেম নিবেদন করে ! এবং শোনা যায় পিতা ভিক্ষা করিয়া পুত্র কন্যার লালন পালন করেন ।

—সেদিন সমাজই ঐ নিরীহ নিষ্পাপ মেয়েটির মনে পাপের প্রলোভন জাগিয়েছে—আজ সে পাপিনী, কাউকেই ক্ষমা করবে না,—দৃঢ়স্বরে এই কথা কয়টি বলিয়া আপন মনে একবার জোরে হাসিয়া উঠিয়া বরুণা গাহিতে লাগিল—

দীপ নিবেছে নিবুক নাক
আঁধারে তব পরশ রাখ......

বরুণাকে এখন দেখিলে মনে হয় ও বুঝি রাজপুতনার একটি দুঃসাহসী মেয়ে, রাত্রি প্রভাতে শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালনার জন্যে প্রস্তুত হইতেছে । এমনি ধারালো তাহার ঠোঁটের ঐ ক্ষীণ হাসির রেখাটি. এমনি তাহার সর্ব্বদেহের গতি চঞ্চলতা ।

কিন্তু একটু পরেই ওর এ চঞ্চলতা শান্ত হইয়া গেল, চোখ দুটি হইয়া উঠিল বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত—ওর সারামুখে যেন বিফলমনা অভিসারিকার ম্লান ছায়া পড়িয়াছে ! বরুণা ধীরে ধীরে ওধারের জানালায় গিয়া স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইল । ঠিক সামনের বাড়ীর মুখোমুখি ঘরটিতে ও বাড়ীর যে মেয়েটি থাকে আজ তাহার স্বামী আসিয়াছেন, তাই এদিকের জানালা একেবারে বন্ধ । দিন চারেক হইল বরুণার সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, শান্ত মেয়েটি, বিবাহ হইয়াছে মাত্র তিনমাস তাই স্বামীর প্রতি ওর ভালবাসার আর সীমা হয়না । এরাত্রে ও ঘরে প্রেমের চিরন্তন অভিনয় চলিয়াছে ।

ঘরের বাহিরের শীতের তন্দ্রাতুর সহর কুয়াশার আবরণে রহস্যময়ী । এবাড়ীটার অন্যান্য চপলা মেয়েগুলি যাহারা ভবিষ্যতের এক রঙীন স্বপ্নের আশায় তাহার ছায়ায় আসিয়া নীড় বাঁধিয়াছে, তাহাদের কেহ আর জাগিয়া নাই । সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে । অদ্ভুৎ মেয়ে ঐ সাহানা, ঠিক এই নিশীথ রাতের নিস্তব্ধ নগরীর মত । সারাদিন ওর আর কলরবের অন্ত নাই কিন্তু সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর দুটি চোখ যেন স্বপ্নাতুর হইয়া ওঠে । বরুণা ভাবিতেছে । একটু পরে বরুণা আস্তে আস্তে সাহানাদের ঘরে গিয়া দেখিল, সে নিবিষ্টচিত্তে একখানা ফটোর দিকে তাকাইয়া আছে এবং সে ছবিখানার দিকে তাকাইয়া এমনি তন্ময় হইয়া গেছে যে, বরুণা এঘরে আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ফের ফিরিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিলনা । ঘরের বাহিরে গিয়া একটু ম্লান হাসিয়া বরুণা আপন মনে বলিল—নারীর একি দুর্ব্বলতা, যে তাকে পায় দলে তারই চরণ পূজার জন্য পাগল ! ফটোখানা যে সাহানার পূর্ব্বপ্রণয়ী অমরনাথের বরুণা তাহা বুঝিল । অথচ এই অমরনাথ সাহানার উপর কি অন্যায় অবিচারই না করিয়াছে ! বাংলার নারী যতদিন না পুণ্য সঞ্চয়ের এই লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে ততদিন তাহাদের দাসীপনা করিতেই হইবে । সাহানার মত মেয়ে লইয়া অনেকের কবিতা লেখা চলে—সংসারও চলিতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহ চলে না ।

* * *

পরের দিন সকালে এবাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা প্রত্যেকেই বরুণার ঘুমন্ত দেহের দিকে তাকাইয়া অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল । পরণে একখানি ফিকে বাসন্তীরংঙের সাড়ী, গায়ে রক্তের মত রাঙ্গা ব্লাউজ, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর রেখা—কপালে ছোট একটি সিঁদুরের টিপ । সবচেয়ে প্রথম দেখিল সাহানা, তখন আটটা বাজে. বরুণা তখনও ঘুমাইতেছে । গায়ের র‍্যাগটা পাশে সরিয়া গেছে, শ্লথবসনা বরুণাকে দেখিয়া মনে হয় নব বধূ, কাল রাত্রেই বুঝি তাহার বিবাহ হইয়াছে । ঘরের ও দিকে বরুণার তোরঙ্গটি খোলা, তাহার পাশে রূপার

সিঁদুর কৌটাটি রহিয়াছে এবং আলতা পরিয়া বরুণা যে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে এদিক ও দিক তাহার ছাপ সুস্পষ্ট।

সুমিতার পিছনে সারা বাড়ীর মেয়ে আসিয়া বরুণার দরজার সামনে উপস্থিত হইল, সকলেই বরুণার অদ্ভুত বেশ দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছে কিন্তু এক সুমিতা ছাড়া প্রত্যেকেই বরুণাকে অত্যন্ত ভয় করে, তাহাকে ঠাট্টা করিবার সাহস ওদের কাহারও নাই। সুমিতা বরুণার খাটের দিকে আগাইয়া গিয়া ধীরে ধীরে তাহার ঠোঁটে একটি চুম্বন করিয়া ডাকিল. ওগো—

কেবল এই দৃশ্যটুকুর জন্যেই বরুণা এতক্ষণ ঘুমের ভাণ করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। সুমিতার চুম্বন-স্পর্শে চমকাইয়া উঠিয়া, থতমত খাইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কিগো—

বরুণা এতক্ষণ চোখ বুজিয়াছিল, এইবার চোখ চাহিয়া সুমিতার মুখের দিকে তাকাইয়া যেন অত্যন্ত নিরাশ ও বিরক্ত হইয়াছে এমনি ভাবে বলিল—তুই!

ঘরের অপর মেয়েগুলি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং তাহাদের কলকণ্ঠের হাসিতে লজ্জা পাইয়াছে এমনি ভাবে বরুণা অত্যন্ত আস্তে আস্তে বলিল—যাঃ, পালা—

এখন বরুণাকে দেখিয়া কে বলিবে যে, সে সদ্যপরিণীতা নববধূটি নয়! ওর সারা মুখখানি প্রথম প্রণয়মুগ্ধা কিশোরীর মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—চেখ দুটিতে পড়িয়াছে এক অপরূপ আলো!

সাহানার দিকে তাকাইয়া বরুণা মৃদু হাসিয়া বলিল—কাল রাত্রে যে আমার বিয়ে হয়েছে! আমার বর যখন এল তখন তোরা সকলেই ঘুমিয়ে, একবার ইচ্ছা হোল তোদের ডাকি—

শয্যার অপরাংশ দেখাইয়া বলিল—এখানে শুয়েছিল, সারারাত্তির ধরে কত গল্পই না কোরলে, কিন্তু এমনি দুষ্টু, ভোরবেলা না বোলে কখন যে পালিয়ে গেছে…

তাহার পর মুখ নীচু করিল।

কবি প্রকাশের সঙ্গে বরুণা ইদানিং এমন ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে যাহাতে সকলের মনেই এমনি একটা পরিণতির কথা কয়দিন ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, এমন কি সুমিতাও বিশ্বাস করিল যে, কাল অনেক রাতে প্রকাশ আবার আসিয়াছিল। কেবল বিশ্বাস করিল না সাহানা।

সাহানা কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেও গেল, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ পাওয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বরুণা বলিল—ঐ আস্‌ছে—

প্রতি মেয়েটির মুখে একটু আগে যে চপল হাসির আলো দেখা গিয়াছিল—তাহা যে ওদের অজ্ঞাতে কখন মিলাইয়া গেছে বলা কঠিন। তাহারা যেন এ ঘর হইতে কোন রকমে বাহিরে যাইতে পারিলে বাঁচে! বরুণা বলিল—যাচ্ছিস্ কেন, দাঁড়ানা। তোদের সামনেই এমন ঝগড়া করব—

কথার মাঝখানেই প্রকাশ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। দরজার সামনে অসিয়া মেয়েদের দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইতেই বরুণা হাসিয়া বলিল—লজ্জা পেলে নাকি!

প্রকাশের বিস্ময় মুগ্ধ মুখের দিকে তাকাইয়া বরুণা আবার বলিল—এরা জান্‌তে পেরেছে, আর লুকিয়ে লাভ নেই—

বেচারী প্রকাশ বরুণার বিচিত্র বেশ দেখিয়া অবাক হইয়া গেছে।

শয্যা হইতে নামিয়া প্রকাশের দিকে আগাইয়া গিয়া বরুণা হাসিয়া বলিল—এই-ই ত তুমি চাচ্ছিলে! তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া বলিল—তোমার বলার অপেক্ষা না কোরেই আমি বউ সেজে ব'সে আছি—

প্রকাশ অনেক কষ্টে এবার বলিল—এ কি ছেলে মানুষী, বরুণা—

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল বরুণা বলিল—তোরা শুনলি…

কিন্তু ইতিমধ্যেই সকলে যে কখন বাহিরে চলিয়া গেছে বরুণা তাহা জানিতে পারে নাই, মুখ ফিরাইয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই, কেবল সে ও প্রকাশ।

এতক্ষণ সে প্রকাশের হাত ধরিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছিল, এইবার তাহার পাশে বসিল। বলিল—একথা ত দুদিন বাদে হয়ত বা আজকে ট্রেণে উঠেই বোলতে, আমি না হয় আগে থেকেই তৈরি হ'য়ে আছি…

প্রকাশ কোন কথা বলিল না।

বরুণা বলিল—পুরুত আসেনি, মন্তর পড়ায় নি—শাঁখ

বাজেনি বলেই কি তোমার আপত্তি! কথা বোলছ না যে?

প্রকাশ বলিল—কি বলব! আমি শুধু ভাবছি তুমি এমন চমৎকার অভিনয় কোরতে পার!

—তুমিও বোলছ অভিনয়! সত্য হোত নারায়ণ শিলার সামনে সিঁদুর পরলে!

—এর ঠিক উত্তর দিতে এখন পারব না, বরুণা, তা ছাড়া আমার উত্তর শুনেই যে তুমি এখুনি সিঁদুর মুছে ফেলবে এমনও নয়।

—তুমি যা ভাবছ সেটা আংশিক সত্য কিন্তু যা তুমি অস্বীকার কোরতে চাইছ সেটা আরও বড়ো।

অর্থাৎ—

—এর মধ্যে অর্থাৎ বা কিন্তু নেই। একসঙ্গে থাকতে গেলে আমাদের দেশে একটা সম্বন্ধ না থাকলে নানালোকে নানা কথা বোলবে, তা ছাড়া—

—কিন্তু এবেশে তোমাকে নিয়ে আমি পাটনায় যেতে পারব না—

প্রকাশের কথা শুনিয়া বরুণা এত জোরে হাসিয়া উঠিল যে প্রকাশ একেবারে অপ্রস্তুত। বলিল—লজ্জা কোরবে বুঝি, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, কনেটি 'পাড়াগেঁয়ে ব্রীড়াবনতা' মেয়েটি নয়—

এইবার প্রকাশ না হাসিয়া পারিল না। বলিল—ফুল-শয্যা কি পাটনার ক্যাম্পেই হবে…

—আজকের ট্রেণেও হ'তে পারে…

বরুণার ওষ্ঠ প্রান্তের ক্ষীণ হাসি-রেখাটি দেখিয়া প্রকাশ বুঝিল বরুণার কাছে আজও সে শিশু তবুও বরুণার নববেশ দেখিয়া সে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তখনই এতদিন পরে হঠাৎ কি জানি কেন অমরেশের কথা তাহার মনে পড়িল। অমরশের বিদায় বেলার করুণ মুখের ছবি!

কিন্তু বরুণা যখন প্রকাশের সঙ্গে মটরে উঠিল তখন তাহাকে দেখিলে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিত না যে, বরুণা প্রকাশের পরিণীতা নয়। ওর চরণ-ছন্দে, দৃষ্টিতে, সঙ্কোচ কিংবা লজ্জার লেশ মাত্র ছিল না।

দুষ্টু সাহানা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া উলু দিয়া উঠিল—আর বরুণার ঘরে ঢুকিয়া ছোট এক টুকরা কাগজ হাতে লইয়া সুমিতা একবার মাত্র বলিল—বেচারী প্রকাশ!

* * *

প্রেম বিষয়ে কবি প্রকাশের মতবাদ অত্যন্ত আধুনিক হইলেও বরুণার নিকট উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের মত। পুরুষের সাধারণ মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান অনুযায়ী প্রকাশও নারীকে ফুলের সহিত (চির প্রচলিত পদ্ধতি) এবং নিজকে ভ্রমরের সহিত তুলনা করে এবং এতদিন এই ধারণা লইয়া তাহার কাটিয়াছে। কিন্তু পাটনার পথে ট্রেনে উঠিয়া প্রকাশ প্রথম বুঝিল যে এত বড় ভুল উপমা একমাত্র বাঙ্গালী কবির পক্ষেই সম্ভব, যাহাদের দেশে দেবী নামে নারী শুধুই সেবাদাসী। ও দেশের সাহিত্যেও ঠিক এমনি ধরণের মিষ্টি কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় তবে তফাৎ এই যে, ওরা সুর বদলাইয়াছে এবং সেও আজ অনেকদিনের কথা।

সারাদিন বেশ নীরবে কাটিল, প্রকাশ কিম্বা বরুণার একটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সামান্য দু একটি ছোট কথা ছাড়া আর কোন কথাই তাহারা বলে নাই। বছর কয়েক আগে হইতে অর্থাৎ প্রকাশ যখন কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছে তখন হইতেই বায়রণের মত ওর নূতন নূতন নারী জয় করিবার বাসনা এবং এই জন্যই ও প্রেমের কবিতা লিখিতে লিখিতে সুর ধরিয়াছে বিদ্রোহের। অবনী, নরেন প্রভৃতির সহিত তাহার পরিচয় এই জন্যে হইলেও ও আজও ভোলে নাই যে, ওর এ বিদ্রোহের কবিতা কেবল দুর্ব্বলচিত্ত বীরপূজারিণী নারীচিত্ত জয় করিবার জন্যে। বরুণার সহিত এতদিন মিশিয়াও ওর এ ধারনা ও বিশ্বাস আজও যায় নাই যে সত্যিকার কোন বিদ্রোহ করাই নারীর পক্ষে অসম্ভব এবং ওর এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে বরুণার আজ সকালের অদ্ভুত ব্যবহারে, ও একবার ভাবিল পাটনায় না গিয়া সোজা দিল্লী কিংবা আগ্রায় যায় এবং দিন কতক বরুণার সঙ্গে দেশ বিদেশ ঘুরিয়া পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। দিনগুলি মন্দ কাটিবেনা। বরুণার মত মেয়েকে সঙ্গে লইয়া পথের জীবন বেশ রোম্যান্টিকভাবে কাটান চলে, তাহাকে লইয়া স্থায়ীভাবে সংসার করা চলেনা—একথা প্রকাশ জানে তাই ও একান্ত ভাবে বিশ্বাস করিয়াছে বরুণা তাহাকে সত্যই

ভালবাসিয়াছে এবং ওর আজকের ব্যবহার একেবারে অভিনয় নয়। জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকাশ এই সব কথাই ভাবিতেছিল। সন্ধ্যার ছায়ায় দূরের গাছ-পালা, মাঠ-প্রান্তর অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, আকাশের বুকে দ্বিতীয়ার সরু চাঁদের আলোয় চারিদিক উজ্জল হইয়া উঠিতেলাগিল। গাড়ীর অপরদিকে জানালার ধারে বসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া বরুণা ভাবিতেছে প্রকাশের কথা। প্রথমে বিশ্বাস করিতে সাহস না হইলেও প্রকাশ যে এখন নিঃশংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বরুণার কোন সঙ্কোচই নাই, একথা বরুণা বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াছে প্রকাশের সারাদিনের সসঙ্কোচ ব্যবহারে। প্রকাশের কথা কওয়ার নূতনতর ভঙ্গী, হাবভাব দেখিয়া ও যে সারাদিন কত কষ্টে হাসি চাপিয়া আছে তা ঐ জানে। ট্রেণ তখন একটা ষ্টেশনে থামিয়াছে, প্রকাশকে ডাকিয়া বরুণা বলিল—একটা চা-অলাকে ডেকে চা নেও না—

প্রকাশ বলিল—তুমিই ডাকনা বাপু।

গ্রীবা দুলাইয়া অপরূপ ভঙ্গীতে বরুণা বলিল বেশ যা-হোক্ কেলনারের চা-অলাকে ডাকিয়া বরুণা ডবল চায়ের অর্ডার দিল এবং প্রকাশের পাশের সিটে গিয়া একে বারে তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিল। কাল পর্য্যন্ত বরুণা অনেকদূরে ছিল বলিয়া প্রকাশ তাহার সঙ্গে বেশ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়াছে, তর্ক করিয়াছে কিন্তু আজ তাহাদের মধ্যে কোন অন্তরায় নাই বলিয়াই সে যেন সহজ ভাবে কথা বলিতেও পারিতেছে না। আসল কথা বরুণার প্রতি বিষেশভাবে আকৃষ্ট হইলেও হঠাৎ এতখানির জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। বরুণা প্রকাশের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল—সারাদিন যে একেবারে চুপ চাপ রয়েছ—ভাল লাগছে না বুঝি!

প্রকাশ বলিল—খুব ভাল লাগছে না সত্যি

কেন, ভাল লাগছেনা কেন,শুনি—বলিয়া প্রকাশের মুখের দিকে বরুণা এমনিভাবে তাকাইল যে, প্রকাশ বিহ্বল হইয়া আর একটু হইলেই তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া ফেলিত কিন্তু ঠিক এমনি সময় বয় চা লইয়া কামরায় প্রবেশ করিল। প্রকাশ আশা করিয়া ছিল চা-পর্ব্ব শেষ হইয়া গেলে বরুণা নিশ্চয়ই আবার তাহার কাছে এমনি অন্তরঙ্গের মত আসিয়া বসিবে এবং ভাবিয়াছিল এবার বরুণাকে আয়ত্ত করিতে সে একটুও সঙ্কোচ করিবে না। এবং চা পর্ব্ব শেষ হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত বরুণা এমনি হাসিখুসি মুখে প্রকাশের সঙ্গে কথা কহিলেন যে বরুণা সত্য সত্যই তাহাকে আত্মসমর্পন করিতে এতটুকুও দ্বিধা করিবে না! এ বিশ্বাস প্রকাশের আরও প্রবলতর হইল। কিন্তু একটু একটু করিয়া নিঃশব্দে বরুণা যে কখন নিজেকে আড়ালে লইয়া গেল যে, প্রকাশ বুঝিতেও পারিলনা। এটা যখন ধরা পড়িল তখন আর নূতন করিয়া কথা আরম্ভ করা যায় না। দুই মিনিটের ছোট অবসরের মধ্যে এমনিই একটা আড়াল তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। চা পর্ব্ব শেষ হইয়া গেলে বরুণা অবশ্য প্রকাশের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলনা তবুও প্রকাশের এমন সাহস হইল না যে বরুণার হাতখানিও স্পর্শ করে।

গাড়ীতে অপর তিনজন যাত্রীর ছোট সংসারটি আগের ষ্টেশনে নামিবার জন্যে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেডিংটা বাঁধা হইল প্রৌঢ়া মহিলাটি তাঁহার গায়ের কাপড়খানা ভাল করিয়া সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া লইলেন—অল্পবয়সের মেয়েটি, বোধ হয় যুবকটির স্ত্রী, ওভারকোট্‌টি গায় জড়াইয়া বোতাম আঁটিতে লাগিল, আর ছেলেটি তখন টিফিন কেরিয়ার ও অন্যান্য ছোটখাট ফট্‌কি নাট্‌কি জিনিষের তদ্বির করিতে ব্যস্ত। বরুণা বেশ প্রশান্ত দৃষ্টিতে ঐদিকে তাকাইয়া ওদের গোছগাছ দেখিতেছে, প্রকাশ ভাবিতেছে যদি পরের ষ্টেশন হইতে কোন যাত্রী এ কামরায় না উঠে তাহা হইলে নিঃসঙ্গ কামরায় বরুণাকে লইয়া ও হাঁফাইয়া উঠিবে। বাহিরের ঐ ম্লান জ্যোৎস্নার অপরূপ মায়া পাশে বরুণার মত মেয়ে সুন্দরী না হোক ওর মত রহস্যময়ী মেয়েকে লইয়া কবি চিত্ত আপনা হইতেই চঞ্চল হইয়া উঠে কবি না হইলেও সাধারণ যে কোন মনুষের পক্ষেও কম অস্বস্তিকর নয়।

পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই অপর দলটি নামিয়া গেল এবং নামিবার পূর্ব্বে সকলের পিছনে থাকিয়া বধূটি পিছন ফিরিয়া বরুণার দিকে তাকাইয়া এমন একটুখানি সাঙ্কেতিক

মধুর হাসিল যে বরুণার দৃষ্টি আপনা হইতেই গিয়া পড়িল প্রকাশের উপর। এবং মেয়েটির অভিনন্দনদৃষ্টির সামনেই প্রকাশ ও বরুণার এই ক্ষীণদৃষ্টি বিনিময়ের মধ্য দিয়া ওদের দুজনের কাছেই যে কথা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল তাহা যে প্রেমের নয় একথা বলা চলে কিন্তু বরুণাও ঠিক অমনি একটুখানি শুভ্র হাসিয়া বধূটিকে সমর্থন করিল। সে ষ্টেসন হইতে কোন যাত্রী এ কামরায় উঠিল না।

ট্রেন পরপর দুইটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া তৃতীয়টির দিকে ছুটিয়াছে—

প্রকাশ বরুণাকে ডাকিয়া বলিল—কথা বোল্‌ছ না যে—

বরুণা মৃদু হাসিয়া বলিল—ঠিক এই টুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম—ভাল, কিন্তু ও মেয়েটি নামবার সময় তোমার দিকে তাকিয়ে হাস্‌লে যে, চেনা বুঝি ?

ও বয়সের মেয়েদের চেনা শোনার দরকার হয় না, ওরা অমনি কারণ-অকারণেই হাসে—তা ছাড়া,—

থামলে যে—

সঙ্গে তুমি রয়েছ কিনা—এমন রাতে এ কামরায় কেবল তুমি আর আমি···

প্রকাশ কোন কথা না বলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার বরুণার দিকে তাকাইলে, তাহার পর মুখ ফিরাইয়া লইয়া গাড়ীর বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল। বরুণা কেবল একটুখানি হাসিয়া সরিয়া বসিল।

একটা অস্পষ্ট রহস্যের যে প্রাচীর প্রকাশ ও বরুণার মাঝে আড়াল করিয়া আছে বাহির হইতে তাহাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না কেবল যাহাদের মাঝে এই প্রাচীর তাহারা শুধু অনুভব করিতে পারে। আর এই আড়ালে তখনই অনতিক্রম্য হইয়া ওঠে যখন এক পক্ষ কেবল উঁকি দিয়া দেখিতে চায়, ধরা দিতে চায় না। তাই প্রকাশ আপনাকে লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বরুণা বলিল—মুখ ভারী কোরে বসে না থেকে, তুমি বরং একটা কবিতা আবৃত্তি করো—

ম্লান হাসিয়া প্রকাশ বলিল—অন্যের কাছে আমাদের হয়ত আজ কবিতা আবৃত্তিকরবারই রাত, কিন্তু আমি ভাবছি কতক্ষণে পাটনার মাটিতে পা দেব—

একান্ত বিস্ময়ের ভাণে বরুণা বলিল —কেন বলো দেখি!

অল্প একটু উষ্মস্বরে প্রকাশ বলিল—কেউ যখন জেনে শুনে ন্যাকা সাজে, আমার ইচ্ছা করে তাকে স্ন্যাট করি···

কথাটা অবশ্য প্রকাশ ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল।

হঠাৎ যেন বরুণার মুখ কাল বৈশাখীর আকাশের মত হইয়া উঠিল, বেশ একটু তীব্রস্বরে বলিল—কথা রাখতে হলে প্রথমে তোমাকেই আত্মহত্যা করতে হবে! তোমার চেয়ে বড়ো ন্যাকা আমি সাজিনি! সিঁথির সিঁদূর দেখেই মনে কোরলে বরুণা যেচে বউ সেজে তোমাকে দেহ দেবার জন্যে এসেছে, বরুণা যেন এতদিন তোমার জন্যেই তপস্যা করছিল।

প্রকাশের অন্তরের ডনজুয়ান যেন এ অপমানের কশাঘাতে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, এ পরাজয় কেবল তাহার পৌরুষের নয়—এর কলঙ্ককালি যেন তাহার অতীত, বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সব লেপিয়া একাকার করিয়া দিল!

ক্রমশঃ

———

বাঙ্গালার কাব্যসম্পদ

মৈমনসিংহ গীতিকা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

(শ্রীউপেন্দ্র কিশোর সামন্ত রায় সাহিত্য সরস্বতী)

ময়নামতীর গান গোরক্ষবিজয়, শূন্য পুরাণ, সূর্য্যের ছড়া, চণ্ডী ও মনসা দেবীর আদি গান ব্রতকথা রূপকথা ডাক ও খনার বচন প্রাচীন সাহিত্যের এই বিশিষ্ট রচনার সঙ্গে এই গুলির এক পংক্তিতে স্থান হইবে বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল গাথা শুধু বঙ্গরমণীর কথা নহে,আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক দিক স্পষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালীর বাহুবলের কাহিনী তাহার জয় পরাজয়ের কাহিনী তাম্রে, শিলায়, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে যেমন পরিস্ফুট রহিয়াছে কাব্যে গাথায় ও সেরূপ পরিস্ফুট দেখিতে পাই। এই প্রকারের কাব্য-সম্পদ যে শুধু মৈমনসিংহের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। বিভিন্নজেলার বিভিন্নপল্লীতে এই প্রকার কাব্যসম্পদ যথেষ্ট রহিয়াছে এখন ও সংগৃহীত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য পরিষদের ২১শ বাৎসরিক অধিবেশনের অভিভাষণে বলিয়াছেন যে এই সব কাব্যসম্পদ কেবল বাঙ্গালাদেশে নহে বাঙ্গালার বাহির হইতে ও সংগ্রহ করিতে হইবে। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র ও তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের এমন পল্লী অতি অল্পই আছে যেখানে প্রাচীন কালে দু' একজন পল্লী কবির আবির্ভাব হয়নাই। বাস্তবিকই বিভিন্ন জেলার পল্লী কবিগণের এই প্রকার কাব্যসম্পদ সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা দীনেশ বাবুর ভূমিকোল্লিখিত গ্রীয়ারসন সাহেবের সুরে সুর মিলাইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি "আপনি এই পরম উপাদেয় জিনিষগুলি শুধু পূর্ব্ববঙ্গে নহে সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে সংগ্রহ করুন। আমরা বিভিন্ন স্থানের এই প্রকার কাব্য সম্পদের দুই একটি উদাহরণ প্রদান করিবার লোভ-সংবরণ করিতে পারিলামনা। সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যের সঙ্গে ইহারা একছন্দে ও একতানে বাঁধা না হইতে পারে কিন্তু রচনা ও ভাবগত ঐক্যের অভাব হইবে না।

ময়নামতীর পুঁথিতে দেখা যায় যে, রঙ্গপুর জেলার ডিমনা থানার অন্তর্গত ধরমপুর নামক গ্রামে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেন। ইনি বঙ্গরাজ্যের রাজা মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়না-মতীর ভগিনী বনমালাকে বিবাহ করেন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন, কিন্তু ময়নামতী সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক তিস্তা নদীরতীরে ঘোরতর যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে পরাজিত করিয়া পুত্রগোবিন্দচন্দ্রকে (গোপীচন্দ্রকে) রাজা করেন। এইগোবিন্দচন্দ্র সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনা (অদৈন্যমালা) ও পদুনা (পদ্মমালা) কে বিবাহ করেন। রত্নমালা ও কাঞ্চনমালা নামে তাঁহার আর ও দুই স্ত্রী ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র সমস্ত বিলাস-সম্ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন তাঁহার স্ত্রীগণ নূতন রাজা খেতুর গৃহে গমন করিয়া নবদাম্পত্যের অভিনয় করিয়া-ছিলেন। সেকালে রাজ প্রাসাদের এইরূপ প্রথা ছিল বলিয়া ইহাতে অবশ্য সেরূপ কোন দোষের কারণ হয় নাই। কিন্তু একমাত্র অদুনা ঘৃণার সহিত এই প্রথা পদদলিত করিয়া স্বামী গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া ছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া এই করুণ গীতি রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দ চন্দ্রের বা গোপীলালের গীত পূর্ব্ববঙ্গের দ্বারে দ্বারে ধ্বনিত হইত। লক্ষ্মণদাস প্রমুখ উত্তর ভারতের কবিগণ ইহাঁদের বিরহ মিলন গাথা গাহিয়া ধন্য হইয়াছেন। ভারত বর্ষের বিভিন্নপ্রদেশে পূর্ব্বে এইসকল কাব্য কাহিনী পারসিক হিন্দী উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই গীতিকার

নায়িকা মৈমনসিংহ গীতিকার নায়িকাদের সহিত একপর্য্যায়ে বসিবার যোগ্য ।

পাঠক মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া ও সখিনাকে বঙ্গ রমনীর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন। ঘনরামের ধর্ম্ম মঙ্গলে মেদিনীপুর জেলার কংসাবতী নদীর তীরস্থ ময়নাগড় দুর্গের রাজা লাউসেনের পত্নীদ্বয়ের বীরত্ব কাহিনী পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যুদ্ধে জ্যেষ্ঠারাণী কলিঙ্গদেবী হত হন। কনিষ্ঠা রাণী কানাড়া দেবী কমনীয় কোমল শরীর বীরসাজে সজ্জিত করিয়া ও অশ্বারোহণে পুররক্ষী সৈন্য পরিচালনা করিয়া কিরূপ অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধে জয়লাভ করেন তাহা এই কাব্যে জলন্তঅক্ষরে পরিস্ফুট হইয়াছে। যাঁহারা রাজপুত রমণী মীরাবাই লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতির বীরত্বের কাহিনী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন তাঁহাদিগকে দেশের এইপ্রকার কাব্য সম্পদের মধ্য দিয়া নিজেদের ঘরের মেয়েদের শক্তি ও গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। এইসব কাহিনী জানিতাম না বলিয়া আমরা এতকাল মীরাবাঈ প্রভৃতিকে যে বীরত্বের গৌরব প্রদান করিয়া আসিয়াছি, সে গৌরব পারি নাই প্রদান করিতে আমাদের কলিঙ্গ, কানারা, ময়নামতী, মহুয়া, সখিনাকে। এতকাল সীতা সাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি এখন আমরা মলুয়া, মদিনা কমলা,অতুনা প্রভৃতিকে লইয়া তদপেক্ষা অধিক গৌরব করিতে পারিব, যেহেতু তাঁহারা ঘাঘরাপরা বিদেশিনী নহেন, শাড়ীপরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে ।

পূর্ব্ববঙ্গের মাঘমণ্ডল ব্রতকথা প্রভৃতির অন্তরালে যে ঐ তিহাসিক তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীকে সমর কুশল জাতি বলিয়া পরিচিত করে—তাহা আজিও অশ্বপৃষ্ঠে বঙ্গনারীর রণচণ্ডিকা মূর্ত্তি নয়নসমক্ষে উপস্থিত করে। বিস্তৃত বঙ্গের নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলে এখন ও এইরূপ নানা ব্রতকথা ও গাথা প্রভৃতির ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষীণ-স্মৃতি জাগ্রত দেখিতে পাওয়া যাইবে। পাঠক ময়মনসিংহ গীতিকার দেওয়ানা মদিনা, কাজলরেখা প্রভৃতির মধ্যে নৌযাত্রার পরিচয় পাইয়াছেন। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা, মনসার ভাসানে চাঁদ ও ধনপতি সদাগর দিগের কাহিনীতে নৌসাধন ও নৌযাত্রার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে ।

মৈমনসিংহ গীতিকায় গর্গের চরিত্র হইতে সমাজের যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পরিলক্ষিত হইয়াছে। তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে পাবনা জেলার বরবরিয়া গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ যে রামায়ণ রচনা করিরা ছিলেন তাহা একসময়ে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ নাকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এই রামায়ণের একস্থানে দেখিতে পাই,

বল করি জাতি যদি লঞ যবনে,
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করা এ ভক্ষণে,
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জন।
ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে।
ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে গোমাংস ভক্ষণে।

সমাজের এতখানি উদারতা হয়ত অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু তখনকার সমাজ এখনকার অনুদার সমাজের মত এতখানি নির্ম্মম কঠোর হয়ত ছিল না।

মেদিনীপুর জেলার কবিদয়ারামের (ইঙ্গিত মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) বিনন্দরাখালের পালায় দেখিতে পাই, দরিদ্র রাখাল-ও যোগ্যতার গুণে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া ছিল। এইপ্রকার কাহিনী আজ কাল উপ-কথার উপাদানে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজের আভিজাত্যগর্ব্বিত অসবর্ণবিবাহ-বিরোধী ব্যক্তিগণ এইপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া কি বলিবেন জানি না।

মাণিকচাঁদের গানে মূর্শীদাগানের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বোধহয় কান্নার সাধনা করিয়া এই গানের আবিষ্কার হইয়াছিল; তাই এর মধ্যে কান্নার ঝঙ্কার বাজে। কবে কোন্ গ্রামের মেয়ে তার বুক ফাটা কান্নায় নিশীথ রাতের বুকে বেদনার ঢেউ তুলিয়া দূরদেশে তার হারান ধনকে খুজিতেছিল। এ গান কান্নার গান এর সুর চোখের জলের বাঁধন হারা ধারায় সিক্ত। গেঁয়ো কৃষকের কাঁদন ধোয়া কণ্ঠে এর স্থিতি।

গাথা, গীতিকা প্রভৃতি, কাব্য বা সাহিত্য সম্পদের মধ্য দিয়া আমরা এইভাবে সমাজের অনেক প্রাচীন ঐতি-

হাসিক ও সামাজিক তথ্যের নিদর্শন দিতে পারি। বাহুল্য ভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে বিরত হইলাম।

এক্ষণে মৈমনসিংহের প্রাচীন খাঁটী বাঙ্গালা শব্দের সহিত সুদূর মেদিনীপুর জেলার বাঙ্গালা শব্দের প্রাচীন খাঁটি ভাবের কিরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহারদুই চারিটী উদাহরণ না দিয়া পারিলাম না। যাঁহারা মেদিনীপুর জেলার 'কাট্যা' (কাটিয়া) 'কুট্যা' (কুটিয়া) 'লুট্যা' (লুটিয়া) লওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হন, তাঁহারা মৈমনসিংহের 'বান্ধ্যা' (বাঁধিয়া), 'তুইল্যা' (তুলিয়া), 'ডাক্যা' (ডাকিয়া) দেখিয়া নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হইবেন। মৈমনসিংহের 'থাইক্যা' (থাকিয়া), কুট্যা (কুটিয়া). 'বল্যা' (বলিয়া), 'কাট্যা' (কাটিয়া), 'পাক্যা' (পাকিয়া), 'বেচ্যা' (বেচিয়া), 'পাল্যা' (পালন করিয়া) 'সঁপ্যা' (সমর্পণ করিয়া ইত্যাদি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সহিত মেদিনীপুরের খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের কোন পার্থক্যই নাই। লাছাড়ী (পদ্যাংশ ১৯৮ পৃঃ) বাউরা বা বাউলা (পাগল ২৪৭ পৃঃ), সাটিয়ারা (ষষ্ঠীদিন ২৫২ পৃঃ) ছেউরা (মাতৃহীন ৩৩৭ পৃঃ) কিরা (শপথ ৮৪ পৃঃ) শাণে (প্রস্তরে ৩০ পৃঃ) সল্লা (পরামর্শ ২৫পৃঃ) রোসনই (আলো ১২২ পৃঃ) কাছলা (গামছা ১২৩ পৃঃ) আটকুঁড়ি (হীন, অপুত্রক ১৩০ পৃঃ) খোন্দল (কোণ বা গর্ত্ত ১৩০ পৃঃ) বাথান (গোচারণ মাঠ ১৩৯ পৃঃ) কাঁকই (চিরুণী ১৪৬ পৃঃ) প্রভৃতি শব্দের মধ্যে সুদূর মেদিনীপুর ও মৈমনসিংহ জেলার কোন প্রকার ভাব বা অর্থের অসামঞ্জস্য নাই।

'যখন নাকি বাইস্তার ছেরি (মেয়ে) বাঁশো মাইলো লাড়া

মৈমনসিংহ গীতিকা ৭২১ পৃঃ—

"হাত পাখলিতে গেছে ছিরে (মেয়ে) চণ্ডালিনী"

লক্ষ্মীচরিত্র—দয়ারাম দাস

"অর্দ্ধেক শুনাইল কথা সেদিন বিয়ানে" (প্রভাতে)

মৈ—গী—১৬ পৃঃ—

"বিয়ানে (সকালে) বুনিয়া ধান্য দিবে তুমি কাল।"

বিনন্দ রাখালের পালা, দয়ারাম দাস।

এইরূপ শব্দের সাদৃশ্য অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কখনও বিভিন্ন জেলার পল্লীগাথা ইত্যাদি সংগৃহীত হয় তাহাহইলে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইবে এবং খাঁটি বাঙ্গালা যে প্রাকৃতের কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দূরবর্ত্তী তাহা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তৎসঙ্গে অভিধানের সাহায্যে প্রাকৃত শব্দ সংশোধনপূর্ব্বক সেই সংশোধিত ভাষাটাকেই বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হইবে না।

এক্ষণে ভাবের মধ্যে কিরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহারও এক আধটি দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু মৈমনসিংহের 'পীড়িতে' বসিয়া আরাম অনুভব করিয়াছেন এবং শলিধানের চিড়া, সবরীকলা ও গামছাবাঁধা দৈ এর স্বাদ গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, আমরা মেদিনীপুর হইতেও কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলাম। তাঁহার ন্যায় রসিকের নিকট সমাদর পাইবে আশাকরা যায়।

"তোমার লাইগ্যা ছিকায় তোলা গামছা বান্দা দৈ"

মৈঃ—গীঃ—কঙ্ক ও লীলা ২৫৯পৃঃ—

"আমার বাড়ীতে যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা।
জলপান করিতে দিয়াম সালিধানের চিরা।
সালিধানের চিরা দিয়াম আরও সবরী কলা।
ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু খাইবি তিন বেলা।

মৈঃ গীঃ মহুয়া ৩৪ পৃঃ—

ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বান্ধা-দৈ।
শাইল ধানের চিরা কত যতন করিয়া
হাঁড়িতে ভরিয়া রাখে ছিকাতে তুলিয়া।

মৈঃ গীঃ—দেওয়ানা মদিনা ৩৫৯পৃঃ

সয়া এলে সয়ের বাড়ী বসতে দিব পিড়া।
জলপান খেতে দিব সরুধানের চিড়া।
সরু ধানের চিড়া নয়রে বিন্নিধানের ই
ঘরে আছে সবরী কলা গামছাবাঁধা দই।

সয়লার গান (সংগৃহীত)।

বিভিন্ন জেলার গাথা ও গীতিকার মধ্যে এইপ্রকার ভাবের সামঞ্জস্যের অভাব নাই। আমরা ক্ষীণ আশার চক্ষে চাহিয়া আছি এমন এক শুভদিন আমাদের মধ্যে আসিবে যেদিন এইসব গানের নেশা সবার প্রাণে পৌঁছিবে এবং তৎসঙ্গে খাঁটি বাঙ্গালার ভাবের ভাষার কাব্য-সম্পদ দেখিয়া জগৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে এবং বাঙ্গালা ধন্য হইবে, বাঙ্গালী ধন্য হইবে।

—*—

খ'য়ে বন্ধন

(গল্প)

শ্রীঅতনু গুপ্ত

বাইশ বছর তারাদাস মিলার কোম্পানীর আপিসে ঢুকেছিলো। সে কি আজকের কথা? সে দিনের সকল কথা মনে কর্ত্তে হ'লে চোখ দুটি বুঁজে মনের তলায় ডুব দিতে হয়। সে যেন আর এক জগতের কথা। আজ না আছে সে ঘোড়ার ট্রাম, গ্যাসের আলো, না আছে ভিস্তির পিঠে সেই অতিকায় মশক। তার ওই আপিসটারই কি কম পরিবর্ত্তন হ'য়েছে? মাথার ওপর ঝুলতো একটা নড়বড়ে টানাপাখা, পাঁচ মিনিট অন্তর বুড়ো পাখাওয়ালাটা ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়তো, আর আপিসময় বাবুর দল তাকে ডাক হাঁকে সজাগ কর্ব্বার চেষ্টায় গলদঘর্ম্ম হ'য়ে উঠতেন; আজ আর সে সব ঝন্‌ঝাটের বালাই নেই। সুইচ্ টিপ্‌লেই বিজলী পাখার অক্লান্ত সেবা। কিন্তু এর চেয়ে আরো বেশী পরিবর্ত্তন হয়েছিলো তারাদাসের দেহে আর মনে। ভামিনীর যত্ন আত্তির বিরাম নাই, আপিস যাবার আগে আল্‌নার ওপর একখানি করে কোঁচানো ধুতি এখনও তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে, জুতো জোড়াটাও দিব্যি বার্ণিশকরা। কিন্তু এত গেরো দিলে আর হবে কি? আয়নার সাম্‌নে দাঁড়ালে তারাদাসের অন্তরপুরুষ বেশ একটু শুকিয়ে উঠতো।

অনেক কিছু বদ্‌লেছে, শুধু যে ব্যাপারটি আজ তিরিশ বছর ধ'রে দিনের পর দিন ঘড়ি ধরে ঘটে চলেছে সেটি হচ্চে আপিস আর বাড়ীর মধ্যে তাঁতের মাকুর মত আনাগোনা, দাঁত নড়েছে ও পড়েছে, চুল ফিঁকে থেকে সাদায় পৌছেচে, ঋজু দেহ সাম্‌নে কিছু নুয়ে পড়েছে কিন্তু দশটা পাঁচটার বিরাম নেই।

এমনি করে যখন তারাদাস খেয়া নৌকার পাটনির মত এপার ওপার করে শেষ পাড়ি জমাবার প্রতীক্ষায় বসে আছে, তখন এলো এক আকস্মিক মুক্তি। ভামিনীকে লুকিয়ে আপিসের ছোট সাহেবের পীড়াপীড়িতে দুটি টাকা দিয়ে কিনেছিলো এক ডার্ব্বির টিকিট। অন্ততঃ দু'দিন ধরে এই দুটো টাকার খোঁচা তার বুকে খচ্ খচ্ করে বিঁধেছিলো।

সে আজ তিনমাস হ'য়ে গেলো, টিকিটের কথা ত মনেই নেই, ভামিনীকে লুকোবার জন্যে মনে মনে যে আত্মতিরস্কারের কালো মেঘটুকু জমে উঠেছিলো, আস্তে আস্তে সে টুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে।

সেদিন শনিবার। সকাল থেকে টিপ্‌টিপে বৃষ্টি। ক্রমে যত আপিসের বেলা হ'তে লাগলো বৃষ্টিও তত বাড়তে লাগ্‌লো। ঠনঠনের মোড়ে বেশী জল জমে উঠেছে। তারাদাস আজ তেমনি কোঁচানো ধুতির ওপর চুনোট করা পাঞ্জাবী আর উড়্‌নি চাপিয়ে বাসে চেপে আপিসে চলেছে। বৃষ্টির জন্য দেরী হ'য়ে গেছে, পোড়া আপিসেও তেমনি কাজের চাপ বেড়েছে। শনিবার হ'লে কি হবে, আজ আবার মাসকাবারী—আজ বাড়ী ফিরতে সেই ছ'টা। ক' দিন থেকে ভামিনী বায়না ধরেছে 'কপালকুণ্ডলা' দেখ্‌বে', তারাদাসের নিজেরও কি সাধ ইচ্ছে নেই! ভাবতে ভাবতে ক্লান্তি ও বিরক্তিতে তার মন ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো।

প্রায় ১৫ মিনিট দেরীতে তারাদাস পৌঁছলো। ঢুকতেই ছোট সাহেবের ঘর থেকে তারাদাসের জরুরি তলব এলো। ব্যাপার কি?

দেরীতে আসার জন্য তারাদাসের মনটা তেমন প্রসন্ন ছিলো না, তার ওপর আপিসে পা বাড়াতে না বাড়াতে সাহেবের ডাক! মনটা কেমন বিমুখ হ'য়ে উঠ্‌লো, কিন্তু সাহেবের নামের এমনি গুণ যে পা দু'টো বেশ ত্রস্ত ব্যস্তে সাহেবের কামরার দিকে এগিয়ে চল্‌লো, কোনো বিদ্রোহের লক্ষণই দেখা গেলোনা তাদের।

পাঁচ মিনিট পরে তারাদাস যখন সাহেবের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো তখন ত সবাই অবাক। তারাদাসের

কাঁধ চাপড়াতে চাপড়াতে সঙ্গে সঙ্গে বের হ'য়ে এলেন ছোট এবং বড় দুই সাহেব। আফিস শুদ্ধ লোক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। সাহেবেরা কি দিন দুপুরে মাতলামি জুড়ে দিলে নাকি? বেচারী তারাদাসের কি ঘাম দিচ্ছে, দু' পাশে দুই সাহেব, তায় আবার পিঠ চাপড়াচাপড়ির ধুম, সে কাঁদবে কি হাসবে ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছে না।

বড় সাহেবের মুখে আপিসের বাবুরা যে খবর শুনলে তার সারমর্ম্ম এই যে ডার্বির টিকিটে তারাদাস কমসে কম পঞ্চাশ হাজার টাকা জিতেছে সেই খবর এইমাত্র টেলিগ্রাম যোগে ছোট সাহেবের কাছে এসেছে।

সে দিনকার মত তারাদাসের ছুটী মঞ্জুর করে' সাহেবরা স্ব স্ব কামরায় ঢুকতে না ঢুকতেই তারাদাসের চারপাশে ভিড় জমে গ্যালো। আপিসের একটি ফাজিল ছোকরা এসে তারাদাসের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে বল্লে, "কই না ত, 'তার মানে?' ব'লে তারাদাস তার পানে চাইলে ছেলেটি উত্তর দিলে "শুনেছিলুম যে হঠাৎ টাকাকড়ি পেলে নাকি পেট ফুলে ওঠে, আর দম ফেটে মানুষ মরে যায়।" "ওরে বাপ্‌রে ফুলবার যো কি? দু'পাশে দুই যম, তার ওপর আবার মিষ্টি হাতের আদর!"—বলে তারাদাস মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগলো।

যাক, তার না হয় সাহেবদের কল্যাণে মাথা ও পেট ঠিক আছে, কিন্তু ভামিনীর দশা কি হবে? চিন্তিত মনে তারাদাস বাড়ীর দিকে পা বাড়ালে। ইচ্ছে করেই সে ট্যাক্‌সি নিলে না বা বাসে চড়্‌লো না। দুপুর রোদে হেঁটে হেঁটেই সে বাড়ী চল্‌লো। বৃষ্টি তখন থেমেছে। আফিস থেকে বেরুবার আগে কি ভেবে তারাদাস আফিসের দারোয়ানদের কাছ থেকে একখানা কম্বল চেয়ে নিয়েছিলো। হেঁটে হেঁটে তার ভিতরের উত্তেজনা বেশ খানিকটে জুড়িয়ে এসেছে। বাড়ীর কাছে এসে কম্বলখানি খুলে বেশ করে' গায়ে জড়িয়ে নিলে।

খাওয়া দাওয়া সেরে ভামিনী সবে একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলো এমন সময়ে সদর দরজায় জোরে কড়া নড়ে উঠ্‌লো। দরজা খুলতেই এই ভরা দুপুরে আপাদ মস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে তারাদাসকে অসময়ে বাড়ী ফিরতে দেখে উদ্বেগে তার মুখখানি শুকিয়ে গেলো। "বড্ড জর এলো গো" বলে কাঁপুনির ভঙ্গীতে তারাদাস যেয়ে সোজা খাটের ওপর সটান শুয়ে পড়লো। ত্রস্তে ব্যস্তে ভামিনী তারাদাসের মাথার কাছে যেয়ে বস্‌লো, বল্লে—"এই ভালো মানুষ নেয়ে খেয়ে আপিস গেলে, এর মধ্যেই জর করে বস্‌লে! কই দেখি" বলে সে তারাদাসের মাথায় ও গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌তে লাগলো। ততক্ষণে তারাদাস পাশ ফিরে ফুলে ফুলে নিঃশব্দে হাসছে, কাঁহাতক আর অভিনয় করা যায়! তার রকম সকম দেখে বিনোদিনী, কিন্তু আরো ঘাব্‌ড়ে গেলো, জরের সঙ্গে আবার বিকারও যোগ দিলে নাকি!

কম্বল ছুড়ে ফেলে তারাদাস তখন দিব্যি উঠে বস্‌লে ও আস্তে আস্তে ব্যাপারখানা সব ভেঙ্গে বল্লে। হঠাৎ সুসংবাদ শুনে পাছে বিনোদিনীর মাথা বিগড়ে যায় তাই তাকে একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিলো।

২

আঃ বাঁচা গেছে: একেবারে একটানা মুক্তি! আর টানা পোড়েন না! নাকে মুখে গুঁজে সেই দশটা বাজতে না বাজ্‌তে আপিসে ছোটা, ছোট বড় মাঝারী সাহেব ও উপরআলার মুখখিচুনী, সাতঘণ্টা কলম পেশা ও তার পর ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ী ফেরা—আজ থেকে এ সবে একদম ইস্তফা। অখণ্ড অবসর ও নিশ্চিন্ত সচ্ছলতার ছবি এঁকে দম্পতীর দিন কাটতে লাগলো। চন্দননগরে গঙ্গার একেবারে গায়ে বাগানবাড়ী কেনা হ'য়েছে। সেখানকার ঘরকন্নার আয়োজনে ভামিনীর আর মরবার ফুরসুৎ নেই। তারাদাসকে সে ঢালা হুকুম দিয়ে দিয়েছে যেখানে ইচ্ছে সে বেড়াতে যেতে পারে। তাগিদ দিয়ে দিয়ে সে তারাদাসকে আজ চিড়িয়াখানা, কাল যাদুঘর, পরশু শিবপুরের কোম্পানীর বাগানে পাঠিয়ে দেয়, সঙ্গে দেয় ছোট একটি হাতব্যাগে করে খাবার আর পানের ডিবে।

এক একদিন ভামিনীও সঙ্গে যায়। কয়েকদিন বেশ কাটলো, কিন্তু ভামিনীর কড়া চোখে কিছু এড়াবার যে

নেই। সে দেখলো তারাদাসের উৎসাহ যেন ক্রমে নিভে আসছে। বেড়াতে যাবার নাম হ'লে তার যেন গায়ে জ্বর আসে। মেজাজ প্রায়ই বিগড়ে থাকে, ভালো কথা বললেও অকারণে বিরক্তি প্রকাশ করে। রাত দিন মুখখানি চুণ করে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ায়। বাহিরে পা বাড়াবার নামটি নেই। সে ভালো করে খায় না, হেসে কথা কয় না। ভামিনীর মনটা কেমন ভারী হয়ে উঠলো। চন্দননগরে সংসার পাতবার জন্ত যে ক্ষিপ্র আয়োজন চলছিলো তাতেও যেন ভাঁটা পড়ে এলো।

ঘড়ির কাঁটা যত এগুতে থাকে তারাদাসের চাঞ্চল্যও তত বেড়ে ওঠে। হঠাৎ একদিন তারাদাস সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলো, বিকেলে যখন সে বাড়ী ফিরলে তখন তার মুখে চোখে বেশ একটা খুসীর দীপ্তি উপ্‌চে পড়ছে দেখে ভামিনীর মনের মেঘ একটু কেটে গেলো, সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে। সেই থেকে তারাদাস রোজ সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে যায় আর ছটা নাগাৎ ফেরে, কিন্তু কোথায় যায় কি করে কিছুই বলে না। ভামিনীও কিছু অনুমান কর্ত্তে পারে না। নাই পারুক, তারাদাস যে আর মুখ গোমড়া করে থাকে না, বেশ খায় দায় হেসে কথা কয় এইটুকুই তারপক্ষে যথেষ্ট। এমন সময়ে এক অবাক কাণ্ড! দিন পনেরো পরে একদিন দুপুরে ভামিনী একটু গড়িয়ে নিচ্ছে, বেলা প্রায় দুটো হবে। এমন সময়ে জোরে কড়া নড়ে উঠলো, দরজা খুলতেই অপূর্ব্ব দৃশ্য—মুখ কাচুমাচু করে তারাদাস দাঁড়িয়ে আর তার হাত ধরে মূর্ত্তিমান যমের মতো এক লালপাগড়ী। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই।—তিরিশ বছরের অভ্যাস তারাদাসকে ভূতের মত পেয়ে বসেছিল। সে দুটো নাকে মুখে গুঁজে সেই পোড়া আফিসেরই আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়! লজ্জায় সেখানে ঢুকতে আর পারে না। আনাচে কানাচে ঘুরে পাঁচটা বাজ্‌লে বাড়ী ফেরে। এমনি করেই সে তিরিশ বছরের খ'য়ে বন্ধনের জের টেনে যায়। এখন আপিসের কাছেই ছিলো একটা গাছের তলায় একটা চিঠির বাক্স। বিটের সাবেক পাহারাওয়ালা সংপ্রতি বদলী হ'য়ে গেছে, নতুন পাহারাওয়ালা তারাদাসকে চেনে না। কয়দিন ধরে সে লক্ষ্য করে যে তারাদাস সেই গাছতলার কাছে ঘুরে বেড়ায়! সহরে তখন দিন গেলে দু'পাঁচটা চিঠির বাক্‌সে কারা সব আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, আর যায় কোথা! আজ পাহারাওয়ালা সাহেব তারাদাসকে পাকড়াও করে বসেছে। সে আর কোন্ মুখে বলে যে মুদ্রাদোষের বশেই আজ তার এমন বিপত্তি! আপিসে গেলে হয়ত সব গোল চুকে যেতো, কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে তারাদাস আপিসের পরিচয় চেপে গেলো। অনেক কাকুতি মিনতিতেও যখন পাহারাওয়ালা সাহেবের মন ভিজলো না, তখন অগত্যা তারাদাসকে সেপাইজীর সঙ্গে বাড়ী আস্‌তে হ'ল, ভামিনী সনাক্ত কর্ত্তে তবে সে মুক্তি পেলো!

ভামিনী মুখ টিপে হেসে বল্লে "খ'য়ে বন্ধন আর কাকে বলে!"

কৈফিয়ৎ

যাঁহাদের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি পাইয়া আমরা এই মাসে আচার্য্য সংখ্যা বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাঁহাদের প্রবন্ধাদি পাইতে বিলম্ব হওয়ায় বাধ্য হইয়াই আমরা তাহাতে নিরস্ত রহিলাম। তবে আশা করি আগামী শ্রাবণ মাসে আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারিব।

বিনীত
সম্পাদক

সঙ্গীতোৎসব

শ্রীইন্দ্রভূষণ সেন

অপূর্ব্ব সঙ্গীত মূর্চ্ছনায়
স্বপ্নাবৃত ছায়াপথে চিত্ত মোর ধীরে চলে যায় ;
অতুল আনন্দলোকে রহস্যের পারাবারে
নব নব সৃষ্টির উন্মেষে
উন্মুক্ত উদার সুরে ছুটিয়াছে লক্ষ্যহারা
সে বিহ্বল দৃষ্টির আবেশে ;
মায়াময় সংসারের সে ক্রন্দন আজিকে নিষ্ফল
নির্ব্বাকের অন্তঃপুরে ঘুরে মরে কাতর বিহ্বল ;
আজি মনে হয় মোর, সেই অলৌকিক মুগ্ধ মন্ত্র
মধুর মঙ্গল সুর ঝঙ্কারিয়া ওঠে দেহ-যন্ত্রে।

(২)

উর্ব্বশীর কলকণ্ঠ হ'তে
নন্দনের পথ বহি' সে যে আসে যেন মর্ত্ত্যপথে
পূত মন্দাকিনী ধারা ; সেই মহাতীর্থ মাঝে
চিত্ত যেন ধীরে নেমে যায় ;
অতল গভীর সে যে,—অন্তহীন পারাবার,
যত যায় সীমা নাহি তায় ;
আনন্দের রসাবেশে উদ্ভ্রান্ত চপল চিত্ত মোর
রহে তবু নির্ব্বিকার ; কী এক সুন্দর বাহুডোর
অনন্ত মুক্তির পথে ধীরে যেন টেনে নিয়ে চলে ;
আমারে ঘিরিয়া তাই উৎসবের তরঙ্গ উছলে।

পুনশ্চ —

'ইঙ্গিতের অভিনব প্রস্তাব' সম্বন্ধে চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

জীবনবীমা ও বাঙ্গালার কর্ত্তব্য

শ্রীশরৎ ঘোষ

বাঙ্গালী সাহিত্যে বড়, বিজ্ঞানে বড়, দেশপ্রেমে বড় কিন্তু ব্যবসা ও বাণিজ্যে অন্য দেশের তুলনায় তার কৃতিত্ব অতি তুচ্ছ। ফলে বাংলা শস্যসম্পদে অতুলনীয়া হইলেও তাহার ধনশক্তি অন্য প্রদেশের উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের করতল গত। আমদানি রপ্তানি পাট ও চা কয়লা ও যানবাহন ইহাদের কোনটিতেই বাঙ্গালীর আজ আধিপত্য নাই। চাকরী নিশ্চিন্ততার কি মোহ যে বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিয়াছে যে আজ তাহার ফলে বাঙ্গলার সম্পদ লুণ্ঠিত হইতে দেখিলেও, বাংলার বুকে অবাঙ্গালীর প্রাসাদ কারখানা নিত্য জুড়িয়া বসিয়াছে দেখিলেও তাহার মনে অনুশোচনা জাগে না! একথা তাহার মনে হয় না যে, দাসত্বে তার সুখ নেই দারিদ্র্য কখনও সত্যিকার নিশ্চিন্ততা হইতে পারে না; পরানুগ্রহ জীবীরা একান্তই অমানুষ। দেশকে বড় করিতে হইলে চাই জ্ঞান ও ত্যাগ, বীর্য্য ও শৌর্য্য, সঙ্গগঠন শক্তি ও অর্থ! বিদ্যার অনুশীলন ও পরার্থে আত্মত্যাগে, আদর্শের জন্যে কষ্ট সহিষ্ণুতায় এবং নিশ্চিত মৃত্যুর সন্মুখে নির্ভীকতায় ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর স্থান আজ অনেক উচ্চে। ইহাদের পিছনে সঙ্ঘশক্তির এবং অর্থের সচ্ছলতা নাই বলিয়া এদেশের উন্নতি যত দ্রুত হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতেছে না; সঙ্ঘবদ্ধতা এবং অর্থশক্তি একটা অনুষ্ঠানকে কতদূর সফল করিয়া তুলিতে পারে গত মুক্তি আন্দোলনে বোম্বাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছে। যে ত্যাগ শক্তি একমাত্র বোম্বাই সহরে আবির্ভূত হইয়া সেখানকার ব্যবসায়ীদের সহায়তায় ঐ রকম অঘটন ঘটন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল, সেই ত্যাগশক্তি বংলার প্রতি জেলায় তদপেক্ষা বেশি পরিমাণ থাকিয়াও শুধু সঙ্ঘশক্তি ও অর্থের অসচ্ছলতার জন্য আশানুরূপ সফলতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি একটু আশার লক্ষণ দেখা দিয়াছে যে, দেশের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ে বাঙ্গালী আজ যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাপড়ের কল, নিত্য নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ, ঔষধ ও প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুত করা প্রভৃতি কাজে বাঙ্গালীরা আজ অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে। জীবন বীমার ক্ষেত্রেও এদেশের লোকের কিছু তৎপরতা দেখা যাইতেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে যে কয়েকটি বীমা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতন নহে। এ কথা ভুলিলে চলিবেনা যে, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাঙ্কিং এর নীচেই এই জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের স্থান। আমেরিকা আজ যে শিল্পে ও বাণিজ্যে এত বড় হইতেছে তাহার মূলে, এই জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান সংগঠনে তাহাদের অসাধারণ সাফল্য।

জীবনবীমা প্রণালী এমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে অসাধুতা ও অবিবেচনা না থাকিলে ইহার কোম্পানী কখনই নষ্ট হইতে পারে না। শুধু যে নষ্ট হইতে পারে না এমন নয়, অতি শীঘ্রই ইহার ভাণ্ডারে এত অর্থ সঞ্চিত হয়, যে কোম্পানীগুলি জীবনবীমাকারীদের দাবী মিটাইয়াও অনায়াসে দেশের শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। বস্তুত যে সব বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি সফল হইয়াছে তাহাদের সন্মুখে সমস্যাই এই যে কি করিয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থ তাহারা নিয়োগ করিবে। এই হিসাবে যে দেশে একটি সফল বীমাপ্রতিষ্ঠান থাকে, সে দেশে নূতন নূতন শিল্পের আবির্ভাব ও পরিপুষ্টি অনিবার্য্য। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে দেশ বাসীর কি কর্ত্তব্য তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। আমরা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার সমর্থন করি না। কিন্তু যেখানে এই প্রদেশের শিল্পগুলি অর্থাভাবে নির্জ্জীব সেখানে যদি বাঙ্গালীরা অবিবেচকের মত অপর প্রদেশের অথবা বিদেশের বীমাকোম্পানীতে তাহাদের জীবনবীমা করিয়া নিত্য রাশি রাশি টাকা বাংলা হইতে বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে

আমরা কিছুতেই ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি না। জীবনবীমা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত এই যে, যে বীমা প্রতিষ্ঠান এদেশীয় তাহাতেই যেন তাঁহারা জীবন বীমা করেন। বিশেষতঃ যে সব বীমাকোম্পানী অন্য দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করিতেছে তাহারা যেন অন্য বীমা কোম্পানী অপেক্ষা বাঙ্গালীর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার অধিকারী হইতে পারে।

এ সম্পর্কে আমরা আমাদের সব প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্ণ-ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পনীর কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কোম্পানী শুধু বাঙ্গালী দ্বারা প্রবর্ত্তিত এবং বাঙ্গালীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট তা নয়, পরন্তু ইহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বাংলার প্রধান শিল্পগুলিকে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যে ইহার পরিচালকেরা বাংলার বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্ম্মাতা ইণ্ডিয়ান্ কিনেমা আর্টস লিমিটেড পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দেশীয় শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের স্থান যে কত উচ্চে তাহা আমেরিকার কথা মনে করিলে অনায়াসেই বুঝা যায়। আমেরিকার সহস্র সহস্র নরনারী চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস্ চলচ্চিত্র নির্ম্মাণে কতদুর কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহার পরিচয় 'কণ্ঠহার' 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'ভাগ্যলক্ষ্মীতে পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা দেশীয় শিল্পের মঙ্গল কামনা করেন তাঁহাদের কাছে আমরা এ দাবী অনায়াসেই করিতে পারি যে জীবনবীমা করিবার সময় তাঁহারা যেন ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যাল প্রভৃতি কোম্পানীর কথা স্মরণ রাখেন। তাঁহারা যেন ভুলেন না যে ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল প্রভৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা হইবে।

বাতায়ন

"আপনি কৃপাণ ধর গো"

আইন অমান্য আন্দোলন প্রসঙ্গে বাংলার কুলবধূরা যে শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছেন রাজনীতির দিক দিয়া আমরা আজ তাহার লাভক্ষতির পরিমাপ করিতে চাহিনা। কিন্তু এই ব্যাপার হইতে আমরা নিঃসংশয়ে এই সত্য সংগ্রহ করিলাম যে প্রয়োজন হইলে বাংলার চির অবহেলিত নারীসমাজ এক দিনেই অবরোধ ও অক্ষমতার সকল গ্লানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সংস্কারমুক্তা কল্যাণীরূপে সার্থক হইয়া উঠিতে পারেন। এই জাগরণের জন্য স্কুল কলেজের শিক্ষা, এমন কি অক্ষরজ্ঞান পর্য্যন্ত যে অত্যাবশ্যক নয় সে প্রমাণ আজ বাংলার অনেক পল্লীগ্রামে পাওয়া গেল।

কিন্তু এই জাগৃতির পাশাপাশি রহিয়াছে এক অতি লজ্জার কথা। কতকগুলি মাংসলোলুপ নরপশুর হস্তে দিনের পর দিন নারীর যে লাঞ্ছনা ও ধর্ষণ চলিয়াছে তাহাতে নির্ব্বীর্য্য পুরুষ সমাজের লজ্জা রাখিবার ঠাঁই নাই। ধর্ষণকারী হিন্দু কি অহিন্দু সে তর্ক থাক, তবে তাহারা পুরুষ এবং আফশোষের বড় কথা এই যে তাহারা স্ত্রী কন্যা ভগিনী জননী লইয়া বসতি করে। নারীরক্ষার জন্য কোথাও কোথাও যুবকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছেন শুনিয়াছি, কিন্তু আমাদের মনে হয় এ রোগের এ ঔষধ নহে। অন্তঃপুরের কারান্ধকারে পুরুষের আওতায় থাকিয়া থাকিয়াই আজ নারী পুরুষের প্রতি একান্ত নির্ভরশীলা। তাই তাহার এত দুর্গতি। আপনার মান আপনি রাখিতে না পারিলে তাহার আর কল্যাণ নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় বাংলার নারীশক্তির বোধন হইয়া গিয়াছে—নারী এবার স্বয়ং কৃপাণ ধরিয়া আপনার মান রাখিতে পারিবে এমন আশা হয়।

আচার্য্য জয়ন্তী

দৈনন্দিন আরাম বিরামের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যাহাদের তিন শত পঁয়ষট্টি দিন কাটে, মহাপুরুষদের ত্যাগপূত চরিত-কথা আলোচনায় তাহাদের মনের গ্রন্থি কথঞ্চিৎ শিথিল হইতে পারে। যুগে যুগে তাই বড়োর পূজা বা বীরপূজা। এ পূজা স্বাজাত্য বা স্বাদেশিকতার অপেক্ষা রাখেনা, তাই আজ সুদূর বাংলার পূজামণ্ডপে আসন পড়িয়াছে জর্জ্জ ওয়াসিংটন ও গ্যয়টের। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন এক অপূর্ব্ব যজ্ঞবিশেষ। জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের ত্রিধারা মিশাইয়া যে অনির্ব্বাণ শিখা তিনি অন্ধকার দেশের বুকে জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন তাহার আলো বহুবৎসর ধরিয়া দিশাহারা দেশবাসীকে পথ দেখাইবে। অনেকে বলেন যে জনসেবায় তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার যে অপচয় হইল দেশের ও জগতের পক্ষে সে এক বিষম ক্ষতি। আমরা বলি যে মুক্তিমন্ত্র তিনি বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কানে দিতেছেন সেই ত শ্রেষ্ঠ রসায়ন যাহার গুণে মাটি সোনা হয়, মৃতদেহে জীবনের স্পন্দন জাগে।

অস্বাস্থ্য

শিক্ষায়তনে বালক বালিকা ও যুবক যুবতী অবাধ মেলামেশার প্রথার প্রচলন এদেশে বেশী হয় নাই এখনও। কিন্তু এরই মধ্যে দু'একটি অধ্যাপক বন্ধুর মারফৎ যে সকল কথা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে তাহাতে মনে হয় অন্ততঃ কতকগুলি ছাত্রের মনে এখনো সুস্থতার অভাব আছে। অধুনিকতার পুরোধা হইয়াও বন্ধুগণ এরই মধ্যে একত্র শিক্ষার সমীচীনতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এ আতিশয্য প্রকৃতির প্রতিশোধ বই আর কিছু নহে। অভ্যাস ও সময়ের গুণে ছাত্র ছাত্রিদের সম্বন্ধ স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর হইয়া উঠিবেই।

পুনরপি

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আততায়ীর হস্তে নৃশংস-ভাবে নিহত হইয়াছেন। গত বৎসর প্রায় এমনই সময়ে এই সহরে অনুরূপ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। রক্তের পিচ্ছল পথে দেশের মুক্তিরথকে আগাইয়া আনিবার কল্পনা যাঁহারা করেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে আর যাহাই থাকুক সত্য ও শিবের স্থান নাই। এ পথ ভারতের নহে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মৃতের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই এবং প্রার্থনা করি,—দূর হউক সকল বিদ্বেষের গ্লানি, জয় হউক প্রেমের!

রবীন্দ্র পরিক্রমা—পারস্য পরিভ্রমণ শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইরাকে পৌছিয়াছেন। কবির ৭১ তম জন্মতিথিতে তেহরাণ নগরে যে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরব ও আনন্দের কথা নহে। প্রাচীনকালে এশিয়াব্যাপী যে কৃষ্টি ও দৃষ্টির সামঞ্জস্য ছিল, কালক্রমে তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিলেও লোক-লোচনের অন্তরালে তাহা ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হইত। আজ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া সেই মিলনের স্বর্ণসূত্র দৃঢ় হইতে চলিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে চীন, জাপান ও যবদ্বীপে রবীন্দ্র প্রতিভার আলোকপাত হইয়াছে। পারস্য ও ইরাক পরিক্রমা শুধু কবির বৈচিত্র্যময় জীবনের একটি ঘটনা নহে, এশিয়ার ইতিহাসে ইহা একটি নূতন অধ্যায়।

৺বিপিনচন্দ্র—চুয়াত্তর বৎসর বয়সে মহামনীষী বিপিনচন্দ্র সন্ন্যাস রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কি মনীষায়, কি বাগ্মিতায় বিপিনচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট আসন ছিল। এক সময়ে বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালা দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে অন্যতম পুরোধা ছিলেন। অনেক দেশ-সেবক সেদিন বিপিনচন্দ্রের কাছে তাঁহাদের প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া ছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বে তথা বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাঁহার দান তুচ্ছ করিবার নহে। কয়েকবৎসর হইতে তাঁহার রাজনৈতিক মতামত একটু ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বিচার করিবার সময় আজ নহে, শ্রদ্ধানত-চিত্তে আমরা আজ তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি।

প্রকৃতির প্রহার—প্রকৃতির ভয়াল রাক্ষসী মূর্ত্তির সম্মুখে মানুষ যে তৃণের মত অসহায় দেশের দিকে দিকে সেই নিষ্ঠুর সত্যের সাক্ষাৎ মিলিতেছে। খুলনা ও ময়মনসিংহে যে ধ্বংসলীলার অভিনয় হইয়া গিয়াছে

তাহাতে আমরা ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়াছি। অর্দ্ধাশনজীর্ণ, কৌপীন-সম্বল কুটীরবাসী কৃষকদের পক্ষে প্রকৃতির এ প্রহার যে কত নির্ম্মম তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। খুলনা জেলা বোর্ডের তরফ হইতে এরই মধ্যে যে সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। শুধু এই ব্যাপারে নহে, অন্যান্য অনেক বিষয়ে এই জেলাবোর্ডের কার্য্যকলাপ প্রশংসার্হ ও অনুকরণযোগ্য। বোর্ডের সভাপতি রায়বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় গত কয়েকবৎসর ধরিয়া যেরূপ যোগ্যতা ও সহৃদয়তার সহিত দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন তাহা শুনিলে পুলকিত হইতে হয়। সেবাব্রত আচার্য্য রায়ের স্বদেশে তাঁহারই পুণ্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে ?

বোম্বাই যুদ্ধ—মহরম উপলক্ষ্যে বোম্বাই নগরে রক্তস্রোত বহিয়াছে। মৌলানা সৌকত আলীর দূরদৃষ্টির তারিফ করিতে হইবে। তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের নামে যে মৃত্যু-লীলার অভিনয় হইল ইহা ভারতবর্ষের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিদ্বেষের বিষ মন্থন করিয়া জাতির ভাগ্যবিধাতা কোন অমৃত সঞ্চয় করিতেছেন তাহা কে বলিবে ?

দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে এর চাইতে আমরা নাস্তিক নিরীশ্বর হইলাম না কেন ?

পুস্তকপরিচয়

পাঁচমিশেলী—শ্রীঅবনীনাথ রায় প্রণীত। ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বইখানি দশটি প্রবন্ধের সমষ্টি, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে নিয়েই সাতটি লেখা হয়েছে, বাদ বাকী তিনটিতে লেখক বিষয়ান্তরের অবতারণা করেছেন। এমনি একটা শ্রেণী বিভাগ করলে বইখানির পাঁচমিশেলী নাম সার্থক হ'য়েছে বলা যায়। গোড়ায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা। চৌধুরী মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে সমালোচনা সাহিত্যে বঙ্গবাণীর পুঁজি এখনও অকিঞ্চিৎকর। অবনী বাবুর প্রবন্ধগুলি যে অভাব কিয়ৎ পরিমাণেও দূর করবে সন্দেহ নাই।

বিষয়বস্তু আলোচনা কর্ব্বার আগে প্রমথ বাবুর আর একটা কথার প্রতিধ্বনি না করে' পারি না। অবনী বাবুর বলার কথা ও অধিকার আছে আর সে কথা তিনি এমন ঝরঝরে সাবলীল ভঙ্গীতে বলেছেন যে বইখানি পড়তে পড়তে মন খুসীতে ভরে ওঠে। প্রবন্ধ বা সমালোচনা সাহিত্যের নামে যাঁরা ভয় পান অতঃপর এ বইখানি পড়লে তাঁদের সে আতঙ্ক কেটে যাবে আশা করি। এর কোথাও কষ্টকল্পনা নাই, স্বচ্ছ দর্পণের মত বইয়ের পাতায় পাতায় লেখকের বক্তব্য ফুটে উঠেছে। 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী'র রূপক দু'টির যে সহজ ব্যাখ্যা অবনীবাবু দিয়েছেন তা' আমাদের মত গদ্য-সর্ব্বস্ব লোকেরও বুঝতে কিছু বেগ পেতে হ'য়না। শরৎচন্দ্রের নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ আছে সেগুলি পড়লে একটা কথা শুধু মনে হয়—কি গভীর ভাবেই না শরৎসাহিত্য লেখককে আকৃষ্ট ও আচ্ছন্ন করেছে! অথচ তাঁর দৃষ্টি কোথাও ঘোলাটে হয়নি-আগাগোড়া বেশ সচেতন ও স্বচ্ছ আছে। দরদী লেখকের দরদী সমালোচক—এমন সমাবেশ বড় উপভোগ্য। কে যেন বলেছেন যে অবনীবাবুর এসব লেখা নিতান্ত ভক্তিযোগের কথা। হ'লই বা! বড়ো বা ভালো জিনিষকে শ্রদ্ধাভক্তি দিয়েই যখন আমরা গ্রহণ করি তখনই বড়ত্ব ও ভালোত্বের বীজ অজ্ঞাতে আদের চরিত্রের মধ্যে রোপিত হ'য়ে যায়। চুলচেরা তর্কে শুধু তর্কই বেড়ে যায়—রস থেকে যায় অনাস্বাদিত। 'তর্কে বহুদূর'। প্রথমবাবু ভূমিকায় বলেছেন

জজিয়াতি করা ক্রিটিকের কাজ নয়। অবনীবাবুও সে চেষ্টা করেন নি।

পাঁচমিশেলী সম্বন্ধে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন, এ প্রসঙ্গের দৈর্ঘ্য না বাড়িয়ে একটা নতুন কথা বলে শেষ করি। কাব্যে ও কথা-সাহিত্যে লেখক তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে খানিকটা করে' ধরা পড়ে যান পাঠক-পাঠিকার কাছে। কিন্তু সমালোচনা-সাহিত্যে পাই শুধু তাঁর মগজের, যুক্তি-শক্তির ও বিচার বুদ্ধির পরিচয়। পাঁচমিশেলীতে কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। পাঁচমিশেলী পড়বার আগে স্বয়ং অবনীবাবুকে পড়বার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে। বই-খানির লাইনে লাইনে লেখকে ও লেখায় মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে।

বিশেষতঃ শরৎ সাহিত্যের সমালোচনায় অবনীবাবুর সকল মুখোস খুলে পড়েছে। বিজ্ঞেরা মাথা নেড়ে হয় ত বলবেন—'উঁহু, ওসব চল্‌বেনা, ভালো লেখককে হ'তে হবে ষোল আনা নির্ব্যক্তিক, হৃদয় বা দরদ বল্‌তে যা' কিছু সব ঘুচিয়ে দিতে হবে, আর সার কর্ত্তে হবে শুধু একরাশ মগজ ও ছ'টা সুতীক্ষ্ণ চোখ যার দৃষ্টি হবে রঞ্জনরশ্মির মত সন্ধানী।" আমরা অতশত বুঝি না, আমরা ভক্তিযোগের মধ্যেই স্বাস্থ্যের আভাষ দেখ্‌তে পাই।

বইখানিতে স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণের প্রচুর শিক্ষার বস্তু আছে।

জহুরী

বামুনবাগ্‌দী—'রক্তের টান' ও 'প্রণয়-প্রতিমা' লেখক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দত্ত প্রণীত উপন্যাসগ্রন্থ। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঁঙার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সোনার জলে লেখা, কাপড়ে বাঁধাই ২২৪ পৃষ্ঠা মূল্য দুই টাকা; ছাপা ও কাগজ ভাল।

সাময়িক পত্রের পাঠকদিগের নিকট লেখক সুপরিচিত। বইখানি সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" পত্রে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ধারা-বাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আলোচ্য উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ খুব সাধারণ। খুলনা জেলার উত্তরপাড়া নিবাসী নিতাই বাগ্‌দী একটি আড়াই বৎসরের শিশুপুত্র রাখিয়া বিসূচিকা রোগে লোকান্তরিত হইলে নবীন বাগ্‌দী নামক ভিন্ন গ্রামবাসী এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় শিশুটিকে লইয়া নিতাইয়ের মনিব প্রবল জমিদার সুখেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। শিশুটির অন্য কোন অভিভাবক না থাকায় স্নেহের নির্ঝরিণী জমিদার-মাতা বিধবা মহেশ্বরী শুদ্ধাচারিণী হইয়াও এই অস্পৃশ্য শিশুটির লালনপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। শিশুটির নাম রাখা হইল কানাইলাল মজুমদার। সুখেন্দুর পুত্র বলাই ও কন্যা শান্তির সহিত মহেশ্বরীর আদরযত্নে কোন প্রকারে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাইয়া কানাইলাল দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ব্যাকরণ, ইতিহাস, গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক পড়িয়া ফেলিল। মহেশ্বরীর সৎশিক্ষার প্রভাবে কানাইলালের চরিত্র নানাগুণে পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং অত্যধিক স্নেহে বালক একটু অভি-মানীও হইল।

কানাইলাল ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে মহেশ্বরী সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনের জন্য তারিণী মামাকে লইয়া তীর্থ-যাত্রা করিলেন। কানাই ও বলাই সঙ্গ লইল। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া কানাই একটি ভদ্রলোকের পীড়িতা স্ত্রীর ঔষধ আনিতে গেল। তখন সকলে টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে। যাইবার সময় বলিয়া গেল যদি তাহার আসিতে দেরি হয় তাহা হইলে সকলে যেন গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে—পরের গাড়ীতে যাওয়া হইবে। কিন্তু তারিণীমামার চক্রান্তে যথাসময়ে গাড়ী হইতে নামা হইল না; গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কানাই ফিরিয়া আসিয়া দেখিল গাড়ীখানা চলিয়া গিয়াছে। তখন সে সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। মহেশ্বরী বা অপর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অভিমানে কানাই দেশে খবর পাঠাইল না, বিপন্ন ভদ্রলোকটীর সহিত ঘাঁটালে চলিয়া গেল।

এদিকে মহেশ্বরী তীর্থযাত্রা স্থগিত রাখিয়া কলিকাতায় বাসায় ফিরিয়া আসিলেন ও কানাইলালের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। কানাই

ঘাঁটালে চাকরি করিয়া পরোপকার, ঔষধ বিতরণ ও শিক্ষার্থী ছেলেদের সাহায্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিল। একদিন বাজারে আগুন লাগিলে কানাই একটি রমণী ও একটী শিশুকে আগুনের মুখ হইতে রক্ষা করিল। এই সূত্রে একখানি খবরের কাগজের মারফৎ মহেশ্বরী কানাইএর সন্ধান পাইয়া তাহাকে দেশে লইয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে আরও তিনটি বৎসর অতীত হইল কানাই শিষ্ট শান্ত বিনয়ী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সুখেন্দুর বিষয়কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণের ভার কানাইয়ের উপর পড়িল। কিন্তু জমিদারী সংক্রান্ত একটি মোকদ্দমায় সুখেন্দু তাহাকে মিথ্যা বলিতে পীড়াপীড়ি করায় কানাই একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং বিবেকবাণীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের দুশ্চিন্তায় পীড়িত হইয়া দেহত্যাগ করিল। মহেশ্বরী সেই মৃত্যুমলিন দেহের উপর লুটাইয়া মহানিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এই সাধারণ আখ্যান অবলম্বন করিয়া লেখক একটি অনন্যসাধারণ রমণীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সম্মুখে একটি মহান সমস্যা উপস্থিত করিয়া তাহার সমাধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের দুরপনেয় কলঙ্ক-স্বরূপ। সংসারের দুঃখ যেখানে আমাদের ভিতরের মনুষ্যত্ব সমবেদনায় কাতর হইয়া সাহায্যের জন্য হাত বাড়াইতে চায় সেখানে আমাদের সমাজের কঠোর কুসংস্কার সেই হাত টানিয়া ধরে এবং ছোঁয়ালেপা বাঁচাইয়া নির্লিপ্ত থাকিয়া শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মাচরণের উপদেশ দেয়। আর যখন দেখিতে পাই মহেশ্বরীর ন্যায় উদার হৃদয়া রমণী—যিনি শুধু মর্য্যাদার খাতিরে নিরাশ্রয় আত্মাকে আত্মা থেকে পৃথক করে আপনাকে বৃথা তৃপ্তি ও স্বস্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে অনিচ্ছুক, যিনি বলেন মানুষ যখন অসহায় হ'য়ে পড়ে তখন তার সহায় হ'তে হ'লে বিচার আচার চলে না—তিনিও পূজা শেষ করিবার পর বাগ্দীর ছেলেকে স্নান করাইয়া পুনরায় নিজে স্নান করিতে চলিয়াছেন তখন বুঝিতে পারি সেই সংস্কারের প্রভাব কতদূর মজ্জাগত। এই মজ্জাগত সংস্কার লইয়াও মহেশ্বরী যেভাবে আপনার নিষ্ঠাটুকু পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া বাগ্দীর ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন তাহা সত্যই অসাধারণ ও প্রশংসনীয়। এই উদারহৃদয়া রমণীর সংশ্রবে আসিয়া মোক্ষদার ন্যায় একজন শুচিবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোককেও বলিতে হইল "ধন্য তোমায়! আড়াই বছর থেকে দশ বছরে এনে ফেলেছ, আমরা হ'লে পেরে উঠতাম না।" ইহার প্রভাবে সুখেন্দুর সংসার একান্ত সংকীর্ণ ভাবাপন্ন হইতে পারে নাই অথচ কিরূপ শিক্ষা পাইয়া মহেশ্বরী এমন মহনীয় চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হইলেন তাহার আভাষ গ্রন্থকার কোথাও দেন নাই।

ছোট ছোট ঘটনা অবলম্বন করিয়া লেখক স্থানে স্থানে বেশ pathos সৃষ্টি করিয়াছেন। কানাইলালের ঝাড় ফুঁকের মন্ত্র শিক্ষা ও বলাইএর মচ্‌কা বেদনার উপশমের জন্য সেই মন্ত্রের প্রয়োগ বেশ উপভোগ্য।

পুস্তকখানির বিশেষত্ব এই যে সাধারণ উপন্যাসসুলভ যুবক যুবতীর প্রণয়বিবরণ ইহাতে স্থান পায় নাই, এই জন্য বইখানি আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলের হস্তেই নির্ব্বিঘ্নে তুলিয়া দেওয়া যায়। এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দেখা গেল, যথা, ডাণ্টা, সরদেওয়াল, খোলাট, চিলতে পানা, আজ্ঞা মশাই, শানুক ইত্যাদি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসাক

ইঙ্গিত

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা | আষাঢ় | ১৩৩৯ সাল

বৈদান্তিকের প্রার্থনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হে গরিষ্ঠ মহামহীয়ান্!
হৃদয়-নৈঃশব্দ্য মাঝে ঊর্দ্ধমুখী উঠিছে কুসুমি'
অমর-স্ফুলিঙ্গ তব ধ্যান।
বিশ্বে রাজো তুমি—শুধু তুমি,
তবু কেন অমা মোরে ঘেরে হায়,—করে আঁখিহীন?
সূর্য্যোজ্জ্বল চিত্তাকাশ ধূমি'—
মেঘ-চমূ ছায় অনুদিন?
বিবর্ণ বিক্ষত হই কেন লক্ষ বাসনার রণে?—
উদ্‌ভ্রান্ত, চঞ্চল, লক্ষ্যক্ষীণ?
রহি' রহি' উচ্ছাস-দাহনে
তব শান্তিরাজ্য হ'তে কেন হয় নির্ব্বাসিত প্রাণ?
প্রতি ঘূর্ণীপাকে ঝড়ে—গনে
তারা দিশা কেন হয় ম্লান?
পড়ি ধরা আচম্বিতে দুঃখ শঙ্কা ফাঁদে কেন প্রভু?

The Vedantin's Prayer.

SRI AUROBINDO

Spirit Supreme,
Who musest in the silence of the heart,
Eternal gleam,

Thou only Art!
Ah, wherefore with this darkness am I veiled,
My sunlit part

By clouds assailed?
Why am I thus disfigured by desire,
Distracted, haled,

Scorched by the fire
Of fitful passions, from thy peace out-thrust
Into the gyre

Of every gust?
Betrayed to grief, o'ertaken with dismay,
Surprised by lust?

লিপ্সা পায় কেমনে সন্ধান ?
যেন মুখ না ফিরায় তবু
মহতী করুণা হ'তে তব মোর রক্তাক্ত জীবন—
বিলম্ব না সহি যেন কভু।
ওগো সত্য ! নিঃসঙ্গ গহন !
তব দীপ্তি-ছদ্মবেশী দেবগণ' নাহি যেন পাবে
প্রবঞ্চিতে মদির-যৌবন।

স্তব্ধ করো যাহারা ফুকারে,
অমৃত-উৎকর্ণ যে গো এ-হৃদয়—না শুনিবে মানা
শাশ্বত এষণা জানিবারে।
চিরন্তন দ্বারে দেয় হানা
যেই দীপ্র মরীচিকা—কর দূর ; তার মায়ালোক
না রহুক আমার অজানা।
দাও দিব্য দৃষ্টি বীতশোক,
দাও স্বচ্ছভাতি হৃদি পুনর্নব,—শুধু মিথ্যাশায়
আলেয়ায় দিও না সুযোগ।
শব্দ-ভ্রান্ত করে যে সে হায় !
যুগের পুঞ্জিত গ্লানি অপসরি'—ফিরায়ে আমায়
দাও সে-হারানো শুভ্রতায়।
হে জ্ঞানের প্রচ্ছন্ন দুয়ার !
খোলো আজি। সুপ্ত সিংহবীর্য্য !
আজি জাগো হে আত্মায়,
ঐশী প্রেম ! ঝরাও আসার।

Let not my grey
Blood-clotted past repel thy sovereign ruth,
Nor even delay,

O lonely Truth !
Nor let the specious gods who ape Thee still
Deceive my youth.

These clumours still ;
For I would hear the eternal voice and know
The eternal will.

This brilliant show
Cumbering the threshold of eternity
Dispel,-bestow

The undimmed eye,
The heart grown young and clear. Rebuke,
O Lord,

These hopes that cry

So deafeningly,
Remove my sullied centuries, restore
My purity.

O hidden door
Of Knowledge, open ! Strength, fulfil thyself.
Love, outpour !

Sri Aurobindo's comment :—"You have made a very fine and true rendering of the Vedantin's Prayer. Perhaps so high and rocky a person as the Vedantin, who is very much of a converted Titan, would not have thought of such a sweet and luscious word as 'কুহমি' in the midst of his ascent and struggle, but these few alterations do not make any real difference to the spirit. There is a quite sufficient nobility and power in your translations.

বর্ত্তমান ও গান্ধীবাদের উপযোগিতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

বর্ত্তমানের যুগটা আসিয়াছে একটা ওলট্-পালটের উন্মাদনা লইয়া। যেন বাত্যা ও প্লাবনের মত দুর্দ্ধর্ষ আবেগ লইয়া সমস্ত প্রকৃতিটাকেই পাল্টাইয়া গড়িবার নিমিত্ত এক অমোঘ শক্তি কালের অভ্যন্তরে থাকিয়া যুগ-তরণীখানিকে বিচিত্রগতিতে পরিচালনা করিতেছে। অতীতে, এমন কি ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের জীবনধারায় এত অস্বাচ্ছন্দ্য, আয়াস-খিন্ন ভাব ছিল না। যে কোন কারণেই হোক ভারত-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য তখন কালের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আজিকার দিনে বিশ্বের দরবারে ভারত যেমন তাহার নিজস্ব গৌরবময় যুগকে, তাহার আদর্শ শিক্ষাদীক্ষাকে, তাহার সেই লুপ্ত গরিমার বৈভবকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার পাইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল পূর্ব্বেও ভারতের জীবনেতিহাসে বোধ হয় আত্মোন্মেষের এমন আশাপ্রদ অভিব্যক্তি প্রকট হয় নাই। তখন ছিল ভারতাত্মার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য-খিন্নতার ছন্দহারা পাদবিক্ষেপ—তাহার নিজস্ব আদর্শের, দৃষ্টিনীতির হারাইয়া যাওয়া গতানুগতিকতা—আত্মবিস্মৃতির পরিণামহীন সুদীর্ঘ ব্যভিচারের একটা লুব্ধ অবস্থা। তাহার মধ্যে না ছিল আত্মসংরক্ষনী বুদ্ধি, নাছিল ভারতের আদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং তখনকার অনুসৃত জীবনধারার মধ্যে বৈষম্য, অনৈক্য ও গরমিলগুলি ধরিয়া লইবার একটা আত্মসংস্থ সক্রিয় চেতনা। ভারতের যুগযুগান্তের রক্ষাকবচ যে অধ্যাত্ম নির্দ্দেশ তাহা প্রতীচি-মরীচির স্বর্ণকরোজ্জ্বল দিশায় পড়িয়া মুহ্যমান প্রদোষেরই মত নিষ্প্রভ হইয়া অবসন্নতার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু এই অন্ধকার ভারতের পক্ষে চির অমানিশার ঐতিহ্য না হইয়া, হইয়াছিল আলোকেরই একটা ক্রমবর্দ্ধন প্রক্রিয়া। ভারতের গভীরতম সত্ত্বায় যে স্ব-ভাব জ্যোতির স্মৃতিরেখা ছিল, সাময়িকভাবে মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও তাহারই বিক্ষিপ্ত দিশা আজও পর্য্যন্ত ভারতকে hellenic সভ্যতার আলোকে নির্ণীত গ্রীস্ ও মিশরের মত নিশ্চিহ্ন হওয়ার কিম্বা একটা memphis গড়িবার মত বিদ্যাশিল্পে নিঃশেষিত হইবার হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; বরং পাশ্চাত্য বিদ্যার দৃষ্টান্তে, পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলেয়ার আলোকে তাহার কুফলটা, ক্ষণিকত্বটা, তাহার মধ্যে আমাদের হারাইয়া যাওয়ার পরিমাণটা কতদূর দাঁড়াইয়াছে তাহার নিখুঁত চিত্রটি আমাদের অভিজ্ঞতার দর্পণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিদের দৃষ্টির শিক্ষার কার্য্যকরী শক্তি কতখানি উপযোগী ও অব্যর্থ ছিল—বিকিকিনির কষ্টিপাথরে তাহার আসল মূল্যটা, চিন্তাটা সমধিক গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

তাই আজ দেখিতে পাই যে ধারকরাসভ্যতার আরাম-শয্যায় ভারতবাসী একদিন মহানিশ্চিন্ততার ছলনায় স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিল তাহা এখন কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া এই কণ্টকের আঘাত হইতে দেহটাকে নির্ব্বিঘ্ন ও সুস্থ করা যায় সেই চিন্তাই হইয়াছে বর্ত্তমানের বিশেষ বিষয়। বাতাস উঠিয়াছে, জোয়ারও আসিয়া পড়িয়াছে—এখন দাঁড় ধরিয়া পাল কষিয়া তরণীটিকে সদ্গতি দিবার যাহাদের পালা, মত ও পথের স্বচ্ছতা তাহাদের এখন অনিবার্য্য।

জাতীয় প্রগতির বর্ত্তমান দিশারী মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন যে, একমাত্র অসহযোগ নীতির পথেই জাতির মুক্তি আসিবে। বিদেশীয়ের চাপে জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি, জাতির সহজ আত্মোদ্ভাবিনী বুদ্ধি, উদ্যম সমস্তই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। বিজেতার কৃতিত্বের গৌরবগ্রাহিতায় তাহাদের ভাব, ধারা, অভিপ্রায় জাতির মন প্রাণের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সঞ্চারিত হইয়া ভারতবাসীকে একটা সম্পূর্ণ পঙ্গু আদর্শহীন জড়জাতিতে পরিণত করাইয়াছে; এই পতনোন্মুখীনতা হইতে জাতিকে

রক্ষা করিতে রাজনৈতিক মুক্তি একান্তই অপরিহার্য্য এবং অসহযোগ-পথই তাহার একমাত্র উপায়।

একটা সমস্যার আবির্ভাব হইলে নানাদিক হইতে নানা ভাবের সমাধান আসিয়া পড়ে। যখন যে নির্দ্দেশটী প্রবল হয়, কিম্বা সময় ও অবস্থার খানিকটা অনুকূল হয়—সাধারণে ধীরভাবে পর্য্যালোচনার অপেক্ষা না রাখিয়া সেই নির্দ্দেশের অনুবর্ত্তী হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যকে সত্যে পরিণত (actualise) করিবার নির্ভুল রীতি উহা নহে।

কোন নীতিকে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ধীরভাবে বুঝা উচিত যে, সে-নীতিটির প্রকৃত স্বরূপ কি? তাহার দ্বারা প্রকৃত সাফল্য অর্জ্জিত হয় কিনা এবং তাহা ভারতীয় সাধনপ্রণালীর অনুরূপ কিনা? বৈদেশিক সভ্যতা—যান্ত্রিক সভ্যতা—তন্ত্রাববস্তুতার কবল হইতে ভারতীয় সভ্যতা ও শিক্ষাকে পুনরুদ্ধার করাই হয় যদি অসহযোগনীতি অনুসরণের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাহা সফল হইবে সেই পরিমাণে, যে-পরিমাণ ভারতীয় সাধন-প্রণালীর সিদ্ধজ্ঞানে সে-নীতি উপযুক্ত। অন্যথায় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে, পরানুকরণ কোন প্রকার উপযুক্ততার পথে—Bolshevism, Nihilism, অথবা Seinfein আদর্শের কোনপ্রকার রাজসিক ভাবের প্রচেষ্টায় ভারতের মুক্তি আসিবার নহে।

বিরোধের দ্বারা, দ্বেষ হিংসার দ্বারা সাময়িক কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল নহে। কিন্তু সেরূপ সিদ্ধি ব্যর্থতারই রূপান্তর। তদ্রূপ নীতি জাতীয় জীবনে সাময়িক মুক্তি আনিয়া পরিণামে প্রবলতর বন্ধনদশার জলন্ত অবস্থায় প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। লেনিনের দেশ, ডি-ভ্যালেরা, সান-ইয়াট-সেনের দেশ আসুরিক শক্তির পথে যুগযুগব্যাপী সংগ্রাম চালাইয়া উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিল; আজ তাহাদের সাফল্যের সেই অতীত জয়মাল্যখানি আত্মবিরোধ ও মত সংঘর্ষের তুষাগ্নিতে বিধূমিত হইতেছে।

মুক্তির যে নীতি ও পন্থা কেবলমাত্র প্রয়োগকারীকেই নহে, প্রকারান্তরে দশকে ও দেশকে করে গর্ব্বিত শক্তির উপাসক, যে নীতির অনুশীলনের দ্বারা মানুষকে লইয়া চলে সাক্ষাতভাবে বর্ব্বরতা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা, ধ্বংস, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, বৈষম্যানৈক্যমূলক ভেদধারার পথে, যাহার লক্ষ্য ও দৃষ্টি শুধু বর্ত্তমানের সার্থকতায় আবদ্ধ, সুবিধাবাদের মানদণ্ডে নির্দ্ধারিত—ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, প্রেম ও নিষ্কামতা প্রভৃতি আত্মিকগুণের কর্ম্মসাধক নহে—আশুফলপ্রসু হইলেও সে পথে মুক্তির জন্য গান্ধীজী প্রস্তুত হন নাই। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি তাঁহার সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু ততোধিক লক্ষ্য তাঁহার উপলব্ধ সত্যের প্রতিষ্ঠায়। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই সত্যের নিরঙ্কুশ অনুসরণে ভারতের তথা জগতের মুক্তি আসিবে। যদি নাই আসে তাহার জন্য তিনি বিচলিত নহেন। তিনি ভারতীয় সত্যোপাসক, সত্যাগ্রহী—রাজনীতি বা পাশ্চাত্যের কাপট্যপূর্ণ হৃদয়হীন নীতির দ্বারা অর্জ্জিত স্বরাজ তাঁহার অনুষ্ঠেয় নয়।

গান্ধীজী এবং প্রত্যেক অগ্রগামী ভারতীয় সাধক সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন যে, অনর্থক নিগ্রহ ও জবরদস্তির ভিতর দিয়া জীবনাস্পৃহার কোন পরিপন্থী ভাবের, কোন প্রবল রিপুর ও উপসর্গের উচ্ছেদ সাধিত হয় না। বরং তদ্দ্বারা সেই সকল উপদ্রবকর স্পর্শগুলিকে চিন্তার ও আলোচনার বস্তু করিয়া—সেগুলিকে দোষারোপ ও প্রতিকূলতার উপযুক্ত (?) পাত্র করিয়া বিরোধের সমধিক শক্তিরূপে প্রকট করান হয়। অধিকন্তু তাহার প্রতিফল ক্রমে প্রয়োগকারীর স্বভাবে আসে তাহার সত্যভাবের—মূল দৃষ্টি, পারগতার ব্যভিচার, অভাব—ব্যতিক্রম। মানুষ হইয়া পড়ে সেই হীন এবং ক্ষণফলবিধায়িনী আদর্শের দাস। সত্যের স্বস্থ সুদৃঢ় অনুগত অবলম্বন ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া যায়। মানুষ তখন বিজীগিষার অহঙ্কারে, রাজসিক দম্ভে বিরুদ্ধশক্তিকে আক্রমণ করিতে যায়। ফলে এই হয় যে, সেইশক্তিকে প্রতিরোধ করিতে গিয়া সে হয় তদ্দ্বারা আক্রান্ত। বিরুদ্ধ শক্তির সফলকাম হইবার যেটী থাকে আদর্শ, পথ—আধারের যে পর্য্যায়ে বা ক্রমে থাকে বিরুদ্ধশক্তির অস্তিত্ব ও সামর্থ্য, অপেক্ষার যতটুকু সহনতায় থাকে বিরোধীভাবের পারগতা—মুক্তিকামীকেও হইতে হয় তাহার অনুরূপ অভিনেতা।

আন্তরসাধনার এইরূপ খাঁটী অভিজ্ঞতা হইতে গান্ধীজী দৃঢ় অহিংসবাদী। বোধহয় এবিষয়ে তিনি অনেকাংশে টলষ্টয়ের মন্ত্রশিষ্য—"resist uot evil by evil" অধিকন্তু তিনি দেশপ্রেমিক—দেশাত্মার বিভিন্ন স্বার্থপাহারক শক্তি-

সমূহের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন একই মহান্ উদ্দেশ্য বহুত্ব এবং পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতাও বিরোধের পরিচ্ছদে আসল সত্যকে অধিকতর বলশালী ও খাঁটী করিয়া গড়িয়া তুলিবার নিমিত্তই আত্মসংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। ক্ষুদ্র স্বজাতি প্রেমের যূপকাষ্ঠে তাহাদের কোনটীরও দাবী নিহত না করিয়া (সে সকলদাবী যতই অন্যায়মূলক হোক না কেন) তাহাদের প্রত্যেকটীকেই তিনি প্রেমের অবিচ্ছিন্ন ও একপ্রাণতার বিপুল সার্থকতায় অনুপ্রাণিত করিয়া চলিয়াছেন। জাতীয় মুক্তির এই পথে হয়ত বা তাঁহাকে হইতে হইবে আত্মকলহ, ভুল বুঝাবুঝির সম্মুখীন—তাঁহারই সতীর্থ বিরোধীগণের অপার নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, বিরুদ্ধতার দুর্ভোগ তাঁহাকে ভুগিতে হইবে; কিন্তু তিনি তাহা সহ্য করিবেন নিরহঙ্কার আত্মিক সামর্থ্যের দ্বারা (soul force) সত্যপ্রাণতার দ্বারা। প্রতিরোধ করিবেন নিরীহের কাতর নিঃসহায়তার দ্বারা নহে—আত্মার নির্ভীক সাবলীল মর্য্যাদা ও অধিকার বোধের ঐশ্বর্য্যের দ্বারা (passivie resistence) ইহা সেইশক্তি যেশক্তি বিশ্বামিত্র ক্ষাত্র শক্তির দ্বারা বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিলে বশিষ্ঠ প্রয়োগ করিলেন, সেই আত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি। ফলে শক, হুণ, পহ্লবগণ আক্রমণকারীর উপর পতিত হইয়া তাহার প্রতিক্রিয়া দর্শাইল। অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যখন অন্যায়, প্রপীড়ন নীরবে সহ্য করেন, তরল বুদ্ধির জনসাধারণ তখন সে অবস্থার বিকৃত অর্থ—একটা অশুভ ভবিষ্যতই নির্দ্ধারণ করেন, কিন্তু চক্ষুষ্মানের নিকট ফুটিয়া উঠে ভিন্ন অর্থপূর্ণ আলোক। তিনি দেখিতে পান সত্যোৎসর্গীকৃত আত্মা অন্ধভাবে কিছুই করে না তাহার সত্যকর্ম্মের পুরস্কার দেয় প্রকৃতি—তাহার প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিক্রিয়া আসে প্রকৃতি হইতে। ধর্ম্মের জন্য শতশত খৃষ্টভক্ত আত্মবলিদান দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই সত্যানুগত্যের ফলে কী য়িহুদীগণের জয় হইয়াছিল? যীশুর সত্যই পাইয়াছিল একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু এই অধ্যাত্মজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বিকাশলাভ করিলেও ভারতের জনসাধারণ অদ্যাপি এই জ্ঞানের পথে চলিবার মত উপযুক্ততা কিম্বা ঐ জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার মত শক্যতা লাভ করে নাই। ভারতের ব্যবহারিক সত্ত্বা আজও তাহার অধ্যাত্মসত্ত্বার অনুগামী হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান অবস্থার বিপক্ষে আলাপ, আন্দোলন, বিক্ষোভ যতই প্রচণ্ড দেখা যাউক না কেন, উহা বুদ্ধিবিবেচনার আবেগোৎপন্ন সাময়িক প্রতিক্রিয়ামাত্র—অন্তর্সত্ত্বার অভ্রান্ত কর্ত্তব্যেষণার দ্বারা নিয়মিত নহে। ভারতের ব্যবহারিক সত্ত্বা এখনও পর্য্যন্ত তাহার অনাত্মীয় বহুপ্রকার অভিপ্রায়ের স্বার্থ-সাধক। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যান্ত্রিক নিরীহতা, ধোপার গাধার (Scape-goat) মত—উদাসীন নিষ্ক্রিয় সাংখ্যের পুরুষেরই মত সবরকম অনাত্মীয় আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করিয়াই সে চলিয়াছে। প্রতিদানে যাহা কিছু পাওয়া যাইতেছে তাহাতেই আপনাকে অনুগৃহীত, কৃতকৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছে; তাদৃশ মনোভাবে অনুগত ও আসক্ত থাকা এখন তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে অন্তরসাধনার যে নীতি ও প্রণালী ধরিয়া ভারতের অগ্রগামী সাধকগণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই পন্থা ধরিয়াই চলিতে হইবে। গান্ধীজীও অনেকাংশে রাষ্ট্রীয় মুক্তির সাধনা এই পদ্ধতিতে পরিচালনা করিতেছেন।

গান্ধীজীর যে অসহযোগ-নীতি তাহা নৈতিকতামূলক এবং ব্যাপকার্থে পাতঞ্জল যোগের "প্রত্যাহার", "অপরিগ্রহের"ই প্রকারান্তর। ব্যষ্টিভাবে না হইয়া উহা প্রযুক্ত হইয়াছে সমষ্টিগত সার্থকতায়। আত্মার শ্রেয়ঃলাভের ক্ষেত্রে অপেক্ষায় রহিয়াছে বহুবিধ অনাত্মীয়টানের, বহুবিধ অভাবাত্মক (negative) রূপের আকর্ষণ। উহাদের স্পর্শাক্রামক হইতে মূল উদ্দেশ্যকে সুস্থ ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সাধককে যেমন থাকিতে হইবে বিরোধী বা অকল্যাণকর বস্তুসমূহ অনুপ্রবিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে নির্লোভ, দৃঢ় ও সতর্ক —ততোধিক হইতে হইবে তাহাতে সম্পর্কশূন্য ও বিচ্ছিন্ন। অধ্যাত্মসাধনার কথায় উহাকে হয়ত বলিবে, বুদ্ধিতে বা চিন্তায় বিচ্ছিন্ন থাকা বা স্থান না দেওয়া। সাংখ্যও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা করেন। সাংখ্যও বলেন, পুরুষ সমর্থন করে, সায় দেয় বলিয়াই প্রকৃতির ব্যভিচার অবাধে চলিতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধি যখন এই ভুল বুঝিতে পারে, পুরুষ তখন প্রকৃতির খেলা হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া লয়।

তাহার ফলে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব, প্রকৃতির খেলা নিমেষেরমধ্যে বন্ধ হইয়া যায়। গান্ধীজীর অসহযোগ-নীতিও সাধনার এই আলোকের অনুবর্ত্তী।

অবশ্য ভিতর হইতে চরিত্র যদি মুক্তিমন্ত্রে সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ না হইয়া উঠে, আধার না হইয়া উঠে স্বাধীন স্বরূপের পরিচয়ে—আস্পৃহায় উদ্বুদ্ধ তন্ময়, সুষ্ঠু, একাগ্র ও সুসঙ্কল্পিত, তাহা হইলে নিছক প্রত্যাখ্যান, পরিবর্জ্জন কিম্বা অসহযোগ, নীতির দ্বারা অকল্যাণের প্রভাব তিরোহিত হয় না; অথবা তদ্দারা প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, উপযুক্ততা, সামর্থ্যও আসে না—তাহা যোগলব্ধ অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াই মহাত্মাজী অসহযোগ-প্রক্রিয়ার উপর যতটা না জোর দিয়াছেন, ততোধিক জোর দিয়াছেন জাতীয় চরিত্র-গঠনের উপর—দেশাত্মবোধ উন্মেষের প্রেরণার—সাধনার উপর। কর্ত্তব্যে অবিচলিত থাকা, সত্যে, নীতিতে অসীম ধৈর্য্যসম্পন্ন ও আস্থাশীল হওয়া, কার্য্যে অক্ষুন্ন পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দেশবাসীর স্মৃতির দুয়ারে বারম্বার উপনীত হওয়ার যে অশ্রান্ত প্রয়াস তাহা এই দৃষ্টিরই সমর্থন করে। বোধ হয় তাঁহার সবরমতী আশ্রমের শিক্ষাদীক্ষা এই উদ্দেশ্যসাধনের মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠান।

ভারতের দর্শনাদিতে আত্মার ভুমাবস্থার যে অপরূপ ঐশ্বর্য্য ও লক্ষণাদির কথা বর্ণিত আছে—"জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥"—মহাত্মাজীর কর্ম্মমুখর ব্যক্তিগতজীবনেও সেই নৈর্ব্যক্তিক বিভাবের সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনের ক্ষেত্রে এত যে দ্বন্দ্ব, কোলাহল, বিরোধ, অসামঞ্জস্য, নিন্দাস্তুতি—কিছুতেই তাঁহার নিরপেক্ষ কর্ম্মৈষণা বিচলিত বা শ্রান্ত হয় না। অবাধ তাঁহার স্বধর্ম্মপালনের সন্ততি—বা॥বিপত্তিতে ব্যাহত না হইয়া সাবলীল আবেগে বহিয়াই চলিয়াছে। সত্যপ্রিয়তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সাধনা তাঁহার মধ্যে আত্মবিকাশ করিয়াছে বোধ হয় তাহাদের নীতিধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা; পদ্মালাভ করিয়াছে চরম অনাড়ম্বরতা—ইচ্ছা সারল্য এবং উলঙ্গ আন্তরিকতা।

গান্ধীজীর সত্য, লৌকিক সত্য এবং সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রসূত। দেশকালের অভ্যন্তরে থাকিয়া শান্তি ও সমতালিপ্সু যে আত্মা সমাজ-দেহের বিভিন্নবিরোধী, অসমন্বয়কারী বস্তুসমূহের মধ্যে সম্ভাবনার পথে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা আত্মসার্থকতার নিমিত্ত তৎপর রহিয়াছে—গান্ধীজীর পথ তাহারই অনুগামী। সেইজন্য সত্য পথে চলিতে চলিতে তাঁহার জীবনে যে অনতিক্রম্য অপূর্ণতা, ত্রুটি, ভ্রান্তি আসিয়াছে, তাহার জন্য তিনি লজ্জিত, অনুতপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু জগতে যে এক আধজন অলৌকিক পুরুষ আছেন যাঁহারা মানবীয়স্তরের আশা, আকাঙ্খা, শক্তিজ্ঞানকে তাঁহাদের বাহ্যকর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও পাথেয় করেন না, অপরিপক্ব, পঙ্গু ও আপাত-ফলপ্রদ মনে করেন—উর্দ্ধহস্তের পরিণত যন্ত্রস্বরূপে অব্যর্থ ইঙ্গিত ও সামর্থ্য হয় যাঁহাদের কর্ম্মের, কর্ত্তব্যের দ্যোতনা-উৎস—গান্ধীজী তাঁহারের পর্য্যায়ভুক্ত নহেন। গান্ধীজীর জনকল্যাণ-দৃষ্টি আত্মকর্ত্তব্যের যে দিকটা বড় করিয়া দেখিয়াছে, তাহারই সার্থকতার নিমিত্ত তিনি নীতিসিদ্ধশক্তির সমস্ত নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতার পারগতাকে উৎসর্গ করিয়া চলিয়াছেন। সত্যের জন্য এইরূপ তিল তিল আত্মদানে, ত্যাগের, নিষ্ঠার এবং সঙ্কল্পের এইরূপ দৃষ্টান্তে, অবদানে আদর্শে—ভারতের উন্মার্গগামী ছন্নছাড়া জীবনে আনিয়া দিবে আত্ম-আদর্শের একটা স্পষ্ট কর্ত্তব্যো-ন্মুখীনতা—তাহা পালনের একটা উন্নত আন্তরিকতা। অনা-দর্শের ধূমাচ্ছন্নতা অথবা ভ্রান্ত আদর্শের মূঢ়-শোষকতা জাতীয় জীবন হইতে নিঃশেষ হইয়া আসিবে। মতের ও পথের স্পষ্ট প্রেরণায় জাতীয় আত্মা স্বচ্ছন্দ ও সানুকূল হইয়া উঠিবে।

অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে শ্রেষ্ঠতম মাঙ্গল্যের ও প্রতিভার বিকাশ করিবে, যাহার জন্য সে গভীর তপস্যামগ্ন—গান্ধীজী তাহারই অগ্রদূত।

পল্লী সম্পদ

শ্রীমনোজ বসু

নাগরিক সভ্যতা হইতে বহুদূরে সত্যকার বাংলা এখনো বাঁচিয়া আছে। দরদী ভিন্ন তাহার সন্ধান পায় না। সহর অপর দেশের হাবভাব নকল করিতে যায়, কিন্তু মুস্কিল হইতেছে এই পৃথিবীর সকল দেশের মাটি এক নহে। ও-দেশে যে গাছে ফুল ফুটিত, এখানে তাহাতে জন্মিতেছে কাঁটা।

অনেক পণ্ডিতকেই বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের দেশে নাচের আদর কোনদিন ছিল না, ইদানীং কেবল নাচের চলন হইতেছে। এই লইয়া প্রাচীনমহলে উষ্মার আর অবধি নাই! মজা মন্দ নয়। আত্মবিস্মৃতি এতদূর ঘটিয়াছে যে চোখ বুঁজিয়া চতুষ্পার্শকে অস্বীকার করিয়া আমরা দিব্য পাণ্ডিত্য দেখাইয়া চলিয়াছি।

অথচ এই গোটা দেশটাকে শ্রীগৌরাঙ্গ একদা নাচিয়াই মাতাইয়া ফেলিলেন। এখনও গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র পণ্ডিত-মূর্খ কীর্ত্তনানন্দে নাচিয়া থাকে। পৃথিবীতে বহু ধর্ম্মপ্রচারক আসিয়াছেন। কেহ তত্ত্বকথা শুনাইয়াছেন, কেহ অতিপ্রাকৃত শক্তি দেখাইয়া জনমনকে বিস্মিত ও বশীভূত করিয়াছেন, কেহ বা ধর্ম্ম চালাইয়াছেন আসুর শক্তিতে—তলোয়ারের জোরে। কিন্তু নৃত্য গীতে মাতাইয়া দেশের লোককে দেবোন্মাদ করিয়া তোলা কেবল বাংলা দেশেই দেখিলাম।

এই জীবন্ত, জাতীয়জীবনের সহিত একান্তভাবে জড়িত অথচ ক্রমবিলীয়মান লোকনৃত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছেন শ্রীযুক্ত গুরু সদয় দত্ত মহাশয়। একথা আমরা কোনদিন অস্বীকার করিব না।

বাংলার লোকনৃত্য নানাধরণের। মোটামুটি তিনটি ভাগ করা যায়। এক রকম অতি পবিত্র ধর্ম্মভাবযুক্ত। যেন নৃত্যযোগে সমস্ত দেহমন দেবতার পায়ে বিলাইয়া দেওয়া। কীর্ত্তন প্রভৃতিকে এই পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি।

আর এক ধরণের হইতেছে—উদ্দাম রণনৃত্য। একদা বাঙালী যুদ্ধ করিত, দেশ শাসন করিত, বিদেশী আক্রমণকারীর গতিরোধ করিয়া পর্ব্বতের মতো দাঁড়াইত। সেই সব বীরসৈন্য মরিয়া গিয়াছে কিন্তু বংশধরদের শোণিতধারায় গত পুরুষের তাণ্ডবতা ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দিত হইয়া ওঠে—রণনৃত্য তাহারই অভিব্যক্তি। পশ্চিমবঙ্গের রাইবিশে, মধ্যবঙ্গের ঢালিনাচ প্রভৃতি এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়।

আর এক রকমের আছে—উহা উচ্চাঙ্গের কলাসম্মত মধুর লাস্যনৃত্য। ঝুমুর প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়িবে। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ আদৌ বিজ্ঞান-সম্মত হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি লোকনৃত্যের ভিতর নানাবিধ রস অল্পাধিক এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কোঠায় ফেলিয়া বিচার করা বৃহত্তর অনুসন্ধিৎসার অপেক্ষা রাখে!

এই পল্লীনৃত্যের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় উদ্ঘাটিত হইয়াছে যশোহর জেলায় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মহিলা ও বালিকাদের মধ্যে চলিত ব্রতনৃত্যে। দত্তমহাশয় গত এপ্রিল মাসে উহার আবিষ্কার করিয়া কলিকাতা গলষ্টন পার্কে দেখাইয়াছিলেন। অতঃপর নারীনৃত্যের প্রসঙ্গে গুজরাটের গর্‌বার নাম করিয়া আর গর্ব্ব বোধ করিবার প্রয়োজন নাই, ঘরের আঙিনাতেই মাণিক মিলিয়া গেল।

কিন্তু এই সব নৃত্যের পরিচয় দিতে বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করি নাই। আসল কথাটা বলিয়া ফেলি। এই কয়েক বৎসরে বাংলার বহু অঞ্চলের অনেকগুলি লোকনৃত্য দেখিবার ভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। এই সম্পর্কে মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে বঙ্গদেশে একদা এক বৃহৎ সংস্কৃতি (culture) ছিল—নানা অঞ্চলে তাহার বিলুপ্তাবশেষ চিহ্নগুলি নানা মূর্ত্তিতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সমস্তগুলির অনুসন্ধান করিতে পারিলে হয়ত পরস্পরের মধ্যে যোগ আবিষ্কৃত হইয়া মূল সংস্কৃতির সন্ধান মিলিবে।

কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দত্তমহাশয় পশ্চিমবঙ্গের নৃত্যগুলি সজীব ও অবিকৃত রাখিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখকেরও ঐ সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে বলিয়া ইহার মূল্য বুঝিতে পারা সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ পল্লীসম্পদ সমিতি বাংলার প্রতি অঞ্চলে গড়িবার আবশ্যক। দত্তমহাশয়ের অধ্যবসায় অপরাজেয় হইলেও এত বড় বৃহৎ অনুসন্ধানে সমগ্র দেশবাসীর যোগ আবশ্যক।

স্মরণ রাখিতে হইবে, দিনের পর দিন বাংলার বিশিষ্ট সুরটি হারাইয়া যাইতেছে—একবার হারাইয়া গেলে আর তাহার সন্ধান হইবে না। কেহ হয়ত বলিবেন, রাষ্ট্রিক উন্নতি হউক, অন্নসমস্যার সমাধান হউক, এসব তাহার পরের কথা! কিন্তু এই কথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। দেশের দুঃখরাত্রি চিরকাল থাকিবে না, সূর্য্য একদিন উঠিবেই। দেখিতে হইবে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দেশটা যেন বিদেশ হইয়া না যায়।

কিরূপ দ্রুতগতিতে দেশের বিশিষ্ট রূপটির বিনাশ ঘটিতেছে তাহার সামান্য একটু দৃষ্টান্ত দিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। ব্রতনৃত্যের সন্ধান করিতে দুর্গম সুদূর গ্রামের মধ্যে দত্তমহাশয়ের সহযাত্রী হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। নয়নাভিরাম সেই অপরূপ নৃত্য দেখিয়া বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না, নৃত্যকারিণীদের শুচিস্মিত মুখভাব সংযত সুন্দর পদক্ষেপ ও নৃত্যভঙ্গী মনকে এই কামনার জগৎ হইতে এক মুহূর্ত্তে উর্দ্ধলোকে উড়াইয়া লইয়া যায়—পৃথিবীর আবিলতার অনেক উর্দ্ধে, অনন্ত গম্ভীর চিরসুন্দরের ধ্যানে অন্তর ভরিয়া যায়। অথচ শুনিলাম গ্রামে ইংরাজী শিক্ষার চলন হইয়া অভিভাবকেরা কঠোর শাসনে এই নাচ উঠাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আর পাঁচ বৎসর পরে গ্রামে গেলে বোধকরি ব্রতনৃত্যের কোন সন্ধানই মিলিত না।

এই দশা এক আধ জায়গায় নয়—গ্রামে গ্রামে—বাংলার সর্ব্বত্র।

ভজন

কাজী নজরুল ইসলাম।

তিলক-কামোদ মিশ্র—দাদ্‌রা।

রাখ রাখ রাঙা পায়
হে শ্যামরায়।
ভুলে গৃহ স্বজন সবি সঁপেছি তোমায়॥
সংসার-মরু ঘোর নাহি তরু-ছায়া
নব নীরদ-শ্যাম আনো মেঘ-মায়া,
আনন্দ নীপ-বনে নন্দ-দুলাল এস
বহাও উজান হরি অক্রুর যমুনায়॥

একা জীবন মোর গহন বন ঘোর
এস এবনে বনমালী গোপ কিশোর
কুঞ্জ রচেছি দুখ-শোখ তমাল-ছায়,
প্রেম-প্রীতির গোপী চন্দন শুকায়ে যায়॥
দারা সুত প্রিয়জন, হরি হে নাহি চাই
পদ্মপলাশ-আঁখি দেখিতে যদি পাই,
রাখাল-রাজা এস, এস হে হৃষিকেশ
গোকুলে লহ ডাকি' অকূলে ভাসি হায়॥

তৃতীয় শ্রেণীর কবি

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

রাজীবচরণ ভট্টাচার্য্যের আজ মন ভালো নেই। ক্যান্‌ভাসের জীর্ণ ইজি চেয়ারটায় শুয়ে সে ভাব্‌ছিলো—ভাব্‌ছিলো। এর একটা প্রতিশোধ, একটা প্রতিশোধ সে নেবেই। কিন্তু কী ক'রে নেবে? বইয়ের সমালোচনার কোনো প্রত্যুত্তর তো কাগজে ছাপা হয় না—সেটা রীতি নয়; 'উচ্ছ্বাস' না হয় না-ই ছাপ্‌লো—অন্য কোনো কাগজে লিখলে কেমন হয়? ঠিক 'উচ্ছ্বাসে'র সমালোচনার জবাব হিসেবে নয়—আলাদা প্রবন্ধ ভাবেই যাবে; প্রসঙ্গক্রমে, উচ্ছ্বাসের সমালোচক অশান্ত মিত্তিরের অবর্ণনীয় নির্ব্বুদ্ধিতা, অতুলনীয় রসবোধহীনতা (কথা দুটো সে মনে মনে টুকে রাখ্‌লে) এমন নির্ম্মভাবে উদ্ঘাটিত করা হ'বে যে যে-কোন পাঠক প'ড়েই নিঃসন্দেহ হ'বে, তা'র, রাজীবচরণের 'শ্যামসিন্ধু'র মত উচ্চাঙ্গের কবিতার বই বাঙলাদেশে হালে বেরোয় নি। অশান্তর সমালোচনার মূলে যে ঈর্ষা রয়েছে (হ্যাঁ—তা ছাড়া আর কী? অশান্ত নিজে যে অনেকদিন ধ'রে, তার একটা কবিতার বই বার করবার চেষ্টা—এবং ব্যর্থ চেষ্টা কর্‌ছে, কে তা না জানে?) পাঠকসাধারণকে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হ'বে: শুধু তার নিজের, রাজীবচরণের প্রতিষ্ঠার জন্য নয়; সাহিত্যজগতের সাধারণ সুবিচার, সততা ও সত্যনিষ্ঠতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য। সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিদ্বেষের, ব্যক্তিগত আক্রোশের স্থান নেই, সে বিষয়ে সাধারণের মনকে তীব্ররূপে সচেতন কর্‌বার জন্য। হ্যাঁ, প্রবন্ধ একটা লিখতেই হবে। বাঙলার সাহিত্য জগৎ আজ নানারকম হীন স্বার্থের ঠোকাঠুকিতে পীড়িত; এই সব দূষিত রক্ত বার করে দিয়ে একটা সুস্থ, পরিচ্ছন্ন অবস্থা আন্‌তে না পার্‌লে সাহিত্যের আর মুক্তি নেই। এবং এই বৃহৎ দায়িত্বের ভার, রাজীবচরণ অনুভব কর্‌লো, পড়েছে তার ওপর। তার প্রবন্ধ যে আন্দোলনের সৃষ্টি কর্‌বে...'আজ আমাদের বড় দুঃসময়। বাণী বনের রক্তকমল যখন ঈর্ষার বিষে নীল হ'য়ে ওঠে—' এই ভাবে লেখাটা আরম্ভ করতে হবে। হ্যাঁ, একটা না লিখ্‌লেই চলছে না। এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক 'অমিত্রে' তার খানিকটা প্রতিপত্তি আছে; সেখানে বল্‌লেই লেখাটা ছাপানো যাবে। রূঢ় ভাষার জন্য 'অমিত্র' বিখ্যাত, কাউকেই রেয়াৎ করে না। সেই কারণে, শিক্ষিত উচ্চসমাজে কাগজখানার খুব কাট্‌তি; রাজীবচরণ শুনেছে, অনেক কলেজের অধ্যাপকদের বসবার ঘরে 'অমিত্র' ছাড়া আর কোনো সাময়িক (কি অনুরূপ) সাহিত্যই আলোচিত হয় না। হ্যাঁ—শিক্ষিত উচ্চসমাজে তার বক্তব্য প্রচার করতে হ'লে 'অমিত্র'র মত মধ্যস্থ আর হয় না। কিন্তু লেখাটা নিজের নামে বার করা কি ঠিক হবে? আর কিছুর জন্য নয়, লোকে হয় তো তার উদ্দেশ্য ভুল বুঝবে; ভাববে, পরোক্ষে সে নিজের বইয়ের বিজ্ঞাপনের কাজ সেরে নিলে। না সে কথা লোককে ভাবতে দেওয়া কোনো রকমেই সঙ্গত হ'বে না। বরং অন্য কেউ যদি লেখে—হ্যাঁ, সেটা নিশ্চয়ই ভালো হয়, অনেক বেশি ভালো হয়। সুরেশকে বল্‌লেই সে সানন্দে এক্ষুনি লিখে দেয়; সুরেশ প্রায়ই তার বাড়ি আসে, এসে তার নতুন কবিতা শোনে; তার অনেক কবিতা সুরেশের আগাগোড়া মুখস্থ আছে। ছোক্‌রার বয়েস অল্প, কিন্তু কবিতা বোঝে। হ্যাঁ, সুরেশকে বল্‌লেই লেখে বটে; কিন্তু ও কি ঠিক মত গুছিয়ে লিখ্‌তে পারবে? ওকে সব বুঝিয়ে বলে' দিলে হয় তো...হ্যাঁ, সাহিত্যক্ষেত্রের কোনো কোনো খ্যাতনামার মত ও একেবারে নির্ব্বোধ নয়।...বাণী-বনের রক্তকমল যখন ঈর্ষার বিষে নীল হয়ে ওঠে—আরম্ভটা এত ভালো যে এটা কিছুতেই বাদ দেয়া যায় না। আর, 'অবর্ণনীয় নির্ব্বুদ্ধিতা, অতুলনীয় রসবোধহীনতা'—এ দুটো কথাও রাখতে হবে। সব চেয়ে ভালো হয় রাজীবচরণ যদি নিজেই একটা খসড়া তৈরি করে

দেয়—সেটা অবলম্বন করে' সুরেশ লিখলো, তার পর পাছে কোনো ভুলচুক থাকে সে আবার সেটা দেখে দিলে। লেখাটা একবার বেরুলে পরে অশান্ত—ও কি যন্ত্রণায় ছটফট্ করবে না? বুঝুক ও—মার খেতে কেমন লাগে! উঃ, অশান্ত—দেখতে কী মিষ্টি, কী ভদ্র, কে বুঝতে পেরেছিলো ওর মনে এত বিষ আছে। ওর বাইরের চেহারায় ভুলে বিশ্বাস করে'রাজীব নিজেই—কী বোকামি! কী বোকামি! ওকে বলেছিলো কোথাও তার বইয়ের একটা সমালোচনা লিখ্তে। ও প্রথমটায় রাজি হয় নি—রাজীবই ওকে বার বার করে' বলে, এমন আস্থা ছিলো তার ওর ওপর। আর সেই সমালোচনা যখন বেরুলো—কী তলহীন প্রবঞ্চনা, কি ভয়ঙ্কর হীনতা! আর কিছু না থাক সাধারণ চক্ষুলজ্জাও কি থাক্তে নেই? এই অশান্তকেই সে একদিন তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে' চা আর কড়াইশুঁটির শিঙাড়া খাইয়ে ছিলো—মানুষের মধ্যে একটু কৃতজ্ঞতা থাকে বলে'ও রাজীবের ধারণা ছিলো। এমন কি, সাহিত্যিক মহলের সবাই তো জানে যে অশান্ত তার বন্ধু—বন্ধু!—তিক্তস্বরে রাজীব কথাটা উচ্চারণ করলে; বন্ধুই তো বটে! 'ছন্দের ওপর', অশান্তর সমালোচনার অংশবিশেষ রাজীবের মনে পড়লো, কথাগুলো তার মনের মধ্যে একেবারে বসে' গিয়েছিলো, রাজীববাবুর পরিপূর্ণ দখল আছে, তাঁর শব্দ নির্ব্বাচন সুন্দর; তাঁর কবিতার ধ্বনিসমাবেশ প্রীতিকর। কিন্তু শুধু কানকে তুষ্ট করলেই কবিতা হয় না। তাই, এই সব নিঃসংশয় গুণ সত্ত্বেও'—এইবার এইখানে সেই অকথ্য অবিশ্বাস্য বিশ্বাসঘাতকতা!—'রাজীব বাবুর কবিতায় একটু যেন প্রাণের অভাব; তাঁর কাব্যের রূপ হচ্ছে যেন একটি অনবদ্য মর্ম্মর প্রতিমা'। অনবদ্য—কিন্তু প্রতিমা। প্রতিমা বটে। উত্তেজনায়, রাজীব তার নীচের ঠোঁট কাম্ড়ালে। চালাক ছেলে বটে অশান্ত; খুব কায়দা করে' বলেছে কথাটা, বোধ হয় ভেবেছিলো, সে বুঝতে পারবে না। কিন্তু প্রতিমা, তার মানে নিষ্প্রাণ, মৃত, কে না এ কথা বুঝতে পারে! অন্য ভাবে বলা হ'লো—কথাটা এমন স্পষ্ট, এমন নিষ্ঠুরভাবে চিন্তা করতেও রাজীব যেন শারীরিক কষ্ট অনুভব করলো—তার কবিতা কিছুই নয়! একটা বিশ্রী কথা ঘুরিয়ে বল্লেই সেটা আর কিছু কম বিশ্রী লাগে না। উঃ, রাজীব লেখাটা প্রথম পড়ে' ভেবেছিলো, এর পর অশান্ত কী করে' তার কাছে মুখ দেখাবে? কিন্তু—আজ বিকেলে মজুমদার প্রকাশালয়ের আড্ডায় অশান্তর সঙ্গে দৈবাৎ তার দেখা—অশান্ত মুখ দেখাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করলো বলে' মনে হ'লো না; বরং—উঃ, নির্লজ্জ আর কাকে বলে।—একগাল হেসে জিজ্ঞেস করেছিলো 'তোমার বই কেমন বিক্রি হচ্ছে,' রাজীব? নির্লজ্জ, বেহায়া, মধুমুখো বিষের ভাঁড়! রাজীব কোনো কথা বলে নি, মুখ ফিরিয়ে ছিলো। খানিক পরে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছিলো, অশান্তর মুখ এতটুকু হ'য়ে গেছে। খুব জব্দ! তবু তো 'অমিত্র'র লেখা এখনো বেরোয়ই নি। অনবদ্য—কিন্তু প্রতিমা···আচ্ছা, দেখা যাবে।

পাশের টেবিল থেকে রাজীব একখানা 'শ্যাম-সিন্ধু' টেনে নিলে। বইয়ের প্রত্যেকটি কবিতা লেখা হবার সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত সে অন্তত একশো বার পড়েছে; তবু এখনো তাব পড়্তে ভালো লাগে। তার নিজের কবিতার মত এত ভালো আর কারো কবিতাই তার লাগে না। কেন এমন হয়? সেও তো একজন বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোক; তারো তো একটা রসবোধ রুচিবিচার আছে; এ সব কবিতা যে তার এত ভালো লাগে, তা কি কিছুই প্রমাণ করে না? অথচ অশান্ত বলে কি না প্রাণ নেই! যদি না-ই থাকবে তা হলে কবিতাগুলো পড়ে তার বিরক্তি ধরছে না কেন? বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় এসে রাজীবের চোখ আট্কালো—

> রজনীর অন্ধকারে চন্দ্রমার উজ্জ্বল উন্মেষ,
> আলোকের চন্দ্রহার আকাশের কটিতটে দোলে
> বিরহিনী নিশীথিনী উন্মোচিলো নববধূ বেশ,
> তারকার মণিদ্যুতি বিচ্ছুরিছে আঁচোল নিচোলে—
> মরি মরি এ কী মূর্ত্তি! মৃত্যু-সম অপূর্ব্ব আবেশ!

বাঃ কি সুন্দর! এ জায়গাটা এত যে সুন্দর, তা এর আগে তো তার কখনো খেয়াল হয় নি। অনেক সময় এ রকম হয়—নিজে লিখে নিজেই বোঝা যায় না। রাজীব

দ্বিতীয়বার পড়লে—এবার সশব্দে। এও কি ভালো কবিতা নয়? কেন, বেশ তো শোনাচ্ছে! প্রাণ নেই—প্রাণ থাকলে এর বেশি কী হতো? কোন্ অংশে—ধরা যাক্ রবীন্দ্রনাথের, ধরা যাক্, 'মোরে করো সভা-কবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়, হে শর্ব্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা'-র চাইতে তার কবিতা নিকৃষ্ট? কী করে ও-কবিতায় এর চাইতে বেশি প্রাণ আছে? যত সব বাজে কথা! আন্দাজে শুধু নিন্দে করবার জন্যেই একটা কিছু বলে দেয়া। বললে পরে কেউ বোঝাতে পারবে? বাজে কথা, ফাঁকা কথা, ছেঁদো কথা। কোনো মনে হয় না। যেন নাড়ি টিপে বোঝা যায় কবিতার প্রাণ আছে কি নেই! যেন অশান্তর নিজের কবিতাতেই প্রাণ একেবারে টগবগ করে ফুটছে! আর, হাজার হোক অনেক লোকের মধ্যে অশান্ত একজন বই তো নয়—তার কথাই যে সত্যি হবে, তারি বা কী মানে আছে? একজন যা বলে, কী আসে যায় তাতে? এদিকে সুরেশ তো বলে—

"বাবা, খেতে যাবে না?"

এখনি খাবার সময় হ'লো! তাই তো—রাজীব টেবিলের ওপর টাইমপিসের দিকে তাকালো—কমও তো বাজে নি। কনককে বসিয়ে রেখে লাভ নেই—সারাদিনের মধ্যে বেচারা একটু ফুরসৎ পায় না। 'যাচ্ছি।' বইখানা রেখে সে উঠতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ বললে, 'এই তিনু, শোন্।'

তিনু তার বাবার কাছে এগিয়ে এলো।

'এই দ্যাখ', বইয়ের টাইটল পেজটা রাজীব ছেলের চোখের সাম্‌নে খুলে' ধরলো, 'পড়্‌তে পারিস্?'

'পারি বই কি।' তিনু ঝুঁকে পড়ে' মনে মনে বানান করে করে পড়লো, 'শাম-সিন্দু।'

'শাম-সিন্দু নয়, শ্যাম-সিন্ধু। বল, শ্যাম-সিন্ধু।'

তিনু বল্‌তে চেষ্টা করলো; ঠিক উচ্চারণ হ'লো না।

আচ্ছা বেশ, ওতেই হবে! এইবার রাজীব লাইনটার নীচে আঙুল বুলিয়ে গেলো, 'এটা পড়্‌তো।'

'শ্রীরাজীবচরণ,' একটু পরে তিনু পড়লো, 'ভট্ট—' তিনু আটকে গেলো।

'ভট্টাচার্য্য। জানিস নে—আমরা ভট্টাচার্য্য। তুইও ভট্টাচার্য্য! এইবার পড়্‌তো।'

'শ্রীরাজীবচরণ ভট্টাচার্য্য।'

'কা'র নাম?'

তিনু চুপ করে রইলো।

'বল না, কা'র।'

হঠাৎ লজ্জিতভাবে তিনু চুপি চুপি বল্‌লে, 'তোমার।'

'হুঁ' রাজীব একটা তৃপ্তির শব্দ নির্গত করলে।

'তোমার নাম ওখানে লিখেছে কেন বাবা?' কৌতূহলী তিনু প্রশ্ন করলে।

সুখে রাজীব হাসলো। নেহাৎই ছোট তার এই ছেলে যে এখন পর্য্যন্ত তার গ্রন্থকারত্ব উপলব্ধি করবার উপযুক্ত হয় নি, এ কথা ভেবে তিনুর প্রতি তার একটু করুণাও হলো। ছেলেটার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে বল্‌লে, 'যা, যা, শুয়ে থাকগে এখন, যা। খেয়েছিস?'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিনু বল্‌লে, 'আমার নাম ওখানে লিখে দাও না বাবা।' তার পর বাবার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বল্‌লে, 'না দিলে লিখে—আমি বুঝি আর লিখতে পারিনে! আমার একটা পেন্‌সিল আছে তাই দিয়ে—'

'না না, এ বইয়ের ওপর কিছু লিখিস নে কিন্তু—বুঝলি? আমি তোকে ভালো দেখে খাতা কিনে দেবো—'

'ওগো এসো না খেতে, কনক ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌লে। তাড়াতাড়ি রাজীব উঠে দাঁড়ালো। বইখানা সাবধানে, সযত্নে যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখে বল্‌লে, চলো।'

'কী যে এক বই হয়েছে,' কনক হেসে বল্‌লে, 'সারাক্ষণ তাই হাতে নিয়েই আছে।'

'না, না—এইত মাত্র একটু দেখছিলাম। সুরেশ বল্‌ছিলো, কোথায় নাকি একটা ছাপার ভুল আছে।'

'আচ্ছা, খেতে বসে রাজীব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'অশান্তকে তোমার মনে আছে?'

'কে অশান্ত?'

'সেই যে গেল শীতের সময় একবার এসেছিলো, ফর্সা মত—লম্বা, তুমি কড়াইশুঁটির শিঙাড়া ভেজে দিয়েছিলে।'

'কে অতদিনকার কথা মনে করে রেখেছে বাপু! কত লোকই ত আসছে, কাকেই বা আমি দেখি!'

'হুঁ।' আত্মবিস্মৃতভাবে রাজীব ভাতের গ্রাস চিবাতে লাগলো।

আর একটু ডাল দেবো?"

রাজীব মাথা নাড়লে। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে থালার দিকে তাকিয়ে, অনেকটা নিজের মনে সে বললে, 'অশান্ত এক কাণ্ড করেছে।'

যে ব্যক্তিকে সে কখনো দ্যাখে নি, যার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, তার কৃত কাণ্ড সম্বন্ধে কনকের মনে কোনো প্রবল কৌতুহল হ'লো না। তবু স্বামীর খাতিরে সে একটু উৎসাহ প্রকাশ করবার চেষ্টা করলে, 'কী করেছে?'

'করেছে এক কাণ্ড।' রহস্যের ভাবে রাজীব একটু চুপ করলো। কনক সেই ফাঁকে তার পাতে আর এক টুকরা মাছ দিয়ে ফেললো। 'অশান্ত আমার বইয়ের এক সমালোচনা লিখেছে।'

'কী লিখেছে তাতে?'

'লিখেছে, আমার কবিতায় নাকি প্রাণ নেই।'

'কী নেই?'

'প্রাণ।'

শব্দটা বুঝতে পারলেও কনক ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, আর এক টুক্‌রো নেবু দেবো?'

'না—আচ্ছা দাও। কী অন্যায় ভাবো তো! প্রাণ নেই—এ কথার কোনো মানে হয়?'

কনক আন্তরিকভাবে বললে, 'তাই তো।'

'বয়ে গেছে,' রাজীব এক ঢোঁক জল খেয়ে নিলে, 'ও কী বলেছে আর না বলেছে। কে-ই বা কান দিচ্ছে ওর কথায়! ভারি তো ও কবিতা বোঝে!'

কনক বললে, 'তা তো ঠিকই।'

অন্যমনস্কভাবে রাজীব খাওয়া শেষ করে' উঠ্‌লো। তার পর গোটা দুই পান চিবিয়ে বসলো সুরেশের জন্য সেই প্রবন্ধের খস্‌ড়া তৈরি করতে। এখন সময় থাকতেই কাজটা সেরে রাখা ভালো; দেরি করলে শুধু দেরিই হতে থাকবে; অনেক জিনিষ হয় তো ভুলেও যাবে। সত্যি সুরেশকে একটা খস্‌ড়া লিখে দেওয়াই ভালো—মুখে বললেও হয় তো ঠিক সব ধরতে পারবে না। তা ছাড়া, মুখে বলার চাইতে লিখতে সুবিধেও বেশি। কলম নিয়ে সে লিখতে আরম্ভ করলো: 'আজ আমাদের বড় দুঃসময়। বাণী-বনের রক্তকমল যখন ঈর্ষার বিষে নীল হ'য়ে ওঠে…' ঘণ্টাদেড়েক পর লেখা শেষ ক'রে সে আগাগোড়া একবার পড়লো। আবার পড়লো। লেখাটা কেমন যেন ঠিক জমলো না। তার কাটা কাটা কথার খোঁচাগুলো যেন ভেসে গেছে। এমন কি, 'অবর্ণনীয় নির্বুদ্ধিতা, অতুলনীয় রসবোধহীনতা,—এই দুইটা নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর আঘাতও কী রকম মৃদু শোনাচ্ছে। যেখানটা যে রকম হওয়া উচিত ছিলো, তা না হয়ে অন্য রকম হয়ে গেছে। এ লেখা পড়ে কি অশান্ত—হ্যাঁ করবে বই কি, নিশ্চয়ই যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করবে, কাৎরাবে। সে নিজে লিখেছে বলে বুঝতে পারছে না; যার উদ্দেশ্যে লেখা, তার গায়ে ঠিক লাগবে। তবু এক একটা জায়গা যেন লাগসৈ হলো না; যেমন, 'অনবদ্য—কিন্তু প্রতিমা'—একথার উত্তর হিসেবে সে লিখেছে, 'শ্রুতিগম্ভীর—কিন্তু অর্থহীন।' দুটো ঠিক একধরণের কথা হলো কি?…থাক্‌গে এখন যা হয়েছে বেশ হয়েছে; কাল সকালে আবার একটু দেখলেই চলবে। সুরেশ এলে ও-ও হয় তো দু' একটা কথা জুড়ে দিতে কি বদল করতে পারবে। এম্‌নিও লেখাটার একটা কাপি করতে তো ওকে হবেই।…

আলো নিবিয়ে দিয়ে রাজীব শুতে গেলো। খানিক আগে ঝিকে বিদেয় দিয়ে ভাঁড়ার ঘরে, রান্নাঘরে চাবি লাগিয়ে কনক এসে শুয়েছিলো; সে ঘুমিয়েছে কি না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তার পাশে শুয়ে রাজীব চুপচাপ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলো; তার পর তার মাথায় হাত রেখে মৃদুস্বরে ডাকলে, 'ওগো—'

কনক সাড়া দিলে না।

রাজীব একটু গলা চড়ালো 'ওগো শুনছো?'

'উঁ:', ক্ষীণ অস্পষ্ট জবাব এলো।

'শোনো। আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি; আমার কবিতা তোমার কেমন লাগে?'

'উঁ-উঁ-উঁ-উঁ,' বিশ্রামেরও আরামের ঈষৎ স্ফুট শব্দ ক'রে কনক পাশ ফিরলো। তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলো যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাজীবের ঘুম এলো না। এক ভাবে শুয়ে সে স্থির দৃষ্টিতে অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো। ঘরের মধ্যে ঘুমের নীরবতা, শুধু মাঝে মাঝে সে খুব নিম্নস্বরে বিড় বিড় করছে: 'প্রাণ নেই…প্রাণ নেই…'।

মিলন-বেদন

আহমদর্ রহমান

মহামিলনের মন্দিরে আজ ছুটে আয় তোরা আয়রে আয়।
ত্রিংশ-কোটির হৃদয়-অর্ঘ্য অঞ্জলি ভরি দানিব মায়॥
যুগ-জনমের পুঞ্জিত গ্লানি, সঞ্চিত শত কালিমা-পাপ,
অশ্রু-সলিলে ধৌত কর অন্তর কর শুদ্ধ সাফ্।
ভুলে যাও ভাই বিধি ও বিচার, ভুলে যাও জাতি-ধরম-ভেদ।
টিকি ও টুপীর বিরোধে ক্ষেপিয়া জাতির ভাগ্যে মেখোনা ক্লেদ॥

মোরা নহিগো হিন্দু, নহি মুস্‌লিম্,—সন্তান মোরা ভারত মা'র।
ভায়ের কণ্ঠে এস ভাই আজ পরাই মিলন-বাহুর হার॥

প্রাণ খুলে আয় করি গলাগলি, বুকে টেনে লই ভায়েরে ভাই।
মিলনের রাখী বাঁধি হাতে হাতে মায়েরে ঘেরিয়া আয় দাঁড়াই॥
আমরা এ ওর অতি আপনার, আমরা এ ওর প্রাণের প্রাণ।
শোণিতে শোণিতে মহাসংযোগ, নাড়ীতে নাড়ীতে ব্যথার টান॥
প্রাণে প্রাণ ঢালি, গানে গান ঢালি মহামিলনের করি অভিষেক।
সাম্য-প্রীতি ও প্রেমের বাঁধনে আমরা বিপুল অভেদ এক॥

মোরা নহিগো হিন্দু, নহি মুস্‌লিম্—সন্তান মোরা ভারত মা'র।
ভায়ের কণ্ঠে এস ভাই আজ পরাই মিলন-বাহুর হার॥

কোরাণে পুরাণে ঠোকাঠোকি করি ভেঙেছি কেবল আপন ভাল।
ভায়ের বক্ষে ভাই ছোরা হেনে মায়ের বক্ষ করেছি লাল।
মস্‌জিদ্ আর মন্দির-ইঁটে নিজেরি চৌদিকে গড়েছি কারা।
আপন-মৃত্যু-পরিখা আপনি খুঁড়েছি আমরা সর্ব্বহারা॥
ধর্ম্ম-জাতির সংগ্রামে মাতি মিছে কর ভাই শোণিতপাত।
শৃঙ্খল-পরা চির-গোলামের কিসের ধর্ম্ম কিসের জাত॥

মোরা নহিগো হিন্দু, নহি মুস্‌লিম্······

শেষপ্রশ্ন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ইঙ্গিত সম্পাদক সমীপেষু :—

আপনি আমাকে বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশ সেনের 'শেষপ্রশ্ন' সম্পর্কে চিঠিটির সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে অনুরোধ ক'রেছেন। আমি নানা কারণে বাদবিসম্বাদের (controversy) মধ্যে নামতে অনিচ্ছুক, কিন্তু আপনার এ অনুরোধ ঠেল্‌তে পার্‌লাম না এই জন্যে যে বন্ধুবর ক্ষিতীশ সেনের পত্রটি আমার ভালো লেগেছে। কেন একটু বলি আগে।

দেশে একটা ধুয়ো উঠেছে সম্প্রতি—art for art's sake ; এই ধুয়োটিকে আমি মনেপ্রাণে অশ্রদ্ধা করি—এই ভাবাবেগহীন বক্তব্যহীন প্রেরণাহীন aestheticism-এর ধুয়োকে। এ কথাটি বোধ হয় Oscar Wilde সব প্রথম সৃষ্টি করেন—যাঁর সৃষ্টিও হ'য়েছিল তেম্‌নি—চিত্তরঞ্জক কয়েকটি কথা সুন্দর ঠুনকো হৃদয়হীন ভঙ্গীতে বলা। আর্ট কী? না, এই ভঙ্গী। অর্থাৎ কিনা আর্টের কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, যেহেতু আর্ট হচ্ছে unmoral, যেহেতু আর্টের কোনো উদ্দেশ্য নেই, যেহেতু আর্টের লক্ষ্য শুধু for art's sake হওয়া। এর মানে কী দাঁড়াচ্ছে তা হ'লে?—না, কোনো সৃষ্টি সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে যদি সে রূপায়িত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, অথচ সে-রূপের পিছনে রূপাতীত কোনো সত্যকে এড়িয়ে চলে প্রাণপণে। এই শ্রেণীর লোকের বড় অপূর্ব্ব সব ধারণা আছে। মানে আর্টের সত্য শুধু তার রূপায়নের সার্থকতায়। অন্য কোনো সার্থকতা থাক্‌লে যেন তার জাত যাবেই।

মানি রূপচয়নে যদি কোনো সৃষ্টি সত্যই সার্থক হয় তবে দার্শনিক দিক দিয়ে সত্য না হ'লেও তার বাঁচবার দাবী আছে—যদি একথার মানে শুধু এই হয় যে রূপকার রূপের মধ্যে দিয়ে এক শ্রেণীর সত্যকে মূর্ত্ত ক'রে ধরতে পারেন। কিন্তু এ কথা মানা চল্‌তে পারে না যে আর্টে সত্যের যে একটা রূপগত সত্যপ্রতিষ্ঠা আছে সে-রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপ তার কাছে বিষবৎ পরিত্যজ্য। অর্থাৎ artএ কোনো moral থাক্‌তেই পাবে না—কোনো মহনীয় পরিণতির ইঙ্গিত ফুট্‌তেই পাবে না—কোনো মহৎ সত্য উপলব্ধির আনন্দ আসন পেতেই পারবে না। সত্যের রূপ এক রকম নয়। নাইটিঙ্গিলের গানের সত্য ও ধর্ম্মোপলব্ধিগত প্যারাবলের সত্য এক শ্রেণীর নয়। কিন্তু তাই ব'লে বলা যায় না কীট্‌সের নাইটিঙ্গেলের ওড-ই আর্ট, খৃষ্টের প্যারাবল্ আর্ট নয়। শেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্র চিত্রণের সত্য মহিমময়। কিন্তু তাই ব'লে প্রমাণ হয় না La Fontainএর Fables বা প্লেটোর ডায়ালগ বা মহাভারতের অপূর্ব্ব মহৎ সৌন্দর্য্য আর্ট নয়। রূপায়নে রূপগত সত্য মুখ্য মানি। কিন্তু মহত্ত্বের, করুণার, নীতির (ethics) প্রেমের, প্রীতির, স্বার্থত্যাগের, এদেরও একটা রূপগত সত্য আছে। আর্টে তাদের স্থান হবে না কেন? আর্টে কোনো moral থাকবে না, কোনো বক্তৃতা থাকবে না, কোনো গভীর সত্য উপলব্ধি থাকবে না (আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বা সামাজিক)—থাকবে শুধুই রূপায়নের রূপগত আকর্ষণী শক্তিটুকু—এ ভাবে আর্টকে দেখা aesthete-দেরই সাজে—যাদের মধ্যে Oscar Wilde ছিলেন অন্যতম। এমন কি বক্তৃতার মধ্যেও একটা মহৎ আর্ট আছেই—যেজন্যে গভীর দার্শনিক এমার্সন Eloquence কে আর্টের পর্য্যায়ে ফেলে বল্‌ছেন "Eloquence is the appropriate organ of the highest personal energy. এর পরিচয় পাওয়া যায় প্লেটোর ডায়ালাগে। কী সুন্দর! কী জীবন্ত! কী চিরন্তন! আর্টের moralএর পরিচয় নিত্যই পাই রামায়ণে, মহাভারতে, ঈশপের গল্পে, পরমহংসদেবের অনুপম উপমায়, টল্‌ষ্টয়ের ছোট গল্পে, Wordsworthএর Odre to Immortalityতে, Lines written near the Tinten Abbey-তে, গেটের বহু লিরিক কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরেতে, মলিয়রের ব্যঙ্গে, শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজে—কত বইয়ে। কাব্যে দার্শনিকতা দীপ্ত হ'য়ে অনুপম কাব্য রচিত হয়েছে ও বহু ললিত সৃষ্টিতে-

উপনিষদের বহু শ্লোকে, গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে, ডষ্টয়েভস্কির Brother Karamazovএ, ইবসেনের কত নাটকে, শেলির Adonais-এ, গেটের Faust-এ, লরেন্সের Pansies-এ, Aldous Huxley-র Antic Hay তে, রোলাঁর ক্রিস্টফারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরও বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারতাম। কিন্তু তার বোধহয় আর প্রয়োজন নেই। কারণ আমার মনে হয় আর্টের ইতিহাসের ও অন্যান্য দৃষ্টান্তের দিকে একটু চোখ চেয়ে দেখ্‌লেই কেউই বল্‌বেন না যে আর্টের শুধু এক রকম মাত্র রূপ হ'তে পারে—সে হচ্ছে তার unmoral রূপ, unphilosophic রূপ। বস্তুতঃ আমাদের Symbolism-এর দোলা ভারতে এ art for art's sake-এর ধুয়োর অঙ্কুর যে রাতারাতি এমন বনস্পতির মতন গগনস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে তার শুধু একটি মাত্র কারণ আছে। সে-কারণ এই যে এ-কথার আমদানী হ'য়েছে য়ুরোপ থেকে। সুতরাং একে আমরা গুরুবৎ লালন করতে বাধ্য।—এমন কি সে-দিনেও যেদিনে য়ুরোপ এ সেকেলে গাছটি তার সব বড় বড় বাগান থেকে উপ্‌ড়ে ফেলে দিয়েছে। "পত্রাবলী"-তে এই কথাই আমি ব'লেছি বীরবলের কথায় সায় দিয়ে যে য়ুরোপের "কাল" চিরদিন আমাদের "আজ" হ'য়ে এসেছে। তাই য়ুরোপের নাস্তিকতা বা agnosticism-তে আমরা মানবাত্মার অনুসন্ধিৎসার থেকে উত্তর জেনেছি—যখন ওরা ফের অবিনশ্বর তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছে; তাই আমরা বিজ্ঞানকে "সর্ব্ব মঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে" ব'লে একমাত্র উপাস্য ক'রে স্তব জুড়ে দিয়েছি তখন য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকরাই বল্‌ছেন বিজ্ঞানে চরম সত্য মিল্‌তেই পারে না।

কিন্তু বস্তুতঃ আর্টেরও স্তরভেদ আছে—প্রকারভেদ আছে—মাপকাটির ভেদ আছে। এপিককে যে-ভাবে বিচার করি লিরিককে সেভাবে করি না। শৃঙ্গার রসের কবিতাকে যে ভাবে বিচার করি দার্শনিক কবিতাকে সে ভাবে বিচার করি না। Folk music-কে যে কান দিয়ে শুনি রাগালাপকে সে কান দিয়ে শুনি না। রঙ্গালয়কে যে ভাবে উপভোগ করি বায়স্কোপকে সে ভাবে করি না। কোনো মহাত্মার পরম সুন্দর জীবনীকে যে ভাবে গ্রহণ করি—উপকথাকে সে ভাবে করি না। আর্ট জীবনের নানা দিকের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবাহ, নানা ভাবে রসগ্রাহী করবার রস পরিবেষণ করবার উপায়। পরমহংসদেবের ভাষায়—আর্ট অনেকটা ব্রহ্মের মতন—এক কথায় ওর ইতি করা যায় না। বিশেষ ক'রে বলা বড়ই কঠিন কোন্‌টা আর্ট, কোন্‌টা আর্ট নয়।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বল্‌ছি না যে বটতলার উপন্যাস যে আর্ট নয় এ-ও বলা যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি রকম জানেন? একটা উদাহরণ দিলে প'রিষ্কার হবে। বলা যায় ঘাস উদ্ভিদ ও পাখী প্রাণী। সত্য। কিন্তু এমন ধরণের জীব আছে (Sponge জাতীয়) তারা উদ্ভিদ না জীব—জোর ক'রে বলা যায় না। আর্টের কাছাকাছি এসে পড়লে অনেক সময় বলা কঠিন হয় রচনা ঠিক "সৃষ্টি" হ'ল কিনা—মানে রসোত্তীর্ণ হ'ল কিনা। এ বিষয়ে মতভেদ এত বেশি ও বিজ্ঞসমাজেও মতান্তর ও মনান্তরের দৃষ্টান্ত এত প্রচুর যে একটু খবর রাখ্‌লে দিশেহারা হ'য়ে পড়তেই হয়। ষ্ট্রাচি সাহেবের Books and Characters বইটিতে এ-রকম নানা উলটা-পালটা নজীর আছে—একদল যাকে ব'লেছেন শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর আর্ট আর একদল তাকে ব'লেছেন অতি বাজে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞজনেরও ঠিকে ভুলের নজীর আছে। গেটে পামেলার মতন তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস প'ড়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়েছিলেন, শেলি ডন জুয়ান প'ড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের মধ্যে ঔপন্যাসিকের দেখা পেয়েছিলেন, ইত্যাদি। সে সব দিয়ে এ ক্ষুদ্র চিঠি ভারাক্রান্ত করতে চাই না। অন্নদাশঙ্করকে আমার বল্‌বার কথা ছিল এই যে যখন আর্ট নিয়ে জোর ক'রে কিছুই বলা যায় না তখন "শেষপ্রশ্নের" মতন উপন্যাস লেখার জন্যে (যা আমাদের অনেককেই মুগ্ধ ক'রেছে) অন্ততঃ শরৎবাবুকে গালাগালি করা সাজে না। অন্নদাশঙ্কর যদি বল্‌তেন বইটি তাঁর ভালো লাগে নি ও এই এই কারণে ভালো লাগে নি, আমরা মন দিয়ে শুন্‌তাম, এবং শিখ্‌তামও। কিন্তু যখন তিনি বল্‌লেন যে শরৎচন্দ্রের এবার থামা উচিত তখন তাঁর একান্ত নিজের রায়কেই একান্তরূপে প্রামাণ্য ধরে মানীলোকের অসম্মান করায় আমি ব্যথিত হ'য়েছিলাম। বলতে ইচ্ছে হ'য়েছিল (বন্ধুবর গিরিজাপতিকে লেখা):—

সখে ! কঠিন কথা বলা সরল ক'রে,
নিন্দা করা সত্যি দরদ ভরে,
সমালোচন—নিজের ত্রুটি বুঝে,
সাঁচ্চা মেকির প্রভেদ খুঁজে খুঁজে,
এর প্রয়োজন হয়ত আজও আছে,—
তাই রূঢ়ভাষ চাই হে তোমার কাছে ;
অন্ততঃ হে সুহৃদ্, তোমায় জানি
তাই তোমারে দরদী বাখানি ।
(শুধু) একটি কথা কেবল চুপি চুপি
ফেল্‌ব ব'লে ?—(নয় কো গুরুরূপী)
যদ্যপি নয় একটুও সে নূতন
সইবে তবু বারেক পুনর্বদন ;
(পুরোণো চাল—জান্‌বে—ভাতে বাড়ে,
না জান্‌লে হায়, লক্ষ্মী ছাড়েই ছাড়ে)
রটিয়ে গেছেন যা কালিদাস কবে—
"ভিন্ন রুচি লোকে হবেই ভবে ।"
(জানো) তবু (কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ?)
নিজের রুচির রায়গুলিরেই চরম
সবাই ভাবে ; নয় কি ? বারেক মিতা,
চিন্তি' দেখ,—সত্য নহে কি তা ?
লাখ কথারি এক কথা যে কবি
গেছেন ব'লে—তাই না তিনি 'নবী' !
সত্যি,—যতই সমালোচন-ধারা
পড়ছি—ততই হচ্ছি দিশেহারা ।
(ক্রমে) বিন্দুও হয় সিন্ধু সমান গুরু
দিন হয় রাত্তি—বুক যে দুরু-দুরু !
না ভাব্‌লে যা জলের মতন সাফ্
ভাব্‌লে যেন পাহাড়—লাগে হাঁফ !
কোনো নীতিই রয় না আর অচলা,
চরণ থেকেও হই যেন অবলা ।
এ যেন যাট্‌ বছর শাস্ত্র ধুনে
সবে-হওয়া মূর্খ লোকের গুণে ।
(বুড়ো) সেই যে রোগী বিশটি চিকিৎসকে
দেখিয়েছিলেন রোগটি—(পাছে ঠকে !)
বিশটি নিদান—আকাশপাতাল তফাৎ
বিশটি ওষুধ—মিল্‌ল—কী জোর বরাৎ !
তেমনি যদি একটি করি যাচাই
করতে সুধাও বিশটি ক্রিটিক বাছাই,—
ফিরবে যখন—বাক্য যাবে হ'রে,
হয় বা না হয়—এসো পরখ ক'রে ।
(আরো) শুধু কি তাই ! ভিন্ন কবিরা নিতি
রসজ্ঞেরো পাচ্ছে নাকি প্রীতি ?
মিছরি-মুড়ীর এক দর তো কী !
না করলে এক তাঁরাই বলেন "ছিঃ !"
বড়ই দুঃখে বল্‌ল কবি : "বাঁচি—
নিরবধি কালের প্রসাদ যাচি ।"
কঠিন কথার উজান পরমাদে
পাল তুলে তাই একান্ত আহ্লাদে—
পরের টুকু উহ্য দিলাম রেখে,—
দেখো, যেন গায় নিয়ো না মেখে ।

আমাকে এখানে ভুল বুঝবেন না যেন। এখানে কোনো বইতে ভালো না লাগলে ভালো লাগ্‌ল না বলার অধিকার অসিদ্ধ এ আমি বল্‌ছি না। (যদিও একথা আমার মনে হয় মস্ত শিল্পীর লেখা সম্বন্ধে ভালো না লাগ্‌লো বল্‌তে গেলেও একটু বেশি করে সাবধান ও সংযত হ'য়ে বলা বাঞ্ছনীয়—যে সাবধানতা সাধারণ লেখকদের সম্বন্ধে অবলম্বন না করলেও চলে। আমি সাম্যবাদী নই—অমহতের চেয়ে মহৎ আমাদের ঢের বেশি অর্হণীয় একথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।) কিন্তু আমি অন্নদাশঙ্করকে ব'লেছিলাম শরৎবাবুর লেখার দোষগুণ নিয়ে সমালোচনা করুন—কিন্তু তার জন্যে শরৎচন্দ্রকে মূর্খ বলা অশোভিন। বিশেষ ক'রে তাঁর পড়াশোনা যথেষ্ট আধুনিক নয় বলার নাম কটূক্তি ;—তা'ছাড়া এ হচ্ছে গায়ের জোরে। এবং যেটা এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা সেটা এই যে এ ধরণের মত বাহির করার "পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম" হয়। আমাকে একটি তরুণ বন্ধু বল্লেন, য়ুরোপের অনেক উদ্ধত তরুণ এ রকম টোনে শ্রদ্ধেয় মানুষের সম্বন্ধে কথা বলে। মানি।—কিন্তু আমরা য়ুরোপের

অনুকরণ করতে বসি নি। ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ —শ্রদ্ধা, পূজা। সে-সম্পদ আমরা ব্যক্তিবাদের বা য়ুরোপের চলন বলনের দোহাই দিয়ে হারাতে পারি না। শরৎচন্দ্রের কাছে বাঙালীর ঋণ—দরদীর ঋণ—প্রেমিকের ঋণ—রসানন্দীর ঋণ গভীর। তাঁর বইয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা অন্যায় বলি না—কিন্তু শ্রীনীরেন্দ্র রায়, * বা শ্রীঅন্নদা শঙ্কর রায়ের টোনে না। এঁরা শরৎচন্দ্রের সমালোচনা ক'রেছেন যেন "শেষপ্রশ্ন" লিখে তিনি মহা পাপ ক'রে ব'সেছেন এবং তিনি অন্য দশজনার একজন। এই শ্রেণীর ডিমক্রাসী অত্যন্ত অসার। পূজ্য যে পূজা পাবে সে পূজা ধূলিধূসরিত মানুষ পেতে পারে না। কবি আমাদের যে কৃতজ্ঞতা পাবেন, চর্ম্মকার সে কৃতজ্ঞতা পেতে পারেন না। পরমহংসদেব বল্‌তেন: "ওরে মানীলোকের অসম্মান করতে নেই। ভগবানও করেন না।" সব বড় পাওয়ার গোড়াকার কথা—নত হওয়া। দান গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহীতার—দাতার নয়। শরৎবাবুর কাছ থেকে, লরেন্সের কাছ থেকে, আলডুস্ হাক্‌স্‌লির কাছ থেকে, গল্‌সওয়ার্দ্দির কাছ থেকে আমরা কতখানি পাব তা নির্ভর করবে এঁদের আমরা কতটা ভালোবাস্‌তে পেরেছি, কতটা শ্রদ্ধা করতে পেরেছি, এঁদের সাম্‌নে কতটা নত হ'তে পেরেছি। বেনেট একটি কথা বল্‌তেন বড় খাঁটি: "There's no means of understanding a man more than by loving him more". "শেষপ্রশ্ন" বুঝ্‌তে হ'লে শরৎচন্দ্র যে ব্যথা নিয়ে কথা বলেছেন সেটা আগে বুঝতে হবে। তবে বোঝা যাবে কমল কী বল্‌তে চাইছে।

এ চিঠি শেষপ্রশ্নের সমালোচনা নয়। অল্প পরিসরে শেষপ্রশ্নের মতন বইয়ের সমালোচনা সম্ভবও নয়। আমি শুধু এই চিঠিতে অন্নদাশঙ্কর প্রমুখ ক্রিটিকদের আর্ট ফর আর্টস্ সেক নীতিবাদের তারস্বরে প্রতিবাদ করছি।

* নীরেন্দ্রনাথ রায় রুখে উঠে লিখ্‌লেন যে রূপকার উপকার করতে চেয়েছেন ভগবান তাঁর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। দরদী মানুষ কল্যাণ কামনায় অনেক কথা না বলে পারেন না। বঙ্কিম আনন্দমঠ বা দেবী চৌধুরাণী লিখে আর যাই হোন আমাদের অভিশাপ-ভাজন হন নি।

কারণ ওর চেয়ে অসার নীতি, ঠুন্‌কো slogan মানুষের মুখ দিয়ে কমই বেরিয়েছে। আর্ট জীবনের নানা স্বপ্ন নানা ব্যর্থতা নানা প্রেম, নানা দর্শন, নানা শ্রুতি, নানা গভীর সত্য উপলব্ধি, নানা মর্‍্যাল, নানা অলঙ্কার নানা বিভূতিকেই ফুটিয়ে তুল্‌বে। ওর উদ্দেশ্য শুধু রূপায়ণে পর্য্যবসিত হ'তেই পারে না, বা এ-ও সত্য হ'তে পারে না যে আর্টের দিক্ দিয়েও বুদ্ধের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিত্রচিত্রণ ও নীরোর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিত্রচিত্রণ সমান গৌরবময় হ'তে বাধ্য।

আলডুস্ হাক্‌স্‌লির আর্ট ফর আর্ট'স্ সেক নীতির উপর একটি আক্রমণ সেদিন চোখে পড়ল তাঁর Antic Hay নামক খ্যাতনামা উপন্যাসে। সেটি একটু দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত না ক'রে থাক্‌তে পারলাম না। শুনুন। এবং মনে রাখ্‌বেন আধুনিকতার দিক্ দিয়ে, স্বাধীন চিন্তার দিক্ দিয়ে, পাণ্ডিত্যের দিক্ দিয়ে, আলডুস্ হাক্‌স্‌লি আজ ইংলণ্ডের শিরোমণিদের অন্যতম, তাই এঁর কথাকে আর যাই করুন না কেন হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন না, শ্রীঅন্নদাশঙ্করও না, শ্রীনীরেন্দ্রনাথও না।

"Life" he said, "life—that's the great essential thing. You've yet to get life into your art, otherwise it's nothing. And life comes only out of life, out of passion and feeling...... That's the stupidity of all this chatter about art for art's sake and the aesthetic emotions and purely formal values and all that. It's only the formal relations that matter; one subject is just as good as another—that's the theory. You've only got to look at the pictures of the people who put it into practice to see that it wo'nt do. Life comes out of life. You must paint with passion and the passion will stimulate your intellect to create the right formal relations. And to paint with passion you must paint things that passionately interest you, moving things, human things. Nobody can seriously be as much interested in napkins, apples and bottles as in his lover's face, or the resurrection, or the destiny of man....... Could

I have painted that portrait if I hadn't loved you ?"

পরে শেষপ্রশ্নের সমালোচনা করার ইচ্ছা রইল। কিন্তু এ পত্রে ব'লে রাখি এ-বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয় নি, যদিও তিনি আমার প্রতি যাকে ইংরাজীতে বলে "ঠাণ্ডা" তাই হ'তে আরম্ভ ক'রেছেন—অথচ আশ্চর্য্য এই যে সাহিত্যে স্বাধীন মতামতের অবাধ প্রকাশের তিনি পক্ষপাতী হয়েও তাঁর প্রবন্ধ আমাদের ভালো লাগে নি এ কথায় রাগ ক'রেছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাগ তাঁর থাকবে না—এবং তাঁর মতন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ সহৃদয় যুবক দুদিন বাদে নিজেই স্বীকার করবেন যে "ও ভাষায়" শরৎচন্দ্রের মতন নমস্য শিল্পীকে আক্রমণ করা তাঁর অনুচিত হ'য়েছিল—যেমন মাইকেলকে আক্রমণ করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকেও পরে অকপটে স্বীকার করতে হ'য়েছিল। এজন্য অন্নদাশঙ্করকে সত্যিই খুব দোষ দেই না, বস্তুতঃ যৌবন একটু হঠকারী হয়েই থাকে। এমন কি ও তার খানিকটা স্বধর্ম্মই বলা যায়। এ আমি তাঁকে patronize করার জন্যে বল্‌ছি না—তিনি যেন বিশ্বাস করেন। কারণ আমি নিজেই জানি কতবার এ-ধরণের হঠকারিতা আমি নিজেই ক'রেছি যৌবনের রক্ত গরমের ফলে। সবচেয়ে ভরসার কথা এই যে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর বা শ্রীনীরেন্দ্রনাথ sweeping generalisation-এ শরৎচন্দ্রের সিংহাসন বাঙালী হৃদয় থেকে তিলার্দ্ধও টল্‌বে না এবং ক্ষিতীশচন্দ্রের সঙ্গে আমি একমত যে কমল বাংলা সাহিত্যে একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

তবে শুধু একটি কথা আমি শরৎবাবুর বিপক্ষে বলব এ-চিঠির সমাপ্তি টান্‌বার আগে। সেটা এই যে কমলের বিপক্ষে তিনি যে-সব বোকা লোকদের দাঁড় করিয়ে তাঁর বিপক্ষ মতকে অপদস্থ করিয়েছেন সেটা fair হয় নি, আর্টের দিক্ দিয়েও না—সত্যের দিক্ দিয়েও না। এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে যদি আক্রমণ ক'রে হেয় প্রতিপন্ন করাই তাঁর উদ্দেশ্য হয় (এ উদ্দেশ্য তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লে এ প্রতিপাদনের চেষ্টা তাঁর পক্ষে অন্যায় নয়) তাহ'লে সে উদ্দেশ্যও সাধিত হয় নি। কারণ ও-ভাবে একটা চরিত্রকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ক'রে তার প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে সবই প্রতিপন্ন করা যায়। কমলের বিপক্ষে গোরাকে নামিয়ে যদি শরৎবাবু তর্কে জিত্‌তেন তবে বুঝতাম। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অদ্ভুত। তিনি যখন যে-চরিত্রকে দিয়ে কোনো point of view প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তখন তাকে দিয়ে সে বিষয়ে চরম কথাটি বলিয়ে ক্ষান্ত হ'য়েছেন। দৃষ্টান্ত তাঁর পঞ্চভূত, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, গোরা। মদীয় পিতৃদেব বহুদিন আগে গোরা প'ড়ে "বাণী" কাগজে লিখেছিলেন :—

"এই উপন্যাসে বহুল পরিমাণে তর্ক বিতর্ক আছে, কিন্তু তাহাতে পাঠকের বিতৃষ্ণা হয় না, বরং সেইগুলি বোধহয় যেন মাণিক্যের মত পুস্তকমধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে। এ-তর্কগুলির মজা এই যে, যখন যে-উক্তিটি যে-পক্ষে উক্ত হইয়াছে তখনই সে-উক্তি সেই পক্ষের চরম যুক্তি বলিয়া বোধহয়, এবং বিপক্ষ পক্ষ তাহার উত্তরে কি বলিবে তাহা জানিবার কৌতূহল বাড়ে।"

এই-ই হওয়া উচিত। দ্রষ্টব্য গল্‌সওয়ার্দ্দির নানা চরিত্র ও point of view চিত্রণেও তাঁর এই ধরণের কৃতিত্ব মুগ্ধকর। তাঁর বিখ্যাত নাটক Strife এর জলন্ত দৃষ্টান্ত। একদিকে হৃদয়হীন Capitalist সচিব অ্যান্টনি, অন্যদিকে হৃদয়বান শ্রমিক নেতা রবার্ট কিন্তু গ্রন্থকার আশ্চর্য্য কৌশলে দু'জনেরই প্রতি সমবেদনা জাগিয়ে তুলেছেন—দুজনেরই সম্ভ্রম ও গৌরব বজায় রেখে। একজনকে মরা তৈরী ক'রে তার ওপর খাঁড়ার ঘা চালিয়ে জয়ী হ'তে চান নি—যা কমলের পদ্ধতি পদে পদে। শেষপ্রশ্নে কমল যেখানে সেখানে যাকে তাকে তুলো ধুনে ছেড়ে দিচ্ছে—কেন না she never met her match. অথচ এ-শ্রেণীর আর্টে এই জুড়ির সৃষ্টিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিষ। তাই জন্যে আমার মনে হয় শেষপ্রশ্নের সব চেয়ে বড় ত্রুটি এইখানে। বেশ বোঝা যায় গ্রন্থকার above the battle-field ন'ন। কমলকে তিনি আঁকতে গিয়ে যে তার মধ্যে নিজের মতামতের আসন পেতেছেন—তাতে দোষ নেই (শিল্পীর প্রিয় চরিত্রের মধ্যে তাঁর নিজের ছায়া পড়বেই)—কিন্তু কমলকেই ফোটানোর জন্যে তার প্রতিপক্ষদেরকেও ফোটানো উচিত ছিল। ইংরাজীতে

বল্‌তে হ'লে বল্‌তে হয় Kamal's convincing logic has in the end defeated itself.

কিন্তু তার স্বপক্ষেও কিছু বল্‌বার কিছুই যে নেই তা বলি না। ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্ম আমাদের দেশের বুককে ঝাঁঝরা করে রেখে গেছে যে এ-পীড়িত দেশে শরৎচন্দ্রের মতন দরদীর পক্ষে স্বাধীন দেশবাসী গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির মতন "যুদ্ধের ঊর্দ্ধে" থাকা সম্ভবপর হয় নি। তিনি তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছেন অসহায় কমলের দিকে। কিন্তু আবার মুস্কিল এই যে কমলকে কোথাও অসহায় মনে হয় না—মনে হয় বরং যে ওর প্রতিপক্ষেরাই দল বেঁধে অসহায় একা ওর বিরুদ্ধে। এরকম তেজস্বিতার চিত্রণ দুর্লভ—যে-কোনো সাহিত্যেই, মানি। কিন্তু তাতে ক'রে কমলের "বক্তব্যগুলি" সর্ব্বত্র জোর পায় নি এই-ই আমার বল্‌বার কথা। কমল অপূর্ব্ব হ'য়ে শতদলের মতনই ফুটেছে —কিন্তু তার আক্রমণগুলো লক্ষ্যভেদ করে নি।

আর একটা কথা অবশ্য মনে হয়ই এ সম্পর্কে যা রোলাঁ ব'লেছিলেন টল্‌ষ্টয়ের সম্বন্ধে যখন টল্‌ষ্টয় ব'লেছিলেন যে ওয়াগনারের সঙ্গীত বিশেষ কিছু নয়। রোলাঁ ব'লেছিলেন যে তাঁর দুঃখ এই যে টল্‌ষ্টয় সঙ্গীত সম্বন্ধে রায় দিতে গিয়ে এমন সব কথা ব'লেছেন যাতে সঙ্গীতাভিজ্ঞের ভেতর মনে দুঃখ হয়ই এই ভেবে কেন সঙ্গীত সম্বন্ধে একটু ভালো ক'রে না জেনে এ-রকম সব কথা বল্‌তে গেলেন? শরৎচন্দ্র যখন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে আক্রমণ করেছেন আমার বার-বারই মনে জেগেছে এই আক্ষেপ। মনে হয়েছে কেন তিনি ভারতীয় অধ্যাত্মিকতাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে কোমর বাঁধার আগে তার স্বরূপ সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করলেন না? তা'ছাড়া—যেটা এসম্পর্কে সব চেয়ে বাজে—শুধু শোনাকথার উপর ভিত্তি ক'রে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোতে শরৎবাবু নিজেও খানিকটা পূজ্যপূজা ব্যতিক্রম করেন নি কি—যে-আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্যে ভারত বুদ্ধ, কবীর, নানক, শঙ্কর, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মহামানবের জন্মদান ক'রেছে? পুনরায় মনে হয় Bennet এর কথা—কোনো কিছুকে সত্য বোঝা যায় কি—প্রেমের আলোয় ছাড়া?

ইতি ভবদীয়
শ্রীদিলীপ কুমার রায়।

পুঃ। এ প্রবন্ধ কিন্তু শেষপ্রশ্নের সমালোচনা নয়। এর নাম হওয়া উচিত বোধ হয় "আর্ট ফর আর্টস্‌ সেক", না? চিঠি ব'লে দু'টো অবান্তর কথা বল্‌লাম। সে সবই দয়া ক'রে ছাপাবেন—এ পুনশ্চটুকু সমেত।

উদয়-তারা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুনীল কুমার ধর

ঙাঁদায় লাস্যে, আভাষ ও ইঙ্গিতে তাহাকে লুব্ধ করিয়া একেবারে কাছে টানিয়া আনিয়া যে নারী, সতী সাজিয়া তেজ দেখাইবার অভিনয় করিতে পারে, প্রকাশের ইচ্ছা হইল, দুই হাতে গলা টিপিয়া চিরকালের জন্য তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকাশ একটি কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না! তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ, অসাড় হইয়া গেছে। কথাগুলো বলা শেষ করিয়াই বরুণার মনে হইল এত নিষ্ঠুর ভাবে না বলিলেও চলিত কিন্তু প্রকাশের চেয়ে তাহার ভয় বেশী, নিশুতি-রাতের দুজনের এই বাধাহীন অবস্থাকে! এ অবস্থায় যে নিজেকেও বিশ্বাস করা চলে না, তাই চিরন্তন

দুর্বলতাকে কশাঘাত করিবার জন্যে এইটুকুর একান্ত প্রয়োজন ছিল! তা ছাড়া আজিকার রাত্রিই যে তাহার জীবনের শেষ রাত্রি নয় একথা বরুণা কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই!

প্রকাশ তখনও বরুণার মুখের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে, তাহার সারা মুখের উপর পড়িয়াছে একটা কালো ছায়া—কিন্তু বরুণার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে—এবং এমনিভাবে একটি কথাও না বলিয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল। কিন্তু প্রকাশকে ক্রমশঃ বেশী গম্ভীর হইতে দেখিয়া বরুণা আর না হাসিয়া পারিল না এবং এখন বরুণার ওষ্ঠপ্রান্তের ক্ষীণ হাসি-রেখাটির দিকে তাকাইলে বিশ্বাসই হয় না, এই মেয়েটি একটু পূর্ব্বে পাশের ঐ ছেলেটির হাত হইতে নিজের সম্মান রক্ষার জন্যে শিকল টানিয়া ট্রেণের গতিরোধ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িতেও পারিত। বরুণাকে হাসিতে দেখিয়া প্রকাশ বরুণার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া গাড়ীর বাহিরে তাকাইল। তাহার রূঢ় ব্যবহারে প্রকাশ যে অত্যন্ত আহত হইয়াছে এবং রাগিয়াছে একথা বরুণা যে বোঝে নাই এমন নয় কিন্তু প্রকাশ যে কেবল রাগের বশেই মুখ ফিরাইয়া লইল না একথা বুঝিয়া জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তোমার এ অভিমানের কোন মানে হয় না, প্রকাশ—

বরুণা আজ প্রথম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল এবং এই ছোট ডাকের মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল যে, প্রকাশ ক্ষণেকের জন্যে বরুণার মুখের দিকে না তাকাইয়া পারিল না।

বরুণা বলিল—আমার এ দেহটার পূর্ব্ব ইতিহাস শুনলে আমাকে ছুঁতেও তোমার ঘেন্না কোরবে—

এবং কথা শেষ না করিয়াই একেবারে প্রকাশের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া বরুণা বলিল—দেহটা বাদ দিলে মানুষের কিছুই থাকে না জানি, কিন্তু কেবল দেহটাই মানুষের সব নয়......

বরুণার স্পর্শ হইতে নিজের দেহকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া প্রকাশ একটু রাগের সুরে বলিল—দেহ আর মনের analysis করবার মত অবস্থা, অন্ততঃ আমার মনের নেই, ক্ষমা করো—

প্রকাশের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বরুণা বলিল—রাগ করো না লক্ষীটি! দিন কতকের জন্যে আমাদের পরস্পরকে ছেড়ে যাবার যখন উপায় নেই তখন একটা মীমাংসা হওয়া দরকার। একটা ভুল ধারণা নিয়ে আমি তোমার দূরে দূরে থাকব বা তুমি একটা মিথ্যে লজ্জার ভয়ে আমার কাছে আসবে না, সে বড়ো বিশ্রী—

প্রকাশের মনের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছে না, কোন্ বরুণা সত্য। যে বরুণা এখন তাহার হাত ধরিয়া ছোট বোনটির মত মিনতি জানাইতেছে—না, যে বরুণা উপযাচক হইয়া তাহার বধূ সাজিয়াছে—অথচ দূরে থাকিতে চায়! প্রেমের কবিতার দোহাই দিয়া প্রথম যৌবনে কবি প্রকাশ যে সব নারীর বন্ধুত্বও সঙ্গলাভ করিয়াছিল তাহারা ঠিক বসন্তের প্রজাপতির মত, তাহাদের দেহে-মনে রঙের প্রাচুর্য্য কিন্তু বেশীদিন তাহাদের মনে থাকে না। তাহার পর যাহারা আসিয়াছে—তাহাদের অনেককে আজও মনে পড়িলেও এই মেয়েটির মত কেহ তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে নাই!

প্রকাশ বলিল—পুরুষকে লুব্ধ করবার ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে আজ পর্য্যন্ত আমার মত অনেকের ঘাড়ে তুমি চেপে ব'সেছ, কিন্তু কি যে তুমি চাও—আর কী তোমার উদ্দেশ্য তা আজও বোঝা গেল না। অমরেশকে তুমি যা ব'লেছিলে তা যদি সত্য হয় অর্থাৎ পুরুষকে নিয়ে ঘর বাঁধবার নেশা তোমার নেই তা হ'লে তোমার এ অভিনয় কেন? আর এ অভিনয়েরই বা কারণ কি? মুখ ফিরিয়ে নিলে হবে না, বরুণা, তোমাকে বোলতেই হবে কি তোমার উদ্দেশ্য......

মিনিট দুই তিন মুখ নীচু করিয়া রাখিবার পর বরুণা যখন প্রকাশের মুখের দিকে তাকাইল তখন তাহার সারা মুখে একটা অপূর্ব্ব আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ও যেন কোন পাপই জানে না!

বরুণা বলিল—নারী তোমাদের পথের বাধা এই কথাই

তোমরা শুনে ও জেনে এসেছে কিন্তু সব নারীই যে চোখের জল ও আকৃতি নিয়ে পথরোধ কোরো দাঁড়ায় না—সে যে প্রয়োজন হ'লে সাথী হ'তে পারে, তার প্রিয়তমের সঙ্গে পাশা-পাশি ব'সে দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে এই কথা প্রচার করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য—

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল—বড়ো নাটুকে হ'য়ে যাচ্ছে, বরুণা, আমি একথা শুনতে চাই নি। এ রকম অনেক কথা প্রতিদিন কাগজে দেখতে পাই—

বরুণা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে ?

অপরূপ বরুণার এই হাসিটুকু !

প্রকাশ বলিল—কথাটাকে এড়িয়ে গেলে চ'লবে না বরুণা। তুমি বলো আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও ?

বরুণার হাসি এখনও থামে নাই, বলিল—আপাততঃ তোমাকে সঙ্গে কোরে পাটনায় যেতে চাই,—

গম্ভীরভাবে প্রকাশ বলিল—কিন্তু আগের ষ্টেশনেই আমি নেমে যাচ্ছি—

বরুণা পুনরায় প্রকাশের হাতখানি নিজের হাতের উপর লইয়া বলিল—ইস্, যাও দেখি তুমি কেমন কোরে যাবে—

প্রকাশ হাত ছাড়াইয়া লইয়া বেশ একটু রাগের সুরে বলিল—তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না বরুণা, এতই যদি সোহাগ তবে এত ভনিতাই বা কেন ?

বরুণার মুখ আবার কঠিন হইয়া উঠিল, দাঁত দিয়া দুই মুহূর্তের জন্যে ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া বলিল—দুটো মিষ্টি কথা বা একটুখানি নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার পেলেই মনে করো মেয়েরা তোমাদের প্রেমে প'ড়েছে—আর এই মনোভাব নিয়েই তোমরা চাও মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে !! ছিঃ, পুরুষ ও নারীর সব চেয়ে বড় সম্বন্ধ কি কেবল দেহকেই ঘিরে ?

প্রকাশ বসিয়াছিল, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এখন তুমি এমন ভাবে কথা বোলছ, বরুণা—যেন তোমাকে একলা পেয়ে আমি তোমার সঙ্গে কত অন্যায় ব্যবহারই না করিছি—কিন্তু আজকের সকালের ঘটনাগুলো কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

বরুণা ঠিক পূর্ব্বের মতই শান্তভাবে বসিয়া রহিল, তাহাকে এতটুকু চঞ্চল দেখা গেল না। প্রকাশ পুনরায় নিজের জায়গায় বসিবার পর বরুণা ধীরে ধীরে বলিল—না হয় মুখেই বলিছি, কিন্তু এ বিশ্বাস তোমার কেমন কোরে হোল যে, আমার সীঁথির সিঁদুর তোমারই উদ্দেশ্যে ?

—এ তোমার, কেবল মুখের কথা ! কিন্তু ও বাড়ীর মেয়েদের যদি কোর্টে হাজির করা হয়, তাহ'লে—

বাধা দিয়া বরুণা বলিল—তাহ'লে তোমার জেলও হ'তে পারে—

প্রকাশ কোন জবাব দিল না, বরুণাই বলিল—আমার স্বামী আছেন এবং সত্যিকারের বিয়ে হ'য়েছিল—

বরুণা মনে করিয়াছিল প্রকাশ হয়ত একথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিবে কিন্তু প্রকাশের কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, সে যেমন ভাবে বসিয়াছিল ঠিক তেমনিভাবে বসিয়া রহিল। বরুণাই প্রকাশকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বাস হোল না ?

বেশ শান্তভাবে প্রকাশ বলিল—গোড়াগুড়ি থেকে তোমাকে বিশ্বাস না করলেই ভাল ছিল, বরুণা, এখন এমন হয়েছে যে কি কোরব বুঝতে পারছি নে ! কিন্তু তুমি যে বিবাহিতা, তোমার স্বামী আজও বেঁচে আছেন, একথা ও বাড়ীর মেয়েরা জানে ?

—কেবল সাহানা জানে। একদিন দুপুর বেলায় খুব মেঘ কোরে বৃষ্টি এসেছে, হাতে কোন কাজ ছিল না, হঠাৎ খেয়াল গেল একখানা চিঠি লিখি। এমনি অনেক চিঠি আমি লিখেছি এবং লেখা শেষ কোরে দু তিন বার নিজে নিজে পড়ে ছিঁড়ে ফেলেছি—সেদিন কোন্ সময় যে সাহানা আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা বুঝতেই পারি নি হঠাৎ একটা নিশ্বাসের শব্দ কাণে আসতেই চম্‌কে তাকিয়ে দেখি, ও দাঁড়িয়ে আছে এবং ওর দুটি চোখ জলে ভ'রে গেছে। কিন্তু ও জানে না যাকে আমি চিঠি লিখ্‌ছিলাম তিনিই আমার স্বামী—তবে বুঝেছিল ঐ ছেলেটিকে আমি এখনও ভুলতে পারি নি—

বরুণার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ট্রেণ আসিয়া একটি ষ্টেশনে থামিল এবং কলরবে সচকিত হইয়া উঠিয়া বরুণা বলিল—থাক্, এসব কথা। তোমাকে এমন কোরে কাছে টেনেছি কেবল তোমাদের কাজের ধারা জানবার জন্যে কিন্তু

দেখ্‌লাম কাজের চেয়ে নিজেদের নিয়েই তোমরা বেশী ব্যস্ত এবং এই জন্যেই তোমাকে নিয়ে আমার এই খেলা! আমার কথা শুনে তোমার হয়ত রাগ হ'চ্ছে কিন্তু আমার দুঃখ যে তুমি আমাকে একদিনের জন্যেও বুঝ্‌তে চেষ্টা করো নি—প্রথম দিন থেকেই আমাকে দেখে তুমি আত্মহারা হ'য়েছ—

বরুণা চুপ করিলে কিছুক্ষণের জন্যে দুইজনের কেহই কোন কথা কহিল না। এই ষ্টেশন হইতে দুইজন পুরুষ যাত্রী এ কামরায় উঠিয়া কলরব সুরু করিয়াছে, সামনে আর একটি মাত্র ষ্টেশন, তাহার পরই পাটনা। কথায় কথায় রাত্রি যে কত হইয়াছে তাহা কাহারই খেয়াল ছিল না। দ্বিতীয়ার চাঁদ বহু পূর্ব্বেই অস্ত গিয়াছে—তাহার পর ইতিমধ্যেই কুয়াশা নামিয়াছে বলিয়া বাহিরের কিছুই আর নজরে আসে না। এমনিভাবে আরও কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর প্রকাশ বলিল—তৈরী হ'য়ে নেও বরুণা, —আর একটা ষ্টেশন পরেই আমাদের নামতে হবে—

—নামতে ত' হবে, প্রকাশ, কিন্তু আমার জীবনের আসল কথাটা না বোলে কেমন কোরে যে সাতদিন—সাতরাত্রি তোমার পাশে পাশে থাকব, এই হ'য়েছে আমার ভাবনা—

দুই মুহূর্ত্তের জন্যে বরুণার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রকাশ বলিল—তোমার সঙ্গে আমার এতদিনের ব্যবহার কেবল তোমার জন্যেই, বরুণা, তুমি আমাকে লোভ দেখিয়েছিলে আমি তোমায় কাছে টেনেছি, কিন্তু এ কথা যদি সত্যি হয়, কোন একটা বড় আঘাতের বেদনায় তুমি পথে বেরিয়ে এসেছ—অথচ তুমি নিজেকে আজও ভুলতে পার নি—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বরুণা—

প্রকাশকে বাধা দিয়া বরুণা বলিল—কথা দেওয়ার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রকাশ, আমি যদি পাটনার লোকের কাছে নিজেকে তোমার স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিই?

প্রকাশের মুখ যেন মুহূর্ত্তের জন্য কালো হইয়া উঠিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল—কোন রাত্রে তুমি যদি নিজে যেচে এসে আমার শয্যার অংশ চাও, আমি তোমাকে সমস্ত শয্যা ছেড়ে দিয়ে বাহিরে চ'লে যাব—

বরুণা ব্যগ্রভাবে প্রকাশের দুখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে ডাকিল—প্রকাশ—

প্রকাশ ডাকিল—বরুণা—

* * *

সভা ভাঙ্গার পর হইতে সহরের চারিদিকে গুজব চলিয়াছে—হয় আজ রাত্রি-ভোরে কিম্বা কাল দুপহরে প্রকাশ ও বরুণা কলিকাতাগামী ট্রেণে উঠিয়া বসিলে, পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করিবে।

প্রকাশ একথা শুনিয়া বলিল—একথা যদি সত্যি হয়, বরুণা, তা হ'লে আমি অন্ততঃ রক্ষে পাই—

প্রকাশের ঠোঁটের উপর হাত চাপিয়া ধরিয়া বরুণা বলিল—ফের, এখনও তোমার সেই পাগলামী গেল না—

গোল ঘরের ছাদের উপর প্রকাশ ও বরুণা দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মাথার উপর মেঘ-হীন উদার আকাশ—নীচের সভামণ্ডপের আলোর খানিকটা আভা আসিয়া তাহাদের মুখে পড়িয়াছে, ডানদিকে শীতের আঁকা-বাঁকা গঙ্গা দেখা যায়—তাহার মাঝখানের সরু চড়াটিতে বোধহয় কোন মাঝি আগুন জ্বালাইয়াছে—এ পাশে আলোর মালায় সজ্জিতা রূপসী নগরী!

দুইজনে পরস্পরের এত নিকটে দাঁড়াইয়া আছে যে বরুণার নিঃশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ প্রকাশের মুখে আসিয়া লাগিতেছে এবং তাহাদের দাঁড়াইয়া থাকিবার ভঙ্গী দেখিয়া স্বামী-স্ত্রী বলিয়া ধারণা হওয়া অন্যের কাছে একটুও বিচিত্র নয়—কিন্তু প্রকাশ ও বরুণা জানে যে, তাহাদের কাহারও নিকট অপরের মনোভাব অজানা না থাকিলেও এমন একটা অজ্ঞাত বাধা তাহাদের মাঝখানে পথ-রোধ করিয়া আছে, যাহাকে অতিক্রম করা তাহাদের কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়!

অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর প্রকাশ বলিল—চলো, ক্যাম্পে যাই, বরুণা—নরেনের আসার কথা আছে—

বরুণা বলিল—অদ্ভুৎ এই নরেন বাবু! কিন্তু ঠিক একেবারে তোমার উল্টো, নারীর স্তবগানে তুমি মুখর—আর উনি—

বরুণাকে বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল—এরি মধ্যে তুমি বুঝে গেছ বরুণা, যে আমার বন্ধুটি একটি 'প্রকাণ্ড' নারী-বিদ্বেষী—

—এ কথা জিজ্ঞাসা কোরে জানতে হয় না, ওঁর সঙ্গে মাত্র মিনিট পনেরো আলাপ কোরেই আমি তা বুঝিছি এবং তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে প্রকাশ, তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে উনি একটুও সন্তুষ্ট হন নি—এমন কি উনি তোমার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন—

—আমিও যদি নরেনের সঙ্গে তোমায় মত একটি মেয়ে দেখতাম, তা হ'লে ওরই মত অসন্তুষ্ট হতাম—

—মানে ?

—আমাদের কাছে মৃত্যু ছাড়া এর আর কোন মানে নেই ! কিন্তু এ সব আলোচনা পরে হ'লেও চ'লবে—প্রায় দুবছর পরে ওর সঙ্গে দেখা—অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। তা ছাড়া আমাদের আর একটি বন্ধুর কোন খবর জানে কিনা—

বরুণা কোন ব্যস্ততা না দেখাইয়া বলিল—এত তাড়াতাড়ি কেন, প্রকাশ, আর একটুখানি দাঁড়াও না ! তুমি একটা কবিতা আবৃত্তি করো না, প্রকাশ !

দুই মুহূর্ত্তের জন্যে বরুণার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রকাশ বলিল—আজ আমি তোমার অবাধ্য হব না বরুণা, কি জানি—

কথা শেষ না করিয়া প্রকাশকে নীরব হইতে দেখিয়া বরুণা বিস্মিত হইয়া প্রকাশের মুখের দিকে অভিভূতের মত তাকাইল।

প্রকাশ অবৃত্তি করিতে লাগিল—

> জীবনে য'াদের মিল জোটে নি ক'—
> যা'রা বাতিল,
> আমি কবি আজ তা'দের জীবনে
> জোগাই মিল্।
> এই কলঙ্কী ধরার আমি যে
> চারণ-কবি—
> যে ধরায় শুধু বেদনা, বিকার,
> ব্যাধির ছবি !
> তবু জানি, আজ যে-ই সুন্দর
> ফিরিয়া গেছে,
> একদা আবার ফিরিয়া আসিবে
> আপনি যেচে ;
> পাঁকে নেমে আজ নব পঙ্কজ
> যা'রা ফোটায় ;—
> বিধাতা আসিয়া প্রণাম করিবে
> তাদেরি পায় !
> নতুন ভোরের গান গেয়ে চলি
> তিমির-তীরে,
> সে-গান শুনাই ধূলি-মাখা জন-
> গানের ভীড়ে ॥ +

প্রকাশের আবৃত্তি শেষ হইয়া গেলে বরুণা আর একটি কথাও না কহিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল, প্রকাশ সেখানেই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—বরুণাকে অনুসরণ করিল না, তাহাকে বারণও করিল না। প্রকাশ যেন আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে—এ পৃথিবীতে মানুষের মত এত অসহায় আর কেহ নাই ! এতদিন খেলার ছলে সে ছন্দ লইয়া খেলাই করিয়াছে—কিন্তু আজ এই শীতের ম্লান-জ্যোৎস্না-স্নাত রাত্রে মানুষের চিরন্তনী কামনাময়ীর ছদ্মবেশ ছাড়িয়া যে নারী তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া কি দৈন্য ! পরণে বসন নাই, রুক্ষকেশা—শীর্ণা—দুই চোখে তাহার অশ্রু ঝরিতেছে !

আট দশটা সিঁড়ি নামিয়া আসিয়া বরুণা একান্ত অবসন্নের মত কিছুক্ষণ দেয়াল হেলান দিয়া দাঁড়াইল তাহার পর সেইখানেই বসিয়া পড়িল। একবার ইচ্ছা হইল পুনরায় ফিরিয়া গিয়া প্রকাশের পাশে দাঁড়ায়—সকল সঙ্কোচ ভুলিয়া বলে—তোমাকে অনেক দুঃখ দিইছি, আমাকে ক্ষমা করো—

কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল এ অবস্থায় যদি প্রকাশ

+ "নতুন ভোরের গান"—শ্রীপ্রণব রায়

তাহাকে দেখে তাহা হইলে সে আর তাহার সামনে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না! অকারণ লজ্জায় সে আপনিই একবার শিহরিয়া উঠিল—তাহার পর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

গোলঘরের নীচে শিশুগাছের ছায়া পড়িয়াছে—প্রকাশ দেখিল সেই ছায়ার আড়াল দিয়া বরুণা ত্রস্তপদে ক্যাম্পের দিকে চলিয়াছে—

* * *

পাশাপাশি দুইটি ক্যাম্প। প্রতিরাত্রে বরুণার ক্যাম্পে একজন না একজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা উপস্থিত থাকেন, কিন্তু সত্য হৌক আর মিথ্যা হৌক প্রকাশ ও বরুণার গ্রেপ্তারের গুজব সহরে রাষ্ট্র হইয়া যাইবার পর আর একটি মহিলাও তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন নাই। আজ যে তাহার ক্যাম্পে কেহ নাই এর জন্যে বরুণার যেন লজ্জার আর সীমা নাই! কেহ যদি বলে—আজ যে তোমার ক্যাম্পে একটি মেয়েও নেই বরুণা, এর একমাত্র কারণ মেয়েরা স্বাধীনতার চেয়ে নিজেদের সুনাম ও সাচ্ছন্দ্যকে বড় কোরে দেখে—এবং যদি বলে, যাদের মন এত ঠুনকো—দেহের জন্যে যাদের এত ভয়, তাদের, এই মরণ নিয়ে খেলা করা'র ছল কেন? বরুণার চোখে কিছুতেই আর ঘুম নামিতে চায় না—তাহার ইচ্ছা হইল এই নিশীত রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া পথ বাহিয়া চলিতে আরম্ভ করে—এ রাত্রি যেন আর প্রভাত না হয়—

পাশের ক্যাম্পে প্রকাশ ও নরেনের ভিতর কথা হইতেছে।

নরেনের কথার স্বরে মনে হইল সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। নরেন বলিল—সামান্য একটা মেয়ের মুখের আড়ালে কি তোমার প্রতিজ্ঞা, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস—তোমার দেশ সব ঢাকা পড়ে গেল! নারীর দেহই হোল তোমার-কাছে সব চেয়ে বড়ো কামনার জিনিষ। আমাদের দল ভেঙে গেছে সত্যি, কিন্তু সকলকে বঞ্চিত কোরে তুমি যে নিজেকে পরিপূর্ণ কোরে তুলবে এ অন্ততঃ আমার সহ্য হবে না—

মৃদু হাসিয়া প্রকাশ বলিল—তুমি উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছ, নরেন, আমার ভয় হ'চ্ছে তুমিও হয়ত—

প্রকাশের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাধা দিয়া নরেন বলিল—ও সব বাজে কথা থাক্। আমি বলছি তোমায়, এই বরুণাকে ত্যাগ কোরতে হবে—

এই সময় মনে হইল কে একজন যেন ক্যাম্পের পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পদধ্বনি লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ বলিল—ঝগড়া রাখ, নরেন, আমার পরওয়ানা এসেছে......

প্রকাশের কথার সুরে নরেন স্তব্ধ হইয়া গেল এবং আর একটি কথাও বলিতে পারিল না!

এমনিভাবে মিনিট কয়েক কাটিবার পর প্রকাশ বলিল—বরুণাকে পাওয়া সম্ভব হ'লে, দেশের চেয়েও আমার কাছে অনেক বড়ো হ'য়ে উঠ্‌ত—কিন্তু তুমি মনে কোর না, নরেন, যে, ওকে পেলাম না বলেই ওকে বড়ো করছি—

ক্রমশঃ

———



জার্ম্মাণমন্ত্রী ক্যাপ্রিভি *

শ্রীবিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী

যখন আমি রাজত্ব গ্রহণ করি তখন জেনারল্ ফন্ ক্যাপরিভি ছিলেন নৌ-বিভাগের কর্ত্তা। আমি অবিলম্বে সরকারী নৌ-বিভাগের সংস্কার ও উন্নতির জন্য মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলাম। এই সংস্কার ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণে জাগিয়াছিল, ইংলণ্ডের ও জার্ম্মাণির নৌ-বিভাগের তুলনা করিয়া। কিন্তু আমার এই কর্ম্ম ক্যাপরিভির মোটেই পছন্দসই ছিল না। তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা ছিল যথেষ্টই, কিন্তু তাহার সঙ্গে কতকটা একগুঁয়েমি আর খানিকটা হামবড়া-ভাব মিশিয়া, দোষই হোক আর গুণই হোক, তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

সৈন্য-সমাবেশে, সামরিক অফিসারদের উন্নতিতে এবং টরপিডো-বোটের গড়ন-শৃঙ্খলা ও ব্যবহারে—এক কথায় অরগেনিজেশনের দিক দিয়া—তিনি জার্ম্মাণির যথেষ্ট সেবা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নূতন জগতে চলিবার জন্য তিনি জার্ম্মাণিকে কোনো নূতন চিন্তা দিতে পারেন নাই। পুরাতন জার্ম্মাণির চিন্তাধারা যখন নূতনের কাছে চিরবিদায় লইতেছিল, তখনো বুড়া ক্যাপরিভি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ পুরাতনকে টানিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে-ছিলেন। তিনি নৌ-বিভাগের উন্নতির চিন্তা করিতেই পারেন নাই, সকল সময় কেবল সৈন্যদলের ভাবনাই ভাবিতেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সৈন্যদলই অতীতে দেশরক্ষা করিয়াছে, ভবিষ্যতে এই সৈন্যদলই দেশরক্ষা করিবে। কাজেই নৌ-বিভাগের ভাগ্যে ক্যাপরিভির নিকট মামুলি 'বরাদ্দের' বেশি আর কিছুই লাভ হয় নাই। তিনি সরকারী বাজেটে নৌ-বিভাগের টাকার কথা না তুলিয়া সৈন্যদলের টাকা হইতেই নৌ-বিভাগে খরচ করিয়া বসিতেন। ইহাতে নৌ-বিভাগের কাজতো কিছু হইতই না, অধিকন্তু সৈন্যদলেরও দুরবস্থা হইত যথেষ্ট। সৈন্যদলের জন্য তিনি টাকা মঞ্জুর করাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তার এক দামড়িও তার ভোগে লাগে নাই। সেটা কেবল খাতাপত্রেই ছিল।

ক্যাপরিভির সঙ্গে কোনো মনোমালিন্য আমার ঘটিল না বটে, কিন্তু নানা রকম অসুবিধা দেখিয়া তিনি নিজে হইতেই অবসর গ্রহণ করিতে চাহিলেন। আমি তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে এক সৈন্যদলের সেনাপতির পদে নিয়োগ করিলাম। নৌ-বিভাগের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন য্যাড্‌মিরাল্ কাউন্ট্ মোন্‌ৎস্।

হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত খবর পাইলাম প্রিন্‌স্ বিস্‌মার্কের পদত্যাগ সম্বন্ধে। তাঁহার মতো উপযুক্ত লোক কোনো কালে জার্ম্মাণির কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হয় নাই। এই একমেবাদ্বিতীয়ং লোকটার মতো প্রতিভা যেমন কাহারো ছিল না, জার্ম্মাণির আত্মসম্মান, জার্ম্মাণির উচ্চ আশা, আর জার্ম্মাণিই জীবনের যা কিছু সব এই অনুপম ভাবুকতাও আর কোনো ব্যক্তিতে তেমন ফুটিতে দেখি নাই। কাজেই তাঁহার এই পদত্যাগের খবর পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিষম ভাবিত হইয়া পড়িলাম। কারণ এই শূন্যপদ যে কেহই পূরণ করিবে, একমাত্র পদ-গৌরবটাই হইবে তাঁহার কাছে বড় বস্তু। এই পদের দোহাই দিয়া নিজের অযোগ্যতাটাকে যোগ্য করিয়া তুলিতে চাহিবে। নানাদিক্ হইতে সমালোচনা, সমালোচনা, কেবল সমালোচনাই হইবে তাঁহার দৈনিক খোরাক। পূর্ব্বে বহুলোক দলবদ্ধ হইয়াও বিস্‌মার্কের বিরুদ্ধে যেকালে একটা কথাও বলিতে সাহস করে নাই, এখন সেই তাহারাই জনে জনে মূর্ত্তিমান ধনুর্দ্ধর হইয়া দাঁড়াইবে।

নানা দিক দিয়া চিন্তা করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত ক্যাপ্রিভিকেই এই চ্যান্‌সালার পদের জন্য মনোনীত করিলাম। কারণ একে তিনি বিস্‌মার্কের যুগের লোক, বিস্‌মার্কের গুণমুগ্ধ, বহু বহু লড়াইয়ে খ্যাতিমান, তার উপর

* কাইজার লিখিত My Memoirs গ্রন্থের এক অধ্যায়।

বিস্মার্কের অধীনে সরকারী কাজেও বহাল ছিলেন। তাঁহার বয়সটাও পদের পক্ষে মানানসই হইয়াছিল।

ক্যাপ্রিভির মন্ত্রীত্ব গ্রহণের কিছু পরেই রুশীয়া-সমস্যা দেখা দিল—রুশিয়ার সঙ্গে আমাদের মিতালীর মেয়াদ বাড়ানো লইয়া। ক্যাপ্রিভি বলিলেন, "অষ্ট্রিয়ার রুশভীতি যথেষ্টই রহিয়াছে, এমন অবস্থায় আমরা রুশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বটা গাঢ় করিয়া তুলিলে, জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার ভিতরে যে শত্রুতার সৃষ্টি হইবে তাহার ফল বড় ভালো হইবে না।" কাজেই, রুশ-জার্ম্মাণ সন্ধি বাতিল হইয়া গেল, আর উহার স্থানে কায়েম হইল অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ সন্ধি। রুশ-মন্ত্রীরা এই সন্ধিটা মোটেই পছন্দ করিতেছিলেন না।

এই সময়ে রক্ষণশীল জোতদাররা এক ধুয়া ধরিয়া ক্যাপ্রিভির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। ক্যাপ্রিভির বিষয়-সম্পত্তি কিছুই নাই, ইহাই হইল বিরোধিতার কারণ। ক্রমে ক্রমে এই আগুন ব্যবসাদার মহলেও ছড়াইয়া পড়িল। এই গণ্ডগোলের মূলে ছিলেন বিস্মার্ক স্বয়ং। আমার যে কোনো চিন্তা যে কোনো কার্য্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য সেদিন বিস্মার্ক চব্বিশ ঘণ্টা সজাগ ছিলেন। তিনি পেছনে থাকিয়া কোমর বাঁধিয়া—লিখিয়া, পড়িয়া, বক্তৃতা দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, দল পাকাইয়া, নানারকম বচন উদ্ধৃত করিয়া—সকল রকমে তাঁহার জন্মভূমির বিরুদ্ধে, রাজা হইতে দরিদ্র শ্রমিক পর্য্যন্ত দেশবাসীর বিরুদ্ধে শত্রুতার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। যে বিস্মার্কের প্রতিভা একদিন সমুদয় ইয়োরোপকে নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া বেড়াইয়াছিল, ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সেদিন তাঁহার সেই প্রতিভা মলকীটের প্রবৃত্তি লইয়া দেখা দিয়াছিল। কিছুকাল পর এই বিস্মার্ককে জনসাধারণ দেশের শত্রু বিবেচনা করিত। অতঃপর হেলিগোলান্ড্ হাতকরার সময় বিস্মার্কের নিজের এবং বিস্মার্কপন্থী খবরের কাগজ ও লোকদের এই শত্রুতা আরো ভালোরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

হেলিগোলান্ড্ দখল করিয়া ইংরেজ এক ডুবে অনেক সুবিধা লাভ করিয়া বসিয়াছিল। জার্ম্মাণি হইতে বাহির হইবার পথে হেলিগোলান্ড্ ইংরেজের ঘাঁটী তো বটেই, অধিকন্তু হাম্বুর্গ ও ব্রেমেনের বাণিজ্য-বন্দরের পক্ষেও উহা এক ভয়ের বস্তু ছিল। যতদিন হেলিগোলান্ড্ ইংরেজের হাতে থাকিবে ততদিন জার্ম্মাণির জাহাজ নির্ম্মাণ করা, এমন কি তাহার চিন্তাটা পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির পক্ষে একটা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নাই। কাজেই হেলিগোলান্ড্ দখল আমার সাধনার বস্তু হইয়া উঠিল।

রাজনীতির দাঁড়িপাল্লায় একদিকে জার্ম্মাণ উপনিবেশ—পূর্ব্ব-আফ্রিকার জান্জিবর ও হ্বিটু দ্বীপকে—এবং আর একদিকে অনুর্ব্বর লালমাটির পাহাড় হেলিগোলান্ড্‌কে তুলিয়া ধরিতেই প্রধান মন্ত্রী লর্ড সলিসবেরী খুসি হইয়া গেলেন। পূর্ব্ব-আফ্রিকার বাণিজ্য-বিবরণ ও ব্যবসার ভাবগতিক দেখিয়া এবং জার্ম্মাণ-পূর্ব্ব-আফ্রিকার উপকূলবাহী জার্ম্মাণ ক্রুজার ও গানবোটের কমান্ডারগণের বিবরণ শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, টাঙ্গা এবং দার্-এস্-সালাম্ প্রভৃতির সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জান্জিবর ও হ্বিটু অতীত গৌরবের স্মৃতিটুকু বুকে লইয়া এক মহাশ্মশান হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

আমি এই ভাবে আর একটা দিকও বাঁচাইয়া চলিতে চাহিয়াছিলাম। উপনিবেশ ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজের সহিত বাণিজ্যিক সংঘর্ষ দূর করা এবং কাজে কাজেই ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করা। আমার এই প্রস্তাবে ক্যাপরিভি রাজি হইলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে লেখা-পড়া হইয়া যাইবার পর এই বিষয় আমি সাধারণকে জানাইয়াছিলাম। হান্সার এবং উত্তর জার্ম্মাণির অধিবাসী ব্যবসাদারেরা বহুদিন যাবৎ নৌবহরের সাহায্য চাহিয়া আসিতেছিলেন, হেলিগোলান্ড দখল করিয়া আমি তাহাদের সেই বাসনা পূর্ণ করিবার প্রথম ধাপে পা দিয়াছিলাম। এইভাবে বিনা রক্তপাতে নীরবে নীরবে জার্ম্মাণির জন্য আমার বহুদিনের একটা প্রবল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া গেল।

যদি হেলিগোলান্ড্ বিস্মার্কের আমলে জার্ম্মাণির হাতে আসিত তাহা হইলে সকলেই মনে করিত একটা বড় রকমের দাও মারা হইয়াছে। বিস্মার্কের তারিফ করিত। কিন্তু ক্যাপ্রিভির আমলে ব্যাপারটা ঘটায় চারিদিক হইতে ছেলে-বুড়া, মেয়ে-পুরুষ সকলেই সমালোচনা করিতে লাগিল। যথা, বিস্মার্কের আসনে বসিয়া ক্যাপ্রিভির মাথা ঘোলাইয়া গিয়াছে, ক্যাপ্রিভির আঙুল ফুলিয়া

কলাগাছ হইয়াছে, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অকৃতজ্ঞ, খামখেয়ালী ছোক্‌রা মনিব পাইয়া ক্যাপ্‌রিভি যা খুসি তাই করিতেছেন, বিস্‌মার্ক্‌ যদি উচিত মনে করিতেন তাহা হইলে বহুপূর্ব্বেই তিনি হেলিগোলান্‌ড্‌ হাত করিতে পারিতেন, আজ শুধু একটা খামখেয়ালীতে উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হইয়া গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি। হান্‌সার ব্যবসাদারদের কান্নার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বিস্‌মার্কের দলের খবরের কাগজগুলি গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে সুরু করিল।

একদিন যখন বিস্‌মার্ক্‌ ছিলেন মন্ত্রী আর আমি ছিলাম তাঁহার অধীনে পররাষ্ট্র বিভাগের একজন শিক্ষানবীশ এবং কর্ম্মচারী, তখন এই সকল কাগজওয়ালারাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত, বিস্‌মার্ক্‌ শুধু রাজনৈতিক ব্যাপারে ইংলণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্যই উপনিবেশের প্রয়োজন স্বীকার করেন। কিন্তু এই ব্যাপার ঘটিবার পর তাহারা উল্‌টা সুর গাহিতে লাগিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী এখন সেই ধারণা হইতেই বোধ হয় এমন একটা কাজ করিয়া বসিলেন! যাহা হোক, দীর্ঘকাল আমরা এই সমালোচনার পর সমালোচনার ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টির ভিতর দিয়া আপন মনে চলিতে লাগিলাম। তারপর, মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর আমার নিন্দুক এবং সমালোচকরাই প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল, হেলিগোলান্‌ড্‌-গ্রহণ জার্ম্মাণপররাষ্ট্রনীতির অতি দূরদৃষ্টি এবং উঁচুদরের রাজনীতির পরিচায়ক। তখন এই তাহারাই বলিয়াছে, যদি হেলিগোলান্‌ড্‌ জার্ম্মাণির না হইত তাহা হইলে অভাবিত বিপদের কল্পনা করা আজ যেমন অসম্ভব, হেলিগোলান্‌ড্‌ পাইয়া আজ কতখানি লাভ হইয়াছে তাহার হিসাব করিয়া আনন্দ করাও তেমনি অসম্ভব।

এই জন্যই সমুদয় জার্ম্মাণ জাতির ক্যাপ্‌রিভির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো উচিত। জার্ম্মাণ নৌবহরের সৃষ্টি ও বিকাশ আর মহাযুদ্ধের কালে স্কাগার-রাকে জার্ম্মাণির অভূতপূর্ব্ব বিজয়লাভ তাঁহারই দূরদৃষ্টির ফল, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ক্যাপ্‌রিভি চ্যান্‌সালার হওয়ার পর বিস্‌মার্কের এত নিন্দা এবং সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া তাঁহার আসনের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া চলিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ-নৈতিকদলও সেদিন তাঁহার বিরোধিতা করিতে কসুর করে নাই। তথাপি তিনি কাজের লোককে তাঁহার সঙ্গে রাখিতে কখনো আপত্তি করেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক দলাদলির মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিল তখন তিনি কাজে ইস্তফা দিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল এক নির্জ্জন স্থানে কাটাইবার জন্য চলিয়া গেলেন।

বুদ্ধের সঙ্কল্প

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্‌
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প-দুর্ল্লভাম্‌
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

ললিত-বিস্তর।

এইখানে শুষ্ক হোক্‌ শরীর আমার,
ত্বক্‌ অস্থি মাংস হোক্‌ ধ্বংস সমুদয়,
বহুকল্প-সুদুর্ল্লভ বোধি বিনা আর,
এ আসন হ'তে কায়া টলিবার নয়।

শ্রীঅনিলবরণ রায়।

তাঁতিরাম *

শ্রীআশালতা দেবী

চৌধুরী বাবুদের সাতমহলা ত্রিতল ভবনটির বিরাট ছায়ায় একখানি অতি জীর্ণ গোলপাতার কুঁড়ে শিখাতিলকধারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের পাশে অস্পৃশ্য চণ্ডালেরই মত সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়াছিল। কুঁড়েঘরখানার ঐ শুষ্ক পঞ্জরখানার নীচে যদি প্রাণ থাকিত তবে সে বেচারীকে নিশ্চয়ই সারাক্ষণ ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিতে হইত।

কিন্তু এত যে সঙ্কোচ কুঁড়েখানার আপাদমস্তক ছাইয়া থাকিত তাহা পাড়ার লোকের চোখে পড়িত না। তাহারা বলিত "নিরুর মা পর্ব্বতের আড়ালে বাস করিতেছে।" পর্ব্বতের মালিক বড়কর্ত্তা আজ ক'দিন আবার বায়না ধরিয়াছেন যে বিধবার ঐ ভিটেখানি না হইলে তাঁহার খোকার টেনিসকোর্ট তৈয়ারী হইতেছে না; তাই সহসা তিনি অনাথিনীর দুঃখে গলিয়া গিয়া আজ সকালে নিরুকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "হ্যাঁরে নিরু, রোগে, হিমে কচি ছেলে দুটোকে নিয়ে তোর মা নিউমোনিয়ায় মর্ব্বে তবু ঐ পচা কুঁড়েখানা আঁকড়ে পড়ে থাকবে? তোরা ত আর আমার পর ন'স মা; তা কোন আমারই একটা নীচের ঘরে রইলি! আচ্ছা আজ যদি তোর বাপ বেঁচে থাকতো তা'হলে কি আমার কথা সে ফেল্‌তে পার্‌তো! হরি হে তোমারই ইচ্ছা, তোমারই ইচ্ছা!!" পনেরো বছরের নিরু নিতান্ত শিশু ছিল না; জ্যেঠা মশাইএর শনির দৃষ্টি যে কোথায় পড়িয়াছে তাহাও সে মার কাছে শুনিয়াছিল। তাই প্রত্যুষেই এই অযাচিত কৃপাবাহুল্যে সে সশঙ্ক হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করিল, "মা যে বলেন মরে গেলেও তিনি তাঁর শ্বশুরের ভিটে ছাড়্‌তে পারবেন না।" বলিতে বলিতে সে আঁচল দুলাইয়া চলিয়া গেল। কর্ত্তা তখন একান্তে বসিয়া জপের মালায় জিলাপীর প্যাঁচ আঁটিতে লাগিলেন।

ফাগুন মাস, এখনও শীতের প্রকোপ যথেষ্ট আছে। দিবাবসানে মৃদু মন্দ ঝড় উঠিল। সন্ধ্যায় ঘনীভূত আঁধার খানি আষ্টে পৃষ্ঠে জড়াইয়া মৌন পল্লীখানি ঝড়ের দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল। নিরুর মার শত জীর্ণ কুটিরখানি হেলিয়া দুলিয়া আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গৃহমধ্যে একখানি মাদুরের উপরে বসিয়া নিরু অতি সাবধানে কিসে একটা তালি লাগাইবার চেষ্টা করিতেছিল। রুগ্না মাতা গৃহের অপর প্রান্তে শয্যায় শুইয়া ছিন্ন কন্থাখানি আঁকড়াইয়া শীত নিবারণের বিফল প্রয়াস পাইতেছিলেন। শিশুপুত্র দুইটি দিদির পার্শ্বে বসিয়া চারিটি বাসি মুড়ি চিবাইতেছিল। এমন সময়ে উপর্য্যুপরি কয়টি ঝাপ্‌টা আসিয়া কম্পমান স্বল্পতৈল প্রদীপটিকে সকল দ্বন্দ্ব হইতে নিষ্কৃতি দিল। বাহিরে বাতাসের শোঁশোঁ শব্দ ও ভিতরের জমাট অন্ধকার। শিশু দুইটি অতিমাত্র ভীত হইয়া বালিকাকে প্রাণপণে জড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দু'টি ভাইকে দুই কক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বালিকা তাহাদের সান্ত্বনা দিতেছে। ঝড়ের বেগও মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী ধনী গৃহের দ্বিতলের প্রকোষ্ঠ হইতে মধুবর্ষণ হইল, "হ্যাঁরে নিরী, সাঁঝেরবেলা এমন মরাকান্না জুড়ে' কাণ ঝালাপালা কচ্ছিস্ কেন লা? তোর মা কি আর মরবার সময় পেলে না? তাই আমার বাছাদের অকল্যাণ কর্‌তে এমন ভর সন্ধ্যেবেলায়—" শেষ কথাকয়টি আর শোনা গেল না। চোখেরজল মুছিতে মুছিতে নিরু ভাই দু'টির মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল এবং দিয়াশলাই ঠুকিয়া প্রদীপটি জ্বালিল। ইতিমধ্যে রুগ্না উঠিয়া বসিয়াছেন, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে মা? তোর জেঠাই মা কি বল্‌ছেন?"

"তুমি শোও না মা ও কিছু না; এত গোলমাল কিসের তাই জেঠাই মা জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন।"

---

* সত্যঘটনার ছায়া অবলম্বনে।

আজ কয়দিন রোগে ভুগিয়া পথ্যাভাবে বিধবার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল।

মাতা পুত্রী ও শিশু দুইটীর গৃহস্থালীর এই করুণ ছবির কোনও সাক্ষী মিলিল না বটে কিন্তু যিনি সর্ব্বসাক্ষী তিনি বুঝি অলক্ষ্যে দু'ফোঁটা চোখের জল মুছিলেন।

প্রাঙ্গণ হইতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কে ডাকিল "নিরু দিদি!" আশায় উৎকণ্ঠায় বিধবার সারাটা বক্ষ তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি টলিতে টলিতে উঠিয়া বসিলেন। ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাবা তাঁতিরাম এলি?" মাতার উত্তেজনায় কন্যা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে রোগিণীর মস্তক উপাধানে রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আগন্তুক ততক্ষণ প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া দাওয়ায় উঠিয়াছে। তাহার ঋজু দেহ সম্মুখে ঈষৎ নম্র, বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, নাসিকা উন্নত, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দু'টির বড় কমনীয় ভঙ্গী। বয়স পঞ্চাশ হইবে। গুম্ফ শ্মশ্রুবিহীন মুখখানি যেন কি এক সব পাওয়ার তৃপ্তিতে সর্ব্বদ হাসিতেছে। কপালের তিলকচিহ্ন ঘামে ধুইয়া গিয়াছে, আবক্ষ একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা।

বালিকা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একখানি চাটাই পাতিয়া দিয়া সন্দিগ্ধভাবে প্রৌঢ়ের শুষ্ক মুখ ও কোটরগত চক্ষু হইতে ধূলিধূসরিত পা দুখানিপর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত তিরস্কারের স্বরে বলিল, "আজও বুঝি উপোস গ্যাছে? আচ্ছা লোক যা হোক! রোজই যদি এমনি কোরে না খেয়ে না দেয়ে দিগ্বিজয় ক'রে বেড়াবে তোমার ও হাড় কখানা ক'দিন টিঁকবে বলোত দেখি? না, কাল থেকে আমি আর তোমায় কোথাও যেতে দেবো না তা বলে দিয়ে রাখলুম কিন্তু!" শুষ্ক মুখখানিতে স্নিগ্ধ হাসি মাখাইয়া তাঁতিরাম বলিল, "তা ভাই রাগ করিস কেন? তোর জন্যেইত এসব বোন! তাও যদি সে বজ্জাতটাকে পাকড়াও করা যেতো! এত দিক জয় কচ্ছি, শুধু তার দিকটাই যে ফাঁক রয়ে যাচ্ছে বোন্!"

বালিকার গণ্ড দুটি ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল; চোখ দুটিও যেন কেমন অবাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। বাঙ্গালীর মেয়ে এতটুকু বয়সেই আত্মগোপনে অভ্যস্তা; সে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, "না বাপু, ঘরের খেয়ে ত বনের মোষ তাড়িয়ে এলে। এখন কি খেতেটেতে হবে বল শুনি। আর কিইবা আছে ঘরে যে তোমায় দেবো।" বলিতে বলিতে বালিকার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিল।

প্রৌঢ়া এবার আর কন্যার নিষেধ না মানিয়া ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া স্খলিতচরণে নীচে মাদুরে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ হাঁফাইয়া শ্বাসকষ্টের উপশম হইলে জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা দেখা পেলি নে?"

"কই আর পেলুম মা! চাঁদপুরের বাবুদের বাড়ী যেয়ে শুনি যে তাদের দল পরশু রাত্তিরেই কোথায় বায়না পেয়ে সেখান থেকে চলে গ্যাছে। পথে আস্তে শুনলুম শুক্রবার ও শনিবারে রসুলপুরের হাটে তারা দু'পালা গান গাইবে। আবার আমায় ছোঁড়াটা সে পর্য্যন্ত নাকে দড়ি দিয়ে না টেনে ছাড়্বে না দেখ্ছি। কিন্তু যাই বলো মা, —ও নিরু শুন্ছিস্ বোন্!—তোমার জামাইয়ের যা প্রশংসা শুনে এলুম! রামচন্দ্র সেজে অমন নাকি হাজারো ছেলে বুড়োর চোখে বাণ ডাকিয়েছে! হ্যাঁরে, ঘরে যে তোর সোণার সীতে ধুলোয় লুট্ছে তা কি একবার ফিরে চাইলি? কি বল্বো মা তোমার এই ছেলেটি ছোট জাত, নইলে একবার তাকে পেলে আমি তার কাণ ধরে এনে আমার দিদির পায়ে নাকে খৎ দেয়াতুম না?" বলিতে বলিতে বলিতে উৎসাহ আতিশয্যে তাঁতিরাম উঠিয়া দাঁড়াইল। কাপড় গামছা গোছাইয়া কোমরে বাঁধিল। রুগ্না শঙ্কিত হইয়া বিষণ্ণ হাস্যে বলিলেন, "সে কাল তখন যাস্ বাবা! আজ সারাদিন খাস্নি। এখন এই ঝড় বাদলে আর তোমার বীরত্বে কাজ নেই।" তার পর আরও ধীরে ধীরে বলিলেন—"হুঁ ছোটলোক বটে, এমন ছোটলোক যদি এ পাড়াগাঁয়ে সবাই হ'ত!"

কার্য্যান্তরে যাইয়া নিরু তাহার উচ্ছ্বসিত কান্না চাপিতে গিয়া দুফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া আসিল। ঝড়ের মত আসিয়া ধপাৎ করিয়া একঘটি জল ও রেকাবিতে চারিখানি বাতাসা রাখিয়া কণ্ঠে যথাসম্ভব উগ্রতা মিশাইয়া বলিল, "মাগো, ধন্যি তোমাদের! সারাদিন উপোসের পারণটা বুঝি গল্প গিলেই সারবে? আর এই বকে বকে যদি অসুখ বেড়ে ওঠে—না, যা বোঝো কর তোমরা; চ' ভাই দাও

রাম্ন সেই গল্পটা শেষ করে ফেলি।' বালকদ্বয় মায়ের পাশে নিষ্কর্মা বসিয়াছিল। তাহারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। দু'জনে নাচিতে নাচিতে দিদির হাত ধরিয়া চলিল।

বিধবা অপরাধের স্বরে বলিলেন, "সত্যিই ত মা! রামের কিছু খাওয়া দাওয়া হয় নি! তা আমারও এমনি পোড়া মন যে নিজের কথা নিয়েই মরে আছি। যা'ত মা উমুনটা জেলে ফ্যাল।"

যাইতে যাইতে থামিয়া নিরু অতি ধীরে উত্তর দিল—"কি রাঁ—ধ—বো মা?" বালিকার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিয়া ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিধবার বক্ষ মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিল।

মাতাপুত্রীর মূক ব্যথা তাঁতিরামের সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়াইল না। অভয় হাস্যে সকল মেঘ উড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল "ওই যাঃ মন বাঁদরটা কি ভুলোই হয়েছে দেখ্‌তো দিদি। হাটের পথে আস্‌তে দেখলুম খাসা খাসা কচি আম উঠেছে। কোন্ দিন মরে যাবো, তাই ভাবলুম নিরুদিদির হাতের ঝোলটা খেয়ে নি। তা বোন দে না বুড়োকে একটু ঝোল রেঁধে আজ। এসব কি পুরুষ মানুষের সাজে? তাইত বাড়ী না গিয়ে সোজা হেথায় এলুম।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ পুঁটলি খুলিয়া শুধু কচি আম নহে তার সঙ্গে চাল, ডাল, আলু, আরো কত কি বাহির করিল।

এক চোখে হাসি ও আর এক চোখে কান্না মাখাইয়া নিরু কষ্টে বলিল, "হ্যাঁ দাদা কচি আমের ঝোলে চাল ডালও লাগে নাকি?"

তাঁতিরাম সহজ কণ্ঠে বলিল, "না তা লাগে না বটে! তা ওগুলো বাড়ীতেই নিয়ে যাচ্ছিলুম। জানোইত দিদি আমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ইঁদুরের দানাটিও জমা থাকে না।" হো হো করিয়া হাঁসিয়া তাঁতিরাম নিজের রসিকতায় নিজেই মাতিয়া উঠিল।

"তা এত রাত্তিরে এ হাতীর খোরাক আর কোথায় পাবি বোন্। ঐ গুলোই পাকিয়ে ফ্যাল। আর দেখ আমের ঝোলটা একটু বেশী কোরে রাঁধিস বোন্ কাল সকালে আবার খেয়ে বেরুতে হবে কি না।"

"হ্যাঁ, কাল আমি তোমায় যেতে দিলে ত?

"আর একটি দিন দিস্ ভাই—তা'হলেই এবার ছোঁড়াটাকে এনে তোর আমের ঝোল খাইয়ে দি। দেখি ভায়া কেমন আমার দড়ি ছিঁড়তে শিখেছেন।"

নিরু ভাবিয়াছিল কাঁদিবে না। কিন্তু তাহার সকল সংকল্প ত্রিবেণী সঙ্গমে ঐরাবতের মত ভাসিয়া গেল। রান্না ঘরে গিয়া রন্ধনের উপকরণগুলি মাটিতে ফেলিয়া সে কাঁদিতে বসিল। যতই শাসনে আঁটিতে যায় ততই তার অবাধ্য চোখ দুইটি দিয়া অশ্রুবন্যা ছুটিয়া চলে। কান্নার কি তার একটা কারণ? নিরুদ্দেশ,ভবঘুরে কুসংসর্গরত স্বামীর উদ্দেশে তার যত উৎকণ্ঠা, মরণাপন্না মায়ের জন্য তার দ্বিগুণ উৎকণ্ঠা; কন্যার চিন্তায় যে তাঁর মরণেও শান্তি নাই তাহা বালিকা বুঝিত। এত ব্যথা বুকে পুষিয়া বালিকা এই দুঃখের সংসারটি পালিয়া আসিতেছিল। আজ নিঃসম্পর্কীয় নীচ জাতীয় বৃদ্ধের স্নেহস্পর্শে তাহার মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল। সে বসিয়া বসিয়া বড় কাঁদিল: একটু হাল্‌কা হইয়া রন্ধনে মনঃসংযোগ করিল।

চোখে মুখে তৃপ্তি বর্ষণ করিয়া তাঁতিরাম আহারে বসিয়াছে। অন্নপূর্ণারই মত দু'শো বার "এটা দেই! ওটা দেই!" করিয়া নিরু তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কথা প্রসঙ্গে নিরু কহিল, "আচ্ছা দাদা, তোমার ত আপনার জন কেউ নেই। পরের জন্য এত মাথাব্যথা কেন আমায় বলো ত দেখি। লোকে কতবার বে'থা কোরে সংসারী হয়। আর তোমার যত সব অনাসৃষ্টি।"

"হ্যাঁ বোন্, আমার আপনার জন নেই একথা তুই কোথায় শিখ্‌লি? তোদের মধ্যেই যে আমি আমার সব হারানো জিনিষ ফিরে পেয়েছি দিদি! নৈলে কি আর বাঁচতুমরে এতদিন? তোদের দশ্‌টাকে চিন্‌বো বলেই ত গোবিন্দ আমায় পথের মানুষ কোরে ছাড়্‌লেন। বড় হ' গিন্নী হ', ছেলের মা হ', তখন বুঝ্‌বি। পেয়ে হারিয়েছি বলেই ত এত আপনার কোরে তোদের পেয়েছি দিদি!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া নিরু তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের পাতে আর এক হাতা আমের ঝোল ঢালিল। বৃদ্ধ হাঁ হাঁ

করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তেমন অরুচিও দেখা গেল না। "যা রেঁধেছিস্ দিদি, এ যেন দেবতাদের অমৃত। এখন অম্বরটাকে এনে বাঁধ্‌তে পারি তবে না হয়।"
তাঁতিরাম আহারান্তে বিদায় লইল। ভাই দুটিকে খাওয়াইয়া রুগ্নাকে ঔষধ পথ্য দিয়া নিরু নাম মাত্র চারিটী ভাত লইয়া বসিল। সে রাত্রিতে নিরুর চোখে কি ঘুম আসিতে চায়? শয্যায় অসিয়া আবার তাহার বুক ফাটিয়া কান্না উঠিল। গলায় বস্ত্র দিয়া সে তাঁতিরামের উদ্দেশে বার বার মাথা নোয়াইল। আর একজনকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলি "ওগো, একবারটি এসো, মা'র মুখে একটু হাসি ফুটুক। দুটো দিন তাঁকে সুখী কোরে যাও। তারপর সব শেষ হ'লে না হয় চলে যেয়ো আবার!" কাঁদিতে কাঁদিতে ভাই দুটিকে বুকে লইয়া রজনী শেষে শ্রান্ত বালিকা ঘুমাইল।

ক্রমশঃ

গান

শ্রীমতী আরতি দেবী।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে আষাঢ়
যেই হোল আজ সুরু;
সকাল থেকেই নাম্‌লো বাদল
ঝুরু, ঝুরু, ঝুরু;
নব-নীপের গন্ধ সহ
বইলো ভিজা গন্ধ-বহ,
ডাকলো আকাশ অহরহ
গুরু, গুরু, গুরু;

পুচ্ছ তুলি ময়ূর গুলি
সেই মাদলের তালে,
উঠ্‌লো নাচি মউয়া, পিয়াল,
তমাল তরুর ডালে;
কেয়া কাঁটায় দেখি যত
মৌমাছিদের হৃদয়-ক্ষত
আমার হিয়াও অবিরত
কাঁপলো দুরু, দুরু!!

বর্ত্তমান বাঙ্গালা গান ও তাহার প্রগতি

(শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ)

সম্প্রতি পাশ্চাত্য কৃতবিদ্য বঙ্গ-যুবক-যুবতী মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা গান সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, সেগুলি পাঠ করিয়া মনে কতকগুলি সংশয়ের উদয় হওয়ায় তাহা পাঠক-বর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি। আশা করি বিষয়টীর সম্যক আলোচনা হইলে বাঙ্গালা গানের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা পরিষ্কার হইতে পারে।

প্রথমেই ভাষা ও রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে আমার অনুযোগ আছে। তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় জটিল ও সূক্ষ্মানুভূতি সাপেক্ষ। পুরাকালে যখন বিদ্বজ্জনের ভাষাসংস্কৃত ছিল,তখনও সাধারণ কথোপকথনের ভাষা অন্য প্রকার ছিল—তাহাকে প্রাকৃত ভাষা বলিত। মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিবার ভাষা এবং সাধারণ ভাষায় প্রভেদ ছিল; যথা, ভারতচন্দ্রের, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, বঙ্কিম চন্দ্রের, নবীন চন্দ্রের, হেমচন্দ্রাদির ভাষা; উপরন্তু মেয়েলি ভাষাও ছিল। ইঁহাদের ভাব গভীর হইলেও ভাষার সরলতা ও ভাবব্যঞ্জকতা থাকায় ভাব গ্রহণ করিতে শিরঃ পীড়া হইত না।

সঙ্গীত বিষয়ের প্রবন্ধাদি জটিল ও সূক্ষ্মানুভূতি-সাপেক্ষ। অতএব সরল ও নিরলঙ্কার ভাষাই তাহা ব্যক্ত করিবার উপযোগী; অথচ কোন কোন নবীন লেখক সঙ্গীত সম্বন্ধে এমন শ্লেষ বক্রোক্তি পূর্ণ চটকদার ও রংদার ভাষা ব্যবহার করেন যে অনেক স্থলেই তাঁহাদের প্রকৃত বক্তব্য যে কি তাহা ধরা কঠিন হয়। "চিন্তার ছন্দ" "সঙ্গীত সাগরের চলোর্ম্মির নাদ ব্রহ্মের ভেলায়" " স্মৃত গ্রন্থাদি থেকে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীর হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ করে দেওয়া" "শ্রুতির বিভীষিকায় স্তম্ভিত করা" প্রভৃতি শ্লেষোক্তির দ্বারা একশ্রেণীর প্রবন্ধকার আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। আবার একশ্রেণীর লেখক-লেখিকা আছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য দেশীয় কর্ড বা হারমনি আমাদের সঙ্গীতে প্রবেশ চেষ্টায় বদ্ধপরিকর। এবিষয়ে প্রতিবাদ করিলে প্রত্যুত্তর দিতে অপারগ হইলেও পুনরুক্তি করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

প্রথম সংস্কৃত শ্লোকের কথা ধরুন। আর্য্য সঙ্গীত প্রাচীন ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যাঁহারা এ সঙ্গীতের আবিষ্কারকর্ত্তা, তাঁহারা এসম্বন্ধে যে চিন্তা বা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত শ্লোকেই নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের সঙ্গীতরসিকের পক্ষে সেই প্রাচীন চিন্তা-ধারার সহিত পরিচয় রক্ষা করাও কি অপরাধ? তারপর শ্রুতির কথা অনেকেই জানেন, আর্য্য সঙ্গীতের স্বর-পদ্ধতির মূল ভিত্তিই হইল স্বরের শ্রুতি-বিভাগ। আজকাল হারমোনি-য়মের যুগে অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। স্বরের সূক্ষ্ম শ্রুতিবিভাগ এখন ক্রমশঃ কল্পনার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর গঠন ও অঙ্গবিন্যাস, বাদী সম্বাদীর সম্বন্ধ বিচার—সমস্তই এই শ্রুতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সঙ্গীতে শ্রুতির খেলা নাই সে সঙ্গীত এদেশের সঙ্গীতবিদের নিকট প্রাণহীন ও মাধুর্য্যহীন বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য যে কোন কলাবিদ্যার রসবস্তু বিশ্লেষণ করিয়া মূল উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই নীরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। নীরস তত্ত্বাংশ একবার আয়ত্ত হইয়া গেলে তাহা রসবোধের বিঘ্ন স্বরূপ না হইয়া সহায়তাই করিয়া থাকে, শিল্পরসিক মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ছন্দ শাস্ত্র কাব্যসৌন্দর্য্যের সম্যক উপলব্ধি পক্ষে সহায়তাই করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, শিল্পীর পক্ষে, শিল্প সমালোচকের পক্ষে এই তত্ত্বাংশের সম্যক জ্ঞান অপরিহার্য্য। নব-শিল্প সমালোচক সম্প্রদায় কি সত্যই মনে করেন যে ভারতীয় সঙ্গীতের এই অক্ষর জ্ঞান না হইলেও সঙ্গীত সমালোচক বা সঙ্গীত সংস্কারক হওয়া চলে?

অধুনা নব্যদলের এই ধারণা যে ওস্তাদগণের অধিকাংশই আজকের দিনে সঙ্গীতের দুরবস্থার জন্য কম বেশী দায়ী একথা আংশিক ভাবে সত্য হইতেও পারে। কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে এই সঙ্গীত যে এতদিন টিকিয়া আছে তাহাও এই ওস্তাদগণের একনিষ্ঠ সাধনার গুণে? যতই

দুরবস্থা হউক এখনও প্রাচীন ভারত সঙ্গীত ভারতবসীকে যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরস উপভোগ করাইতেছে তাহার তুলনা অধুনা সৃষ্ট অন্য কোন শিল্পের মধ্যে নাই। এ সঙ্গীতের ভিত্তি জাতীয় আত্মার গভীরতম স্তরে নিহিতথাদু প্রভৃতি সিনেমা থিয়েটার-রসিক তরুণ বঙ্গ তাহা অস্বীকার করিতে পারে, কারণ তাহার অন্তরাত্মার দ্বার আজ সকল প্রকার গভীর রস বোধের পক্ষে নিরুদ্ধ। কিন্তু দ্বার একদিন খুলিবেই এবং তখন ঐ ওস্তাদদিগের নিকটে তাহাকে অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তরুণ সঙ্গীত সংস্কারকগণ যে তরুণ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখেন সেই তরুণদের ধারণা ওস্তাদি সঙ্গীত একটা কিম্ভুত কিমাকার হাস্যাস্পদ পদার্থ। এই ভ্রম ধারণা অবস্থা বিশেষের। সাধক-প্রবর রাম প্রসাদ গান করিয়াছেন :—

মন, গরীবের কি দোষ আছে ?

বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেমন নাচায় তেমনি নাচে।

আর একটী কথা' প্রায় শুনিতে পাই যে ধ্রুপদের যুগ গত হইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের গজল, ঠুংরী, টপ্পাই নাকি বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের উপযোগী। তবে নিরবচ্ছিন্ন গজল, টপ্পা, ঠুংরী এক ঘেয়ে হইতে পারে, তাই ধ্রুপদ ও খেয়াল অন্ততঃ মিউজিয়মে তুলিয়া রাখিবার মত বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কথার উত্তর রাম প্রসাদের গানে পাইয়াছেন। ধ্রুপদ, খেয়াল গভীর ও স্থায়ী রসের সৃষ্টি করে; গজল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি অপেক্ষা ধ্রুপদ খেয়ালের স্থান যে বহু ঊর্দ্ধে তাহা কৃষ্ণের জীব বুঝিতে পারেন না, কিন্তু জীবতত্ত্বদর্শী রসিক মাত্রেই তাহা অনুভব করেন। আজিকার চঞ্চল জীবন যাত্রায় সেই গভীর রসের অনুভূতির অবকাশ স্বল্প, অধিকাংশ লোকই এখন চঞ্চলচিত্ত। কিন্তু রসতত্ত্ব চিরন্তন। যুগভেদে সমাজে রসবোধের প্রসার বা সঙ্কোচ হইতে পার, কিন্তু এই আবর্ত্তনের মধ্যে যে স্বল্প সংখ্যক গুণী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি উচ্চতম শিল্পের চিরন্তন রসভাণ্ডার রক্ষা করিয়া যান তাঁহারাই জাতীয় সভ্যতার ও মানব সভ্যতার প্রকৃত ভাণ্ডারী। যাহা নিত্য কালের সম্পত্তি তহার উপর ক্ষণিক যুগধর্ম্মের দাবী খাটে না। এই স্থানে বলিয়া রাখি, যুগধর্ম্ম বা কালধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু আছে তাহা আমার মনে হয় না। প্রচলিত ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন; অর্থকরী শিক্ষার ফলস্বরূপ এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম'।

অনেকের ধারণা "বাঙ্গলা গানে হুবহু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঢং আমদানী করিতে গেলে সে চেষ্টা সার্থক হইবে না। বাঙ্গলা গানের মধ্যে একটু বাঙ্গালীত্ব থাকা চাই। প্রধানতঃ এই মতের প্রচারক শ্রীমান দিলীপ কুমার। তিনি বলিতে চান যে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লালের গানে হিন্দুস্থানী স্বরবৈচিত্র্যের সহিত বাঙ্গলা কাব্যের দরদের অনেক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য হইয়াছে। অতুল প্রসাদের ঠুংরী অঙ্গগান ও কাজী নজরুলের গজল অঙ্গের গান সম্বন্ধেও তিনি ঐ কথাই বলিতে চান। বোধহয় তাঁহার বক্তব্য এই যে বাঙ্গলা গানে এই সকল আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু উল্লিখিত গান-সমূহে কি ভাবে এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝাইয়া বলেন নাই। বুঝাইবার কিছু থাকিলে বুঝাইয়া বলিতেন।

বাঙ্গলা গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীর শুদ্ধ স্বর প্রয়োগ চেষ্টা বহুকাল পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে! জয়দেব মহাপ্রভুর গানে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। তাঁহার কাব্য জগতে অদ্বিতীয়। গৌরাঙ্গদেবের সময়ে যখন ধর্ম্মভাবের রোল ছুটিয়াছিল, তখন প্রচার কার্য্যের জন্য কীর্ত্তনাদি গান পুনরায় প্রচলিত হইল। ইহাতে বাঙ্গালা কাব্যের দরদ রক্ষা করিয়া রাগ-রাগিনীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া পুরাদমে বাঙ্গালীত্ব রক্ষা হইয়াছে।

সমসাময়িক বাবা হরিদাস স্বামী নিজ শিষ্যদের দ্বারা রাগ-রাগিনীর বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে কীর্ত্তন গানের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া রাগ-রাগিনীর সম্পূর্ণ সম্পর্ক না রাখিয়া কয়েক প্রকার গানের উদ্ভব হইয়াছে। যথা, ঢপ্, বাউল, রামপ্রসাদী গান। এই সকল গানের মধ্যে এক এক প্রকার বিশেষ রসের উদ্বোধন হইয়াছে। বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তঃস্তর হইতেই উহাদের উদ্ভব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সুর মুখ্যতঃ কাব্য রসের বাহন হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সঙ্গীত কলা তাহার নানা বিচিত্র উপাদান ও অলঙ্কার লইয়া স্বকীয় পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠান লাভ করে নাই, করিল স্বর্গীয় দেওয়ান মহাশয়ের গানে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথমাবস্থার বহু ধর্ম্ম সঙ্গীতে,

নিধুবাবুর টপ্পায়, গোপাল উড়ের যাত্রায়, দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে, গোবিন্দ অধিকারীর প্রেমময় আত্ম-নিবেদনে।

ইতি পূর্ব্বে আদর্শ স্বরূপ যে তিনটী সঙ্গীত রচয়িতার নাম উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদের ন্যায় নব্য বঙ্গের অধিকাংশ সঙ্গীত রচয়িতাদের গানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়—তাঁহাদের গানে কথার এত আধিক্য যে তাহার মধ্যে সুরের স্বচ্ছন্দ লীলা পদে পদে ব্যাহত হয়। সঙ্গীতের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য তাহা স্বর বিন্যাসের দ্বারাই ফুটিয়া উঠে। "বাগর্থ" বিন্যাসের দ্বারা নহে। গান যদি রাগ—পদবাচ্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে সৃষ্টির জন্য মুখ্যতঃ মীড়গমক-মূর্চ্ছনাদি সুরের কারুকার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সুরের সৌন্দর্য্য প্রকাশের পক্ষে গানের বাক্যাংশের উপাদান স্বর-ব্যঞ্জনাদি বর্ণের প্রত্যেকের এক একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বরবর্ণের মধ্যে আ এ এবং ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে গ, ঘ, ট, ঠ, ড, ঢ, ধ, ল, হ প্রভৃতি বর্ণ গমক প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হিন্দুস্থানী গান প্রায়ই সঙ্গীত কলাবিদের রচিত, সেইজন্য তাঁহাদের গানে সুরের স্বচ্ছন্দ বিকাশের অবকাশ দিয়া বাক্যাংশকে যোজনা করা হয় এবং যে স্থানে যে অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে হইবে সে স্থানে তদুপযোগী বর্ণ ব্যবহার করা হয়। সে গানে বাক্যাংশ এলোমেলো ভিড় করিয়া সুরকে চাপিয়া মারে না এবং প্রচুর অবকাশ দিয়া সুরকে স্বচ্ছন্দে খেলিতে দেয়, আবশ্যক মত সুরের সহকারী হইয়া রাগের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার সহায়তা করে। উপরন্তু প্রকৃত রাগ-রচয়িতাকে রাগ, তাল, লয়, ছন্দ, রূপ, রসের বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সকলের বিশেষ বিবৃতি লিখিতে হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায় এবং পাঠকেরও বিরক্তির সম্ভাবনা, সেই কারণে সংক্ষেপে বলি। ধ্রুপদ অঙ্গের তালের মধ্যে সাধারণতঃ আট দশটা তালের ব্যবহার দেখা যায়।—চৌতাল, ধামার, সুর ফাঁক-তাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকের ছন্দ ও গতি-প্রবণতা পৃথক। চৌতালের জন্য যে গান রচিত তাহা অন্য কোন তালে গীত হওয়া অসম্ভব। সেইরূপ ধামার বা অন্য তালের গান ধ্রুপদ অঙ্গের তালে, কিম্বা ধ্রুপদ অঙ্গের গান, টপ্পা, ঠুংরী ধরণের তালে গীত হইতে পারে না। এই হইল তাল, লয়, ছন্দ বিষয়ের কথা। রাগ, রূপ ও রসের বহু ব্যাপার। রাগ বিশেষের রস ও ভাব বিশেষের কথা শাস্ত্রে আছে। আমি এক্ষণে তরুণদের রুচির বশবর্ত্তী হইয়া আদিরসের (অনুরাগ) ব্যাপার লইয়া রাগ, রূপ ও রসের ব্যাপার একটু "তা না না না" করিয়া সঙ্গীতাচার্য্যগণের গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। উপনিষৎ বলিলেন ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি অভেদ; যেমন সূর্য্য ও তাহার জ্যোতিঃ বা হীরক আর তাহার দীপ্তি। গুণঃ ক্ষোভ হইলে বিকাশ বা সৃষ্টি হয়। পুনরায় গুণত্রয় (সত্য, রজঃ, তম) কে সংযত করিয়া শক্তির বিকাশ রহিত করাই অদ্বৈতবাদ। বেদান্ত এই সিদ্ধান্তকে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ আর সব অসৎ, মায়া বা অজ্ঞান বলিয়াছেন। এই মায়া অর্থাৎ ভ্রম ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতে উপনীত হইতে হইবে। এই মূল ধরিয়া সাংখ্যকার তাহাকেই পুরুষ প্রকৃতি সংজ্ঞা দিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইলেন। এই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহার ফলে বৈষ্ণবেরা নেড়ানেড়ী আর আমরা সাহেব মেমে পরিণত হইয়াছি। এখন ডাইভোর্স ব্রতাবলম্বন করিলেই আমরা সহজে অদ্বৈত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিব। বেদান্ত আমলের গান, যথা :—

রাগ—ভৈরব, তাল—চৌতাল।

আদি রমা জ্যোতিকো যো জানে জানে অন্তর্যামী।
পাবে বৈ সে যোগীধ্যায়ে তাহে দেত অচল স্মরণ॥"

সাংখ্যযোগ কারিকা ভাবের গান যথা :—

রাগ—পুরিয়া, তাল—চৌতাল।

আজু কেতকী যে কেশোরায় গুলাব যে গোপাল লাল,
মোগরে যে মদন মোহন, পিয়ারি ছব দেত।
দাওদী মে দামোদর, শীলা :মে শ্রীজগরনাথ
পারলে মে অপার ব্রহ্ম, সেউতী মে সীতারাম সবরস—পিয়ে॥

শ্রীকৃষ্ণ লীলায় গান বিষয়ে বলিবার পূর্ব্বে আমার কিছু বলিবার আছে। সাহিত্য সম্রাট অমর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "কৃষ্ণচরিত" গ্রন্থে বলিয়াছেন,—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন [illegible] তাঁহাদের জন্য তিনি 'কৃষ্ণচরিত' লিখেন নাই। আমাদের মত ভাবাপন্ন লোকের জন্যই লিখিয়াছেন।

সে জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব ধরিয়াছেন। আমিও এখানে তাঁহারই পদ স্মরণ করিলাম। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম ভাবেন তাঁহাদের গান :—

রাগ—ইমনকল্যাণ, তাল—চৌতাল।

১। "পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অলখ্ নিরঞ্জন অব্যক্ত অবিনাশী
নরবর নারায়ণ নরোত্তম।" ইত্যাদি

এবং যাঁহারা তাঁহাকে আদর্শমানব ভাবেন তাঁহাদের গান :—

রাগ—মূলতান, তাল—ধামার।

২। "মৈনে দেখি আনোখি হোরিরে
মনমোহন কি কুঞ্জগলিন মে অনুপম সোর মচোরি।
মমতা কেশর ভর পিচকারী মারতুহৈ বরজোরী ;
জ্ঞান গুলাল উড়ে অতি ভারী, উড়ে ভব ঝোরী।"

প্রেমভাবের গান যথা—

রাগ—খাম্বাজ, তাল—ঝাঁপতাল।

৩। "এ সখি শ্যামরো রূপ যৌবন মন ললচায়ে,
অধর ধর মধুরী মধুরী মুরলী বজায়ে।
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম গায়ে শুনায়ে, মনমে মনমে নিরত
কর ভাব বতায়ে॥"

প্রতীক্ষা ভাবের গান যথা—

রাগ—আশাবরী, তাল—চৌতাল।

৪। "সোগনহো আজুতোর আলী, ভুজফরকত
মোরি পিয়া মিলনকো। মনমে উমগ ভই,
পিয়াকে আবন লাগী ঘরি পলন গিলন কো।"

বিরহভাবের গান যথা,—

রাগ—মালকোষ ; তাল—সুরফাঁক তাল।

আওন কহগয়ে অজহুন আয়ে, সবনিশ বীতি,
মোহে গিনবত তারা। দীপ জ্যোত মলিন হোত
চলি আয়ে, কেয়া করি এ সখী নিত ভর যায়ে॥"

অভিমান ভাবের গান যথা :—

রাগ—কামোদ, তাল—ধামার।

৫। "মতবারো ঠাঢ়ো বাট মাঝ, মতবারো কঠিন
ভয়োঘর যামেরী,
সজনী জিয়া কাঁপত, জহু জহু পড়ত সাঁঝ।" ইত্যাদি

বিষাদভাবের গান যথা,—

রাগ—শঙ্করা বেহাগ, তাল—ধামার।

৬। "হারে নিরদয়ীরে লুংগর মোহন মোহলই।
জবসে শ্রবন শুন বাঁশরী, সুধ বুধবিসর গই॥ ইত্যাদি

গোপবালকদের বিরক্তির গান যথা,—

রাগ—আলোয়া, তাল—ঝাঁপতাসা।

৭। "ইয়ালে তোরি লাকরি কামরিলে,
গৌয়ে চরাওন নজাউরী মায়ী।
সঙ্গকে গোয়াল বলভদ্র কিউনি মোকলো
বনমে অকলো ন জাউরী মায়ী।"

সখা ভাবের গান যথা, (গোপিনীর)—

রাগ—মুদ্রাকি কানাড়া, তাল রূপক।

৮। "কনৈহা যানে দেহো যমনা জল ভরন,
আপন দান লে কানাহি।
হমারে সঙ্গ কি দূর নিকস গয়ী
পরিহো তোরি পইয়াঁ।"

ভাবের লঘু গুরু ও যে সময়ে গীত হইবে সেই সেই অনুযায়ী রাগ গ্রহণ করিতে হইবে। এবং তাল নির্ব্বাচনও সেই অনুসারে করিলে রাগ ও ভাব সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিবে ; এতদ্ভিন্ন অন্য পন্থা গ্রহণে রসের কিছু অভাবই পরিলক্ষিত হইবে। উক্ত গান কয়টির কেবল স্থায়ী এবং অন্তরামাত্র দেওয়া হইয়াছে। সঞ্চারী এবং আভোগাংশ বাহুল্য ভয়ে দিই নাই। এত অল্প কথায় উচ্চ হইতে উচ্চতম ভাব বাঙ্গলাগানে সম্ভব হইলেও সচরাচর দেখিতে পাই না। কথার বাহুল্য থাকায় বাঙ্গলাগানে রাগের বিকাশ পূর্ণমাত্রায় হয় না। বাঙ্গলাগান যাঁহারা রচনা করেন, তাঁহারা অনেক

স্থানে সঙ্গীত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ঔপপত্তিকও নন, ক্রিয়াসিদ্ধও নন। গানের সুর ও তাল বিভিন্ন লোকের দ্বারা বসাইয়া লন। সে স্থলেও অসঙ্গতি অনিবার্য্য। সে গানের মধ্যে সঙ্গীত রসিক কোন রস পান না। যাঁহারা পান তাঁহারা কাব্য রস মাত্র উপভোগ করেন। স্বর সেখানে কথার বাহন মাত্র। তাহা সঙ্গীত নহে, সুর সহযোগে কথার আবৃত্তি মাত্র। তাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতের যথার্থ মাধুর্য্য রস উপভোগ করিতে একেবারে অসমর্থ। সেই মাধুর্য্যরসের সহিত পরিচয় সাধন করানই এখন সংস্কারকের প্রধান কর্ত্তব্য, প্রাচীন গুণীগণের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করা নহে। যতদিন এই প্রকৃত রসবোধ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জাগ্রত না হইবে, ততদিন তাঁহাদের প্রেরণায় কোন সংস্কারের প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র। ভারতীয় সঙ্গীতের মূলধারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেই বৈচিত্র্য ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, এখন কিছু আছে। বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান পায় নাই তাহা কেবল গায়ের জোরেই বলা চলে। নূতন চেষ্টার কথা শুনিলেই ভয় হয়—পাছে ভারতীয় সঙ্গীতের মূলধারার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙ্গলা সঙ্গীতকে এমন একটা পারম্পর্য্যহীন স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করা হয়, যে প্রবাহ নূতন নূতন যথেচ্ছাচারে আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। এ আশঙ্কা যে আমার একবারে অমূলক তাহা নহে; বর্ত্তমান তরুণ বাঙ্গলার বৈঠকে ও রঙ্গমঞ্চে এই উন্মার্গ সঙ্গীতের আত্ম ঘোষণা প্রকট হইয়া উঠিতেছে। আমরা যদি বাঙ্গলাগানের মধ্যে সঙ্গীতকলার বিকাশ দেখিতে চাই তাহা হইলে এই পন্থা পরিহার করিতে হইবে। *

চৈল পাহাড়ে দু'রাত্রি

শ্রীসুধীন্দ্র কৃষ্ণ বসু

কাল্‌কা থেকে সিম্‌লার মধ্যপথে কাণ্ডাঘাট রেলষ্টেশন। চৈল পাহাড়ে পৌঁছতে হ'লে এখান থেকে ১৮ মাইল পথ মোটার রোডে বা পাকদণ্ডির রাস্তায় যেতে হয়। চৈল সহর মহারাজা পাতিয়ালার গ্রীষ্মাবাস। মহারাজা যখন এখানে থাকেন তখন তাঁর অনুমতি ভিন্ন বা তাঁর অতিথি ছাড়া সাধারণের এখানে প্রবেশ নিষেধ। চৈলের উচ্চতা সিম্‌লার চেয়ে বেশি। এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে পারিপার্শ্বিক হিমালয় পর্ব্বতমালার দৃশ্য অপূর্ব্ব। একদিকে চিরতুষারাবৃত হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী ক্রোড়স্থ নাতি-উচ্চ পর্ব্বতবৃন্দের সহিত মিলিত হ'য়ে, এক মহান্ ভাবের বিকাশ করেছে। অপর দিকে সমতলভূমি তাহার বৃক্ষ, নদী, বনানী ইত্যাদির শোভা বিতরণ ক'রে নিজের বিরাটত্বের মহিমা প্রকাশ করছে।

চৈল পাহাড় দেখবার আমার ও কয়েকজন বন্ধুর বহুদিন যাবৎ বাসনা ছিল। কিন্তু সাধারণের ভ্রমণের উপযোগী নয় বলে, যোগাযোগ হওয়া সম্ভব হ'চ্ছিল না।

অবশেষে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে, মহারাজার মিলিটারি সেক্রেটারির কাছে দেশভ্রমণের সংকল্পে কয়েকদিনের জন্য ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন করলাম। উত্তর পাওয়া গেল যে চৈল পাহাড়ে সাধারণের বাসোপযোগী ডাকবাঙ্গালা বা হোটেল নেই। ইহা মহারাজার গ্রীষ্মাবাস এবং সাধারণের ভ্রমণের জন্য নয়। সুতরাং নিরাশ হ'য়ে তখনকার মত আমাদের নিরস্ত হ'তে হ'ল। তারপর শীতকালে একবন্ধু খবর দিলেন যে যখন মহারাজা থাকেন না, তখন বিনা ছাড়পত্রে চৈলে গেলে কোন আপত্তির কারণ হয় না। তখন বন্ধুর চেষ্টায় আমরা সেখানকার এক মহাজনের নামে চিঠি নিয়ে যাত্রার উদ্যোগ করলাম। আমাদের দলে তিন

---

* এই প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

বন্ধু ছিলেন। তখন ডিসেম্বর মাসের শেষ। সিমলাতেই বরফ পড়বার উত্তোগ হচ্ছিল, সুতরাং শীত প্রচণ্ড। সেখানে সিমলার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হবে এবং এই দুঃসাহসিক অনুষ্ঠানে কষ্টের শেষ থাকবে না—এসব যুক্তি দিয়ে বন্ধুরা আমাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমরা কিন্তু মনস্থির করেছিলাম, এবং যাত্রারম্ভের সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হওয়ামাত্র আমরা বাক্সা রেলে সিমলা থেকে রওনা হলাম। সঙ্গে একজন চাকর, বিছানার বড় বড় দুটী মোট, চার দিনের উপযুক্ত চাল, ডাল, ঘি, মসলা, নুন, আলু, ডিম ও তার ওপর কাঁচা রসদ, চায়ের সরঞ্জাম, বাসন, ষ্টোভ ইত্যাদি পূর্ণ টিফিন বাক্স ও প্রয়োজনীয় জামাকাপড়ের সুটকেস। বেলা ২॥০টা আন্দাজ কাণ্ডাঘাটে নামলাম। প্রথমে ষ্টেশনের টি রুমে, চা টোষ্ট ইত্যাদি খেয়ে, সেখান থেকে আবার যাত্রা-পর্ব্বের উত্তোগ করা গেল। এ সময় লোকজন না থাকায় মটর (ট্যাক্সি) চলাচল করে না, সুতরাং পাওয়া গেল না। তখন আমরা পায়ে হেঁটে এবং খচ্চরে (mule) চড়ে মালপত্র নিয়ে যাবার জন্য খচ্চরের চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু কেউ যেতে রাজি হ'ল না, ফেরত পথে তাদের ত আর ভাড়া জুটবে না।

আমাদের চাকরটা পাহাড়ী ছিল। তারই চেষ্টায় ও দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে রাজি হওয়ার ফলে অতিকষ্টে তিন জন কুলি পাওয়া গেল। এসব বন্দোবস্ত করতে বিকাল হ'য়ে গেছলো। কুলিরা তখন রওনা হ'তে নিষেধ করে, পরদিন প্রাতে যাবার জন্য অনুরোধ করল। আমরা তাদের কথায় কাণ না দিয়ে তখনই রওনা হলাম।

প্রথমে মোটার রোড্ ধরে পাহাড়ের উৎরাই দিয়ে যেতে লাগলাম। প্রায় তিন মাইল থেকে চার মাইল যাবার পর অশ্বিনী নদীর তীরে পৌঁছলাম! অশ্বি নামে নদী হ'লেও কয়েকটি বড় ঝরণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। এ সময় আমাদের একটু গরম বোধ হ'তে লাগলো, তখন কোট খুলে শুধু সোয়েটার কোট্ পরে চলতে লাগলাম। তখন শীতকাল ব'লে রাস্তার দুপাশের গাছ সব পাতাহীন। ঘাস ও অপর ছোট ছোট গাছ সব শুকিয়ে গেছে। অপর পাহাড়ে বরফ পড়ায় ও শীতের আধিক্যে সে বরফ গলতে না পারায় নদীর জল ধারা ক্ষীণতর হয়েছে। অশ্বিতে এসে যখন আমরা চা ক'রে খেলাম, তখন প্রায় সূর্য্যাস্তের সময়। ক্ষীণ সূর্য্য রশ্মি পার্ব্বত্য নদীর ক্ষীণ জল রেখার উপর প'ড়ে দিনান্তের শেষ বিদায়ের বাণী শুকনো গাছপালা ও নদীর ঝরঝর্ কল্লোলের মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছিল। নির্জ্জনতার অন্তরে এই ধ্বনি স্বভাবের সামঞ্জস্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণে এক নব শিহরণ এনে দিলে। বেশীক্ষণ এ অনুভূতি স্থায়ী হ'ল না। কুলিদের তাড়নায় আবার যাত্রার উত্তোগ করতে হ'ল। তাদের পরামর্শে, আমাদের ওভারকোট বিছানার মোট থেকে বার করলাম। পূর্ব্বেই কোট গায়ে দিতে হ'য়েছিল। তবু একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হ'চ্ছিল।

এইবার আমাদের উঠবার পালা, সব রাস্তাটাই চড়াই। কুলিরা বললে যদি মোটার রোডে যাই তো চড়াইয়ের রাস্তা কম হবে, আর যদি পাকদণ্ডির রাস্তা দিয়ে উঠি তো চড়াই বুকভোর হবে, কিন্তু দূরত্ব কম হবে। আমরা পাকদণ্ডির রাস্তাই ধরলাম। প্রায় হাজার ফুট উপরে উঠবার পর বেশ অন্ধকার হ'য়ে এল। শীতের প্রকোপও বেশ অনুভব করাতে ওভারকোট গায়ে দিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম।

ক্রমাগত চড়াই ওঠার দরুণ হাঁফ লাগছিল। খানিকটা করে চলে একটু করে দাঁড়াতে হচ্ছিল, বিশ্রামের জন্য কুলিরা এখন থেকে পেছিয়ে পড়তে লাগল। আমরা কেউ রাস্তা না জানাতে বেশি দূর অগ্রসর হ'তে পারছিলাম না। তাদের জন্য অপেক্ষা করে চলে চলে যখন পাহাড়ের অনুমান প্রায় অর্দ্ধেকটা উঠেছি, তখন প্রায় রাত্রি ৭টা বেজেছে। চারিদিকে কেবল চিড়, কেলু ও অপর পার্ব্বত্য গাছের জঙ্গল। সান্ধ্য সমীরণ চিড় ও কেলু গাছের মধ্যে প্রবাহিত হ'য়ে সমুদ্র কল্লোলের মত ধ্বনিত হচ্ছিল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার কলরব তার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করবার চেষ্টা করছিল। পাকদণ্ডির পথ অতি অপ্রশস্ত। পথ চ'লে রাস্তা হয়েছে, কেউ কখনও রাস্তা তৈরী করে নি বা ঠিক রাখবার জন্য যত্ন করে না। একজন লোক মাত্র সে পথে যেতে পারে চিড় ও কেলুগাছের মসৃণ শুকনো পাতা, সেই পথের সবটাই অধিকার করে আছে। রাত্রের অন্ধকার, মাঝে মাঝে জোনাকির আলোতে তা' আরও গাঢ় হচ্ছিল। পথ

চল্‌তে চল্‌তে প্রায়ই পদস্খলন হ'চ্ছিল। আমাদের কেউ কেউ বার কয়েক পড়েও গেল।

লাঠিতে ভর দিয়ে কখনও কখনও গাছের ডাল ধ'রে, সেই অন্ধকার পথে চড়াই উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। নিজেদের মনে তখন কুলিদের কথা না শুনে রওনা হবার জন্ত অনুশোচনা আস্‌ছিল। একে রাত্রির অন্ধকার, অজানা অপ্রশস্ত পথ, তার উপর এইবার বৃষ্টি নাম্‌লো।

আমরা যখন উপরে উঠ্‌তে আরম্ভ করি, তখনই মেঘ জমতে সুরু হয়েছিল। গাছতলায় আশ্রয় নেওয়া গেল। ছাতি সঙ্গে নেওয়া হয়নি, সেজন্ত টুপি ও ওভারকোট সব ভিজে গেল। পথে জনমানব নেই, কাছাকছি কোন গ্রাম বা মনুষ্যের বাস আছে ব'লে অনুমান হ'ল না। আমাদের মন তখন ক্লান্তি ও নিরাশায় ভরে গেছে, ভয়ও যে পায় নি এমন নয়। জলে ভিজে পথ চল্‌তে বিশেষ কষ্ট বোধ হতে লাগ্‌লো। নিজেদেরই দেহের ভার বইতে যখন আমাদের এই কষ্ট, তখন কুলিদের ভিজা মোট নিয়ে উঠার কষ্টের কথা বেশ অনুমান করতে পারলাম। বক্‌সিসের কথা ব'লে তাদের উৎসাহিত করা গেল। এ ভাবে অনেক পথ চলার পর আমরা দূর সিম্‌লা পাহাড়ের আলোর ঝিকিমিকি দেখ্‌তে পেলাম। তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে, সাদা পাত্‌লা মেঘ, মাঝে মাঝে পূর্ব্বের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করছিল। চৈল পাহাড় থেকে সিম্‌লা পাহাড় এত দূর যে, সিম্‌লার বিজ্‌লি আলোর রশ্মির উজ্জলতার প্রখরতা কিছুই ছিল না। আকাশের তারা ও পাহাড়ের গায়ের তারার মত ঝিকিমিকি দুয়ে মিলে এক অপূর্ব্ব রূপের সৃষ্টি করেছিল। সিম্‌লার আলোকমালার দৃশ্যে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হ'লাম। চলার গতি সঙ্গে সঙ্গে বাড়্‌লো, কারণ অনেকটা উপরে উঠেছি অনুমান করতে পারলাম। এইবারে রাস্তার পাশে এক চাষীর ক্ষেত ও কুটীর দেখ্‌তে পেলাম, তখন রাত্রি ৯টা। এই দেখে আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমরা সেই কুটীর-দ্বারে গিয়ে অনেক ডাকাডাকির পরে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। তার কাছে অনুসন্ধান ক'রে জান্‌তে পারলাম যে, আরও এক মাইল দেড় মাইল পথ আমাদের চল্‌তে হবে। এইবার চড়াইয়ের উচ্চতা কম্‌তে লাগলো। ক্রমে চৈলের ঘর বাড়ীর এলাকার মধ্যে এসেছি বুঝতে পারলাম শেয়ালের ডাক শুনা গেল ও পথের মাঝে গৃহত্যক্ত আবর্জ্জনার স্তূপের দৃশ্য চোখে পড়লো। আবার খানিক পথ চল্‌বার পর, আমরা চৈলের বাজারে পৌছিলাম। তখন সব নিস্তব্ধ। অনেক খোঁজা খুঁজির পর আমরা যখন যে মহাজনের নামে চিঠি এনেছিলাম —তাঁর দোকানও বাড়ীর কাছে পৌছিলাম, তখন রাত দশটার কাছাকাছি হবে।

(ক্রমশঃ)

দেশর কথা

শ্রীসরোজরঞ্জন মিত্র

ইউনিয়ন বোর্ডের নাম আজ কাহারো অপরিচিত নাই। পল্লীর রাস্তাঘাট সংস্করণ, পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ, পল্লীবালকদের প্রাথমিক শিক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ ও পল্লীবাসিদের ছোট খাট গৃহবিবাদের মীমাংসাদি এই বোর্ডের কার্য্য। এক কথায় বলিতে গেলে পল্লীবাসীর মোটামুটী সুখ সুবিধা করিয়া দেওয়ার সকল ভারই এই বোর্ডের উপর ; ইহা এক প্রকার গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন।

এই সকল কার্য্য ব্যয়-সাপেক্ষ ; এই ব্যয় আসিবে কোথা হইতে ? স্থির হইল যে দরিদ্র পল্লীবাসীদের উপর কর আরোপিত করিয়াই এই ব্যয় সংকুলান হইবে। ট্যাক্‌সের নূতন কোন নামকরণ হইল না, চৌকিদারী ট্যাক্‌সের নামেই যাহার যে ট্যাক্‌স নির্দ্ধারিত ছিল তাহার দ্বিগুণ হইতে দশগুণ পর্য্যন্ত ট্যাক্‌স বসিল। দরিদ্র প্রজা প্রমাদ গণিল।

যাহা হউক গ্রীষ্মকালে বাটী কাটিয়া শেয়ালা-পচা ঘোলা

জল আর পান করিতে হইবে না ত? বর্ষাকালে হাটে যাইতে গেলে ত আর একবুক জল ও একহাঁটু কাদা ভাঙ্গিতে হইবে না? অদূর ভবিষ্যতেই ইউনিয়ন বোর্ড তাহাদের রাস্তা তৈয়ার ও পানীয় জলের কূপ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিতেছে, এই আশায় তাহারা পেটে না খাইয়া বোর্ডের কর যোগাইল।

বলা বাহুল্য বোর্ডের নূতন নিয়মে যখন গ্রাম্য চৌকিদারগণ ইহার অধীনে আসিল তাহারাও মনে করিল সপ্তাহে সপ্তাহে যখন থানায় হাজিরা দেওয়ার পরিবর্ত্তে বোর্ডে হাজিরা দিলেই চলিবে, তখন বোর্ডের কর্ত্তারা তাহাদের দেশের লোক হইয়া তাহাদের আপদে বিপদে কি একটু স্নেহের চক্ষে চাহিবেন না? বাবুরা ত আর সরকারের চাকর নহেন? আর মাহিয়ানাটা ত তাহারা নিয়মিত পাইবেই—তাহাদের আনন্দের দিন!

অতএব বোর্ডের নির্দ্ধারিত চাঁদা আদায়ে তাহাদের উৎসাহের অন্ত রহিল না—একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বর্ত্তমানে চাঁদাটা দিয়া দিলে অদূর ভবিষ্যতে যে কত প্রকার সুখ সুবিধা হইবে, ইহা তাহারা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে কাহাকেও ত্রুটী করিল না। সরল গ্রামবাসী সরল মনেই তাহাদের শ্রমের কড়ি দিতে থাকিল। বিপুল উৎসাহে চাঁদা আদায় চলিল। জনহিতকর কার্য্যের জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে বোর্ডের হাকিম (President) নির্দ্দিষ্ট স্থানে সদলবলে মিলিত হইয়া সভা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিল। গ্রামবাসিগণ এক বৎসরের মধ্যে কোথাও রাস্তা বা জলাশয়ের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া হতাশ হইল। দলে দলে আসিয়া তাহারা বোর্ডের কর্ত্তাদের নিকট দাঁড়াইল, এবং রাস্তা ঘাটের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাই জানিয়া গৃহে ফিরিল যে প্রথম বর্ষ গিয়াছে চাঁদা আদায় পর্ব্ব শেষ হইতে, কার্য্য আরম্ভ হইবে দ্বিতীয় বৎসর হইতে।

কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর গত হইল, এবং দ্বিতীয় ছাড়িয়া তৃতীয় বৎসরও ঘুরিয়া গেল, পল্লীবাসীরা কোথাও রাস্তা বা জলাশয়ের সন্ধান পাইল না। তবে কি রাস্তা ঘাট একেবারেই কোথাও তৈয়ার হয় নাই? না, কিছু কিছু হইয়াছে বই কি, তবে সেটা স্থান কাল পাত্রানুযায়ী। হয়তো কোন প্রধান হাকিম (President) ব্যবসাদার, বর্ষাকালে তাঁহার ব্যবসায়ের গদিতে যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা; তাঁহার গৃহদ্বার হইতে আড়ত পর্য্যন্ত একটী সুন্দর রাস্তা নির্ম্মিত হইল; হয়তো কোন হাকিম চিকিৎসক, অতএব তাঁহার গৃহ হইতে ঔষধালয় (Dispensary) পর্য্যন্ত একটী রাস্তার একান্ত অভাব তিনি অত্যন্ত বোধ করেন, অতএব সে অভাব পূরণ হইতে বাকী রহিল না। এইরূপে কাহারো বহিঃপ্রাঙ্গণে একটী নলকূপ বসিল, কোন সভ্যের (Member) সদর বাটীতে একটি ইঁদারা খনিত হইল; এসব ত জনহিতকর কার্য্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ নিশ্চয়ই। অতএব কাজ কিছু কিছু হইয়াছে বৈ কি? আদৌ কিছু হয় নাই বা এসকল কার্য্যে অর্থব্যয় হয় নাই বলিলে হয়ত মিথ্যাই বলা হইবে। *

ট্যাক্সের টাকা আদায়কল্পে যত প্রকার কলকৌশল বুদ্ধি পরামর্শ প্রয়োগ করা সম্ভব তাহার কোন প্রকার ত্রুটী না করিয়া এবং পরিশেষে দরিদ্রের ঘটী গাড়ু ক্রোক বিক্রয় করিয়া যে চাঁদা আদায় করা হইল, তাহাতে চৌকিদারের মাহিয়ানা দেওয়া হইল কি প্রকারে তাহা একটু উল্লেখ না করিলে ব্যাপারটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

প্রথম প্রথম তাহাদিগকে কিছু কিছু দেওয়া হইল বটে, পরে তাহাদের হাতে একটি পয়সাও না দিয়া কাহারো দ্বারা ৬ মাসের শোধ রসিদ লেখাইয়া নেওয়া হইল, কাহাকেও তিন মাসের এবং কাহাকেও বা সারাবৎসরের টাকা পাইয়াছে বলিয়া রসিদ দিতে বাধ্য করান হইল।

হাকিম বা মেম্বারগণের মধ্যে কেহ হয়তো তাহাদের মনিব, কেহ মহাজন এবং কেহ হয়তো সম্মানার্হ মৌলবী। অতএব তাহারা ভয়ে হোক, লজ্জায় হোক কথা বলিতে পারিল না—কথা তারা ত বলিতে শিখে নাই, তারা শিখিয়াছে শুধু নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামীকেই তাহাদের হৃদয় বেদনা জানাইতে।

* কোথাও বা কোন ইউনিয়নে যে যথার্থ জনহিতকর কিছু কিছু কার্য্য হয় নাই, আমরা তাহা বলিতেছি না। সাধারণতঃ অধিকাংশ স্থলে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং জনসাধারণের মনের উপর তাহার ফল যেরূপ হইয়াছে, তাহারই একটী ছবি সাধারণের নিকট দাঁড় করান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলা ইহার উদ্দেশ্য নহে।

এই ত গেল ইউনিয়ন বোর্ডের গঠন ও রাজস্ব বিভাগ। এখন বিচার বিভাগের বিষয় দুচার কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

বোর্ডে বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা হাকিমদের দর্শনী পার্ষদনীসহ দুবেলা কর্ত্তা হুজুর বলিয়া তৈলমর্দ্দন করিতে পারিলেন, তাঁহারা হয়তো কিছু সুফল পাইলেন। (সেটা ন্যায্যই হোক আর অন্যায্যই হোক); কিন্তু যাঁহারা অতদূর পারিয়া উঠিলেন না, তাঁহাদের আর্জ্জি পড়িয়া দেখিবার অবসরই হয়তো হইয়া উঠিল না!

সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের ভদ্রসন্তানগণ দরিদ্র হইলেও আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য নহেন। সামান্য গ্রাম্য বিবাদভঞ্জনের জন্য বোর্ডে বিচারপ্রার্থী হইলে, বোর্ডকর্তৃপক্ষগণ যদি তাহা কাণে না তুলেন, তবে তাহা লইয়া মেম্বারদের দ্বারে দ্বারে হাত কচলাইয়া বেড়ান তাঁহাদের আত্মসম্মানে বাধে। বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মহাশয় তাঁহার সহকারী সভ্যবৃন্দসহ এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া, বাদী বিবাদীকে ডাকিয়া পাঠাইলে বা সুবিচার করিবার জন্য সংবাদ দিলে তাঁহারা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মোকর্দ্দমার উপযুক্ত তদ্বির করিতে পারেন—কিন্তু মোকর্দ্দমা যেখানে আদৌ হাকিমের এজলাসে উঠে না সেখানে তদ্বির তদারকের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।

সকল কথা বলিয়া বোর্ডের নির্ব্বাচন-বিভ্রাট সম্বন্ধে কিছু না বলিলে অঙ্গহানি হয়। সকল স্থানেই প্রথমে নির্ব্বাচনের মেয়াদ অর্থাৎ তিন বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় নির্ব্বাচন কোথাও হইয়া গিয়াছে ও কোথাও এখনও চলিতেছে। এই দ্বিতীয় নির্ব্বাচন সময়ে মেম্বারদিগের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট পদলাভের জন্য ভদ্রনামধেয় পল্লীজননায়কগণ যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন তাহাতে সত্যই গভীর দুঃখ হয়।

এই ইউনিয়ন বোর্ড যখন প্রথম পাশ হয় সে ১৯০৪ সালের কথা। তখন আমাদের দেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনিষীগণ এই বোর্ড ভবিষ্যতে আমাদের গৃহবিবাদের যন্ত্রস্বরূপ হইবে বলিয়া কদর্থ করিলেও, সরকার বাহাদুর আমাদের এইরূপ বলিয়া বুঝাইলেন—আমরা যে স্বায়ত্বশাসন প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছি; ইহা তাহারই একটা অভিনব সংস্করণ—স্বায়ত্বশাসনেরই একটা পরীক্ষামূলক (Experimental) ব্যবস্থা। অতএব আমরা এই ক্ষুদ্র গণ্ডীবিশিষ্ট গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন কার্য্যে দক্ষতালাভ করিলে ও কৃতিত্বের সহিত ইহার পরিচালনা করিয়া উপযুক্ততা অর্জ্জন করিলে, আমাদিগকে ক্রমে দেশশাসনভার অর্পণ করা হইবে। সেই হইতে এই ইউনিয়ন বোর্ড স্বায়ত্বশাসনের মানদণ্ডস্বরূপ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে এবং গত তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে ইহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা হইয়াছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই ইউনিয়ন বোর্ডের পরিচালন লইয়া আমরা যে জঘন্য মনোভাবের, অনুপযুক্ততা ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিতেছি, তাহাতে স্বার্থগন্ধশূন্য স্বদেশ-সেবার কার্য্যে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব তাহা সহজেই অনুমেয়।

আজ আমরা পরাধীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতি, এই কারণে আমাদের এই হীনতার কাহিনী সাধারণের নিকট প্রকাশ করার মধ্যে আত্মাপরাধের লজ্জা আছে। কিন্তু আবার নিজেদের মধ্যে আমাদের এই নৈতিক চরিত্রের গলদ সম্বন্ধে আলোচনারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই বাংলার মাটিতে জন্মিয়াই, রাজসরকার হইতে হাকিমীর জন্য বাহালী পরোয়ানা (appointment of presidentship) না পাইয়াও, নিজেদের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ নিজেরাই বুঝিতেন ও যথাসাধ্য মিটাইবার চেষ্টা করিতেন। জলহীন পল্লীতে পুষ্করিণী খনন, রাস্তাহীন স্থানে রাস্তা নির্ম্মাণকরণ ও ছোট খাট বাদ বিসম্বাদ নিজেরাই মেটান তাঁহাদের নিত্যকর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারাই এই পঞ্চায়েৎ প্রথার (System of appointing village president) সৃষ্টিকারক। অথচ তাঁহারা যে বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন তাহা নহে; স্বাভাবিক নৈতিক বুদ্ধি ও কুটীলতাশূন্য সরল প্রাণই তাঁহাদের যাবতীয় সৎকার্য্যের উৎস ছিল।

এখন আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলিয়া মনে করি। কিন্তু স্ব-পল্লীর প্রতি, স্ব-সমাজের প্রতি, স্ব-জাতির প্রতি সে দরদ কই? যাহাতে তাহাদের সকল দুঃখ দুর্দ্দশা আমাদের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হয়, এরূপ মন আমাদের কোথায় যাহাতে স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা হয়—

"এই সব মূঢ় মুক ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

উপসংহারে বলিতে চাই, ইউনিয়ন বোর্ড যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত এবং কার্য্যকরী হইলে দরিদ্র গ্রামবাসীগণের আর কিছু না হউক স্বাস্থের উন্নতি এবং রাস্তা ঘাট, পানীয় জলের অভাব দূরীভূত হইতে পারিত; সামান্য সামান্য কারণে মামলা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হইয়া ব্যয়সাপেক্ষ আদালতের আশ্রয়ও লইতে হইত না। কিন্তু তাহা না হইয়া এই প্রতিষ্ঠানের সমুদয় লক্ষ্য, অভিসন্ধি, সামর্থ্য, অর্থ যদি ব্যয়িত হয় ব্যক্তি বিশেষের তেজারতী মহাজনী অথবা দালান ইমারত গড়িয়া তুলিবার সার্থকতায়—তাহা হইলে এইরূপ ব্যাপারে গ্রামবাসীগণের কর্ত্তব্য কি তাহা তাঁহাদের বিচার্য্য।

নিজেদের অধিকার, নিজেদের সুযোগ সুবিধা, সামর্থ্য পারগতাকে সদ্ব্যয় করিবার আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, ভবিষ্যতকে জয়মণ্ডিত ও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবার চৈতন্য ও দার্ঢ্য আজও যদি দেশবাসীর না আসিয়া থাকে তাহা হইলে বলিবার কিছু নাই। ঘরে বসিয়াই নিজেদের শুধু দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ও অভিশপ্ত ঠাওরাইলে আর হা অন্ন জো অন্ন করিয়া দিন কাটাইলে পল্লীবাসীর সুদিন বোধ হয় নিকটতর হইয়া আসিবে !!

পুস্তক পরিচয়

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত-রায়

শ্রীগোবর্দ্ধন কৃত "বৃহৎ মাহিষ্যকারিকা" শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক সংকলিত ও সংগৃহীত। প্রকাশক শ্রীশঙ্করনাথ সরকার, ৩১ নং এলগীন রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এই বৃহৎ মাহিষ্যকারিকা একখানি প্রাচীন, প্রামাণিক, দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই কারিকা বহু প্রাচীন গোবর্দ্ধনাচার্য্যের দ্বারা সংগৃহীত ও রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সার উইলিয়াম হাণ্টার, সার হাবার্ট রিজলী, ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ এবং অধ্যাপক কোলব্রুক্ শেরিং আদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের পুস্তকে এই প্রাচীন কারিকার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। প্রকাশবাবু বহু কষ্টে, অর্থব্যয়ে ও প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কারিকাখানি সংগ্রহ ও সংকলন করিয়া সাধারণের বিশেষতঃ সামাজিক ইতিহাস-আলোচনাকারীদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রকাশবাবু ইহা কোচিন, গঞ্জাম ও সম্বলপুরবাসী ব্রাহ্মণদের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম মূল পুঁথিটি মান্দ্রাজ বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী পার্থসারথী আয়েঙ্গার মহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইতিহাসের দিক ইহতে ইহা একখানি প্রাচীন মূল্যবান্ গ্রন্থ। ইহা হইতে দেশের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। প্রায় চারিশত শ্লোকে রচিত মূলকারিকা ও তাহার সটিক বঙ্গানুবাদ জাতিতত্ত্বের নানা তথ্যপূর্ণ শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক গবেষণাযুক্ত আলোচনা এবং গ্রন্থকারের সুচিন্তিত মন্তব্যাদিতে প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকখানি পূর্ণ হইয়াছে। ইহা মাহিষ্যকারিকা এবং প্রত্যেক মাহিষ্যের অবশ্য পাঠ্য হইলেও জাতিতত্ত্বালোচনার সহায়ের একখানি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ পুস্তক। লেখকের সুদক্ষ লেখনীতে জাতীয় ও সামাজিক সকল বিষয় নিরপেক্ষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানির স্থানে স্থানে আতিশয্য পুনরুক্তি ও বানান দোষ দৃষ্ট না হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

শোকসংবাদ

বাংলার সাহিত্যাকাশ থেকে আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়্‌লো ৺স্বর্ণকুমারী দেবীর লোকান্তর-প্রাপ্তিতে। এই মহীয়সী মহিলা প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গবাণীর বেদীমূলে কি নিষ্ঠার সহিতই না পূজারতা ছিলেন। শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয় মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও তিনি সাহিত্য সেবায় মগ্ন ছিলেন। লিখিবার সামর্থ্যই কেবল ছিলো না, কিন্তু তাঁর অন্তর বুঝি বা শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সক্রিয় সচেতন ছিল।

দেহের জরা যাঁদের ভাবঋদ্ধ অন্তরের নাগাল পায় না—তাঁদের সংখ্যা অতি বিরল ও অসাধারণ—স্বর্ণকুমারী ছিলেন সেই অসাধারণদের একজন। মহর্ষির কন্যা, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা, শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবীর মাতা—শুধু এই পরিচয়ের জোরেই স্বর্ণকুমারীর আসন উচ্চে নয়—বঙ্গবাণীর আমদরবারে তাঁহার ছিল একটি স্বতন্ত্র স্থান ও সুর। অধুনা-লুপ্ত কিন্তু মাসিক-সাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর-সূচয়িত্রী ভারতীর সম্পাদিকা হিসাবে স্বর্ণকুমারী বাঙ্গালী নরনারীর নমস্যা। ভারতীর বুকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কৈশোর ইতিহাস রচিত হ'য়েছিল। যাঁরা সেই ইতিহাসের রচনা কর্ত্তেন একে একে অনেকেই অকালমরণের কোলে ঢলে পড়েছেন।

ভারতীর প্রথম সম্পাদিকার প্রতি আমাদের শোকার্ত্ত মনের প্রণাম জানাই।——

এই বিয়োগ আমাদের বেশী ক'রে বেজেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে সত্যেন্দ্রস্মৃতিবাসর উপলক্ষে সাহিত্য-সেবকসমিতির একটি অধিবেশনে আমরা উপস্থিত থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সভানেত্রী ছিলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী। প্রবীণ সম্পাদক জলধর সেন মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে স্বর্ণকুমারীর সম্মানে জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। তাঁহার আবেগকম্পিত ভাষায় যে আশাঙ্কা ধ্বনিত হ'য়েছিলো তাহা যে এত শীঘ্র বাস্তবে পরিণত হবে তা আমরা ভাবি নি।

———

মোহনভোম্ম ব্রাদার্স

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

অভিজ্ঞ ভূতপূর্ব্ব ক্রীড়াশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত—
রাজা মহারাজা, কর্পোরেশন, কলেজ ও স্কুল
শিক্ষক দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত সুলভে টেকসই
ও মনোরম জিনিষাদি সরবরাহ
আমাদের বিশেষত্ব।

ফুটবল ও ক্যারমবোর্ড

পত্র লিখিয়া আমাদের বিভিন্ন জিনিষের বিভিন্ন
ক্যাটালগ গ্রহণ করুন—

ব্যাডমিণ্টন	ফুটবল	বারবেল	স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় ও
টেনিস	ডাম্বেল	ইণ্ডিয়া ডাম্বেল	স্বাস্থ্যোন্নতির
ক্রিকেট	ডেভোলেপার	পুলিওয়েট	ও অন্যান্য যাবতীয়
হকি	ক্যারম		ব্যায়ামের উপকরণ পুস্তকাদি

ব্রাঞ্চ—৩৮ ক, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবাণীপুর
কলিকাতা।

বনমর্ম্মর

শ্রীমনোজ বসু—

ঊষা-মনোময়ের মধুরতম রোমান্স—লীলা-উমা-প্রভা কিরণের উত্তরঙ্গ নদীস্রোতের মত অভিমান-বিক্ষুব্ধ ভালবাসা—কনক-চাঁপার গন্ধ-আতুর শতাব্দী পারের মালতীমালা! নির্জ্জন গভীর রাত্রে অরণ্য-আত্মা কথা কহিয়া ওঠে...... যন্ত্র-দানব মানুষের ঘরে ঘরে হানা দিয়া বেড়ায়......দুর্ব্বার জীবন-ধারার কূলে কূলে ছায়াঘন গ্রামান্তরাল হাতছানি দিয়া ডাকে......

বাংলা সাহিত্য যে মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে এ বই তাহার পরিচয় দিবে।

বহুরঙের প্রচ্ছদ পট। অভিনব বাঁধাই।
উপহারের চমৎকার উপযোগী।
দাম—১।০ আনা।

প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০/২ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মহাপুরুষের অদ্ভুত চিকিৎসা—

হতাশার আশা সঞ্চার—

বহুরোগী নিরাময়

কলিকাতার ১৬০ নং ক্রশ ষ্ট্রীটে সেক্সি কোংএ এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি সেই স্থানে প্রত্যহ বৈকালে ১টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এবং তাঁহার আশ্রম চন্দননগর যুগান্তর কুটীরে সকাল ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত রোগী দেখিতেছেন। তাঁহার অলৌকিক চিকিৎসায় বহু প্রকার রোগী নিরাময় হইয়াছে। একবার সাক্ষাৎ করিলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইবেন। ডাক টিকিটসহ চিঠি লিখিলে ব্যবস্থাপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

তিনি আবার এমনভাবে হাত দেখিয়া ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান বলিয়া দেন যে তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তি না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। সহস্র সহস্র কঠিন ব্যাধি তিনি বিনাব্যয়ে আরাম করিতেছেন। ভেষজ চিকিৎসাই তাঁহার পছন্দনীয়।

EVER READY STORE

88/1, Harrison Road, Calcuttta.

Privious House for Pen Repairing



Moffosils order promptly executed.

The Pen is worth for its name.

Regular No 12—Rs 2-8as. Self-filling No 52—Rs 3-8as. Safety No 32—Rs 3-8—5.

Parker Model:—Senior Rs 12, Junior Rs 8.

Special concession for Dealers.

মিলন সমিতি

(সেবা বিভাগ)

ফোন—বি, বি—১৫৫৭।

প্রায় দুই বৎসর হইল সর্ব্বসাধারণের হিতকল্পে এই সেবা প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। বিনা পারিশ্রমিকে দুঃস্থ, অসহায়, পীড়িত ও আহত নরনারীর পরিচর্য্যাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই জন্য নিঃস্বার্থ কর্ম্মিবৃন্দ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। সংবাদ পাইলেই তাঁহারা স্থান-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সেবার্হ দুঃস্থ, পীড়িত বা আহত ব্যক্তির শুশ্রূষা ভার সাদরে গ্রহণ করেন।

কর্ম্মিগণকে শুশ্রূষা বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা আছে। এই সেবা কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছুক এইরূপ সকল ব্যক্তিকেই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের দান কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত হইবে।

পৃষ্ঠপোষকগণ—

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস

শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় এড্‌ভোকেট, হাইকোর্ট।

„ হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ
কাউন্সিলার, কলিকাতা করপোরেশন।

„ জগদীশচন্দ্র মৈত্র এম, আই, ই, ই, (লণ্ডন)

„ এস্, ওয়াজেদ আলী
৩য় প্রেসিডেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।

বিনীত

মুরলীমোহন বসু এম, বি সম্পাদক।

৩।২ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা।

আবশ্যকবোধে নিম্নলিখিত ঠিকানায়ও অনুসন্ধান করিতে পারেন।

বয়েজ এসোসিয়েশন।

৩১ শাঁখারীটোলা ইষ্ট লেন,

টেলিফোন নং ২১৭১ কলিকাতা।

প্রাপ্তি স্বীকার

"প্রবাহ"—১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসেই এই পত্রিকাখানি নূতন আলোক লাভ করিল। ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—৭ নং নবীন কুণ্ডুর লেনে ইহার অফিস।

এখানি বিংশ শতাব্দীর তরুণের মুখপত্র। তবে ভয় হয়, পত্রিকাখানি তরুণদের অতি-তারল্যের আস্তাকুঁড় না হইয়া উঠে। তারুণ্যের নামে যে কদাকার মনোবৃত্তি আজকাল অনেক ক্ষেত্রে নর-নারীর দৈহিক কামনার মধ্যে আত্ম-স্বার্থকতা খুঁজিতেছে, এই তরুণ-সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য না হয় যেন ভাব ভাষার মধ্য দিয়া তাহারই সংক্রামক বিষ ছড়াইয়া দেওয়া। প্রথম সংখ্যাতেই শ্রীসুকুমার সরকারের "সুরা"-স্তুতি ও শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের পথ-চলতি উদ্ভোপ্রেমের গল্প "উদ্বৃত্ত" পড়িলেই এইরূপ একটা আশঙ্কা আমাদের স্বভাবত আসিয়া পড়ে।

প্রাচীর-পত্রে যেন দেখিয়াছিলাম সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীজগৎ মিত্র হইবেন এই "প্রবাহের" কর্ণধার। কিন্তু তাঁহার ন্যায় যা পরিচয় প্রথম সংখ্যায় না দেখিয়া আমরা একটু হতাশ হইয়াছি। আমরা এই নূতন সহযোগীর শুভ কামনা করি।

"পূর্ব্বাশা"—মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত।

পত্রিকাখানি মফঃস্বলের—কুমিল্লার District magazine বলিলেও দোষ হয় না। জাতীয় প্রগতিতে, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় কুমিল্লা যে কতখানি অগ্রসর তাহা এই কাগজখানির পাতায় পাতায় দেখা মিলিবে। ইহার সাহিত্যিক সুরও বেশ উচ্চাঙ্গের বিশেষভাবে "দুর্ব্বাসার" নির্ভীক উক্তি অনেকখানি যুক্তি ও উদ্দেশ্যপূর্ণ—তবে তাহার বলিবার ভঙ্গীটি আরও একটু সংযত ও উদার নিপেক্ষ হইলে ভাল হয়।

পত্রিকাখানি সবেমাত্র তৃতীয় মাসে পদার্পণ করিল। আমরা এই শিশু সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীসরোজরঞ্জন মিত্র কর্ত্তৃক ৩০নং হরিতকি বাগান লেন, কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত, ও মেহেরপুর, গোপসেনা পোঃ, জেলা যশোহর হইতে প্রকাশিত।

ইঙ্গিত

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

১ম বর্ষ
১০ম সংখ্যা

শ্রাবণ

১৩৩৯
সাল

প্রফুল্ল জয়ন্তীতে অভিনন্দন

শ্রীমানকুমারী বসু

দেব !

শুক্তি বুকে মুক্তা যথা খনি মাঝে মণি,
তেমতি আসিলে তুমি এ আঁধার দেশে !
দেবকী সাধনা সাধি, কংস কারাগারে,
পাইলা পুরুষোত্তম পুত্র নীলমণি !
তেমতি মা বঙ্গলক্ষ্মী তপঃ আচরিয়া,
লভিলা দেবের বরে প্রফুল্ল-রতনে !
জনম সে পল্লি-কোলে বিহগ কূজিত
স্নিগ্ধ শ্যামা, ফুলময়ী পবিত্রা সরলা !
বিধি দিলা পুণ্যকর্ম্ম, ললাটে লিখিয়া—
উদাসী শঙ্কর সম রাজ-রাজেশ্বর
কুবের ভাণ্ডারী যার, তবু সে ভিখারী,
সে শুধু পিশাচ ভূতে দেয় নব প্রাণ !

ষোড়শ মাতৃকা দিলা শত আশীর্ব্বাদ,
অক্ষয় কবচ দিলা অলক্ষ্যে শিরসে।
অর্পিলা দেবর্ষিদল তপোবল যত।
কহিলা বিজ্ঞান-বাণী "বরপুত্র মম !
আপনা সঁপিও বাছা, নিখিল-কল্যাণে।"
সপ্ততি বর্ষের তাই শুভ অনুষ্ঠান,
প্রফুল্ল-জয়ন্তী আজি বঙ্গ মা'র কোলে।
বিশ্বের মঙ্গল কর্ম্মী, আত্মত্যাগী যোগী,
কি দিব তোমারে মোরা, কিবা পারি দিতে ?
আজ যে ফুটেছে ফুল কানন উজলি,
তোমারে পূজিতে দেব ! তোমারে পূজিতে !
আজি যে অনিল বহে মধুর হিল্লোলে,
তব গুণ গাহি দেব ! তব গুণ গাহি !
আজি যে গাহিছে পাখী মধুর কাকলি,
তোমারি মহিমা গীতি দিগন্তে ছড়ায়ে !
আজিকার রবিশশী যশোরাশি তব,
ঢালিছে, নিষ্কাম কর্ম্মী ! ভাস্বর কিরণে !
দিন্ শুভময় বিধি আমাদের তরে,
তোমারে আরোগ্য, আয়ু, মহতী শকতি।
আকাশে নিনাদে শঙ্খ অমর নিচয়,
প্রফুল্ল জয়ন্তী আজি প্রফুল্লের জয়।
অনুরক্ত ভক্ত আমি প্রণমি চরণে
এ সুদিন স্মরি যেন—বাকী যা' জীবনে।

আচার্য্যের পায়ে

সে আজ বাইশ বছরের কথা—প্রায় দুই যুগ। সবে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি। নিছক পাড়াগেঁয়ে না হ'লেও সহুরে ছেলের মতো Smartness ও বিজ্ঞতার বড়াই রাখতুম না; একটা সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও নিষ্ঠার ভাব নিয়ে গিয়ে ছিলুম আচার্য্যের দর্শনে। একে অত বড়ো লোক তায় আবার অপরিচয়ের আশঙ্কা, রাজ্যের Shyness এসে বুকের ভেতর ঢেঁকির নৃত্য জুড়ে দিলো। কিন্তু সকল সংকোচের মাঝে একটা মধুর অনুভূতির কম্পন অনুভব করেছিলুম—একথা বেশ মনে পড়ে। আচার্য্য রায়কে Close quarters-এ খুব কমই দেখেছি, অনেক সময়ে কাছে যাবার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যথিত হ'য়েছি, দোরগোড়া থেকে দেখাই পেয়েছি, কথা কইবার সুযোগ না পেয়ে ক্ষুন্নমনে ফিরে এসেছি—কিন্তু আজ এই বাইশ বছর ধ'রে যতবার তাঁকে স্মরণ করেছি, প্রথম সাক্ষাতের সেই মধুর অনুভূতি জেগে উঠেছে। মনের তলায় ডুব দিয়ে কিন্তু সে অনুভূতির মূলে তাঁর গরিমার চাইতে স্নিগ্ধতারই সন্ধান বেশী করে পেয়েছি। প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক, পণ্ডিত, গবেষক, হয়ত ব্যবসা-কুশলও, কিন্তু সে কথা মনে হবার আগে মনে পড়ে তাঁর শিশুর সরলতা আর সরস হৃদয়। ঐ শুষ্কশীর্ণ পঞ্জরের নীচে প্রেমের কি গভীর ফল্গুধারাই না বয়ে চলেছে!

আচার্য্য সম্বন্ধে নিতান্ত দুটো নিজের কথাই বল্‌বো এই সংকল্প নিয়ে কলম ধরেছিলুম, কিন্তু কথায় কথায় কলমের ওপর একটু বেদখল হ'য়ে পড়েছি। হ্যাঁ, প্রথম দর্শনের কথাই বলি আবার। একানব্বই নম্বর আপার সার্কুলার রোড—যেখানে এখন মোহাম্মদী আফিস আছে এবং কিছু দিন আগে প্রবাসী আফিস ছিলো—সেই নাতিক্ষুদ্র বাড়ীটির দোতলায় একটি স্বল্পপরিসর কক্ষে পেলাম তাঁর দেখা। সময়টা ঠিক মনে নেই—বিকেলের দিকেই হবে। শরীরটা সেদিন ওঁর একটু অসুস্থ ছিলো। কয়েকটি তরুণ ছাত্র তাঁকে ঘিরে বসে আছে, আমারই মতো তাদের অনেকের বয়স। কেউ পা টিপছে, কেউ মাথা টিপছে, চুল টানছে। কি কথাবার্তা হ'য়েছিলো আজ আর সে সব কিছুই মনে নেই, শুধু মনে আছে অপর ছেলেদের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে মনটা আমার অনেকক্ষণ ধরে লুব্ধ ভৃঙ্গের মত আচার্য্যের পা' দুখানার আশে পাশে ঘুরে ফিরছিলো। শেষটা হাত দু'খানিও যে কখন মনের অনুসরণ করে একেবারে তাঁর পায়ে যেয়ে পৌঁছেচে তা জান্‌তেও পারি নি। পায়ের সেই ছোঁয়াটুকুই আজ মনে ও হাতে লেগে আছে—চন্দন লেপের মতো। আর সব ভুলে গেছি।

মাস দুই আগে 'ইঙ্গিতের' অর্ঘ্য নিয়ে সুদীর্ঘ বাইশ বছর পরে আবার তাঁর নিকটে গিয়েছিলাম। ষোল বছরের সেই ভীরু বিস্মিত বালক আজ আমার জীবনে মৃত, স্মরণ পথের পথিক—মনে যত, চুলেও তত পাক ধরে এসেছে—কিন্তু আচার্য্যদেবকে দেখলাম তেমনই চিরশিশু ভোলানাথ, মুখে হাঁসি, বুকে অতলস্পর্শ স্নেহ আর অকুতোভয় শক্তি, চোখে প্রতিভার স্থির দ্যুতি! পরিবর্ত্তন যা কিছু দেখলাম আমারই এই স্থবির জরাগ্রস্ত দেহে ও মনে। আজও দেখি সর্দ্দিকাশী মাথার যন্ত্রণায় কাতর, আলো সইতে পারেন না, তাই চোখে রুমাল বেঁধে বিছানায় শুয়ে আছেন, আশে পাশে ছাত্রদল ঘিরে বসে। লোভ হ'ল তেমনি করে আবার পা টিপে দিয়ে আসি—কিন্তু পারলুম না! প্রথম সাক্ষাতের দিনেও এমনি সংকোচ হয়েছিলো, তফাৎ এই যে সেদিনকার সংকোচ জয় কর্ত্তে পেরেছিলুম। আজ কেন পারলুম না—ক'দিন ধরে শুধু তাই ভেবেছি।

আর এক দিন তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম—আমার গ্রামে, সাগরদাঁড়ীতে; কপোতাক্ষীর তীরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ আচার্য্য স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয়কে পরিহাস ছলে বললেন "সেই নদী তেমনই বইছে, কিন্তু মধুসূদন যে কলধ্বনি শুনে ছিলেন আমরা তা শুনি কই?"

গ্রামের একটি বলিষ্ঠ যুবককে দেখে আচার্য্যের সে কী উল্লাস! যুবকটির পিঠে গোটাকয়েক ঘুষি মেরে চিমটি কেটে তবে সে উল্লাসের উপশম হয়।

আপন দেহের শীর্ণতার দৈন্য তাঁকে অহরহ দেশের ও জাতির কায়িক, মানসিক, আর্থিক সকল অসম্পূর্ণতার বিষয়ে সদাজাগ্রত ক'রে রেখেছে। তাই বুঝি বাংলার শ্মশানে তাঁর এ অক্লান্ত শবসাধনা। এ সাধনা বিফল হবার নয়। জীর্ণপঞ্জরের নীচে দধীচির অমিত তেজ নিয়ে তিনি শতায়ু সহস্রায়ু হোন, তাঁকে শত প্রণাম।

সম্পাদক

—

প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীঅবনীনাথ রায়

তখন আমি দৌলতপুর কলেজে পড়ি। যে আদর্শবাদ থাকলে ঐ বয়সে জগৎটা স্বপ্নময় হ'য়ে দেখা দেয় বলা বাহুল্য তা আমার ছিল। বড় আদর্শকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতুম। অতএব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ যে মনের মধ্যে পূজা পেত এ কথা স্বীকার করা বাহুল্য মাত্র। এমন সময় একদিন শুনলুম প্রফুল্লচন্দ্র আস্‌চেন। তাঁর সর্ব্বস্ব নিংড়ে দানের সম্বন্ধে নানান্ গল্প শুনে আস্‌ছিলুম কিন্তু তাঁকে চোখে দেখ্‌তে পাব, একেবারে আমাদের মধ্যে এসে তিনি গল্পগুজব করবেন, এতটা সৌভাগ্য কল্পনা করতে পারি নি। কিন্তু তাই হ'ল। একদিন বেলা দশটার ট্রেণে তিনি এসে নাম্‌লেন। ক্ষীণ অপরিসর চেহারা কিন্তু প্রশান্ত মুখশ্রীর মধ্যে চোখ দুটি অপরিসীম ব্যথায় ভরা—জগতের সমস্ত করুণা যেন সেখানে নীড় বেঁধেচে। ষ্টেশন থেকে মিছিল ক'রে তাঁকে কলেজে নিয়ে আসা হ'ল। কিন্তু এসব পৃথক আদর আপ্যায়ন তাঁকে স্পর্শই করলো না। তিনি কারুর কাঁধে চড়লেন, কাউকে আদর করলেন, কাউকে বকুনি দিলেন, আমাদের সঙ্গে স্নান করলেন, নদীর ধারে দৌড়াদৌড়ি করলেন—এক মুহূর্ত্তেই আমরা ভুলে গেলুম যে এক জন বিখ্যাত রাসায়নিকের সঙ্গে আমরা কারবার করচি, এ যেন আমাদের পুরাণো কোন বন্ধু, বিদেশে ছিলেন হঠাৎ অনেকদিন পরে আমাদের মধ্যে এসে আমোদে মেতেচেন। কেবল খাওয়া দাওয়ার সময় তিনি আমাদের সঙ্গে তাল রাখ্‌তে পারলেন না—সামান্য পেঁপে আর এক আধটুক্‌রো ফল খেলেন।

তার পর তাঁকে দেখলুম মীরাটে—১৫ বৎসর পরে। সেই প্রশান্ত মুখশ্রী, ব্যথায় ভরা দুটি চোখ, পরদুঃখকাতর চিত্ত। এই দীর্ঘকালের ব্যবধান যেন তাঁর দেহে এবং মনে কোন ছাপই দিতে পারে নি। জরা তাঁর কাছে হার মেনেছে। এসেছিলেন প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্ব করতে কিন্তু কোন অভিভাষণই লিখে আনেন নি। অভিভাষণ মুখেই বলে গেলেন, আমরা লিখে নিলুম, চিরকাল বিজ্ঞানের সেবা করে আসচেন কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধেও কি প্রগাঢ় অনুরাগ! বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং ক্রমবিবর্ত্তন মুখে মুখেই বলে গেলেন। যে কয়দিন ওখানে ছিলেন মীরাটের প্রবাসী বাঙ্গালীদের আনন্দের সীমা ছিল না।

প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা আমার বার বার মনে হয়েচে—সেটি হচ্চে এই যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মানুষের কোন জাতিবিভাগ বা শ্রেণী বিভাগ নেই। তিনি সর্ব্ববাদীসম্মত রূপে পূজ্য। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি বাঙালী, কি মান্দ্রাজী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জৈন সকলেই তাঁকে সমভাবে শ্রদ্ধা করে। এত সহজে এবং এত সমান ভাবে সকলের শ্রদ্ধা যে তিনি আকর্ষণ করতে পেরেচেন এর মূল কোথায়? এর এক মাত্র কারণ হচ্চে তাঁর নিঃস্বার্থ দান এবং নিরহঙ্কার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। চিরটা কাল তিনি পরের জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিয়েই গেলেন, নিজে কিছুই ভোগ করলেন না কিম্বা কারুর কাছে হাত পাতলেন না। ছাত্রজগৎ তাঁর কাছে ঋণী, তিনি কারুর কাছে ঋণী নন। জাগতিক সুখভোগ বল্‌তে যা বোঝায় তাতে কোন দিনই তাঁর অভিরুচি হল না—এমন এক আদর্শবাদ জীবনের অবলম্বন ব'লে গ্রহণ করেচেন যার কাছে বস্তু জগৎ তার শত সহস্র প্রলোভন নিয়ে তুচ্ছ হ'য়ে গেল। তালি দেওয়া পোষাকের চেয়ে ভদ্র পরিচ্ছদ তাঁর অঙ্গে কোন দিন উঠলো না। আহারের তালিকা যে কত সংক্ষিপ্ত তা পূর্ব্বেই বলেচি। নিজে কিছুই নিলেন না কিন্তু পরকে কি ক'রে দেওয়া যায় এই চিন্তাই হ'ল তাঁর জীবনের ব্রত। রসায়ণ শাস্ত্রের জ্ঞান লোক হিতার্থে নিয়োজিত করলেন—বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্ম হ'ল। এক কথায় বলা যায়, তিনি আমাদের দেশমাতৃকার সেবারূপ, কল্যাণরূপ। তিনি লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দেন নি, বড় বড় প্ল্যাটফর্ম্মে বক্তৃতা দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটান নি, রাজনৈতিক নেতা সাজেন নি, এমন কি সমাজ সংস্কারের দুরূহ পণও তাঁর নেই—তিনি দীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত নিভৃতে এবং অত্যন্ত নীরবে মানব জাতির সেবা ক'রে চলেচেন। তিনি সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর—তাঁরই মত নিস্পৃহ, তাঁরই মত আত্মভোলা। ভারতবর্ষের তিনিই আদর্শ।

প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীসুকুমার সরকার

হৃদয়ের ধ্যানপদ্ম পূর্ণ করি সুন্দরের প্রেমে
আলোর পুলিন হ'তে কে এসেছ ধরণীতে নেমে !
সংযম-কঠোর তব সাধনার রুদ্রবহ্নি তেজে
শক্তির দুন্দুভিধ্বনি উঠিয়াছে দিশি দিশি বেজে।
ত্যাগের মহান্ স্পর্শে সোনা হোলো সারা হিয়া তব।
বন্দিনী মায়ের মুখ আলোকিত হোলো অভিনব
তোমারি আলোক রাগে ; অর্থহীন কল্পনার লোকে
গাঁথনি ভাবের মালা ; বিলাসের স্বপ্নালোক চোখে
কাটেনি জীবন তব বাসনার রূপমুগ্ধ ক্ষণে।
তুমি আসিয়াছ, বন্ধু ! বাস্তবের কঠিন প্রাঙ্গণে ;
নন্দনের মূর্ত্ত প্রীতি কতদিন কত পলে পল
দেখেছি দুচোখে তব বেদনার মৌন অশ্রুজল,
ব্যথিত আর্ত্তের লাগি। ফিরিতেছে আজো অগোচরে
যে ক্ষুধার্ত্ত নারায়ণ দুঃখদগ্ধ প্রতি ঘরে ঘরে,
জীর্ণ বাস শীর্ণ দেহ যে দেবতা ধূলি-রুক্ষ দেহে
লক্ষ নর নারী মাঝে পথ চলে, তারে তব স্নেহে
করিয়াছ সঞ্জীবিত ; অস্পৃশ্যের অখ্যাতের দেশে
কতবার দেখিলাম চলিয়াছ সপ্রেম আবেশে
সেবার দেবতা তুমি ; বঞ্চিতের বিরাট সান্ত্বনা !
বক্ষে তব প্রেম-সোম, চক্ষে তব অমৃতের কণা
উঠেছে উদ্বেল হয়ে ; আনিয়াছ ভরি করতল
বিপুল বিশ্বাস ভরা জীবনের আকাঙ্ক্ষা উজ্জ্বল
দিকে দিকে, মরণান্ধ এ জাতির প্রদোষ তিমিরে
তুমি সূর্য্য শতাব্দীর ; রহিয়াছ জননীরে ঘিরে
বিচিত্র বর্ম্মেতে তব ; জ্ঞান হতে বড় তব প্রাণ
হে নবীন ত্যাগ-ভীষ্ম ! হে বীর তোমারি আত্মদান

হানিয়াছে মৃত্যুশর প্লাবনের দুর্ভিক্ষ দানবে !
মোর কণ্ঠ বাক্যহীন ; অশ্রুরুদ্ধ আনন্দের রবে
তোমারে প্রণাম করি ; মুগ্ধ প্রাণ রুদ্ধ বাক্ কবি
অন্তরের স্বপ্ন-লোকে হেরিতেছে তব সৌম্য ছবি
অপরূপ করুণার ; মানুষেরে ভালোবাসো বলে
আমি মানুষের কবি, মোর প্রাণে তরঙ্গ উছলে ।
হে গণ-দেবতা, তব প্রাণময় অন্তরের প্রেমে
দেবতা বন্ধুর রূপে তোমারি মাঝারে এলো নেমে ।

প্রফুল্লচন্দ্র

বেদপন্থী

তুষার মৌলি নীল হিমাদ্রির ধবল বক্ষে পুঞ্জে পুঞ্জে বরফ জমে আছে, তাই থেকে ছিটে ফোঁটা চুঁইয়ে গলে যা বেরোয় তাতেই দেশের প্রাণ বাঁচে।

কিন্তু যদি ঐ পুঞ্জীভূত তুষার সগর্ব্বে পতনোন্মুখ উচ্চতায় আপন অস্তিত্ব নিয়ে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতো তাহলে সে হতো একটা অভাবনীয় আতঙ্কের মতো। প্রাকৃতিক নিয়মে হিমাচলকে অনাবশ্যক ভার বইতে হয় না, পার্ব্বতীয় আনন্দ সহস্র নির্ঝরঝঙ্কারে বেজে ওঠে, তৃষাতুর ভূমির আহ্বানে পুণ্যতোয়া নামতে থাকে—সঙ্গীতে নর্ত্তনে দুইকূল কেঁপে ওঠে। তারপর সে ধারা ছোটে নীচের দিকে—এই মাটির বুকে—হীনতার দীনতায় নয়—আনন্দে, মহৎ চরিতার্থতা লাভের জন্যে—সমুদ্রাভিমুখে।

সমুদ্রের জোয়ার নদীর টানকে আবিষ্ট আড়ষ্ট অতিষ্ঠ করে রাখবার চেষ্টা করে, প্রলোভন দেখায়, ভ্রূকুটি করে কিন্তু ধরিত্রীর তাপহারী নদী আপন আবেগে আনন্দে সমুদ্র-মুখে ছোটে—থামে না। এই তার প্রকৃতি—এই তার প্রবৃত্তি—এই তার পরিণাম।

পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রকাণ্ড চাপ স্তরে স্তরে আজো জমে আছে, গলে নেমে দেশের কর্ম্মভূমিকে উর্ব্বরা করেনি। কিন্তু তারই দু একটা ধারা যা নেমেছে, তাও তুচ্ছ নয়। প্রাচ্য পাশ্চাত্য কোনো শিক্ষাই খাটো নয় যদি মানুষে শিক্ষা পায় এবং সেই শিক্ষাকে কাজে খাটাতে পারে। শিক্ষার মাপকাঠি সুখ নয়, সুবিধা নয়, সৌখিনতা নয়—শিক্ষার পরিমাপ আচারে—ব্যবহারে—সৌজন্যে।

অন্যদেশে যা একান্ত সত্য, অন্তঃসারশূন্য এ দেশে ঠিক তার উল্টো। এখানে প্রতিভার পূজা নেই, পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ককালিমা নিশ্চিন্ত হস্তে কেমন ক'রে লাগাতে হয় আমরা তাই জানি। এখন যেটুকুও হয় বা হচ্ছে তা হয় দায়ে প'ড়ে নয় বিদায়ে !

ঐ যে বনস্পতি-সদৃশ উন্নত ঋজু মানুষটি ক্ষীণ দেহযষ্টি নিয়ে দিনের পর দিন কি ভাবে কত দিকে চোখ রেখে কর্ম্মজীবন ও জ্ঞানযোগের তপস্যায় দেহপাত ক'রছেন—উনিই সার পি সি রায়, আচার্য্য রায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। আদর্শ কুলীন চরিত্র, আকুমার সাধক, ব্যবহারে অমায়িক, বেশভূষায় অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন, ভোগে জিতেন্দ্রিয়, ত্যাগে মহিমান্বিত, সততায় গরীয়ান—একটা কিসের আনন্দে চিন্তাক্লিষ্ট জরাজীর্ণ মুখখানি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। প্রফুল্লচন্দ্র দেহে-মনে আস্ত বাঙ্গালী। তিনি বিজ্ঞানের মধ্যে কতটা অজ্ঞান তাড়াতে পেরেছেন সে সংবাদ ওস্তাদেরা বলতে পারবেন কিন্তু তাঁর একখানি ছোট্ট প্রাণের কাছে

যে সারাটা বাংলা—না, সারা ভারত কেনা—এ কথা কে না জানে ? যশোরের কই মাছের প্রসিদ্ধি আছে। মাথাটি শরীর অপেক্ষা যথেষ্ট বড়। কেবল মাথাটার বাড়াবাড়ি আজ জগতে কি হুড়োহুড়ি এনে দিয়েছে ঘাড়ের উপর যার একটা ঐ বালাই আছে সে অস্বীকার করবে না, কিন্তু প্রাণ কৈ ?

প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ের অগ্নিশিখা শুষ্কজ্ঞানকে গলিয়ে সুন্দর সরস করেছে, সেই অগ্নি সাহায্যে যে তেজ, যে তপস্যা, যে সাহস তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা বাইরের বৈরাগ্যে নয়, অন্তরের অভিসন্ধিতে নয়—একটা চারুতা রম্যতা এমনি ফুটে উঠেছে যা করুণার মতো প্রবল আর পবিত্র।

ওদেশ এদেশে প্রফুল্লচন্দ্র সুপরিচিত। তিনি পরের হাত থেকে যা নিয়েছেন, নিজের হাত দিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশী দান করেছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র

কুমার শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো। আজ এই শুভদিনে সমস্ত বাঙ্গালীজাতি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে তাঁকে হৃদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন কচ্ছে। প্রফুল্লচন্দ্রের সমগ্র জীবনের সাধনা আজ সিদ্ধির গৌরবে মণ্ডিত হ'য়েচে। আজকের দিনে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কথা নূতন ক'রে বল্‌বার কিছুই নেই। তাঁর প্রতিভা আজ সমস্ত পৃথিবী স্বীকার কচ্ছে। রসায়নশাস্ত্রে তাঁর মৌলিক গবেষণা তাঁর খ্যাতিকে চির উজ্জল ক'রে রাখবে। বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রফুল্লচন্দ্রের আসন আজ কোথায় তা নিয়ে আর কারু মতদ্বৈধ নেই। স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক গবেষণার গৌরবে যাঁরা বিদেশে বাঙালীজাতির সম্মান বৃদ্ধি ক'রচেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের দানই সব চেয়ে বৃহৎ এ একরকম অবিসম্বাদিত সত্য। প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল ও খাদিপ্রতিষ্ঠান এই দুইটি কীর্ত্তিস্তম্ভের কথা জানে না এমন বাঙালী নেই বল্লেই চলে।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এ কথার যাথার্থ্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনেই প্রমাণ করেন। মাত্র আটশো টাকা মূলধন নিয়ে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের পত্তন করেছিলেন আজ সেই আটশো, পঁচিশ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েচে। বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্মকালে তার এই বিপুল সম্ভাবনার কথা কে কল্পনা কর্ত্তে পেরেছিলো ? প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর অসামান্য প্রতিভাকে এই নূতন দিকে চালিত ক'রে চাকুরিগত প্রাণ ক্ষীণজীবি বাঙালীদের সম্মুখে যে উন্নত আদর্শ স্থাপন ক'রে গেলেন তার যথাযথ মূল্য যেন আমরা দিতে পারি। এর চেয়ে বড়ো কামনা আজকের দিনে আমাদের আর কিছুই নেই। নিজে অত বড়ো বৈজ্ঞানিক হ'লেও প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভাও বড়ো কম নয়। তাঁর রাসায়নিক পরীক্ষাগারে টেষ্টটিউবের পাশাপাশি তিনি সাহিত্য-কলালক্ষ্মীকেও স্থান দিতে ভোলেন নি। বিজ্ঞান চর্চ্চার চেয়ে সাহিত্যেরসচর্চ্চায় আনন্দ তাঁর কিছুমাত্র কম নয়।

সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ তাঁর প্রকৃতিগত। এই দুটি বিভাগেই তাঁর পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ যে কত গভীর তাঁর নানা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি একটু মন দিয়ে পড়লেই একথা সম্যক উপলব্ধি কর্ত্তে পারা যাবে। যে কোনো নীরস বিষয়ের অবতারণা ক'রেই তিনি লেখনী চালনা করুন না কেন, তাঁর সরস বর্ণনা-চাতুর্য্যে অনায়াসেই জিনিষটা literary হ'য়ে ওঠে। লেখেন তিনি প্রচুর এবং পড়েনও

তিনি অসাধারণ ; ইংরেজীতে যাকে বলে a voracious reader তিনি তাই। গোটা শরৎচন্দ্রটাই তাঁর একরকম মুখস্থ এ কথা তিনি প্রায়ই ব'লে থাকেন। এ বড়ো কম শক্তির পরিচয় নয়। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বন্ধে শেষ পরিচয় নয়।

বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র, পণ্ডিত মনীষী প্রফুল্লচন্দ্রের চেয়ে মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের কাছে কম বিস্ময়ের বস্তু নন। একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্রের যে পরিচয়, দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে সেই তাঁর যথার্থ পরিচয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যে কতো বড়ো একথা বিশ্লেষণ ক'রে বোঝাবার মতো ক্ষমতা আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই। তার জন্যে যোগ্যতর লোক তাঁর বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক শিষ্যদের মধ্যে ঢের পাওয়া যাবে। তাঁর সমগ্র জীবনের বিপুল সঞ্চয় তিনি খদ্দর প্রচারকল্পে ব্যয় করেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও অন্যান্য কোম্পানীর প্রায় ৫৬০০০৲ টাকার অংশ তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের জন্যে দান ক'রে গেলেন। খাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দান করেছেন বল্লে একটুও অত্যুক্তি হয় না। এতো বড়ো ত্যাগ সমগ্র ভারতবর্ষে আর কটা লোক কর্ত্তে পেরেছেন জানিনে। যেখানেই বন্যাপীড়িত দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের আর্ত্তনাদ শোনা গেছে তৎক্ষণাৎ প্রফুল্লচন্দ্র মূর্ত্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। খুলনার দুর্ভিক্ষে ও উত্তর বঙ্গ প্লাবনের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা ভিক্ষা ক'রে তিনি যেমন অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে দুর্গতদের বাঁচিয়েছিলেন, বাংলা দেশের লোক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরদিন এ কথা মনে রাখবে। "আর্ত্তের ছাত্রের বন্ধু" প্রফুল্লচন্দ্রেব বিরাট হৃদয়ের কথা, অসাধারণ ত্যাগের কথা চিন্তা কল্লে শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক আপনি নুয়ে পড়ে। শুধু মহৎ চরিত্রের গৌরবে সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ এক মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর কেউ কর্ত্তে পেরেছেন ব'লে আমার জানা নেই। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, চারিদিক্‌কার ঢক্কানিনাদের মধ্যে আমরা প্রফুল্লচন্দ্রের পুণ্যকথা প্রায় বিস্মৃত হ'তে বসেছি। তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আমাদের দেশে হয়নি। এর একমাত্র কারণই হচ্ছে এই যে, তিনি লোকলোচনের অন্তরাল থেকে কাজ কর্ত্তেই ভালোবাসেন! যশ ও সম্মানের জন্য কাড়াকাড়ি করা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নেতা ও দেশপ্রেমিক আমাদের দেশে অনেক আছেন ও হবেন কিন্তু এই সব তথাকথিত দেশহিতৈষীদের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের গরমিল হোলো এইখানে যে, খ্যাতির সস্তা প্রলোভন তাঁকে কোনোদিন বিচলিত কর্ত্তে পারে না। শুধু 'নাম্‌কা ওয়াস্তে' বক্তৃতার তোড়ে platforn কাঁপিয়ে তোলা, এ তাঁর দ্বারা কোনো দিনই হ'য়ে উঠল না। অথচ প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে যোগ নেই এমন একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এইটেই হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষত্ব। আমাদের এই অভিশপ্ত সমাজের বিধি ব্যবস্থায় যেখানে যত গলদ আছে সেইখানেই তিনি নির্ম্মমভাবে আঘাত করেছেন। যেখানেই যত তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতপথ গ্রাস ক'রে ফেল্‌তে চায় সেইখানেই তাঁর সত্যবাক্য "ঝলি উঠে খর খড়্গ সম," আমাদের ইউনিভাসিটি শিক্ষার শোচনীয় ব্যর্থতার কথা ব'লে তিনি বার বার আমাদের সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। শিক্ষিতের মুখোসধারী ডিগ্রিধারীদের হাতে শিক্ষার শোচনীয় অপব্যবহার দেখে তাদের ওপর নির্ম্মম তিরস্কার তিনি বর্ষণ করেছেন এবং এই মেকী শিক্ষাব্যবস্থার মূলে তিনি কুঠারাঘাত কর্ত্তে চেয়েছেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে তিনি ব'লে থাকেন "There does not exist a more miserable creature than the average graduate of the Calcutta University. আমাদের সামাজিক পণপ্রথাকে শ্লেষ ক'রে তিনি ব'লে থাকেন Every unmarried youngman is a prospective assassinator of Snehalata. তিনি হিন্দুমুসলমানের মিলনকামী। তিনি বলেন, Scratch a Bengali Mussalman and you will find him a Hindu অতএব হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে কি ক'রে ভেদবুদ্ধি আস্‌তে পারে তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। আমাদের সনাতন জাতিভেদ প্রথাকে তিনি আমাদের মুক্তিলাভের সবচেয়ে প্রধান পরিপন্থী ব'লে মনে করেন। এই দুর্ভাগ্য-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য কী নির্ম্মমভাবেই না তিনি আমাদের বার বার কষাঘাত করে-

চেন ; "স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে জাতিভেদ প্রথার ভীষণ বন্ধনে আমরা আড়ষ্ট হ'য়ে আছি, অধঃপাতে গেছি। এতই অধঃপাতে গেছি যে ধর্ম্মের অজুহাতে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে আমরা এই প্রথাকে বিশেষতঃ এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটাকে বিধিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত ব'লে প্রমাণ না ক'রে আর ছাড়ছি না।" তাঁর ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার। তিনি বলেন, "আমি কোনো সমাজভুক্ত নই। আমি হিন্দুর হিন্দুত্ব. মুসলমানের মুসলমানত্ব, ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ করি। আমি রাসায়নিক, আমি নিক্তির ওজনে সকলের ভালমন্দ বিচার কর্ত্তে চাই ; আমাদের সামাজিক ব্যাধি দূর কর্ত্তে হ'লে আগে diagnosis কর্ত্তে হবে," ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকের এই জাতীয় জাগরণের দিনে, যখন আমাদের দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য, যতকিছু দোষ আছে সব নন্দঘোষরূপী বিদেশী গভর্ণমেন্টের ওপর চাপিয়ে দিব্যি স্বরাজের সুখস্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আছি, তখন প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী আমাদের ক্ষণে-ক্ষণে বিচলিত ক'রে তুলচে—"ভারতবাসী 'স্বখাদ-সলিলে' ডুবে মরছে ; আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারছে। কোথায় তার অভাব, কোথায় তার দোষ, সমাজের নিষ্ঠুর মুষ্টি কোথায় তার গলা টিপে ধরে তার শ্বাসরোধ ক'রে দিচ্ছে,—এসকল কথা বিচার ক'রে বুঝে আপনার পথ আপ্‌নিই নির্দ্ধারণ কর্ত্তে হবে। অন্তরের দেবতা না জাগলে শুধু উত্তেজনার জ্বালায় এ দীর্ঘপথ অতিক্রম কর্ত্তে পারা যাবে কি ? ছটফটানির একটা গতি আছে কিন্তু তার দৌড় বেশীদূর নয়। মানুষের উন্নতির পথে যে বাধা তা হয় ভিতরের, নয় বাহিরের। কিন্তু অন্তর যার বাধানির্ম্মুক্ত তার কাছে বাহিরের বাধা কখনও সাংঘাতিক হয় না। অন্তরে সত্যের আলোকে যা গ'ড়ে ওঠে, বাহিরে তার প্রতিষ্ঠা হবেই,—সে কোনো বাধা মানবেনা। অন্তরে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হ'লে বাহিরের অধীনতা ঘুচবেই। ভারত আজ দুঃখের অতলস্পর্শ সাগরে ডুবে আছে, উঠ্‌তে পারচে না। আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা ব'লবারই উদ্যোগ কর্‌ছি না ; নরম বা গরম কোন দলেরই আমি নই, আবার নরমই হোক্ আর গরমই হোক্ যা কিছু আমার দেশকে যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর ক'রে দেয় তাই আমি পরম পবিত্র বস্তু ব'লে মনে করি।" আজো যদি প্রফুল্লচন্দ্রের এই বাণী আমাদের হৃদয়ঙ্গম না হ'য়ে থাকে তবে আমাদের মুক্তির উপায় স্বয়ং বিধাতাপুরুষেরও বোধ হয় নির্দ্দেশ ক'রে দেবার ক্ষমতা নেই। আজকের দিনে এতোবড়ো সত্যকথা, এতো বড়ো আশার কথা বাঙালীজাতিকে খুব কমলোকেই শোনাতে পেরেচেন ব'লে মনে হয়।

বছরকয়েকের কথা। প্রফুল্লচন্দ্র রংপুরে এসেছিলেন। কলেজ-হোষ্টেলে আমার দোতলার ঘরটিতেও তাঁর পায়ের ধূলো পড়েছিল। বেশ মনে পড়ে তাঁর গালাগাল শোন্‌বার ভয়ে আমার চায়ের সরঞ্জাম অন্যত্র লুকিয়ে রেখে এসেছিলুম। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর বেরোবার সময় আমার পৃষ্ঠদেশে একটি বজ্রমুষ্টি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। অবিশ্যি আশীর্ব্বাদটা সেদিন একটু তীব্রভাবেই আমাকে উপলব্ধি কর্ত্তে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সরল মনটিকে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে চিন্‌তে পেরেছিলুম। এই অক্লান্তকর্ম্মী চিরকুমার বৈজ্ঞানিক আরো দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে আমাদের প্রাণে উৎসাহ, কর্ম্মে উদ্দীপনা ও মনে বিশ্বাস জাগিয়ে রাখুন—শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আজ আমার শুধু এই একটিমাত্র প্রার্থনাই জেগে উঠচে।

সদাই তরুণ সাধক কুমার,
বিরাট হৃদয় আসন ভূমার,
যুবার সুহৃৎ শুভের জনক,
নবীন ভারত সংস্কারক

প্রফুল্লচন্দ্রের পায়ে আজ এই শুভ জন্মদিনে এই অজ্ঞাত সেবকের নমস্কার গিয়ে পৌঁছুবে কি ?

বঙ্গসাহিত্যে প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত বি, এ

বঙ্গীয় কবি ও লেখকগণ যখন কল্পনার উন্মুক্ত আকাশে বিচরণশীল, তখন প্রফুল্লচন্দ্র কঠিন মাটির শক্ত ঢেলার উপর পরিভ্রমণ করিয়া জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত নির্জীব বঙ্গবাসীকে আশা ও উৎসাহের বাণী শুনাইয়াছেন। স্বাধীন-কর্ম্মকুণ্ঠ, চাকুরী-গতপ্রাণ বাঙ্গালী তাঁহার অমৃতময়ী আশার বাণী শ্রবণ করিরা আজ কর্ম্মক্ষেত্রে নিরলস ও অধ্যবসায়ী হইয়া উঠিয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের প্রয়োগ-শালায় তিনি ধ্যান-নিরত তপস্বীর ন্যায় সর্ব্বদা গবেষণায় নিমগ্ন। এমতাবস্থায় বাঙ্গালীর দুঃখময় দৈনন্দিন জীবনের সংবাদ লইবার ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার অতি অল্পই ছিল। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ উদার হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বদেশ-হিতৈষণা তাঁহাকে সংসার-কোলাহল বিহীন বিজ্ঞানাগার হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কাতর কোলাহল মুখর কঠোর বাস্তব জগতে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে ব্যথিতের বিষম বেদনায় হৃদয়ের রক্ত-কমল তাঁহার শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে। তাই, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আজি সারস্বত-সাধনায় আপনার অম্লান আসনখানি রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে দিক দিয়ে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর পতনের সূত্রপাত হইয়াছে সেই জাতিভেদ, পাতিত্য-সমস্যা, অমানুষিক অস্পৃশ্যতা, অন্ন-বস্ত্র সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্র লেখনী চালনা করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যও "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার," "নব্য রসায়নীবিদ্যা ও তাহার তাৎপর্য্য," "অন্ন সমস্যা," "সমাজ-সংস্কার সমস্যা," "অধ্যয়ন ও সাধনা," "জাতিভেদ" ইত্যাদি অভিনব সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনী বঙ্গসাহিত্যকে রক্তিম-রেখায় অনুরঞ্জিত করিল। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইল। এই সমস্ত প্রবন্ধ-পুস্তিকার ক্ষীণায়তনের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও বিবিধ তথ্যের যে তেজস্বিনী আলোচনা আছে তাহা প্রকৃতপক্ষেই বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারের অপূর্ব্ব সামগ্রী।

"বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" যখন প্রথম প্রকাশিত হইল তখন বাস্তবিকই বঙ্গসাহিত্যে গভীর আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই পুস্তকখানি তথাকথিত আভিজাত্য সম্প্রদায়ের অনেকের রুচিবিশিষ্ট না হওয়ায় তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা তেমন আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ গ্রন্থকারের সাহিত্য-প্রতিভা ও শিল্পের মর্য্যাদা কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র অলক্ষিতে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে বরণীয় হইয়া উঠিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র নিতান্তই বিপ্লবপন্থী। নিষ্ফল পাণ্ডিত্য যখন হিন্দুসমাজের অধঃপতনের কারণস্বরূপ হইয়াছে তখন প্রফুল্লচন্দ্র তাহাকে নির্ম্মমভাবে কষাঘাত করিয়াছেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রকে সর্ব্বদা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বৈজ্ঞানিকের স্পষ্ট ও দৃঢ় যুক্তিময় বিচারের দ্বারা হিন্দুদিগের জাতীয় অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে ইহাও আছে যে, যুক্তিহীন বিচারের দ্বারা ধর্ম্মহানি হয়, প্রফুল্লচন্দ্র তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। যুক্তিহীন শাস্ত্রের অনুশাসন যে সর্ব্বদা মানিয়া লইতে হইবে প্রফুল্লচন্দ্র একথা কখনও স্বীকার করেন নাই। শাস্ত্রে আছে——

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য-বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥"

প্রফুল্লচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস এই অমূল্য উপদেশ অনুসারে চলিবার ইচ্ছা ও সাহসের অভাবে সমাজ গতানুগতিক ভাবগ্রস্ত হইয়া স্বাধীন চিন্তা ও বিচারকে নির্ব্বাসন করিয়া

অধঃপতিত হইয়াছে। ইহার ফলে কুসংস্কার, কুপ্রথা ও অমানবোচিত আচার ব্যবহার সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গলিত আবর্জ্জনার ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া আছে। প্রফুল্ল-সাহিত্য এই সমস্ত শোচনীয় দুঃখের পসরাই বহন করিয়া আনিয়াছে।

"বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহারে" হিন্দু সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও অবনতির যে তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে ইহাতে প্রফুল্লচন্দ্রকে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক বলিয়াই ধারণা হয়। বস্তুতঃ তাঁহার উক্ত পুস্তকখানিতে হিন্দু সভ্যতার একখানি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকখানির ভাষাও নিতান্ত প্রাঞ্জল ও অনায়াস। ভাষার এমন তেজস্বিনী দ্রুতগতি বঙ্গসাহিত্যে দুই চার জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরই লেখনীমুখে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

আইন-নিগড়াবদ্ধ বাঙ্গালীর উর্ব্বরমস্তিষ্কের অপব্যবহারের ফলে মানুষের সহিত মানুষের ভেদনীতিই সৃষ্টি করিয়াছে। অধ্যবসায়ে অগ্নিশক্তিসম্পন্ন জগতের শিল্পকুশল জাতির সহিত শক্তি-পরীক্ষায় তাহারা প্রতি পদে পরাজিত হইয়া বিশ্বের নিকট হেয় ও অবজ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপ প্রভৃতি দেশে আইন-নিগড়ের নাগপাশ মুক্ত হওয়ায় প্রতিভাদেবী বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" গ্রন্থের একস্থানে ফ্রান্স দেশকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

"তাই ফরাসীজাতি যখন বিলাস ও রাজকীয় অত্যাচারের পঙ্কে পড়িয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন রুশোর সাহিত্যিক প্রতিভা তাহাদের মধ্যে নবভাবের প্রচার পূর্ব্বক ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সৃষ্টি করিয়া স্বজাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আবার যখন বৈপ্লবিক সৈন্যগণ রাজপক্ষীয়গণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত হইতেছিল, তখন ইঞ্জিনিয়ার কার্ণো তাঁহার নব ব্যূহ রচনা-প্রণালী আবিষ্কার করিয়া বিপক্ষের প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আবার যখন বিপক্ষগণ ফ্রান্সের বারুদ প্রস্তুত বন্ধ করিবার জন্য বিদেশ হইতে সোরার আমদানী বন্ধ করিল, তখন বৈজ্ঞানিক গোবর গোমূত্র প্রভৃতি জীব দেহাবশেষ হইতে সোরা প্রস্তুত করিয়া ফ্রান্সকে রক্ষা করিলেন।"

এইরূপে ইউরোপের বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সাধনা সমগ্র জাতির দুর্ব্বিপাকে মুক্তির পথ আবিষ্কার করিতে নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে সাহিত্যসাধনা অধিকাংশ সময়ে মানুষের ভগবানকে উপেক্ষা ও ঘৃণা করিয়াছে। এইজন্য রঘুনন্দন ও কুল্লুক ভট্টের অপূর্ব্ব মনীষা প্রফুল্লচন্দ্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর প্রতিভাস্রোত বহুযুগ ধরিয়া তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে প্রবহমান হইয়া বাঙ্গলার মহা মনস্বীগণ শুধু ছোঁয়া খাওয়ার মীমাংসাতেই স্বীয় প্রতিভা ব্যয়িত করিয়াছেন। তাই বাঙ্গালীকে স্বাধীন চিন্তাক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করাইবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র জীবনব্যাপিনী সাধনায় শরীর ক্ষয় করিতেছেন। ইংলণ্ডে প্রবাসকালে জাপানী ছাত্রদের সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লণ্ডন ও বার্লিনের বৈজ্ঞানিক পত্রগুলি পূর্ণ হইতে দেখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানের বর্ত্তি প্রজ্জ্বলিত করিতে তাঁহার প্রাণান্ত সাধনা কথঞ্চিৎ সফল হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, যতীন্দ্রনাথ সেন, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত, বিমান বিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, মেঘনাথ সাহা প্রভৃতি তাঁহার কৃতী ছাত্রগণ মৌলিক প্রবন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রগুলির স্তম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র এবং ইঁহাদের অনেকে বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-সাধনা সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্রের অক্লান্ত অধ্যাবসায়ে বঙ্গসাহিত্যের একটা অবয়ব আজ সমুজ্জল ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচিত "নব্যরসায়নী বিদ্যা ও তাহার তাৎপর্য্য" ও "History of the Hindu Chemistry সাহিত্যক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ।

তাঁহার "অন্ন সমস্যায়" বাঙ্গালীর চাকুরী জীবনের শোচনীয় কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে আমাদিগকে নিতান্ত মেরুদণ্ড বিহীন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছে প্রফুল্লচন্দ্র তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে

পারিয়াছেন। এইরূপ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকৃতপক্ষেই বিরল। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বাঙ্গালীর শিক্ষা দীক্ষার ও অন্ন সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইয়াছে। যাঁহারা বি. এ, এম. এ. পাশ করিয়াও সংসারের তপ্ত সৈকতে অন্নবস্ত্রের অভাবে হাহাকার করিতেছিলেন এই পুস্তকখানি সেই সকল পথভ্রষ্ট পথিকের একমাত্র আশ্রয়-স্থল। পুস্তকখানি প্রচারিত হইবার পর বিষম বেকার অবস্থায় পতিত অনেক শিক্ষিত যুবক ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছেন। এবং অনেকের চেষ্টা সাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে। অনেক নিরক্ষর ও অল্প শিক্ষিতব্যক্তি মাড়োয়ারী, ভাটিয়া ও দিল্লীওয়ালা প্রভৃতির ব্যবসায় বুদ্ধিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দারিদ্র্য-নিবারণের নূতন পথ আবিষ্কার করিতেছেন।

"অন্নসমস্যা," "জাতিভেদ", "সাধনা ও সিদ্ধি", "অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ" প্রভৃতি পুস্তিকাগুলি যেন বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের এক একটি উজ্জল রত্ন। পুস্তিকাগুলির বিষয়-বস্তু এমন নৈমিত্তিক অথচ সারবান্ যে পাঠক মাত্রেরই কল্পনা-প্রবৃত্তিকে সজোরে বাস্তব জগতের সম্মুখে টানিয়া আনে। পাঠক যখন সাহিত্যের ভাবজগতের বস্তু বিহীন রাজ্যের পথিক, যখন তাঁহার সবল সংস্থানের জন্য আঁকড়াইয়া ধরিবার কিছুই থাকে না—তখনই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ মুক্তাবলী তাঁহাকে এই দৃশ্যজগতে—এই মাটির পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হয়। এখানে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দুঃখময় নিরাশার অন্ধকারে যখন নিমজ্জিত হন তখন প্রফুল্লচন্দ্রের অভিনব বাস্তব চিন্তাধারাগুলি তাহার ব্যাকুলচক্ষে শান্তির অনুলেপ প্রদান করে—তাঁহাকে শ্রেয়ের স্নিগ্ধ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। এইজন্য বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণ প্রগতির ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি সকল স্থানে শিল্প-সৌন্দর্য্যকে যেন তেমন আমল দিতে চায় নাই। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা প্রয়োজনকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য সূক্ষ্মশিল্পকলা সেখানে তেমন জমাট না বাঁধিলেও অন্নবস্ত্র সমস্যা-সমাকুল, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা-দোষ-দীন বিরাট হিন্দু জাতির মুক্তির বাণী তাহাতে উদ্ঘোষিত হইয়াছে। সেখানে মুচী মেথর কোল ভীল সাঁওতাল, ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়—অস্পৃশ্য ও অনাদৃত. মূক ও বধির, দীন ও দরিদ্র মহান মনুষ্যত্বলাভ করিয়া জগতের ধূলিধূসর প্রসর কর্ম্মক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইবার আশ্বাস ও অভয়মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে!

আচার্য্য প্রশস্তি

শ্রীহরিগোপাল সরকার

হে চির-কুমার হে চিরতরুণ হে সুধী সাধক তাপসরাজ,
শুভ সপ্ততি বর্ষে তোমার মস্তকেপর' বিজয় তাজ।
শত সাধনায় তুমি যে সাধক হিয়া জয়ী তুমি দীনের ত্রাণ
শত সমস্যা আঁধারে অন্ধ বাঙালীরে কর চক্ষুষ্মান।
বিজ্ঞানবিৎ পতিতের ত্রাতা, স্বদেশ প্রেমিক, পূজারী তুমি,
ঈক্ষণাগারে, ক্ষুধিতের ঘরে, দীন যেথা তব কর্ম্মভূমি।

নব রসায়ন ডেকেছিল তোমা জ্বালিতে জ্ঞানের দিব্য ভাতি,
গুরু ড্যালটন মোগুলিফের উর্দ্ধে উচ্চ আসন পাতি।
রহিতে পারিতে বিজ্ঞানাকাশে জ্ঞানের জ্যোতিষ্ক জ্যোতির্ম্ময়,
জ্ঞানীগুণিগণ যুগে যুগে তব মুক্ত কণ্ঠে গাহিত জয়।
বিজ্ঞান চেয়ে বড় যে সত্য মরামানুষেরে মানুষ করা,
মোহের আঁধার নাশিতে জীবের জীবনের দীপ জ্বালিয়া ধরা ;—
তাই সে সবারে হেলায় ত্যজেছ তুচ্ছ করেছ কীর্ত্তিমান,
কাঙালিনী মার নয়ন সলিলে গলিল তোমার মহান প্রাণ।
জীবন্মৃতেরে প্রাণদান ছাড়া তাই তব কোন কামনা নাই,
অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য শকতি দিতে পারে হেন সাধনা চাই।
হে শব-সাধক এ শব-সাধনা স্বেচ্ছায় তাই নিয়েছ তুলি,
আপনারে তুমি দিলে বলিদান আপন নামের গরিমা ভুলি।
আপনারে ভুলি ভোলানাথ সে যে চিরকল্যাণ শম্ভু শিব,
আপনায় ভুলি তোমারও সাধনা বাঁচাইতে শত লক্ষ জীব।
রসায়নে তুমি জ্বালিতে যে আলো তার বাড়া আলো করেছ দান,
তথ্যপূর্ণ তোমায় সত্যে লভেছি আমরা নবীন প্রাণ।
জ্ঞান শলাকায় খুলেছ হে গুরো মোদের অন্ধ নয়ন পাত
নব প্রেরণায় জাগিছে বাঙালী আজি বাঙলায় সুপ্রভাত।
ঐ "বাঙলার কেমিক্যালখানা" বঙ্গলক্ষ্মী যন্ত্র'লয়,
অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য বিতরি গাহিছে তোমারই জ্ঞানের জয়।
তব আদর্শে লভিব আবার অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য সুখ,
জগতের মাঝে দাঁড়াব আমরা গর্ব্বোজ্জ্বল হাস্য মুখ।
ওগো জ্ঞান-গুরো ঋষি ঋত্বিক যুগ-যজ্ঞের যোগ্য হোতা !
তোমার মুখের অমৃত মন্ত্রে বাঁচিবে হাজার হাজার শ্রোতা।
আজি শুভদিনে দিতে ও চরণে নাহিক যোগ্য অর্ঘভার,
দীন কবি আমি, শ্রদ্ধা আনত হৃদয়ে জানাই নমস্কার।

৩৫৮/

বীর-পূজা

শ্রীসখানাথ দাশ

ভারতবর্ষ ত্যাগ-প্রধান দেশ। পশ্চিম যখন ভোগবিলাসের প্রচুর আড়ম্বরের মধ্যে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া সার্থকতার পরিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে, ভারতবর্ষ তখন বৈরাগ্যের কমনীয় জ্যোতির মধ্যে নিজের সত্তা সম্পূর্ণ প্রতিফলিত দেখিতে পায়। তাই দেখিতে পাই দেশের মহাদুর্দ্দিনে যে সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মভূমির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতঃ তাহার জয়পতাকা উর্দ্ধে তুলিয়া নিন্দুকের চিত্তে বিস্ময়ের চমক লাগাইয়াছেন তাঁহাদের জীবনের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে এই ত্যাগ-সাধনা—তাই দেখি সবরমতীর মহাঋষি কটিবস্ত্র হইয়া ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতেছেন, যুগাবতার চৈতন্য গেরুয়া পরিয়া বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সার্ব্বজনীনতার মন্ত্র বিলাইয়াছেন, অর্দ্ধজীবন ভোগবাসনার মধ্যে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াও শেষজীবনে দেশবন্ধু দেশসেবায় আপনাকে বিলাইয়া দিলেন। ভারতবর্ষে এই ত্যাগেরই জয় জয়কার! ভোগে ও সংযমে, আসক্তি ও বৈরাগ্যে এক অপরূপ মিশ্রণই ভারতবর্ষের ত্যাগকে একটি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি দিয়াছে। ভারতবর্ষ শিখাইয়াছে—'সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।'

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ভারত তাহার চিরদিনের স্বপ্নকে আর একবার প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে সত্য বলিয়া দেখিয়াছে, তাঁহাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়াছে।

স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য ইঁহার মাথায় গৌরবের মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। সংসারের ভোগবাসনার মায়ায় ইঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই, যৌবনের সবুজ স্বপ্ন ইঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, ত্যাগ নিরাসক্তি বৈরাগ্যকেই ইনি বরমাল্যরূপে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। 'কর্ম্মের উচ্ছল উর্ম্মি' ইঁহার রক্তে রক্তে যে দোলা লাগাইয়াছে, সেই দোলায় ইনি সারাজীবন ধরিয়া দুলিতেছেন। জীবনের কোন শুভমুহূর্ত্তে দেশের আর্ত্তনাদে তিনি চমকাইয়া উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন—

> "ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
> মূক সবে ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
> বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
> বহি চলে মৃদু গতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার।
> *　　*　　*　　*
> শুধু দুটি অন্ন খুটি' কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
> রেখে দেয় বাঁচাইয়া; সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে
> নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে
> দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
> মরে সে নীরবে।"

এই দরিদ্র নিরন্ন নিঃসহায় দেশবাসীর পরিত্রাণের উপায় তখন রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁহার বক্ষে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—

> "অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
> সাহস-বিস্তৃত বক্ষ-পট।"

এই আর্ত্ত ব্যথিতদের ত্রাণ করাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন উপায়ে তিনি দেশবাসীর পরিত্রাণলাভের পরিপোষক বলিয়া জানিয়াছেন তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন দেশকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইলে স্বাবলম্বী হইতে হইবে, তাহার নিজের শিল্পবাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে, নিজের কারখানাজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে, সাগরপারে বস্তা বস্তা টাকা নির্ব্বাসিত করিলে চলিবে না, তাই চরকার প্রচলন ও খদ্দরের প্রচার ও কুটির-শিল্প প্রবর্ত্তনই তাঁহার আমরণ সাধনা। "স্বদেশী" তাঁহার সাধনার মন্ত্র। এজন্য তিনি তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য অকাতরে বিলাইয়া

দিয়াছেন, কাঙ্গাল সাজিয়াছেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। তিনি জানেন বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বর্ত্তমান জগতের জাতিসমূহকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে হইলে বিজ্ঞানকে অস্ত্র করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। তাই বিজ্ঞানচর্চ্চা তাঁহার তপস্যা, বিজ্ঞানে তিনি নিজের অনেকখানি বিলাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। রসায়ন শাস্ত্রে বিবিধ কৃতিত্বপূর্ণ আবিষ্কার তাঁহাকে রসায়ন জগতে যুগান্তর আনয়নকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। নিজের ক্লেশোপার্জ্জিত হাজার হাজার টাকা তিনি অনায়াসে হাস্যমুখে বিজ্ঞান কলেজে বিজ্ঞানের উন্নতিমানসে বিলাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গেলে আমরা বলিব দেশোপকার ও বিজ্ঞানানুশীলন। পরোপকারকে তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কত নিরন্ন অভাবগ্রস্ত, নিঃসহায় যে তাঁহার নিকট হইতে নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলপন্থা খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। এই মঙ্গলালোকোদ্ভাসিত সদানন্দ মুখখানির দিকে চাহিলে, অতি নীচাশয়েরও মুখমণ্ডল ত্যাগ-গরিমায় অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। যে তাঁহার সঙ্গলাভ ক্ষণকালের জন্যও করিয়াছে তাহারই মানস-পটে এই ত্যাগ-দীপ্ত পুণ্যচরিত্রের স্পর্শ চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইবে। প্রফুল্লচন্দ্রের কথা মনে করিতে গেলেই Rupert Brookeএর সেই অমর কবিতাটি মনে আসে। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আত্মদানকারী সৈনিকদের সম্মানে Brooke লিখিয়াছেন—

> These laid the world away, poured out the red—
> Sweet wine of youth ; gave up the years to be......unhoped Serene,
> That men call age ; and those who would have been
> Their sons, they gave, their immortality."

একটু মানে ঘুরাইয়া দিলেই প্রফুল্লচন্দ্রের বেলায়ও এই উক্তির সার্থকতা দেখিতে পাই। তিনি বিশ্রামপূর্ণ শান্তিময় বার্দ্ধক্যের মোহ পরিত্যাগ করিয়া আজও যুবকের মতো পরিশ্রম করিতেছেন। সন্তানের কাছে 'স্মৃত' হইবার লোভ তাঁহার দেশসেবার আগ্রহের নিকট পরাজয় মানিয়া লইয়াছে। তিনি চিরকুমার, ত্যাগে, দৃঢ়-সঙ্কল্পে, চরিত্রবলে দ্বিতীয় ভীষ্ম। সংসারের সুখ সম্ভোগ তাঁহার জীবনে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, যৌবনে সুমিষ্ট মদ্যের মতো রক্তের প্রতিবিন্দু তিনি দেশসেবায় নিঃশেষ করিয়াছেন

প্রফুল্লচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহার ন্যায় দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, তাঁহার ন্যায়—'আমার দেশ, আমার জাতি, আমি আমার দেশের মুক্তি চাই, কল্যাণ চাই' ভাবিতে হইবে।

ভীষ্ম, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, অশোক হরিশ্চন্দ্র ইঁহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহার তুলনায় আমরা এত নগণ্য যে ইঁহার নাম করিবার পর্য্যন্ত অধিকার আমাদের নাই। আমাদের সম্মুখে আজ তিনি যে আদর্শ ধরিয়াছেন, তাহাকে একান্ত আপনার বলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে হইবে। ইঁহার অনুসৃত পথ লক্ষ্য করে, আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রফুল্লচন্দ্র দেশের লুপ্ত গৌরব, লুপ্ত আদর্শ পুনরুদ্ধারের মহান প্রয়াস পাইয়াছেন, পশ্চিমের মায়াপাশ হইতে ভারতের ভাববিলাসী প্রাণকে ফিরাইয়া আনিয়া নিজ আদর্শের উপর তাহাকে ন্যস্ত করিয়াছেন। ভারত আবার তাহার হারানো পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, নিজের গৈরিকপতাকা উর্দ্ধে উড্ডীয়মান করিয়া ভোগদৃপ্ত পশ্চিমের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। Brookeএর আরো কয়েকটি লাইন এখানে তুলিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে।

> "He has brought us, for our dearth,
> Holiness lacked so long and Love and Pain,
> Honour has come back, as a king to earth,
> And paid his subjects with a royal wage ;
> And Nobleness walks in our ways again ;
> And we have come into our heritage."

আজ তাঁহার সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইল। এই শুভদিনে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বিস্ময়-শ্রদ্ধা-মুগ্ধতা-বিমিশ্রিত নমস্কার জানাই।

২৭০

নমস্কার

শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য

১

ছাত্র যারা ভক্ত তোমার তোমায় করে অর্ঘ্য নিবেদন,
জ্ঞানের গুরু, বিদ্যালয়-বিশ্বে তোমার শিষ্য অগণন।
দেশের 'পরে দৃষ্টি তোমার খাদি এবং চরকা তোমার ব্রত,
হাজার সেবক, হে দেশপ্রাণ, তোমার পায়ে কর্‌ছে মাথা নত।
মসীজীবী বাঙালীরে বৈশ্য হওয়ার মন্ত্র দিলে কাণে,
দলে দলে তরুণরা আজ তাইতে ছোটে ব্যবসায়ের পানে।
শুদ্ধচেতা ব্রহ্মচারী বুদ্ধ সম সিদ্ধ আপন-ভোলা,
গৃহবাসী হে সন্ন্যাসী, তোমার তরে সবার দুয়ার খোলা।
আজো তোমার শীর্ণ দেহে কর্ম্ম-যোগের প্রতীক তুমি খাঁটি,
তোমায় পেয়ে ধন্য হ'লো নতুন ক'রে বাংলা দেশের মাটি।

২

আমি তোমার ছাত্র নহি—ধার ধারিনে বৈজ্ঞানিকতার,
রসের কদর বুঝবো তোমার, রাসায়নিক, নেই সে রসধার।
খাদি আমার নয় পরিধান, চরকা আমার হয়নি করগত,
তোমার হাজার চেলার পাশে দৃষ্টি আমার লজ্জা অবনত।
ব্যবসায়ের ফন্দী ফিকির মগজে মোর একটু নাহি মেলে,
আজো ব'সে আপিস গৃহে চল্‌ছি কেবল কলম ঠেলে ঠেলে।
ব্রহ্মচারী চাইনি হ'তে—এই বয়সেই হোলেম কৃতদার,
যোগ্য তোমার শিষ্য হবার কোনই আমার নেইকো অধিকার।
কর্ম্ম আমার নেই কো কিছু—কেবল আমার আপন কর্ম্ম বিনে
তুচ্ছ চায়ের মায়া—তা'রেও ছাড়িনি কো তোমার নিষেধ চিনে।

৩

তবু আমি ভক্ত তোমার ঠাঁই দিয়েছি তোমায় মনের তীরে,
পরাণ দিয়ে ভালোবাসি তোমার প্রাণের চপল শিশুটিরে।
শিশুর মতোই সহজ তুমি, সবার প্রতি তেম্‌নি তোমার টান,
তেম্‌নি সরল, তেমনি উদার, শিশুর মতোই তেম্‌নি খোলা প্রাণ।
শিশুর মতোই শুভ্রশুচি, বেশে ভূষায় তেমনি অবিলাসী,
বক্ষে প্রেমের ঝরণা তোমার, ওষ্ঠে তোমার নিত্য মধুর হাসি।
আজকে তোমার জয়ন্তীতে শিষ্য সেবক তোমার যেথা যত,
তোমায় তা'রা জানায় পূজা—কীর্ত্তিগাথা গাইছে তোমার শত।
অযোগ্য এ ভক্ত তোমার লজ্জা মানে গাইতে সে-সব গীতি,
অখ্যাত এই প্রেমিক জনার গ্রহণ কর, মুগ্ধ প্রাণের প্রীতি।

দুই দিন

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বোধ হয় ১৯১৪ সালের কথা।

নতুন কলিকাতায় এসেছি, খুব কম লোককেই চিনি। একদিন হঠাৎ খেয়াল গেল ডাক্তার রায়ের সহিত আলাপ করা চাই। তাঁর কথা আমি স্কুলে থাকবার সময় শুনতুম খগেন দার কাছে—খগেনদা (এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) আমার বছর তিনেক আগে ম্যাট্রিক পাশ করে কল্‌কাতায় এসেছিলেন, ফিরে গিয়ে এখানকার নানা উল্লেখ যোগ্য অবশ্য-দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকার সঙ্গে ডাক্তার রায়ের নামও করেন। বোধ হয় সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে প্রসুপ্ত ছিল।

সন্ধান নিয়ে জানলুম ডাঃ রায় বেঙ্গল কেমিক্যালের বাড়ীতে থাকেন—তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিস ছিল আজকাল যেখানে 'মোহাম্মদী'র আপিস ওই বাড়ীটাতে।

গ্রীষ্মাবকাশের ঠিক আগে, কল্‌কাতায় খুব গরম। অত বড় লোকের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যাচ্ছি, ভয়ে ভয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেলুম উঠে। ছোট্ট একটা ঘরে একটা ছোট্ট খাটে কে একজন শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন, পায়ের শব্দ শুনে শয্যাশায়ী লোকটি মুখের সামনের থেকে বইখানা সরিয়ে ফেলে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—কিরে, তুই আবার কে রে? আয়, আয়—

মনে হোল এ সম্ভাষণ অদ্ভুত। এর মধ্যে যে প্রাণখোলা আন্তরিকতা আছে, তা পাড়াগাঁয়ে স্নেহময় খুড়া জ্যাঠার নিকট থেকে হয়তো লাভ করা সম্ভব ছিল কিন্তু কল্‌কাতা সহরের প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন নামজাদা অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকের মুখে এ ধরণের আদরের ডাক অদ্ভুত বলেই মনে হোল। তার পর গিয়ে কাছে বস্‌লুম।

নিকটতম আত্মীয়ের মত ডাঃ রায় কত কি প্রশ্ন করলেন একটু পরে ডাক দিলেন—বৃন্দাবন—বৃন্দাবন—

বৃন্দাবন তাঁর সে আমলের চাকর ছিল। বৃন্দাবন ঘরে ঢুকলে ডাঃ রায় তাকে বল্লেন এই বাবুকে এক গ্লাস সরবৎ করে দাও।

এ কথাটাও আমার কাছে অদ্ভুত ঠেক্‌লো। সবে পাড়াগাঁ থেকে এসেচি আমার নিজের সম্বন্ধে বাবু বলতে কখনও কাউকে শুনিনি, তা আবার সার পি সি রায়ের মুখ থেকে এ ভাবে শুন্‌বো কে স্বপ্নেও এ কথা ভেবেছিল? আমাদের দেশের স্কুলের থার্ড পণ্ডিত মশায়ও চাকরের সাম্‌নে আমাকে এতটা সম্মানিত কর্‌লেন না যে!

আস্‌বার সময় ডাঃ রায় বল্লেন—রবিবারে তোর এখানে নেমন্তন্ন রৈল, দুপুরে খাবি।

করপোরেশন ষ্ট্রীটে কাকার মেসে এসে উঠেছিলুম। সেখানে আমায় সমবয়সী দু তিনটি ছেলে থাকতো—কেউ পড়তো, কেউ চাক্‌রী করতো—আর সব কেরাণী বাবুর দল, তাঁদের বয়স বেশী। আমি ছেলেদের দলে কথাটা সগর্ব্বে প্রচার করে বেড়ালুম। কেউ বিশ্বাস কর্ল্লে, কেউ কর্ল্লে না। রবিবারে বেলা এগারোটার সময় ডাঃ রায়ের ওখানে গেলুম। সেদিন গিয়ে দেখি খুব ভিড় ঘরটাতে। এক ভদ্রলোক (নাম মনে নেই) জার্ম্মানি থেকে (তখন যুদ্ধ বাধে নি, সাম্‌নের আগষ্ট মাসে বাধ্‌ল) চামড়ার কাজ শিখে এখানকার কোন্ ট্যানারিতে বড় চাক্‌রী পেয়েছিলেন—তিনি তাঁর জার্ম্মানির অভিজ্ঞতা বর্ণনা কয়ছিলেন, আমি সসম্ভ্রমে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ তাঁর গল্প শুন্‌লুম।

তিনি বল্‌ছিলেন—অনেক সময় যখন বুঝতে পারিনে চাম্‌ড়াটা ঠিক তৈরী হয়েচে কি না, তখন একটুক্‌রো মুখে ফেলে দেখি—

আমার ভারী খারাপ লাগ্‌লো কথাটা। মুখে আবার চাম্‌ড়া ফেলে দ্যাখ কি কোরে! নতুন তখন দেশ থেকে এসেচি কি না!

অনেক বেলায় খেতে বসলুম। ডাক্তার রায় একটা ছোট মার্ব্বেলের টেবিলে, আমি মেজের ওপর। কিন্তু খাবার থালা দেখে নিরাশ হলুম। একটু আলু ভাতে, তার ওপর বৃন্দাবন সামান্য একটু মাখন দিয়ে গেল। নিরামিষ তরকারী, ডাল ও মাছের ঝোল। এত বড় একজন নামজাদা লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে অনেক উপাদেয় দ্রব্য খেতে পাওয়া যাবে আশা করেছিলুম, বিশেষ তখন বয়স অল্প, কিন্তু এ আবার কি নিমন্ত্রণ খাওয়া? আমাদের গ্রামে একজন গরীব লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণেও এর চেয়ে ভাল খাওয়ায়।

ডাক্তার রায় বল্লেন—মাখন আর আলুভাতে, ওঃ, there is nothing like this under the heeven—বেশ করে মেখে নে, মেখে নে।

মনে মনে ভাবলুম আহা ভারী তো, এ আমি অনেক খেয়েছি বাড়ীতে—বাড়ীর সরের টাটকা ঘি ও আলুভাতে এর চেয়েও ভাল লাগে।

আচার্য্যদেবের আহারীয় তালিকা সেদিন যে এক লোভী নির্ব্বোধ পল্লীবালকের রসনা পরিতৃপ্ত করতে পারে নি একথা আজও মনে হলে হাসি পায়।

বিকেলে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেলুম ডাঃ রায়ের সঙ্গে। গাড়ীতে আর কেউ ছিল না. শুধু তিনি আর আমি। তিনি বড় বড় বাড়ী দেখিয়ে বল্‌তে লাগলেন—এই দ্যাখ এটা গ্রাণ্ড হোটেল, ওটা হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকান, ওটা অমুক—আমি তার আগে সে সবই চিনি। মেজ মামার সঙ্গে আরও দু তিন বার কলকাতায় এসেছি ও সব দেখে শুনে গিয়েছি. তবুও চুপ করে শুনে গেলুম। ডাক্তার রায়কে অত্যন্ত আপনার লোক বলে মনে হোল—সেবার মেজ মামাও এত আগ্রহের সঙ্গে কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থান আমায় দেখান নি তো?

ইডেন গার্ডেনে একটা গাছতলায় অয়েলক্লথ পেতে আমরা বসলুম। সন্ধ্যার পরে ডাক্তার রায় আমার মেসের সাম্‌নে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন। গাড়ী থেকে নামবার সময় এদিক ওদিক চেয়ে দেখলুম আহা, মেসের একটা লোকও বারান্দার দাঁড়িয়ে নেই, কেউ দেখলে না যে আমি সার পি সি রায়ের গাড়ী থেকে নাম্‌চি!

প্রণতি

শ্রীফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জগত দেখেছে তোমা বৈজ্ঞানিকরূপে
হে আচার্য্য! দেখিয়াছে তারা তব জ্ঞান
গবেষণা, গৌরব মুকুটে তারা তাই
মণ্ডিয়াছে ভাল তব—জড়ের পূজারী!
দীন আমি পল্লীবাসী; বিজ্ঞান আগার
তব দেখি নাই; বুঝি না ক রসায়নে
আছে কিবা রস। তোমার অসীম জ্ঞান
কোন রেখাপাত মোর করেনি হৃদয়ে
অজ্ঞান তামসভূমি। যেদিন হেরেছি
তোমা মূক মুখে তুলি দিতে ভাষা,
দুর্ভিক্ষ বন্যার মাঝে দেবদূত সম
বরাভয় বিলাইতে, হেরিয়াছি যবে
অঙ্গুলি হেলনে ত্রস্ত অপসারি' দূরে
সরে যায় আর্ত্তি দুঃখ হাহাকার রব
সভয়ে প্রণমি তোমা, জেগে উঠে প্রাণে,
মনে ময়নের কোণে আশার আশ্বাস—
সেইদিন হতে শুধু গুরু বলি দেব
লয়েছি মানিয়া। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
ঢালি দিতে চরণে তোমার প্রাণ মন,
দেহ একান্ত হইয়া গেছে।
হে যাজ্ঞিক,
বিশ্বজিৎ ব্রতে ব্রতী প্রীতিভরে লহ
আজি দীনের প্রণাম। পল্লীর দেবতা,
দেশহিত ব্রত তুমি; পল্লীবাসী তব
দীর্ঘায়ু কামনা করে। ওগো সন্ন্যাসী,
মনুষ্যত্ব ধর্ম্মে পূত ওগো কর্ম্মবীর,
চিরজীবী হয়ে রও মাতৃঅঙ্ক জুড়ি'
দ্বিধা দ্বন্দ্ব মাঝে তব শ্রেষ্ঠ অবদান
জ্বলুক দেশের বুকে চির অনির্ব্বাণ।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

রসায়ন বিজ্ঞানে উচ্চস্তরের মৌলিক গবেষণায় বিজ্ঞান জগতে যে ইঁহার নাম কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত সেকথা বলা অনাবশ্যক। শিক্ষিত সুধীজনমাত্রেই অবগত আছেন। আমি এঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যেরকথাই কিছু বল্‌ব।

ব্যক্তিগত জীবনের দুই একটি সত্য যখন নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে তখনই সে লোকসমাজে সমাদৃত হয়। কিন্তু এ দেশের লোকে খাঁটি চোখ হারিয়ে যেন কাঁচের চোখ পরেছে। বাইরে থেকে দেখা যায় বেশ জলন্ত—নিজে কিন্তু কিছুই সে দেখ্‌তে পায় না। অথচ কাণা চোখে দেখার অত্যাচার পূর্ণমাত্রায় সে করে। যে বরেণ্য নয়—তাকে করে তুল্‌তে চায় চিরস্মরণীয়! যে চিরস্মরণীয় তাকে বলে,—হটু যাও। এই রকমে বাড়িয়ে কমিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে। ফলে আসল সত্যকে মাটি করে দেয়। মহাত্মা গান্ধীর আদি ও মধ্যজীবনে অনেকে তাঁকে এই রকমই ঘুরপাক্ খাইয়ে ছেড়ে দিলে। শুধু মহাত্মাজী নয়—বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষদের অনেকের জীবনকে লোকে এই রকম বিড়ম্বিত করে তুলে বোকামী করে। শক্তিবেগমত্ত পুরুষ নিজের বেগে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যখন শেষ সীমায় এসে দাঁড়ায় তখন সকল দিক্‌কার সকল কলরব থেমে শান্তি আসে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনেও এরূপ অত্যাচার কম হয় নাই।

প্রফুল্লচন্দ্র যখন বিলেত থেকে দেশে ফির্‌লেন—তখন দেশবাসী বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের লোক অনেকটা কুসংস্কারাপন্ন। একদল লোক ক্ষেপে উঠ্‌ল,—যায় যায়—জাতিধর্ম্ম যায়। আচার্য্য হাস্‌লেন। ধমকের মধ্যে পূর্ণতা নেই—প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। তিনি ধমক দিলেন না। মিষ্টস্বরে ডেকে বল্‌লেন,—তোমরা ভাল থাকো—আমি তোমাদের ছোঁব না—ভয় কেন?—তিনি দেশ থেকে সরে এলেন। সত্যই কি সরে এলেন? সমাজের কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে ধরা পড়্‌ল না—কতটা তিনি থেকে গেলেন।

দেশ ও সমাজ যাঁর কাছে গভীরতর প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্তরের বিপুল বেদনা তাঁকে গলার হার করিতে হয়। সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ ভাব যেমন ঈশ্বরের সহিত প্রণয়ীর মধুর ব্যাকুল সম্বন্ধ—দেশের সহিত দেশপ্রেমিকেরও ঠিক সেইরূপ মধুর সম্বন্ধ। কত আঘাত—কত মান অভিমান অপমান আসে যায় এই সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে—তবু সে ভাঙ্গে না। আচার্য্যদেবেরও দেশের প্রতি সে সম্বন্ধের টান ছিঁড়্‌ল না। তিনি প্রতিবৎসর একবার করে এসে দেশের দুয়ারে হাজির হতে লাগ্‌লেন। ঠিক যেন—

"প্যারে দরশন দীজ্যো আয়
তুম বিনা রহে ন জায়।
জল বিনা কঁবল চন্দ বিন রজনী।
ঐ সে তুম দেখা বিন সজনী॥
ব্যাকুল ব্যাকুল ফিরু রৈন দিন
বিরহ কলেজা খায়॥

প্রিয় হে, দেখা দাও। তোমা বিনা যে থাকিতে পারি না। জল বিনা কমল, চাঁদ বিনা রজনী, সেইরূপ তোমা বিনা আমি আকুল ব্যাকুল হইয়া দিন রাত ফিরিয়া বেড়াই। বিরহ আমার কলিজা খাইয়া ফেলিল।

ঠিক এইরূপ টানেই দেশের দ্বারে এসে হাজির হতেন। দ্বারে দ্বারে শুনাতেন,—আমি এসেছি—কেমন আছ দেখ্‌তে এসেছি—হাসিমুখখানা দেখ্‌তে এসেছি।

হাসিমুখ বড় দেখ্‌তে পেতেন না—হাসিমুখ করিয়ে দিয়ে যাওয়াই আসার উদ্দেশ্য হত। ফলে দীন দুঃখী, কন্যাদায়গ্রস্ত অন্ধ আতুরে—আর রাস্তা ঘাট, স্কুল পাঠশালা, টোল মক্তবে অজস্র টাকা ঢেলে দিয়ে ফিরে চলে যেতেন। ক্রমে এটা

তাঁর কর্ম্মপন্থার একটা অবর্জ্জনীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে সকল কাজ ত্যাগ করে' দেশে এসে দেশবাসীর সুখ দুঃখের রঙে রঙিয়ে যাওয়া চাই।

মৈ বিরহিন বৈঠি জাগু
জগত সব সৌবে রে আলী।

সখিরে আমি বিরহিনী—বসিয়া বসিয়া জাগিতেছি; আর জগতের সকলেই ঘুমাইতেছে। সে তারিখটি এমনই সুনির্দ্দিষ্ট—যাত্রাটি এমই আবেগাকুল যেন এই জ্যৈষ্ঠমাসের অপেক্ষায় গত এগারটি মাস তাঁর চোখে ঘুম ছিল না।

স্বভাবটি আবার যেমন সুস্থ সবল মানুষের স্বভাব—তেমনি বালকেরও। আশ্বিনমাসের শিশুরা যেমন মা আনন্দময়ীর অপেক্ষায় বসে থাকে। দেশের শিশু ও যুবকেরাও তেমনি জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতীক্ষায় দিন গণে। এই একটি মাস তাদের সঙ্গে শিশু মন লয়ে খেলা করে চলে যান। ছেলেদের সঙ্গে জাম খেতে গিয়ে নিজেই নীচের ডালে চড়ে বসেন। তারা বলে,—

"আপনি কেন গাছে চড়্‌লেন ?"

তিনি হেসে বলেন, "আমি বোকা নইরে। থোবার রসাল জামটা তোরা কখনই আমাকে দিবিনে—গালে পুর্‌বি।"

খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে কপোতাক্ষী নদীর তীরে ইঁহার পৈত্রিক বাসভবন। গৃহের সন্নিকটেই নদী। অনেক জেলের বাসও এই নদীর ধারে। প্রতিদিন বিকালে এই সময় ছেলেদের লয়ে বাইচ খেলার প্রতিযোগীতা হয়। তা' ছাড়া কুস্তী খেলা—পাঠাশালার ছেলেদের মিষ্টান্ন বিতরণ প্রভৃতি নানারূপ আনন্দ দিয়ে তাদের মাতিয়ে রেখে আসেন।

ইনি শুধু নীরস শুষ্ক বিজ্ঞানাচার্য্য নহেন। রসজ্ঞও বটেন। সঙ্গীতে ইঁহার প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। সুগায়ক শ্রীমান অনাথনাথ বসুর বাড়ীও এই কপোতাক্ষী তীরে নদীর অপর পারে। সে সময় ইনি দেশে থাক্‌লে সর্ব্বদা তাঁকে নিজের কাছে এনে রাখেন। বিকালে কপোতাক্ষীর কালো জলের উপর দিয়ে এঁদের নৌকা নেচে যায়। শ্রীমান অনাথ যন্ত্রসহযোগে গান করেন। সে সুর বাতাসে ধ্বনিত হয়ে দুই তীরের গ্রামবাসীর কর্ণে মধু ঢালে ও আচার্য্যদেবের শুভাগমন ঘোষণা করে।

একদিন সকালে আচার্য্য নিজের হাতে কোদাল ধরে জমী কোপাচ্ছিলেন। কিছু দূরে একটি বালক বার খেল্‌ছিল। সে খেলা ছেড়ে এসে বল্‌লে,

"আপনি কোপাচ্ছেন ?"

আচার্য্য হেসে বল্‌লেন "তুই কি করছিলি ?"

"বার খেল্‌ছিলাম।"

"তবে তুই আমার বন্ধু। আমিও শরীর-চর্চ্চা কর্‌ছি। কিন্তু তুই ঠকে গেলি।"

"কেন ?"

"আমার একসঙ্গে দুটো কাজ হল—তোর একটা।"

"কি রকম ?"

আচার্য্য হেসে বল্‌লেন, "শরীর-চর্চ্চাও হল—জমীটারও চাষ হল। এখন এতে পেঁপে, শশা, তরমুজ, ফুটি এই সকল লাগাব। জমী কুপিয়ে বাড়ী যেয়ে সেই সকল ফল কেটে কেটে খাব—কারও মুখ তাকাব না—আর তুই বার খেলে বাড়ী যেয়ে বল্‌বি,—মা ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও।"

আজকাল স্বদেশীর হুজুগে দেশের জন্য গলাবাজী করে অনেকে—রঙ ধরে না। নিজের জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়ে অপরের জীবন উদ্‌ঘাটিত করা সহজ হয়।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

নিমাইএর হরিনাম বিলানর মত তিনখানা হাড় লয়ে ভেল্‌কি খেলে দেশে দেশে এমনটি আর ক'জনা বিলিয়ে বেড়াতে পেরেছেন ? 'চরকা-বায়ুগ্রস্ত' এ খেতাব বা মহাত্মাজী ছাড়া আর ক'জনা অর্জ্জন কর্‌তে পেরেছেন ?

"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"

পথে ঘাটে পার্কে ময়দানে এই সঙ্গীত শুনি। কিন্তু তাঁতির ঘরে কামারের কর্ম্মশালায় এঁকেই যেতে দেখি।

সূতা জাঁতা ধরে পাঠশালার গুরুমশায়ের মত হাতে ধরে 'ক' 'খ' শেখাতে এঁকেই দেখি।

নদনদী ত আজকাল মাতাল—কাকেও বড একটা আমলের মধ্যে আনে না। বছর বছর বাণ ডেকে কত শত শত লোককে উদরের মধ্যে পুরলে—ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই জীর্ণ শীর্ণ অস্ত দিগন্তের দিকে হেলে-পড়া সত্তর বছরের বৃদ্ধ-যুবকটিকে দেখ্‌লেই ভয়ে তারা আঁত্‌কে ওঠে। তালপাতার সেপাইটিকে তারা ডরায়।

দেশের ছেলেরা সিদ্ধির নেশায় আলস্য ও তন্দ্রার ঘোরে সময়ের অপব্যয় করছিল—তাদের শক্তি শৌর্য্য ও কৌশলের খবর হয়ত অনেকে দিয়েছেন। কিন্তু—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে
পর দাস-খতে সমুদয় দিলে।"

দৈববাণীর মত এ বাণী তাঁর মুখে যেমন ছেলেরা শুনলে, আর কার মুখে এমনটি শুনেছে? লোভ বিসর্জ্জন দিয়ে বীণাপাণির পাদমূলে তাদের কল্যাণে অর্ঘ্য ঢেলে দিতে পেরেছিলেন বলেই না এই লাভ আজ তাঁর হল।

আচার্য্যদেব কোন দলে ভিড়েন নি। নিজের বিবেক বুদ্ধিকে সহায় করে দেশের মুক্তির পথ পরিষ্কার করতে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। কিন্তু এঁর সমস্ত চরিত্রটা বিশ্লেষণ করলে ইনি কতটা যে মহাত্মাজীর অনুরাগী ও অনুগামী—তা' বেশ বোঝা যায়।

বাঙালী প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

বৎসর পঁচিশেক আগে বাংলার আশ্‌মান-জমীন যখন স্বদেশের মহিমা-গানে আর স্বদেশী-প্রচারে গুল্‌জার, তখন বাংলার এক দূর পল্লীতে আমরা প্রথম শুনিয়াছিলাম বাংলার অন্যতম একনিষ্ঠ ভক্তকর্ম্মী বাঙালী প্রফুল্লচন্দ্রের নাম।

তিনি সেদিন দেখা দিয়াছিলেন এক নূতনরূপে—বাংলার স্বদেশী-যজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিকরূপে নয়া বাংলার বুকের উপর বিজ্ঞানের গোড়া পত্তন করিয়া স্বদেশীর মান রক্ষা করিতে, শিশু বাংলার প্রাণে বুকভরা আশা জাগাইয়া দিতে, আর স্বদেশীর কর্ম্মকাণ্ডের অন্যতম আচার্য্যরূপে বাঙালীকে-আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন মানুষ গড়িয়া তুলিতে।

আজ স্বদেশীভাবে তাজা বাঙালী যে সকল বৈজ্ঞানিক কর্ম্মক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিয়া বাংলার স্বদেশীকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদের সে ভাবের জন্মদাতা বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র। শিশুবাংলার ছাত্রসমাজ সেদিন প্রফুল্লচন্দ্রের দিকে অনেক আশা লইয়া তাকাইয়াছিল। নয়া বাংলার বুকের উপর দিয়া বিজ্ঞানের স্রোত বহাইয়া দিয়া তিনি বাঙালীর নিকট শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন এক নূতন ভগীরথরূপে।

হিন্দু-রসায়ন যেখানে স্রোত হারাইয়া ফেলিয়াছিল, বিজ্ঞানের চাষীরূপে প্রফুল্লচন্দ্র উহা হইতে খাল কাটিবার জন্য সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন কোদালী হস্তে। আত্মবিশ্বাসহীন বাঙালীকে ভরসা লইয়া তাঁহার পেছনে পেছনে চলিবার জন্য তিনি তাহাদের সামনে "হিন্দুরসায়ন"-এ একে একে ধরিলেন চির-উজ্জ্বল হিন্দু রাসায়নিকদের বিরাট গম্ভীর মূর্ত্তি। বাঙালী পরম বিস্ময়ে বিশ্বাস করিল—তাহার অতীত উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল—প্রফুল্লচন্দ্রের সিদ্ধি নিশ্চিত।

তারপর প্রফুল্লচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইলাম, "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার"-এর প্রচারক এক ভীষণ বিপ্লবীরূপে। সেদিন বাঙালীর নিন্দায় প্রাণে দারুণ বেদনা পাইয়াছিলাম সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার প্রাণের সে বেদনাকে মাপিবার

শক্তি আমার সেদিন যেমন হয় নাই, আজিও ঠিক তেমনি রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস প্রফুল্লচন্দ্রের সে বেদনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

বিজ্ঞানের সাধনার ভিতর বাংলার চিন্তা আসিয়া উঁকি মারিতেই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানশালা ছাড়িয়া বড়বাজার, কলুটোলা আর মুর্গীহাটায় বাঙালীর আর্থিকজীবন বুঝিবার জন্ম বাহির হইলেন। দিনের পর দিন সেখানে ঘুরিয়াছেন আর ঘরে ফিরিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন। তারপর পশ্চিমের জিলায় জিলায় ঘুরিয়া বাঙালীর শক্তি কি ভাবে উজান বহিয়া চলিয়াছে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছেন, আর বাঙালীর বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের জমা-খরচ কষিয়া কষিয়া দিনের পর দিন অশ্রু ফেলিতেছেন।

বাংলার জন্ম উন্মাদ প্রফুল্লচন্দ্র যে সকল আর্থিক কেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন সেই সব স্থানে বাঙালীকে দেখিতে পান নাই, পাইয়াছেন যাহাদিগকে তাহারা অ-বাঙালী। কিন্তু তাই বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র অবাঙালী-বিদ্বেষী নন। বিদেশীর সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় ভারতবাসীকে না দাঁড়াইলেই যেমন চলিবে না, অবাঙালীর সঙ্গে বাঙালীকেও বাঁচিবার জন্ম ঠিক সেই রকম টক্করই দিতে হইবে। বাঙালীর আর্থিকজীবন সম্বন্ধে ইহাই প্রফুল্লচন্দ্রের মত বলিয়া মনে হয়।

সাধক প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন নানা দিক দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কখনো কোনো স্থানে আবদ্ধ হয় নাই। স্বদেশ-কল্যাণের মানস-সরোবর হইতে যে স্রোত দিকে দিকে তালে তালে গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন-ধারা তাহাদের অন্যতম। তার বেগ, তার গর্জ্জন দিনের পর দিন শক্তি সংগ্রহ করিতে করিতে ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। সে স্রোতের কণায়-কণায় আশা-ভরসা ও বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

যুবককে যুবকের মতো, মানুষকে মানুষের মতো দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধের অন্তরে চিরজাগ্রত। সেই জন্যই বৃদ্ধসাধকরূপে তিনি কখনো জ্ঞানের তপস্যায় মগ্ন, আবার কখনো যুবককর্ম্মীরূপে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মে পাগল। স্বদেশের প্রয়োজনে ছোট বড় যে কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে হাতিয়ার হাতে যোদ্ধার জয়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র চিরদিন দণ্ডায়মান। তাঁহার সকল সাধনা সকল কর্ম্ম একটি দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাঁহার জীবন চিরদিন অর্ঘ্য দিয়া আসিতেছে, "শুধু একটী ভাবের পা-য়"। তাঁহার সাধনা যেমন তাঁহার দেশবাসীর জন্য, তাঁহার জীবন এবং ধনও তেমনি তাঁহার দেশবাসীর সম্পত্তি। যেদিন তিনি নূতন ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই দিন হইতেই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার দেশবাসীর দৌলত হইয়া রহিয়াছে।

যেখানে কোনো বাঙালী হাতপায়ের জোরে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে, প্রফুল্লচন্দ্র তাহার কাছে নিজে হইতেই আগাইয়া যান। সেই জন্যই গরীব বাঙালীর লক্ষ্মীপূজার পুরোহিতরূপে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লচন্দ্রকে কখনো ঘি-মিঠাইয়ের দোকানে, কখনো বা কাপড়ের দোকানে দেখিতে পাই। প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রবল ব্যবসাদার বাঙালীর পেছনে নানা ক্ষেত্রে আজ একটা প্রবল শক্তিরূপে কাজ করিতেছে দেখিতে পাই। যে কোনো ভাবেই হউক, বাঙালী বাঁচিয়া উঠুক, বাঁচিয়া মানুষ হউক, মানুষের মতো কাজ করুক; অস্থিপঞ্জরসার বাঙালী তাজা মানুষের মতো দেহে-মনে, স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্য্যে, হৃদয়ে-মস্তিষ্কে তাজা হইয়া দিগ্‌বিজয়ে বাহির হয়, এই কামনাই তাঁহার সকল কর্ম্মের মূলে চিরদিন রস যোগাইয়া আসিতেছে।

প্রফুল্লচন্দ্র বাংলাকে এমন একটা রূপে দেখিতে চাহেন, যাহা আগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সামনে, তারপর জগতের সামনে একটা নূতন রূপ লইয়া দেখা দিবে। প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণ ভাবী বাংলার যে সুন্দররূপ কল্পনা করিয়া উহাকে মূর্ত্তি গড়িয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরূপে আজ যাঁহারা সেই মূর্ত্তিকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া, নানা গুণে ভূষিত করিয়া তুলিবার জন্ম প্রাণপণ সাধনায় রত বাঙালী প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম।

জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র; নয়া বাংলার বিজ্ঞান-রাজ্যের নিত্যানন্দ প্রফুল্লচন্দ্র; বাংলার গৌরবে গর্ব্বিত, অপমানে অবনত, দুঃখে ক্ষুণ্ণ প্রফুল্লচন্দ্র; বাংলার স্বদেশী প্রচারক প্রফুল্লচন্দ্র; মানুষের দুঃখে বিগলিতচিত্ত প্রফুল্লচন্দ্র; কর্ম্মী এবং নেতা প্রফুল্লচন্দ্র দীর্ঘজীবন লাভ করুন। কখনো জলপ্লাবিত বাংলায় সাঁতার কাটিয়া বিপন্নকে রক্ষা করিবার

জন্য, কথনো ভিক্ষার ঝুলি হস্তে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য আর্ত্তের অভাব মোচনের জন্য, এখনো তাঁহার দীর্ঘকাল প্রয়োজন হইবে।

যাঁহাদের গৌরবে বাংলাদেশ চির-উজ্জ্বল, বাংলার গভীর অন্ধকারে, শীতে-গ্রীষ্মে, বর্ষা-বাদলে, ঝড়-ঝাপ্টায়, ভিতর নির্ব্বিকারভাবে লাইট হাউসের মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া যাঁহারা দিক্‌ভ্রান্ত নিরাশ বাঙালীকে পথ চলিবার সুযোগ দিয়া আসিতেছেন, প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের একজন। আজ প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্ততিবর্ষ জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাঙালীজাতির সেই মনীষিগণকেও প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মধারা

শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় বি, এ

এই বিরাট মানবের সম্বর্দ্ধনার জন্য দিকে দিকে যে বিস্তৃত জয়ন্তী উৎসবের প্রচেষ্টা চলিতেছে ইঙ্গিতের জয়ন্তী সংখ্যা তাহারই এক ক্ষুদ্র অংশ এবং আচার্য্যদেবের উদ্দেশে ভক্তগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের ক্ষীণ প্রতীকস্বরূপ। এই অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র সামর্থ্য লইয়া যোগদানের সুযোগ পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

চিন্তা ও কার্য্যের সমষ্টিই মানবের প্রকৃত জীবন এবং এই চিন্তা ও কর্ম্মের ইতিহাসই মানবের প্রকৃত জীবনী। প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তা ও কর্ম্ম অসাধারণ এবং অনন্ত। অল্প পরিসরের মধ্যে তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁহার কর্ম্মধারা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের ভক্তির অতি দীন অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

আচার্য্যদেব এ পর্য্যন্ত দেশের ও দশের জন্য যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহা এক অনন্ত আত্মার অখণ্ড অভিব্যক্তি হইলেও, তাঁহার কার্য্যকে আমরা প্রধানতঃ কয়েকটী দিক হইতে ভাবিতে পারি। তাঁহার কর্ম্ম সাধারণতঃ তাঁহার শিক্ষাজীবন ও গবেষকমণ্ডলীর সৃষ্টি, নিজ আবিষ্কার, হিন্দুরসায়নের ইতিহাস, শিল্প বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা, এবং জনসেবার আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দুর্ব্বল দেহযষ্টি দিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি এত কাজ কি করিয়া করেন তাহা অনেকের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "He believes in doing one thing at a time and that done well"—তিনি এক সময়ে একটী মাত্র কাজ করিতে ভালবাসেন এবং সেইটী সুসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কাজে হাত দেন না। Jack of all trade, but master of none একথা তাঁহার বেলায় খাটে না।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে কতক পৈত্রিক দেনার ভার গ্রহণ করিতে হয়। যতদিন সে দেনা পরিশোধ করিতে পারেন নাই, ততদিন অন্য কোন আহ্বানে সাড়া দেন নাই। বহু খেয়াল তাঁহার মাথায় খেলিতেছিল; তিনি তাহাদিগকে রাশ টানিয়া সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ডি-এস্‌-সি ডিগ্রী প্রাপ্তির পর বিলাতের বিজ্ঞানাগারে স্বীয় আরব্ধ গবেষণা পরিসমাপ্ত করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে মাত্র ২৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। এই সামান্য বেতনের বিরুদ্ধে তিনি আপত্তি উত্থাপন করিলে শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর সুপ্রসিদ্ধ Croft সাহেব স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দেন "জীবনে অনেক করণীয় আছে, কে তাঁহাকে চাকুরী লইয়া সাধাসাধি করিতেছে।"

ডিরেক্টর সাহেবের এই শ্লেষোক্তিতে প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মাভিমানে অত্যন্ত আঘাত লাগে এবং তাঁহার চাকুরী করিবার সাধ একেবারে চলিয়া যায়; কিন্তু তাঁহাকে দায়ে ঠেকিয়া কর্ম্মগ্রহণ করিতে হয়। তিনি বিলাত হইতে উচ্চ রসায়নীবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। অন্য পথে যাওয়া সুবিধাজনক নহে! বিশেষতঃ মৌলিক গবেষণা দ্বারা নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার স্বপ্ন তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রেসেডেন্সি কলেজ ভিন্ন অন্য কোন কলেজে নিযুক্ত হইলেও তাঁহার এই বাসনা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং একরূপ বাধ্য হইয়াই "রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন" গতিকে তাঁহাকে এই কর্ম্ম করিতে হয়।

ঈপ্সিত জ্ঞানানুশীলনের পথে এইরূপে নানা বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্রের জ্ঞানপিপাসু চিত্ত সহজেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তিনি শিক্ষাবিভাগের এই সকল নীরব অত্যাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু পরাধীনতার একটা গ্লানি আসিয়া বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বশরীরে এমন একটা জ্বালা উৎপাদন করিল যে তাহারই ফলে তাঁহার সমগ্র জীবন ভবিষ্যবংশীয়গণের মুক্তির সন্ধানে উৎসৃষ্ট হইয়াছে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের পর কলেজ খুলিলেই প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিয়া সেই যে test tubeকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন, তাঁহার জীবনের এই সপ্তত্রিতম বর্ষেও তিনি তাহার সহিত সম্বন্ধ অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন টেষ্ট টিউব হাতে করিলেই তাঁহার কর্ম্মশক্তি জাগিয়া উঠে, তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত হয়; তাঁহার কোন বাহ্য আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বিজ্ঞানাগারে টেষ্ট টিউবের সহিত আলাপে তিনি তাঁহার বার্দ্ধক্য ভুলিয়া যান। বাস্তবিক এইরূপ একনিষ্ঠ সাধন ভজনের ফলে তিনি টেষ্ট টিউবের ভিতর দিয়া যে ভাষা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার উন্মাদনায় ভারত ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে; যে কর্ম্মশক্তি তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন তাহার প্রেরণায় বাঙ্গালীর জড়ত্ব দূরে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার অনুপ্রেরণায় দেশের আবিলতা মুছিয়া যাইতেছে।

স্বীয় কর্ম্মে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া তিনি বিজন অরণ্যে পথহারা পথিকের ন্যায় স্বীয় গবেষণার পথে সঙ্গীর অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনেকে আসিল গেল, কেহ স্থায়ীভাবে গবেষণায় মনোনিবেশ করিল না। তাঁহার প্রচেষ্টায় গবেষকবৃত্তি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু গবেষণায় তৃষ্ণা জাগিল কি? ছাত্রেরা সুবিধা পাইলে বড় বড় চাকুরী লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। ছাত্রদিগের এই ব্যবহারে প্রফুল্লচন্দ্রের সরল চিত্ত ক্ষোভে উদ্বেল হইয়া উঠিল। একদিন তিনি সংবাদপত্রে দেখিলেন যে তাঁহারই এক প্রিয় ছাত্র যিনি গবেষণার জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়া তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করিতেছিলেন, আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র ক্ষোভে ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন "This is illegal This is illegal! He should not have done it—while receiving a research scholarship he should not have attended law class. All my labour of twenty years is gone for nothing in maiking Lawyers and Deputy-magistrates.

প্রফুল্লচন্দ্র নীরবে তাঁহার গবেষণার পথে অগ্রসর; শ্রান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, সমভাবে নীরবকর্ম্মী পথ বাহিয়া চলিয়াছেন আর কেবলই সঙ্গীর আশায় প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি কাতরভাবে সর্ব্বদাই ভগবানকে অন্তরের বেদনা জানাইয়াছেন,—"আমি মরি হে মুরারি দুখ নাই অন্তরে গো। কিন্তু কে আমার এই আরব্ধ কর্ম্মের স্রোত বহমান রাখিবে?" তাঁহার কাতর প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলিল। ১৯০৬ সালে স্রোতের গতি ফিরিতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত, বিমানবিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতী ছাত্র আসিয়া স্বীয় স্বীয় গবেষণায় আচার্য্যদেবের মুখোজ্জ্বল করিলেন এবং ইঁহাদের শক্তিতে ভারতীয় রাসায়নিক সঙ্ঘের সৃষ্টি হইল। বাঙ্গালীর গৌরবের দুইটী বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে বলিতে পারা যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্যগণ ভারতের প্রধান প্রধান রসায়নিক কেন্দ্র আয়ত্ত করিয়া স্বীয়

স্বীয় গবেষণার প্রভাবে ভারতের ও বাঙ্গলার মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত বহু বাঙ্গালী শিল্পী স্বীয় স্বীয় প্রতিভায় ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। ১৯১৭ সালে প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রাসায়নিক বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বিনা বেতনেই তিনি উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবারণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের মজ্জাগত ইতিহাসপ্রিয়তা স্বদেশানুরাগের প্রেরণায় রসায়নশাস্ত্রের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসকে অনেকে তাঁহার ভূতীয় কীর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, যদি একমাত্র ইতিহাস প্রণয়নই তাঁহার জীবনের মুখ্যকার্য্য হইত, তাহা হইলে এই ইতিহাসই তাঁহাকে চির-অমরত্ব প্রদান করিতে পারিত। সূচীভেদ্য অন্ধকারময় পর্ব্বতগুহার ভিতর হইতে তিনি যে পদ্মরাগ মণির আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে ভারতবাসীর নিকট চিরবরেণ্য করিয়া রাখিতে পারিত। ভারতবাসী রসায়ন বিজ্ঞানে আরব ও যুরোপীয়গণের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী—এই ধারণাই যুরোপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। আচার্য্যদেবের ইতিহাস-প্রকাশের ফলে এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া রসায়ন-বিজ্ঞানে ভারতীয়-গণের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

নব্যবঙ্গে শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কারখানা স্থাপনে প্রফুল্লচন্দ্রের কার্য্য তুলনাহীন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বাঙ্গালীর ব্যবসায়-জীবনে নূতন উদ্যমের সঞ্চার করিয়াছেন। হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিয়াছেন যে, জগতের বিভিন্ন প্রদেশে সভ্যতা বিস্তারের বহু পূর্ব্বে ভারতীয় মনীষিগণ স্বীয় স্বীয় গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ রসায়নশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। হিন্দুসভ্যতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ক্রমে ক্রমে অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বাধীনচিন্তা-বিবর্জ্জিত, অকর্ম্মণ্য ও জড় বলিয়া উপহসিত লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত হইতে থাকে। ব্যবসায় বাণিজ্যে, বিশেষতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠায়, বাঙ্গালী যে অকর্ম্মণ্য তাহা পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই 'রায়' দিয়াছিল। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যাবলী এই রায়ের বিরুদ্ধে কেবল আপীল। প্রফুল্লচন্দ্র এই কারখানা করিয়া সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে বাঙ্গালীজাতির যে সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গবাসী ভক্তিভরে তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ রাখিয়া পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া পূজা করিবে। স্বীয় আবিষ্কার হিন্দুরসায়নের ইতিহাস প্রণয়ন, গবেষকমণ্ডলীর সৃষ্টি ও বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার অধীত বিদ্যাকে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া বিদ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের এই সকল কার্য্যের অন্তরালে কত উদ্বেগ, কত বিনিদ্র রজনী, কত গোপন সাধনা কত স্বার্থত্যাগ নিহিত আছে, তাহা তাঁহার অন্তরতম বন্ধু ভিন্ন অন্যে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। হে নাম যশের অতীত আচার্য্যদেব, আমরা তোমাকে বলি তুমি চিরকাল

কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে।

প্রফুল্লচন্দ্রের জনসেবা ভারতের দুস্থ পীড়িত, বুভুক্ষু নরনারীর সম্মুখে জগন্মাতার ন্যায় নানা অভয় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের দয়াধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া বিবেকানন্দ প্রদর্শিত নরনারায়ণের সেবায় বার্দ্ধক্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস

জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে . . .
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।

তাঁহার জনসেবায় ইতর ভদ্র নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নাই। দুস্থ মানবমাত্রেই তাঁহার করুণার পাত্র।

কত সমস্যাসমাধানে তাঁহার চিন্তা ও কার্য্য পর্য্যবসিত তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পতিতের পতিতসমস্যা, অন্নহীনের অন্নসমস্যা, বিদ্যাহীনের শিক্ষাসমস্যা, গরীবের উৎপীড়নসমস্যা, দুর্ব্বলের স্বাস্থ্যসমস্যা,—বহু সমস্যা-সমাধানে তিনি জীবন-সায়াহ্নে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি

মহাত্মাজীকে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "প্রত্যেকেই স্বরাজলাভের প্রশস্ত পন্থার আশ্রয় লইতে চাহেন। কেহই কণ্টকাকীর্ণ আয়াসসাধ্য পথের অনুসরণ করিতে চাহে না।" উত্তরবঙ্গ প্লাবনে, খুলনা দুর্ভিক্ষে তাঁহার কার্য্য তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। দরিদ্র নারায়ণের সঙ্কট মোচনের জন্য তাঁহার সঙ্কটত্রাণ সমিতির সৃষ্টি। খদ্দর সম্বন্ধে তিনি প্রথমে অনুকুল মত পোষণ করিতেন না। কিন্তু বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই বুঝিতে পারিলেন যে ভারতের অর্থকষ্টের মুক্তি চরকায় নিহিত। যেই ধারণা অমনি কার্য্যতৎপরতা। মহাত্মাজীর পরই আচার্য্যদেবের স্থান। অর্থজগতে ভারতের অন্যান্য জাতি বাঙ্গালীকে সর্ব্বত্র কোণঠেসা করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালী বাস্তবিকই নিজ বাসভূমে পরবাসী' বাস করিতেছে। বাঙ্গালী অত্যধিক আতিথেয়তার লজ্জায় কাহাকেও কিছু বলিতে পারে না। আচার্য্যদেব এই ভুল ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালীকে সজাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর বাজারে দোকানদার মাড়োয়ারী, মোটবাহী উড়িয়া, নৌকার মাঝি পশ্চিমা, দারোয়ান হিন্দুস্থানী, মোটরচালক পাঞ্জাবী, মিস্ত্রী চীনা, ফেরীওয়ালা অবাঙ্গালী, মহাজন কাবুলীওয়ালা। এই চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বাঙ্গালীর কুত্রাপি প্রবেশের অধিকার নাই। আচার্য্যদেবের প্রচারের ফলে দিকে দিকে এই চক্ষুলজ্জার আবরণ উন্মোচন করার চেষ্টা চলিতেছে। অচিরে বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে।

আচার্য্যদেব স্বপ্নপ্রবণ ভাবুক মাত্র নহেন। ভাবুকতার সহিত সাংসারিক জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় মিলিত হইয়া তাঁহাকে একদিকে যেমন আদর্শবাদী করিয়াছে, অন্যদিকে তাঁহাকে খাটি কর্ম্মী করিয়া তুলিয়াছে। অনেক বচনবাগীশ শুধু বক্তৃতার জাল বুনিয়া দেশোদ্ধার করিয়া যায়। আচার্য্যদেব সকল কার্য্য অনাড়ম্বরে করিয়া যাইতেছেন। নিজের মনের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই। সর্ব্বদা "Plain living high thinking"এর দৃষ্টান্ত-স্থল হইয়া রহিয়াছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার একমাত্র জুড়ি তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু মনীষী শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়। দুই বন্ধু বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের Conference হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনাসভায় প্রাতঃস্মরণীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় যে সঙ্গীত রচনা করিয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে ছিল,

বাড়াতে আপন মান চাহনাক কেহ কখন,
তাই তোমাদের গুণ গাহিবারে চাহে মন।

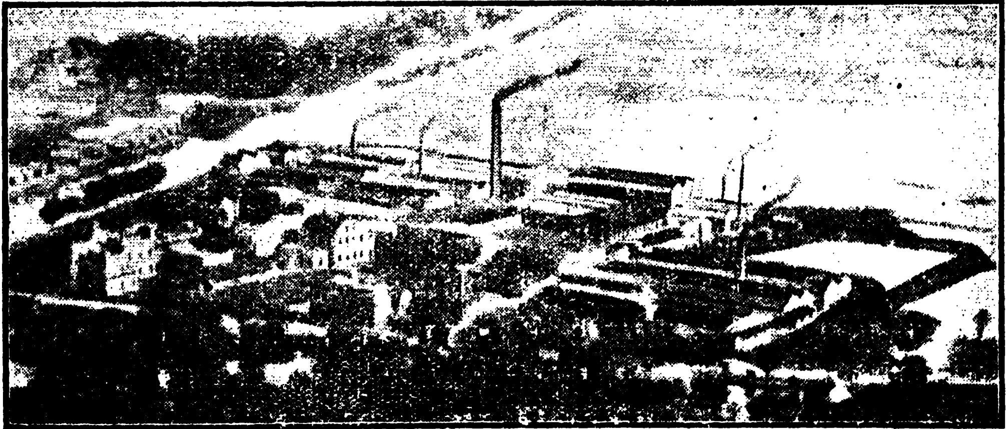
আচার্য্যদেব একজন আদর্শ গৃহস্থ; চিরকুমার, কিন্তু সাংসারিক জ্ঞানে তিনি বেশ পটু। যাকে বলে "True to the kindred points of heaven and home." এমন আদর্শ পৃথিবীতে বিরল। তাই প্রার্থনা "যাঁহারা মঙ্গলময় স্বরূপ এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের প্রত্যেক পরমাণু মধ্যে নিত্য দেদীপ্যমান, সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" সদাশিব ভূমা—সেই প্রাণময় কৃপাসিন্ধু ঈশ্বর আচার্য্যদেবকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন ও তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায় সাহিত্য-সরস্বতী

খুলনা জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত কপোতাক্ষী তীরে রাড়ুলী কাটিপাড়া নামক একটি গণ্ডগ্রামে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁহার পিতা। তিনি পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সাদী ও হাফিজে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। হরিশ্চন্দ্র সেকালের লোক হইলেও প্রাচীন কুসংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। খুলনা জেলায় ইংরাজী শিক্ষার

বিস্তারে তিনি একজন অগ্রদূত ছিলেন। তিনি স্বীয় বাসভবনে একটি আদর্শ মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালটি পরে আদর্শ উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এবং ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আচার্য্য রায়কে বাৎসরিক যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। তখনকার যুগে তিনি স্বীয় বাসভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলকে স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহিত করিবার জন্য স্বীয় পত্নী ও ভগিনীকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র British Indian Association নামক জমিদার সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। আচার্য্যদেবের জননী



উড়ো জাহাজ হইতে বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা

ভুবনমোহিনী দেবী অসামান্যা রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতি ও কোমল হৃদয় নিতান্ত পরকেও আপন করিয়া লইত। উপযুক্ত মাতা পিতার নিকট দীক্ষিত হইয়াই আচার্য্যদেব সর্ব্বস্ব দান করিয়া পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। মাতা পিতার সদ্‌গুণ আচার্য্যরায়ের অন্যান্য চারি ভ্রাতার হৃদয়েও অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হইয়াছে। ইনি পিতার ৩য় পুত্র।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র অন্যান্য ভ্রাতার সহিত পিতার প্রতিষ্ঠিত মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিলে পর পিতা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চান্সেলার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী আচার্য্যরায়ের সহপাঠী ছিলেন। আহারও পাঠসম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম ছিল না। অসংযমী প্রফুল্লচন্দ্র নিজের খেয়ালে যাহা পাইতেন তাহাই ভক্ষণ করিতেন এবং যতবার খুসি আহার করিতেন। পাঠের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শরীরের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের ফলে কিছুদিন পরে কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া দুইবৎসর যাবৎ ভুগিতে থাকেন। পাঠে ও ভোজন ব্যাপারে তাঁহার যে সংযম আজ সর্ব্বসাধারণের আদর্শ ও অনুকরণীয় হইয়াছে তাহা তাঁহার বাল্যজীবনের ঠেকিয়া শেখা রোগমুক্ত হওয়ার পর তাঁহাকে কলিকাতা এলবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে ইংরাজী ভাষার অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের সাহায্যে ও শিক্ষার গুণে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রের প্রগাঢ় আসক্তি জন্মে। দেশনায়ক সুবক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের সুযোগ লাভের আশায় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান (বিদ্যাসাগর) কলেজে এফ এ পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন। এই কলেজে অধ্যয়নকালে ডাঃ

প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হইয়া সুবিখ্যাত অধ্যাপক সারজন এলিয়ট ও সার আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার সাহেবের নিকট যথাক্রমে পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। আচার্য্যরায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হরিশ্চন্দ্রের ইচ্ছা ছিল পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া সেখানে উচ্চশিক্ষা দিবেন কিন্তু সাংসারিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আচার্য্যরায় পিতার মনোভাব পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Gilchrist বৃত্তিলাভ করেনও বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে বিলাত যাত্রা করেন। বাল্যকাল হইতে ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরক্তি থাকিলেও বিজ্ঞানচর্চ্চার উপর ভারতের স্থায়ী উন্নতি নির্ভর করিতেছে ভাবিয়া তিনি এডিনবরায় গিয়া রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি অতি শীঘ্র সেখানে একজন বিজ্ঞানানুরক্ত মেধাবী ছাত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়েন। Prof. James Walker F. R. S. যিনি এডিনবরার রসায়ন শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ স্থান (Chair of Chemistry) অধিকার করিয়াছেন এবং স্বর্গীয় Prof. Hugh Marshall F. R. S. যিনি ডাণ্ডি ইউনিভরাসিটি কলেজের রসায়ন বিদ্যার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহারা ইহার সহপাঠী ছিলেন। আচার্য্যরায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তথায় বি, এস সি ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি, এস সি ডিক্রিলাভ করেন। তিনি তথায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ছিল। ঐ প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি পঞ্চাশ পাউণ্ড মূল্যের Hope prize নামক সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ডি, এস সি উপাধি প্রাপ্তির পর ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে (Indian Education Service) কর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য তদানীন্তন ভারতসচিবের নিকট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কি কারণে তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তি ইহাতে প্রবেশাধিকার পাইলেন না তাহা ভারতসচিবই জানেন। যাহা হউক ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে (Provincial Education Service) প্রবেশ করেন ও ২৫০৲ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি গভীর মনোযোগের সহিত কলেজের Chemical Laboratoryতে কয়েক বৎসর যাবৎ গবেষণা করেন। গবেষণার ফল প্রকাশিত হইলে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত হন এবং বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ইউরোপের প্রসিদ্ধ কেমিকেল লেবোরেটারীসমূহ পরিদর্শন জন্য প্রেরণ করেন। ইউরোপের সর্ব্বত্র তিনি বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিয়া test tubeকে আদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন,—"বিজ্ঞানাগারই আমার শান্তি ও কর্ম্মের স্থল; সেখানে টেষ্ট টিউবের সহিত আলাপে আমি আমার বার্দ্ধক্য ভুলিয়া যাই। এক শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশকাল বিজ্ঞানাগারের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বাহ্য জগতের সহিত সকল সম্বন্ধচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি।" ইহারই নাম সাধনা—এবং এই সাধনায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। এই আজীবন সাধনার ফলে তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া বেঙ্গল কেমিক্যাল ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু-রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস সঙ্কলন সম্ভব হইয়াছে।

কলেজের ছাত্রগণ রসয়ানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন বটে, কিন্তু হাতে কলমে (practical) কোন কাজ কেহ করিতেন না। পরীক্ষা পাশের সাহায্য জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন তাহার অধিক কিছুই করিতেন না। অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিলেও মৌলিক গবেষণার জন্য কেহ অগ্রসর হইত না। চাকুরীর মোহ সকলকে দূরে সরাইয়া আনিয়াছিল। কিন্তু আচার্য্যের নিরুৎসাহ নাই—শ্রান্তি নাই—বিশ্রাম নাই—দুর্গম গিরি মরু কান্তার বাহিয়া চলিয়াছেন। ২০ বৎসরের সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফলে জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, যতীন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি কৃতী ছাত্র আসিয়া লেবোরেটারীর নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের মৌলিক গবেষণায় নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া বাঙ্গালীর মুখরক্ষা করিল। আচার্য্যদেবের ও তাঁহার শিষ্যবর্গের গবেষণার

কথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। আচার্য্যদেব ইউরোপীয় বিদ্বদ্‌গুলীর নিকট সম্মানিত এবং হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা বলিয়া তাঁহার যশ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। মিঃ পেড্‌লার (পরে সার পেড্‌লার) মিঃ ষ্টেপলটন, মিঃ কানিংহামের ন্যায় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কানিংহামের পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপকপদে উন্নীত হন এবং অবসর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে যে নিখিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় মহাসম্মেলন হয় তাহাতে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ও ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া লণ্ডন গমনপূর্ব্বক বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের যোগ্যতা দর্শনে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রকে ডি, এস্ সি ও ডাঃ সর্ব্বাধিকারীকে এল, এল ডি উপাধিভূষণে ভূষিত করেন। গবর্ণমেণ্টও এই সময়ে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রকে সি, আই, ই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরে দানবীর সার টি পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ২৫ লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করেন। এই অর্থ সাহায্যে বর্ত্তমান বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রকে অধ্যাপকের ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রায় কার্য্যগ্রহণে সম্মতি প্রদান করিলে বাঙ্গালা সরকারের অনুমতি লইয়া ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। আচার্য্যরায় এখনও ঐ পদে নিযুক্ত আছেন এবং নিজের বেতনের সমস্ত টাকা ঐ বিজ্ঞান কলেজের উন্নতিকল্পে ব্যয় জন্য কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। বিজ্ঞান কলেজে নিযুক্ত হইবার পর তাঁহার গবেষণার পুরস্কারস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি এস্ সি উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে বিজ্ঞানচর্চ্চা ও গবেষণায় সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চাও উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া "সাহিত্যে বিজ্ঞানের স্থান" নামক যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সাহিত্যানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন সুবিখ্যাত Indian World নামক বিখ্যাত পত্রিকায় আচার্য্যদেবের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রায়ই স্থান পাইত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পত্রিকায় পূর্ব্বে এবং এখনও মধ্যে মধ্যে তাঁহার যে দুই চারিটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হইত ও হয় তাহার তুলনা হয় না। বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেও ইংরাজী সাহিত্য ও অর্থনীতি ইতিহাস আলোচনা বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ অল্প ছিল না। লাটিন ও ফরাসী ভাষায় তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এস্ সি পরীক্ষা প্রদানের পরেই "India before and after the Mutiny" নামক যে সুচিন্তিত নানাতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর স্বদেশানুরাগ, ভারতের ইতিহাস এবং সাধারণ রাজনীতিমূলক বিষয়গুলির দ্বারা গভীর জ্ঞানের ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত মূল্যবান্ তথ্য অন্যত্র বড় একটা পাওয়া যায় না।

History of Hindu Chemistry (হিন্দুরসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস) তাঁহার অমর কীর্ত্তিস্তম্ভ। প্রাচীন ভারতের রসায়নশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা তিনি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক বর্ত্তমান জগতের সমক্ষে সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন হিন্দুরসায়নী বিদ্যা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আচার্য্য রায় তাঁহার বহুমুখী প্রতিভাবলে সমাজ, শিল্প, জাতীয় উন্নতি, জাতিগঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধের দ্বারা যে ভাবধারা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা দেশের ভবিষ্যৎ

যুবকসম্প্রদায়ের পক্ষে পথপ্রদর্শক হইয়াছে। 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার,' 'অন্নসমস্যা,' 'পাতিত্য-সমস্যা,' 'সমাজ-সংস্কার সমস্যা' 'অর্থনৈতিক সমস্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে, একই কথা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইলেও নবীনত্বের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাহার স্বভাবসুলভ সরল কথায় শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া যায়। কালের আবর্তনে দেশনেতাদের চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে চিন্তার ধারা ও আদর্শ লইয়া আচার্য্যদেব বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ যুবকবর্গের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আজিও সেই চিন্তার ধারা ও সেই আদর্শের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কি ভাবে বাঙ্গালীর ধন অবাঙ্গালীর গ্রাস হইতে রক্ষা করা যায় ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত গতিতে সমানভাবে চলিয়াছেন।

আচার্য্যদেব একজন প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক। বাঙ্গালী জাতি যে হীন অবস্থায় পতিত হইয়া পুরাতনের প্রতি একটা অযথা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছে ও আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা তিনি প্রাণের আবেগের সহিত পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালী জাতির নিকট জানাইয়াছেন। 'অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত সামাজিক প্রথা ও ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কালের চঞ্চল স্রোতে পার্থিব জগতে যেমন যুগযুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, মনোজগতেও যে তাদৃশ বিপ্লব স্বাভাবিক, ইহা অন্ধবিশ্বাস-চালিত হইয়া এ জাতি বুঝিতে পারে না।' কুল্লুক ভট্ট ও রঘুনন্দনের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শুনিয়াই যাহারা দেশে সেই প্রাচীন টোলের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করিতে চাহেন নূতনকে একেবারে তাড়াইয়া পুরাতনকে তাহার স্থানে আনিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সহিত তিনি কখনও একমত হইতে পারেন নাই। তাঁর ইচ্ছা নূতন ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালী জাতি নূতন ও পুরাতন উভয়ের সম্মেলনে গঠিত হউক। প্রকৃতপক্ষে অন্ধবিশ্বাস জাতীয় উন্নতির মূল হইতে পারে না। রঘুনন্দন ও কুল্লুক ভট্টের টীকা টীপ্পনী প্রভৃতির বিষয় জ্ঞান করিয়া যদি উহারই আদেশ অভ্রান্ত সত্য মানিয়া সেই অতীতপ্রায় কূট শিক্ষায় মনোনিবেশ আমাদের গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়, আর বর্ত্তমানের নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনা ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রাচীনের প্রচলন স্থির, ধীর ধর্ম্ম বলিয়া আদৃত হয় তাহা হইলে এ মৃতপ্রায় জাতি আর কতদিন বাঁচিতে সমর্থ হইবে বলিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমরা যে এখনও নীচে পড়িয়া আছি তাহার একটা কারণ, আত্ম-প্রবঞ্চনা ও ব্যবসাদারী। আমাদের দ্বিধা বিভক্ত জীবনের বাহিরের দৃশ্য যেমন সুন্দর ভিতরের দৃশ্য তেমনি কুৎসিত। বাহিরে—দেশোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার, বিধবা-বিবাহ, জাতিভেদরহিত, ছুঁৎমার্গ পরিহার, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রভৃতির আদর্শ লইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে আকাশ বাতাস কম্পিত করি,—আর ভিতরে—উত্তররাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ২৬ পর্য্যায়, গঙ্গাস্নানের পুণ্যফল, একাদশীতে নিরম্বু উপবাস ইত্যাদি অযৌক্তিক কপটাচারের প্রশ্রয় দিই।" বাস্তবিকপক্ষে আমরা পূর্ব্বে সমাজসংস্কার বিষয়ে যে অবহেলা করিয়াছি এখন তাহার বিষময় ফলভোগ করিতেছি। ইহার জন্য রাজনৈতিক উন্নতির পথে আমরা বাধা পাইতেছি। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখে বলিয়াছেন,—আমরা সমাজে যে অন্যায়কে আটে ঘাটে, বিধি বিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী ক'রে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যের হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে তখন সেটা সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে আপত্তি করার জোর আমাদের কোথায়?" নিজেদের মধ্যে অনৈক্য থাকিলে আমাদের পতন অনিবার্য্য। নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও আমাদের ভাই, তাহাদের বর্ত্তমান হীন অবস্থা হইতে উন্নতির পথে তুলিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত। দেশের প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীর সমান মনুষ্যত্ব অস্বীকার আমাদের হীনতার একটি প্রধান কারণ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



১ম বর্ষ — ১১শ সংখ্যা | ভাদ্র | ১৩৩৯

যোগাসনে অরবিন্দ

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

উত্তর মেরু রাঙা করিয়া উদিত হইয়াছে প্রলয়ের অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু। চারিদিকের জলরাশি তোলপাড় করিয়া ফেনাইয়া উঠিয়াছে, সপ্তসিন্ধুর তরঙ্গরাজি, মাঝখানে স্তব্ধ আশঙ্কায় মূক হইয়া রহিয়াছে এই সর্ব্বংসহা মাটি। না জানি কি অঘটন ঘটিবে, এত দিনের ভাগ্যচক্র বুঝি বিপরীত দিকে পালটিয়া যাইবে, পূর্ব্বের সূর্য্য তার প্রোজ্জ্বল রথগতি ফিরাইয়া পশ্চিমে উদিবে, সার্দ্ধ তিন হস্ত বামনরূপী মানুষ বুঝি নিদ্রাতুর বিধাতার সৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইবে।

পুরাতনের জগদ্দল পাথর টলিয়াছে, স্বর্গমর্ত্ত্য দশ দিক কাঁপাইয়া এত দিনের তুষার-জাঙাল ভাঙিয়াছে, এখন আসিবে বন্যা—এখন বহিবে হিমগিরি বিগলিত রজতশুভ্র নব অলকনন্দা। তাহারই কাল বৈশাখীর ঘনঘটা, তাহারই এ ভূমিকম্প, সেই নবযুগের পিণাকীরই এই সৃষ্টিকাঁপানো প্রলয় নৃত্য। তাই বুঝি দুঃখ আসিয়াছে সুখ বুকে, মৃত্যু আসিয়াছে অমৃতের সাজে, পরাজয় আসিয়াছে সিদ্ধির আশীষ লইয়া।

এই ধূমকেতু-আলোকিত তরঙ্গমথিত শঙ্কাস্তব্ধ ধরিত্রীর মাঝখানে কে তুমি মৌন পুরুষ? শান্ত নীল আকাশের মত জগতের সকল ত্রিতাপ দুঃখ জুড়াইয়া কে তুমি আশার অতীত? মাথার কেশে তোমার কোন্ নবভানুর স্বর্ণজ্যোতি, ধ্যাননিমীলিত নয়নে তোমার ত্রিকালভেদী দৃষ্টি, অবিচলিত আসন ঘিরিয়া তোমার জগতের বিস্ময়মুগ্ধ জনস্রোত!

সব টলিয়াছে, তুমি টলো নাই; সব কিছু ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে, তুমি কর্ম্মচ্যুত হও নাই; ইহাদের মুখর অবান্তর কলকোলাহলের মাঝে তুমিই শুধু নীরব রহিতে জানো; কামনার ঘূর্ণমান কুলালচক্রের মাঝে নেমীদণ্ড হইয়া তুমিই শুধু শিখিয়াছ সে গতিকে অনিবার্য্য উদ্‌ভ্রান্তি হইতে ধরিয়া রাখিতে। তুমিই লালসা-বিতাড়িত মানুষকে দেখাইয়াছ বাসুকীর ফণার বসুন্ধরা-ধারণ শক্তি, কোটি সৌরজগৎ গ্রাসকারী আতত দিবির মহিমা। তোমাকে আজ নমস্কার।

পাশ্চাত্যের পঙ্কিল প্রমত্ত কর্ম্মস্রোত আর প্রাচ্যের তামস মৃত্যুর মাঝে স্বর্ণসেতু হইয়া এ দুইকে তুমিই বাঁধিয়াছ এক নূতন ছন্দে; অসুরবিজিত স্বর্গ ও মোহ উদ্‌ভ্রান্ত মর্ত্ত্যের মাঝে তুমিই রচিয়াছ আশার তারকাখচিত জ্যোতির্ব্বর্ত্ম্য। তুমিই সাধিয়া ও জীবনে ফলাইয়া দেখাইতেছ কোথায় দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র হয় বিরাট, দীন হয় মহান, বিভ্রান্ত হয় স্থির, সন্তপ্ত হয় সুখী। তুমি যে অচলের ও তুরীয়ের প্রতীক, সে আছে বলিয়াই নগ্ন প্রকৃতির শ্মশান-নৃত্যে জগৎ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। তোমাকে আজ নমস্কার!

Sri Aurobindo

Mahakali is of another nature. Not wideness but height, not wisdom but force and strength are her peculiar power. There is in her an overwhelming intensity, a mighty passion of force to achieve, a divine violence rushing to shatter every limit and obstacle. All her divinity leaps out in a splendour of tempestuous action ; she is there for swiftness, for the immediately effective process, the rapid and direct stroke, the frontal assault that carries everything before it. Terrible is her face to the Asura, dangerous and ruthless her mood against the haters of the Divine ; for she is the Warrior of the Worlds who never shrinks from the battle. Intolerant of imperfection, she deals roughly with all in man that is unwilling and she is severe to all that is obstinately ignorant and obscure ; her wrath is immediate and dire against treachery and falsehood and malignity, ill-will is smitten at once by her scourge. The impulses that are swift and straight aud frank, the movements that are unreserved and absolute, the aspiration that mounts in flame are Mahakali's.

কালী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মাগো তুঙ্গ আসনা ! ঝঞ্ঝা সাধনা !
এসোলো অট্ট-হাসিয়া ;
গৃহ- তৃপ্তি কৃপণ কর মা দলন
উদার ধ্বংস গাহিয়া ।

দূরি' ছায়া মাধুর্য্য
বহ্নি তূর্য্য
বাজাও কুহেলি কাননে ;
আজি ধূলি আবর্ত্ত
ছাইল মর্ত্ত্য
এসো দুর্ব্বার প্লাবনে ;
যত বাসনা ভ্রান্তি
লভুক শান্তি
মরীচিকা যাক্ ভাসিয়া,
এসো ভ্রংশি' ধ্বান্ত
গতি অশান্ত
গর্জ্জে চিত্ত ত্রাসিয়া ।

যত যুগসঞ্চিত
বাধা-নন্দিত
অম্বর দ্রোহী বাহিনী
হোক্ কৃপাণ দণ্ডে
লক্ষ খণ্ডে
লুণ্ঠিতা হাহাকারিণী
এসো বিদ্যুল্লতা
বজ্র-বারতা
বিছাও দৈত্য নাশিয়া
এসো বিপ্লবময়ী !
বিপ্লবজয়ী
তাণ্ডব তালে নাচিয়া ।



"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"

প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝ্‌লুম,—ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য ক'বে চেয়েছেন, সত্য ক'বে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যাব চাওয়া ও পাওযাব দ্বাবা তাঁব সত্তা ওতপ্রোত। আমাব মন বল্‌লে, ইনি এঁব অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বাল্‌বেন। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হ'লো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খব-দস্তব মতেব উপদেবতাব নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব্ব কবেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জল আভা। মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে বিক্ত শুষ্ক করাকেই চবিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহেব এই বাণী অনুভব কবেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেব বিশন্তি। আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদেব মধ্যে বেবিয়ে আস্‌বেন এই অপেক্ষায় থাক্‌বো। সেই বাণীতে ভারতেব নিমন্ত্রণ বাজবে—শৃন্বন্তু বিশ্বে।

অরবিন্দকে তাঁর যৌবনেব মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনেব মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অববিন্দ, ববীন্দ্রেব লহ নমস্কাব।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যাব আসনে অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায, আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—

অববিন্দ, ববীন্দ্রেব লহ নমস্কাব।

রবীন্দ্রনাথ

সুভাষিত

ব্যক্তির অহঙ্কারকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে নিমগ্ন হইতে হইবে নিখিল সত্তায়। চৈতন্যে ও সত্তায়, শক্তিতে ও প্রেমে আমাদের হইতে হইবে বিশ্বমুখী। সেই পরম-লক্ষ্যের পথ হইতে সাধকের আর পশ্চাদ্বর্ত্তন করিবার উপায় নাই। পিছুপানে প্রতিটি পদক্ষেপ দুঃখের দিকেই আগাইয়া চলিবে। কিন্তু এই বিশ্বচৈতন্য লাভ করিতে হইলে সংসারের বাহিরে, নিরালায় যাইবার দরকার নাই। তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে এই সংসারেই, মানুষেরই ন্যায় কর্ম্ম করিয়া—গীতার নির্দ্দিষ্ট পথে।

* * *

আমাদের ইষ্টসাধনাতেও আমরা ব্যষ্টিকে অতিক্রম করিয়া পাইতে চাই সমষ্টিকে। চাই না—ব্যক্তিগত মুক্তি, চাই এমন মুক্তি, এমন শক্তি আর এমন আনন্দ যাহা আমরা বিশ্বের সাথে বণ্টন করিয়া ভোগ করিতে পারি, নিখিলের সঙ্গে একযোগে ভোগ করিবার জন্যই যাহাকে আমরা বাঞ্ছা করি। এই সৃষ্টিলীলা ও তার অন্তর্গূঢ় ভাগবত প্রয়োজনকেই যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে কি আসিয়া যায় বন্ধন ও মুক্তিতে ?...বিশ্বের ভার দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া সকলে যদি নিজের নিজের ভার লইয়াই ব্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে মুক্তি হইত অনায়াসলব্ধ।

* * *

সন্ন্যাসীর ন্যায় দারিদ্র্যের অন্ধপূজা, কিংবা বিষয়ী লোকের ঐশ্বর্য্য-সর্ব্বস্বতা—এ দুইটির কোনটিই শ্রেয় নহে। অর্থও ব্রহ্মের প্রতীকবিশেষ,—বীজগণিতের সঙ্কেতের মত—সমাজে ভাবগত শক্তির একটা বিশিষ্ট প্রকাশ বা রূপ। ইহাকে তুচ্ছ করাও নহে, আবার সর্ব্বস্ব করাও নহে। প্রয়োজন হইলে ইহাকে গ্রহণ করিতে হয়, না পাইলে অর্জ্জন করিতে হয়,—অবশ্য ভগবানের যদি তেমন ইচ্ছা থাকে।

* * *

খ্রীষ্টের প্রেমে নিমগ্ন মেরী যখন সংসারে বিরক্ত উদাসীন হইয়া পড়িলেন, তখন মার্থার অভিযোগের উত্তরে খ্রীষ্ট হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "মার্থা, তুমি অনেক ব্যাপারে মাথা ঘামাও, মেরীর মন পড়িয়াছে পরম বস্তুতে।" নানা ব্যাপারে মাথা ঘামাইও না, সেই শ্রেষ্ঠ বস্তুতে একাগ্র হও—জীবনের সকল কাজে, সকল ব্যাপারে নিরহঙ্কার হইয়া ভাগবদনুভূতি লাভ কর,—কার্য্য ত্যাগ করিয়া নহে, নির্জ্জনে ভজনা করিয়াও নহে, দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকোলাহলকেই সোপান করিয়া আত্মোৎকর্ষ লাভ কর।*

---

* শ্রীঅরবিন্দের একখানি অপ্রকাশিত পত্রের খণ্ডানুবাদ। সম্পাদক

কোথায় অরবিন্দ ?

"—তিনি আজ তাঁহার স্বদেশের কোথাও নাই। নাই রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে। নাই সাহিত্যে শিক্ষায়। বন্যায় দেশ যায়;—নাই অরবিন্দ! রচিত হইতে যাইতেছে নবরাষ্ট্র, সেখানেও দেখি না শ্রীঅরবিন্দকে! অরবিন্দ আছেন ? না, তিনি জীবন্মৃত কিংবা তাঁহার অস্তিত্বের একটা গূঢ়তম মহনীয়তা রহিয়াছে! এই নীরবতার সার্থকতা কি ? অরবিন্দের তপস্যা ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির কোন কল্যাণ সাধনে তৎপর কিনা, কোন প্রশ্নই তুলি নাই। কিন্তু আর নহে। বর্ত্তমান যুগের মুখর ঔদ্ধত্যের মাঝখানে শ্রীঅরবিন্দের নিশ্চলতাকে একপাশে সরাইয়া রাখিলে আর চলে না।

কত কাজ, কত উদগ্র অনুষ্ঠান! ধী বিভাসিত, মণীষা সম্প্রসারিত, অন্তঃকরণ সুবিশাল! ত্যাগ এবং শক্তি অপরিমেয়। অরবিন্দ তবু নাই! ভোগী নহেন, রাজানুগৃহীত নহেন, পরবাসী নহেন, রোগী অসমর্থও নহেন, অথচ জাতির কোনখানেই আজ অরবিন্দ নাই! ইহা একান্ত ভাবেই অধ্যয়নের, গবেষণার এবং অনুসন্ধানের বিষয়। এই অন্তর্গূঢ় গোপনাঙ্ক অধ্যয়ন করিবার প্রচেষ্টার মাঝেই হয়ত আমাদের সর্ব্বসাফল্য এবং শক্তিলাভের সর্ব্ব উপাদান নিহিত রহিয়াছে।"

—বলাই দেবশর্ম্মা।

Sri Aurobindo.

The delight of victory is sometimes less than the attraction of struggle and suffering; nevertheless, the laurel and not the cross should be the aim of the conquering human soul.

God and Nature are like a boy and a girl at play and in love. They hide and run from each other when glimpsed, so that they may be sought after and chased and captured.

We may seek after him passionately and pursue the unseen beloved; but the lover whom we think not of, may pursue us, may come upon us in the midst of the world and seize on us for his own whether at first we will or no. Even he may come to us at first as an enemy with the wrath of love, and our earliest relations with him may be those of battle and struggle.

শ্রীদিলীপকুমার রায় অনূদিত

জয়ের দীপ্র পুলক তীব্র
ছাড়ি' হৃদি চির-দিগ্বিজয়ী
কভু তারি পাকে পড়ে,—যেথা ডাকে
দ্বন্দ্ব বেদনা কুহকময়ী ;
তবু বাঞ্ছিত নহে লাঞ্ছিত
তপ্ত জীবন দুঃখ-শিখা :
বিঘ্নবিনাশী পরাণ দুরাশী
পরিবে পরিবে বিজয়-টীকা।

লীলাময় ধাতা লীলাময়ী এই প্রকৃতি দুজনে
লুকোচুরি যেন খেলে
প্রেমিক-যুগল—কিশোর-কিশোরী সাধে,
এ উহারে খুঁজে, দুজনার দেখা হয় ক্ষণে ক্ষণে
পলায় এ—ওরে ফেলে
শেষে দোঁহে দোঁহা ছুটি' বাহুপাশে বাঁধে।

'শুভদৃষ্টি

অলখ বল্লভে তার
পান্থ বার বার
খুঁজে কভু আকণ্ঠ তৃষায়…
যারে নাহি চেনে…তারি…
তারি নিরুদ্দেশ-যাত্রা-পথে বাহিরায়।
কভু বা অচেনা প্রিয় একান্ত বিজনে
আনমনা পথিকের পিছু লয় গোপন চরণে ;
লক্ষ নর্ম্ম কর্ম্ম মাঝে তার
প্রবল দুর্ব্বার
ঝঞ্ঝাস্বনে সে অতিথি অকস্মাৎ উড়ি' আসি' হায়,
ছিন্ন বল্লরীর সম ছিনিয়া তাহারে ল'য়ে যায়
তার চির-আপন বলিযা :
ত্রস্ত হিয়া
সে-প্রথম বাসরের সন্ধিলগ্নে কান্ত গোধূলিতে
সুনিভৃতে
অনাহূত হৃদয়েশে চিনিতে নাহিও যদি পারে
চির সখা তবু নাহি ছেড়ে যায় তারে।
অরিরূপী আসে অরিন্দম…
প্রেমের স্ফুরিত রোষে পথ কাটি' লয় সে নির্ম্মম :
দোঁহার প্রথম শুভদৃষ্টি-পরিচয়
বিমথতা…দ্বন্দ্ব…বেদনার মাঝে হয়।



শ্রীঅরবিন্দের বাণী

"এই ভারতবাসীই সব বিশ্বাস করিতে পারে, সব দুঃসাহস করিতে পারে, সব বলি দিয়া দিতে পারে। সুতরাং সকলের আগে হও ভারতবাসী। তোমার পিতৃপুরুষের সম্পদ উদ্ধার কর। উদ্ধার কর আর্য্যের চিন্তা, আর্য্যের সাধনা, আর্য্যের স্বভাব, আর্য্যের জীবন-ধারা। উদ্ধার কর বেদান্ত, গীতা, যোগ দীক্ষা। এ সকল শুধু মস্তিষ্ক দিয়া, ভাবাবেগ দিয়া ফিরিয়া পাইলে চলিবে না, জাগ্রত জীবনে উহাদিগকে ফলাইয়া ধরিতে হইবে!"

* * * *

"অন্তরাত্মার যে শক্তি তাহাই অসীম অনন্ত—বাহিরের সাম্রাজ্য যদি ফিরিয়া পাইতে চাও, তবে আগে অন্তরের স্বরাজ ফিরিয়া পাও; মায়ের আসন এইখানে।"

* * * *

"নিজের ভিতরে শক্তির উৎস উদ্ধার করিয়া আন—তবে আর সব জিনিষই তোমরা অবলীলাক্রমে ফিরিয়া পাইবে সামাজিক স্বাস্থ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, বিশ্ব-চিন্তার নায়কত্ব, ভূমণ্ডলের রাজচক্রবর্ত্তীত্ব।"

* * * *

"ইউরোপের Philosophy হইতে আমাদের "জ্ঞান" অনেক বড়। **প্রাচীনেরা যাহাকে বলিতেন দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক চক্ষে** প্রত্যক্ষ করা, তাহারই বলে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান তাহাই 'জ্ঞান' আর **শক্তি অর্থও ইউরোপের Strength নয়** যে বিশ্বশক্তি গ্রহনক্ষত্র চালাইয়া লইয়াছে তাহা **যখন একটা নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া ব্যষ্টিভাবে** দেখা দিয়াছে তখনই তাহাকে বলি শক্তি।" ভারত উঠিতেছে, **কিন্তু ভারতের ভিতর দিয়া প্রাচ্যের জয় হইবে।** তাই রাষ্ট্রীয় নেতার পশ্চাতে দাঁড়াইবে বা **তাঁহারই মধ্যে আবির্ভূত হইবে সিদ্ধযোগী।** একই আধারে শিবাজীর সহিত রামদাসকেও জন্ম লইতে হইবে, **কাভূরের সহিত ম্যাট্‌সিনিকেও মিশিয়া** যাইতে হইবে। আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি, শুদ্ধি হইতে **বিচ্ছিন্ন বল, ইউরোপীয় বিপ্লবের সহায় হইতে** পারে কিন্তু ইউরোপের বলে চলিলে আমাদের জয় হইবে না।"

*　　*　　*　　*

"নিজের সহিত নিজের আদান প্রদান ছাড়া, নিজের ভিতরের আলোক **ছাড়া জ্ঞান আসিবে না এমন কি, বাহিরের** কাজে সফলতার জন্য দরকার যে পথ-নির্দ্দেশের জ্ঞান সে জ্ঞানও নয়। **এই শিক্ষাটুকু আমাদের ততদিন না** হইবে ততদিন নীচের অল্প জ্ঞানের আলোকে যে পথেই **যতটুকু চলি না কেন, তাহা ব্যর্থ হইবেই।"**

*　　*　　*　　*

"দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা শেষ হওয়া ত দূরের **কথা, লোকে তাহার মর্ম্ম এখনও গ্রহণ** করিতে পারে নাই। বিবেকানন্দ যাহা **পাইয়াছিলেন,** যাহা বিকশিত করিয়া তুলিতে **চাহিয়াছিলেন, সে জিনিস এখনও** বাস্তবে মূর্ত্তি লয় নাই। **ভবিষ্যতের যে সত্য বিজয় গোস্বামী নিজের মধ্যে লুকাইয়া** রাখিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার **শিষ্যদের কাছে নিঃশেষে ব্যক্ত হইয়া যায় নাই। যে দিব্য জ্ঞান দেখা দিতে চলিয়াছে** তাহা কিন্তু তেমন গোপন নয়, যে শক্তির **আবির্ভাব হইতেছে তাহা আরও বাস্তব, আরও শরীরী কিন্তু** সে বস্তু কোথায় আসিবে, কবে আসিবে—কে বলিতে পারে?*

আর্য্যজাতির উদার বীর যুগে এত হাঁক ডাক, নাচানাচি ছিল না। **কিন্তু যে চেষ্টা আয়ত্ত করত তারা, তা' বহু শতাব্দী** ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।......

*　　*　　*　　*

"লাখ লাখ শিষ্য চাই না, এক শ' ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পূরো মানুষ ভগবানের **যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট।...এইরূপ মানুষই** এই দেশকে তুলবে।"

*　　*　　*　　*

যেদিন জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাবের সামঞ্জস্যে ও একীকরণে আত্মগত ঐক্য **দেখা দিবে সমষ্টিগত বিরাট পুরুষের ইচ্ছাশক্তির** প্রেরণায়, সেদিন জগন্নাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির **হইয়া দশদিক আলোকিত করিবে। সত্যযুগ নামিবে** পৃথিবীর বক্ষে, মর্ত্ত্য মানুষের পৃথিবী হইবে দেবতার **খেলার শিবির, ভগবানের মন্দির নগরী Temple City of God**—আনন্দপুরী।

---

* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের অনূদিত শ্রীঅরবিন্দের "কর্ম্মযোগীর আদর্শ" হইতে সংগৃহীত।

আমন্ত্রণ *

[শ্রীঅরবিন্দের Iuvitationএর অনুসরণে]

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পাহাড়ে পাথারে মরুভূবক্ষে,
ঝড় দুর্য্যোগ ভেদি' দু'পক্ষে,
একেলা চলেছি যাত্রী,
ওরে, কে চড়িবি আয় তুঙ্গ শিখরে,
ঝাঁপিবি তুফানে, দলিবি তুষারে,
মথিবি তিমির রাত্রি!

মোর তরে নহে নগরীর নীড়
বদ্ধ দুয়ার আগল প্রাচীর
আমি সে পথের পান্থ;—
শিরে মোর ছত্র বিরাট আকাশ,
নীল মহিমায় করে যথা বাস,
দেবতা সে নীলকান্ত!

বাদ মোর সনে ঝড় ঝন্‌ঝার,
মরণ দোসর নর্ম্ম-সভার
আমি বিজনে পেতেছি তক্ত;
স্বাধীনতা আমি, দিব্য গর্ব্ব,
শৈলেশ-শির করেছি খর্ব্ব—
বজ্র? সে মোর ভক্ত!

ওরে, বরিবি কে যদি জীবনে মুক্তি,
বিরাটের মাঝে লভিবি ভুক্তি,
বাধা বন্ধুর লঙ্ঘি';
রিক্তের বেশে ভীষণে ভেটিবি
তবে রাজটীকা ভালেতে পরিবি
তবে হবি মোর সঙ্গী!

---

* এই কবিতাটি ইঙ্গিতের প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়। ইহার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার একটা বিশেষ অবস্থার পরিচয় আছে, তাই অরবিন্দ প্রসঙ্গে ইহার পুনরুক্তি করিলাম।

অশেষের কথা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

ভগবান অনন্ত অনির্ব্বচনীয়—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম; তাঁহার লীলাও অসীম, বিপুল অদৃশ্য—অনন্ত উদ্দেশ্য নীতি শক্তিজ্ঞান সৌন্দর্য্য সরসতায় তাহা বিধৃত। আবার তিনি নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং, তিনি অপানিনাদো-জবনোগ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষু স শৃনোত্যবর্গঃ। তাঁহাকে ধরিতে গিয়া মানুষ কবি হইয়াছে—অনন্ত সৌন্দর্য্যনীতির ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছে। কেহ হইয়াছে যুক্তিতর্কের ক্ষুরধার যন্ত্রবিশেষ, কেহ কৌপীনবন্তং খলুভাগ্যমন্তং; আবার কেহ প্রেমে ভক্তিতে ঢলঢল-বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্রই অসাধারণত্বের মানবীয় লাঞ্ছনা—মানুষের এক একটী দিকের, প্রতিভার এক একটা ধারার চরম অভিব্যক্তি-পরাকাষ্ঠা; এবং তাহার বৈদগ্ধ্যে আংশিক মানুষটী ফুটাইয়া তুলিয়াছে আত্মস্বরূপের বিশেষ ভঙ্গিমাটী; দাঁড় করিয়াছে মতের পথের ছাঁটাকাটা, ধারাবদ্ধ ভাবের আকার ইঙ্গিত।

সেই অনোরণীয়ান মহতোমহীয়ানের, সেই সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং, সেই অব্যর্থ অনাহত অঘট-ঘটনপটীয়সী শক্তির হদিস্ পাইতে হইলে, জীবনে তাহাকে অবিকৃত অক্ষুণ্ণরূপে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতে হইলে, শুধু বাহিরে বাহিরে বুদ্ধির বিকাশ আনুগত্য সাধন করিয়া যুক্তিতর্কের কসরত পাঁয়তারা দেখাইলেই সার্থকতা মিলিবে না; অথবা কবিত্বের উচ্ছ্বাসময় পরিণতিলাভ করিয়াও সে উদ্দেশ্যের বিশেষ কোন সিদ্ধি আসিবে না। আবার অন্তরঙ্গের কোন একটা শক্তির আত্যন্তিক বিকাশ সাধন করিয়া দার্শনিক নীট্‌শে কথিত যে অতি-মানবতার পদবীলাভ করা যায়—তদ্দ্বারাও ইহার কোন মহত্ত্বলাভ হইবে না।

ইহার পথ নীট্‌শের রাজসিক অহঙ্কারের, দম্ভের—দানবীয় শক্তির অনুশীলনের মধ্যে নাই। ইহার পথ আছে ত্যাগে—মানুষের সর্ব্বস্ব ত্যাগের মধ্যে; আছে মানুষের সমগ্র আধারটীকে সেই মহান আস্পৃহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে। আধারের শুধু বিশেষ অংশকে নয়—শুধু বুদ্ধি চিত্ত বা প্রাণকে নয়—সম্পূর্ণ আধারটীর যে বিভিন্ন বৃত্তি, প্রেরণা বা কর্ম্মসচিবগুলি তাহাদের সঙ্কীর্ণ ও হিসাবকরা সেবা দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে অহমিকার এক বিরাট সাম্রাজ্য, বাঁচাইয়া চলিয়াছে জীবনের এক অনুদার অবনত আদর্শকে, তাহাদের প্রত্যেকের অথবা সকলের সমবেত ধর্ম্ম অভিপ্রায়কে ছাড়িয়া দিতে হইবে উচ্চতর আস্পৃহা উচ্চতর আদর্শের হস্তে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—

There must be a total and sincere surrender; There must be an exclusive self-opening to the Divine Power.........The Surrender must be total and seize all the parts of the being......... There must be in no part of the being, even the most external, anything that makes a reserve, anything that hides behind doubts, confusions and subterfuges, anything that revolts and refuses.

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডারউইন (Darwin) জগতের ক্রমোন্নতির মূলে যে বিবর্ত্তনবাদের কথা বলিলেন, যে বিবর্ত্তনবাদের তথ্য স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে ভারতের দর্শন পুরাণ ভিন্নতররূপে প্রচার করিয়াছিলেন—বিজ্ঞান বিজৃম্ভিতানি—আধুনিক বিজ্ঞান তাঁহাকেই প্রাধান্য ও অনুসরণ করিয়া স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে চাহিতে-ছেন যে, জগতের প্রত্যেক অনুতে (atom) প্রতিকোষে (cell) একটা সচেতন বুদ্ধি, একটা ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া করিতেছে। এই মতানুসারে, সেই সচেতন শক্তি জড় হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে পশু—এইভাবে ক্রমান্বয়ে ক্রম বিকাশ সাধন করিয়া, পশ্বাবস্থা হইতে বাঘ ও বানর ভাবের ক্ষয়সাধন করিয়া মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে; উচ্চ বুদ্ধি ও নৈতিক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষের পদবীলাভ

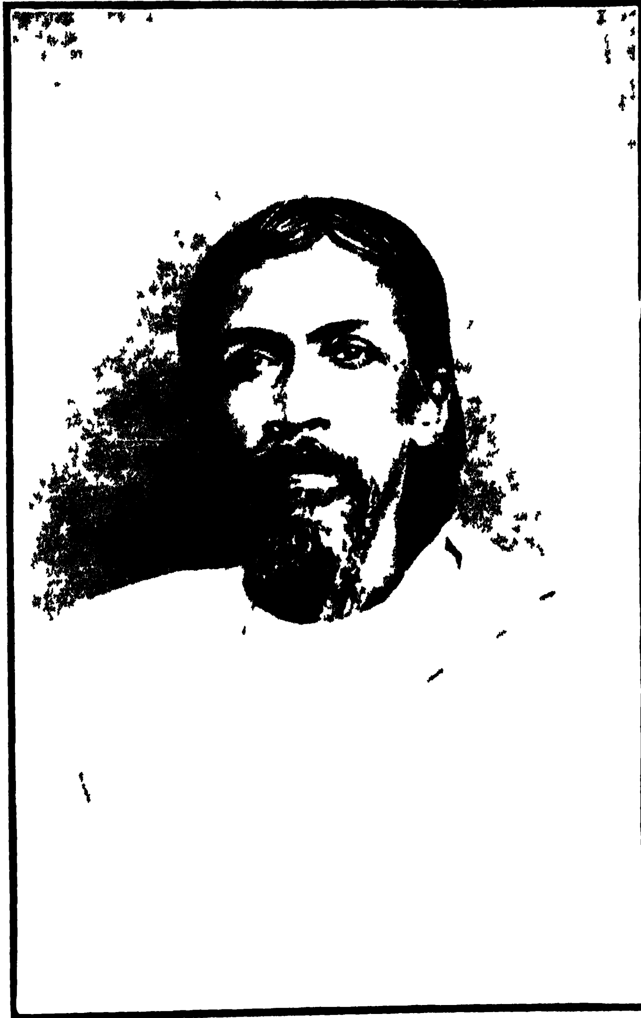
করিয়াছে। কিন্তু সে ক্রমোন্নতি প্রকৃতির ক্ষমতাধীন—প্রকৃতির ধর্ম্ম ও জ্ঞান সাপেক্ষ।

বিজ্ঞানের এই অস্পষ্ট এবং ক্রমবর্ত্তী সত্যকে শ্রীঅরবিন্দ দিলেন সুমহত্তর সম্ভবনা। মানুষকে দিলেন সেই অনোরনীয়নে মহতোমহীয়ান চৈতন্যের, সেই সর্ব্বগত অথচ সার্ব্বাতীত চেতনাময় সত্তর দিব্য অংশীদারত্ব, দিব্য জয়শ্রী—তাহা সাধনের অনাবিল বিশ্বাস, নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধা—পারগতার অপূর্ব্ব অক্ষুণ্ণ সিদ্ধ ওজস্। অনেক সময় দেখা যায় কেন রাসায়নিক দ্রব্যে (chemical solution) অন্যান্য বহু উপাদানের সমাবেশ করাইয়াও কোনরূপে দানা (crystal) বাঁধিতেছে না। কিন্তু যেমনি একজন বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদ তাহাতে একটা অপূর্ব্ব বস্তুর সংযোগ ঘটাইলেন, অমনি অতিদ্রুত দানা বাঁধিয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দ, মানবাধারের নানাভাবে অপূর্ণ, নিম্ন চেতনার মধ্যে পরা চেতনার (divine consciousness) অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ঘটাইয়া তাহাকে উৎকট পথানুসরণ, দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিচক্রের কবল হইতে দিলেন মুক্তি। মানুষমাত্রকেই দিলেন দেবজন্মের অধিকার, নবজন্মে দীক্ষা—To open ourselves to the Universal Sakti is possible to every one of us. সঙ্গে সঙ্গে জড় অণু, তদূর্দ্ধে—সকল অনুন্নত অপূর্ণ সৃষ্টি, সকল অচেতন, অর্দ্ধচেতন তামসিক সৃষ্ট-বস্তুলাভ করিল অখণ্ড সজীবতা—ক্রমোন্নতিতে অভিনব দ্রুততা বিরাটতর দ্যোতনা। মানুষ পাইল আত্মস্বরূপের বৃহত্তর যোগসূত্র—বিপুলতর সার্থকতা। মানুষ বুঝিল যে, মানবীয় চৈতন্য ফুটিয়া এবং দিব্য চৈতন্যের ভাবে রূপান্তরিত হইতে হইতে যখন হয় পরিণত ভাগবত চৈতন্যে, তখনই মানুষের আসে দিব্যজন্ম। এইটাই চৈতন্যের উর্দ্ধগতি—এই প্রেরণা বা যোগপ্রক্রিয়ার চরমাবস্থায় ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে মানুষের স্বাতন্ত্র্য-বোধ—অহংচেতনার নির্ব্বাণ হয়। সত্তা তাহার ব্যক্তিত্বকে এক অসীম বিশ্বব্যাপী সত্তায় ডুবাইয়া বিলাইয়া দেয়, অথবা বিশ্বাতীত সত্তার সহিত এক অভিন্ন হয়।

এইরূপে দিব্যাস্পৃহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে সামাজিক বুদ্ধি তথা হইতে নৈতিকবুদ্ধি এবং অবশেষে মানুষের সমগ্র প্রকৃতিকে অধ্যাত্ম চেতনায় তুলিয়া ধরিবার যে বিশেষত্ব তাহাতে বিকশিত হয় অশেষের ত্রিকালসম্ভাব্য শক্তি, খুলিয়া ধরে ত্রিকালজ্ঞ দৃষ্টি। দর্শন, বিজ্ঞান, কবিত্ব, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি সমাজতত্ত্ব যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সার্থকতার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সে প্রশ্ন আকাঙ্ক্ষা করিতেছে তাহা সেখানে নীরব হইয়া যায়; পায় তাহাদের চিরন্তন স্বরূপটী এবং তাহাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় সমাধানটী। সেই জন্য বোধ হয় অনন্ত জ্ঞান পারাবারে লীলায়িত অর্থাভিব্যঞ্জনার সূচনাটুকুমাত্র দেখিয়াই বিস্ময়বিমূঢ় James Cousin লিখিলেন * প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে New ways in English literature শীর্ষক আমার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক মান্দ্রাজে প্রকাশিত হয়। নূতন বই প্রকাশিত হইলে যেমন সকল সংবাদপত্রে পাঠান হইয়া থাকে, তেমনি আমার বইখানা ফরাসী ভারতের পণ্ডিচারী সহরের আর্য্য কাগজে সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়। (অরবিন্দের) সমালোচনা তাঁহার "আর্য্যে" সেই সময়েই বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং আজও চলিতেছে। আজ অবধি এই অপূর্ব্ব সমালোচনার যতখানি ক্রমশঃ প্রবন্ধাকারে বাহির হইয়াছে, তাহা আমার সমালোচিত বইয়ের কয়েকগুণ বড়। তাহাতে আলোচিত জ্ঞানের তুঙ্গশিখর অনেক উচ্চে। ভবিষ্যতের কবিতা—"The future poetry" শীর্ষক এই সমালোচনা আলোচিত পুস্তকের সকল দীনতা মুছিয়া দিয়াছে; আমার পুস্তকে যাহার মাত্র সূচনা হইয়াছিল, এই সমালোচনায় তাহা সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যে গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহার যে গভীরতার মাত্র উপর স্তরটী দিয়া আমার লেখালীলাপক্ষে উড়িয়া গিয়াছিল, সে অতলেরও এই আলোচনাতল পাইয়াছে। অরবিন্দের লেখা আমার অনুমানগুলিকে সত্যে পরিণত করিয়াছে, আমার ইঙ্গিতের সব পথটুকু পায়ে মাড়াইয়া সে তীর্থ যাত্রাখানি সফল করিয়াছে। যাহা এক সময় অন্য একখানি গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্যতে একদিন একখানি স্বাধীন গ্রন্থে পরিণত হইবে। সে ভবিষ্যত গ্রন্থ-

* James Cousinএর এই উক্তিটী বারীন্দ্রকুমারের অধুনালুপ্ত "নারায়ণ" হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীঅরবিন্দ



You have the word and we are waiting to accept it from you India will speak through your voice to the world Hearken to me

— Rabindranath

খানি ভাষা সম্পদে ইংরাজী গদ্য সাহিত্যের চূড়ামণিগণের সমতুল্য ; কিন্তু তাহার অন্তর্দৃষ্টি ও ভবিষ্যদ্দর্শনের শক্তি বা এই ভাগবতজ্ঞান সচরাচর ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যে কোথাও আমি আজও পাই নাই।

আমার এ কথাগুলি স্বার্থ সম্বন্ধচ্যুত নহে ; কারণ অরবিন্দের লেখায় আমার বইখানির নামোল্লেখ মাত্র প্রথম অনুচ্ছেদেই শেষ হইয়াছে। আমার ক্ষুদ্র বইখানি এই শুক্তির বুকে ভবিষ্যৎ মুক্তার জননীরূপে বালুর কণাটুকু রুদ্ধ উৎসের মুখে আবরণের উপলটুকু —এ যে সেই তুচ্ছ বস্তু যাহা পরম ধনের দুয়ার খুলিয়া দেয়। কিন্তু এ ঘটনায় ভারতের প্রতিভার গুপ্ত মন্দিরখানি আমাকে দেখাইয়া দিয়াছে। যে নব সৃষ্টির প্রতিভা ও তত্ত্বমর্ম্মোদ্ঘাটিনী কল্পনা শক্তি অতীতযুগে দর্শনের মূল তত্ত্বকথার অপূর্ব্ব মহাভাষ্যের রচনা করিয়াছে এবং কেবল ভারতের নহে, গ্রীস্, চীন জাপানেরও নানামুখী সভ্যতা, সাধনা সাহিত্য ও কলার সৃষ্টি করিয়াছে, এই ঘটনায় আমি সেই শক্তির প্রকট লেখা দেখিয়াছি। আর ইহাতে সাহিত্যের সেই অনন্ত প্রসার ও বিভূতির আংশিক সাক্ষাৎ পাইয়াছি, যে জ্যোতি, সম্পদ ও বিভূতি ইংরাজী সাহিত্যে গড়িতে দিয়া এই প্রতিভার ঋষিপ্রেরণা জগতের মনোরাজ্যের এক একচ্ছত্র ভাগবত সাম্রাজ্য রচিয়া দিবে।

যাঁহার কথা বলিতেছি সেই অরবিন্দ ঘোষ জন্মে বাঙ্গালী, যৌবনের পাঠ্যজীবনে Stephene philipsএর সহচর এবং অধুনা পণ্ডিচারীতে স্বেচ্ছায় দেশান্তরিত। যে ঘটনায় তাঁহার দেশত্যাগ তাহা সৌভাগ্যক্রমে আজ অতীত ইতিহাসের একটি বিস্মৃতপ্রায় পৃষ্ঠা বই আর কিছুই নহে। কিন্তু প্রধানতঃ সাধনার জন্য অন্তরের দেবতার ডাকই তাঁহাকে দেশত্যাগ করাইয়াছে। এইটিইত হিন্দুর চিরন্তন রীতি। তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই, কিন্তু সেসৌভাগ্যে ভাগ্যবান লোকে বলেন যে অসাধারণ গুণে গুণী এই মহাজনের চক্ষে অন্তর্জগত নিত্য দীপ্যমান, তাঁহার চরিত্রে অপূর্ব্ব সমতা ও মাধুরীর সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে, এবং সাধনলব্ধ শিবজ্ঞান তিনি জাতি বর্ণ নির্ব্বিচারে সকলকে দিতে সদা প্রস্তুত।

দর্শনের যে মূলতত্ত্বগুলিরদিকে ইউরোপীয় দর্শন আয়াসে শনৈঃ শৈনঃ যাইতেছে, অরবিন্দের "আর্য্য" পত্রিকায় সে গুলির পূর্ণ নির্দ্দেশ আমরা পাই। সাপেক্ষিক জগতের যে তত্ত্ব ইনষ্টিন্ (Ainstein) আবিষ্কার করিবার পরে দুই দশ দিনের সখের মজলিসে নাড়াচাড়া পাইয়া বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিসর্জ্জিত হইল, ভারতের এই মন্ত্রদ্রষ্টা দার্শনিক কবির কাছে সে তত্ত্ব জীবনের রসস্বরূপ, শুধু বিচারের বস্তু নহে—পরন্তু জ্ঞানের বস্তু, শুধু মন্তব্যের বস্তু নহে—কিন্তু জীবনে রূপান্তরিত করিবার সামগ্রী।... ...

তাঁহার চক্ষে ভগবান কেবল মতবাদ মাত্র নহেন, তিনি সজীব ও আত্মময় অপরোক্ষানুভূতির যত উপায় ও পন্থার কথাই তাঁহার লেখায় আপূর্য্যমান সমুদ্রবৎ রহিয়াছে।... ...

নীট্শের অতিমানবতার বিকাশের নিমিত্ত শ্রীঅরবিন্দ সংসারে আসেন নাই, তাহার জন্য তাঁহার কোন তপস্যার প্রয়োজন ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের প্রকৃতির সহিত যাঁহারা ছিলেন পরিচিত, তাঁহারাই সম্যক্ জীবনে যে কি প্রচণ্ড শক্তির উৎস হইতে সে প্রকৃতি ছিল উৎসারিত, কি বিপুল গতির তোড়ে সে প্রকৃতি নিনাদিত—সে প্রবাহ ছিল পরিপ্লুত অব্যর্থ। তাহা ছিল নীট্শের অতি মানবতার উর্দ্ধতর বস্তু আত্যন্তিক শক্তির উপযুক্ততা হইতে বলবত্তর কিছু। তাই না বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হৃদয়ের বিমুগ্ধতায় অনুপম অর্ঘ্যের রচনা করিয়াছিলেন :—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি।"

আবার ঐন্দ্রজালিক পুরুষের মত অলৌকিক কীর্ত্তির কসরতের নিমিত্ত, কিম্বা রাজনীতি, দার্শনিকতা, কবিত্ব, নৈতিকতা প্রভৃতির দুই একটির চরম সিদ্ধি, চরমোৎকর্ষতা বা চরম অভিব্যক্তি—পরাকাষ্ঠার নিমিত্তও শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব হয় নাই। সেগুলি তাঁহাতে পাইয়াছে অপূর্ব্ব সমন্বয়, অদ্ভুত সামঞ্জস্য ; বিকাশ করিয়াছে মহত্তর অর্থ, বিপুলতর সার্থকতা। সেখানে কত তত্ত্ব কত তথ্যে, কত ভঙ্গী কত লাস্যে, কত রাগ কত ছটায়, কত দীপ্তিতে দ্যুতিছন্দে, কত বর্ণ গন্ধে, কত প্রভায় বিসারে অশেষের সে শতদল পদ্মটী যে ঝলসিয়া উঠিয়াছে—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে।

মনে হয় মনীষী পল রিশারের (Paul Richard) সেই উক্তিটী কতখানি সত্য, যখন প্যারিসের কোন এক রেঁস্তো-রায় (Restaurant) জনৈকা ফরাসী বিদুষীর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে * শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—"জগতে এত বড় আধার আমি কোথাও দেখি নাই; একাধারে এত বিভিন্ন বিচিত্র শক্তির সমাবেশ ও বিকাশও আমি আর কখন কল্পনা করিতে পারি নাই। শ্রীঅরবিন্দ কি না হইতে পারিতেন। কিন্তু এই সব নিশ্চিত সম্ভবনাকে নিশ্চিত যশ একছত্র পতিত্ব তিনি ছাড়িতে পারিলেন, নিতান্ত অনিশ্চিতের সন্ধানে।" প্রত্যুত্তরে ফরাসী মহিলাটী বলিলেন "কিন্তু অনেক ভারতীয় যোগীকেইত এই রকম ছাড়িতে দেখা যায়?" পল রিশার বলিলেন "কিন্তু তাঁহারা যোগী ছাড়া যে অন্য কিছু হইতে পারিতেন তাহার ত কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ—আজও যদি মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি একবার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে কবির রাজনীতিকের দার্শনিক, সংস্কারকের সকলের প্রতিভাই পাণ্ডুর হইয়া যায়।"

* এই প্রসঙ্গটী বোধ হয় দিলীপকুমারের "ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকায়" আছে।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅবনী নাথ রায়

শ্রীঅরবিন্দ আমার কাছে শুধু একটি নাম মাত্র, তাঁকে কোনদিন চোখে দেখিনি, জীবনে যে দেখ্‌তে পাব এমন আশাও নেই। কেননা শুনেচি পণ্ডিচেরীর আশ্রমে সম্বৎসরে মাত্র ২ দিন তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাকি ৩৬৩ দিন তিনি ঘরের মধ্যেই থাকেন, কেউ তাঁকে দেখ্‌তে পায় না।

কিন্তু তবু কেমন ক'রে জানিনে এই নামটার চারিদিকে একটা গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পুঞ্জিত হ'য়ে আছে। কিছু না জেনেই নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছি তিনি পণ্ডিচেরীর আশ্রমে দারুণ তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত আছেন। এই তপস্যার ফলে দেশের তথা মানুষের মুক্তি হবে কিনা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারিনে কিন্তু এ-কথা নিশ্চিত জানি যে শ্রীঅরবিন্দ সেখানে যে সাধনায় নিমগ্ন আছেন তার উদ্দেশ্য সামান্য নয়, তার ফল কেবলমাত্র বর্ত্তমান কালেই সীমাবদ্ধ নহে।

এ ধরণের মনোভাবকে নিছক উচ্ছ্বাসময় মনের প্রতীক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বরঞ্চ আমার বিশ্বাস এর মধ্যে দিয়ে ভারতের চিরন্তন তপস্যার আদর্শের প্রতি একটি সুনিবিড় শ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়।

ভারতের আদর্শ যে ত্যাগ, ভোগ নয়, এ কথা চিরদিনের জন্যে স্থির হ'য়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর এত বড় ভোগমুখী সভ্যতাও আমাদিগকে ভোগের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারেনি। সারা জীবন বাড়ীর উপর বাড়ী তৈরী ক'রে, গাড়ীর উপর গাড়ী কিনে, এখানে বুড়ো বয়সে কেউ আত্মহত্যা করে না। বরঞ্চ সারা জীবন ধরে অর্থোপার্জ্জন ক'রে বুড়ো বয়সে সর্ব্বস্ব দান ক'রে যায়, এখানকার যুবকেরা যৌবনে ফকিরী নেয়। অর্থোপার্জ্জনের ফাঁকে ফাঁকে এখানকার ধনিকের মন প্রকৃতির উন্মুক্ত স্পর্শ পাওয়ার জন্যে লালায়িত হ'য়ে ওঠে। এ-ই ভারতের ঐতিহ্য, কারোর ক্ষমতা নেই একে উল্টোয়।

না হ'লে শ্রীঅরবিন্দের নামে উল্টা পাল্টা কথা শুনেচি কম নয় কিন্তু কোন দিন তা মনের উপর রেখাপাত করতে পারেনি। তিনি যে এই সব বিশ্ব-নিন্দুকের চেয়ে অনেক বড়, তিনি যে যোগী, তিনি যে ত্যাগী, তিনি যে সত্য-সন্ধানী, তিনি যে মুমুক্ষু, এতে ত আর কোন ভুল নেই। তাঁর মত জ্বলন্ত প্রতিভা আমাদের দেশে ক'জন জন্মেছেন? এ প্রতিভা বিভ্রান্ত হ'তে পারে না। যারা নিন্দুক, যারা অবিশ্বাসী, যারা ব্রণধর্ম্মী তাদের হাত থেকে কারোর কোনদিন পরিত্রাণ নেই। নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি সাধনা চিন্তাশক্তির দিকে তাকিয়ে কথা বলে না বলে কোন কথাই এদের মুখে আট্‌কায় না। কিন্তু জগতে যা সত্য তা চিরকাল সত্যই থেকে যায়—নিন্দা পরীবাদের সাধ্যও নেই তাকে এতটুকু ম্লান করে।

আজকের দিনে ভারতের এই যোগীরূপী সাধকের দীর্ঘজীবন কামনা করি। তাঁর ভিতর ভারত-মাতৃকার যে বিশিষ্ট রূপ দেখা দিয়েছে তা আমাদের গৌরবের বস্তু। ভারতের ভাগ্য-বিধাতার কাছে আমি দিনরাত প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদিগকে এই মহাপুরুষের দেশবাসী এবং সমকালবর্ত্তী বলে পরিচয় দেবার অধিকারের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলেন।

শ্রীঅরবিন্দের সেবায়

শ্রীরতিকান্ত পালিত

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে, কিছু বল্‌তে যাওয়া আমার সাজে না; তাঁর সম্বন্ধে কিই বা জানি আর কিই বা বল্‌তে পারি? তাঁর বিরাট জ্ঞানের কথা, অনন্যসাধারণ সাধনার ইতিহাস, তাঁর মহামানবত্বের কথা, দেবত্বের কিম্বা ঐশীত্বের কথা, তাঁর ভক্ত যাঁরা, শিষ্য যাঁরা, শ্রীঅরবিন্দকে যাঁরা জান্‌তে চেষ্টা কোরেছেন তাঁরাই বল্‌তে পারেন। শ্রীঅরবিন্দকে আমি নররূপেই দেখেছি, —তাঁকে শ্রদ্ধা কোরে, ভালবেসে, তাঁর সেবা কোরে যে অপার আনন্দ পেয়েছি,—সে কথাই সামান্য বল্‌তে পারি। শাস্ত্র আমি পড়িনি, ধর্ম্মের উপদেশ আমার জানা নাই, ভগবান আছেন কিনা সে সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞ, কাজেই শাস্ত্রমত তিনি যে কতটা ধার্ম্মিক, দেবত্বের লক্ষণ তাঁহাতে কতটা পরিস্ফুট, জগৎকে তিনি ত্রাণ করবার জন্য অবতীর্ণ হোয়েছেন কিনা, কিম্বা তিনি নররূপী ভগবানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, এসব চুলচেরা ভাগ করে, বিচার করে দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

শ্রীঅরবিন্দকে আমি দেখেছি করুণাময় পালক, স্নেহময় পিতা, অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর চাঁপা ফুলের মতো আঙ্গুলগুলিকে আমি ভালোবেসেছি, পদ্মের পাপড়ির মতো নরম পা দুখানিতে মাথা দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছি, দুধে আলতায় মেশানো গায়ের রঙ্‌ দেখে মোহিত হয়েছি। তাঁর ঘর ফুল দিয়ে সাজিয়ে, তাঁর জন্যে রান্না করে, বাসন মেজে যে অতুল আনন্দ পেয়েছি তা ঠিক ভাষায় বোঝাতে পারবো না। তাঁর সেই স্বপ্নলোকের চাহনি আমার দিকে ফেরালে অন্তর আলোকিত হয়ে উঠেছে, তাঁর করস্পর্শে আমার সমস্ত শরীরে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেছে। তাঁর পায়ের তলায় বসলে ইচ্ছা হয়েছে ঐ পা দুটী আমার বুকে জড়িয়ে ধরি। নিকটতম, প্রিয়তম বন্ধুর কাছে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতির কথা কখনও বল্‌তে পারিনি তাঁর কাছে সে সব কথা না বলে আমার তৃপ্তি ছিল না। কত বাজে কথা, আবোল তাবোল ভাবে তাঁর কাছে বলে গেছি, কত আবদার করেছি তিনি পরম স্নেহে সে সব শুনে গেছেন।

বোধ হয় সেটা ১৯২২ সাল যখন একদিন কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেছিলাম তাঁর কাছে। খুব একটা বৈরাগ্যের তাড়ায় কিম্বা ধর্ম্মলাভের আশায়, কিম্বা বড় নামজাদা লোকের শিষ্য হবো, কি মহাপুরুষ দর্শন করবো, ভগবানের বিভূতি দেখবো, কি বড় একজন সাধক হবো এ সব কোন idea আমার মাথায় ছিল না, তাঁর সম্বন্ধে তখন কিছুই জানতাম না, কিন্তু যে আকর্ষণে তাঁর কাছে ছুটে গেছলাম, জগতের সমস্ত বস্তু তার কাছে অতি তুচ্ছ ছিল এবং তখন থেকে বোধ হয় ১৯২৮ সাল অবধি তাঁর কাছে থেকে এবং শুধু তাঁর সেবা করে যে আনন্দ পেয়েছি, যে তৃপ্তি পেয়েছি, সেটাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় পাওয়া। আমার বিশ্বাস যে আমি ভুল করিনি।

তিনি যে কি তা আমি জানি না, জানবার জন্য চেষ্টাও করিনি। মানুষের মতই তাঁকে দেখেছি, তাঁর কাছে নিজের অভাব অভিযোগের কথা অকপটে বলেছি, কোন ভয় করিনি, দ্বিধা হয়নি, কুণ্ঠা হয়নি।

যা দেখেছি তাঁর সম্বন্ধে সব কথা বলবার ক্ষমতা আমার নেই। দুই একটী সাধারণ ঘটনার কথা অতি সাধারণ ভাবেই বল্‌তে পারি। শ্রীঅরবিন্দের জন্য রান্না করবার অনুমতি আমি নিয়েছিলাম; উচ্ছে, লাল আলু, বিলাতী বেগুন, কুমড়া, সজনে ডাঁটা, ঝিঙ্গে, কাঁচকলা সম্মিলিত, ফরাসী কায়দায় পারীয়া রাঁধুনীর যে ভোজ্য তিনি ১৭ বৎসরকাল পরমানন্দে খেয়ে এসেছেন তার পরিবর্ত্তে আমার অশিক্ষিত, অপটু হাতের রান্না যে তাঁর কি ভোজ্য হতো তা আমি

জানিনা কিন্তু তাঁর জন্য রেঁধে, তাঁকে খাইয়ে আমার অতুল আনন্দ হতো এবং সে আনন্দ থেকে তিনি আমায় বঞ্চিত করেননি। তিনি যে কি ভালোবাসেন, কি ভালোবাসেন না সে খবর আমি জানতাম না। নিজের ইচ্ছামত ও পছন্দমত যা কিছু তৈরী করে দিয়েছি তিনি তাই খেতেন, ফিরিয়ে দিয়ে তিনি কখনও আমায় ব্যথা দেননি। শুনেছিলাম তিনি ফুলকপি ভালবাসেন তাই ফুলকপি রান্না করতে আরম্ভ করেছিলাম। দুদিন পরে তিন দিনের দিন তিনি প্রশ্ন করে পাঠালেন ফুলকপি কোথা থেকে এসেছে, আশ্রমের সকলের জন্য তো ফুলকপি রান্না হয়নি। আশ্রমের সকলের জন্য রোজ যা রান্না হতো তার এক ডিস করে প্রত্যহ তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হতো। এর বেশী বাড়তি কোন জিনিষ গেলেই তাঁর প্রশ্ন আসতো কোথা থেকে এটা এলো। হাত খরচের টাকায় যে কপি কিনেছিলাম এটা যখন তাঁর অবিদিত রইলো না তখন কপির ডিশটি ফেরত আসতে লাগলো। তিনি চাইলেন না যে তাঁর জন্য আলাদা করে দুচার আনাও খরচ করা হয়। যা সকলে খায় তিনিও শুধু সেই টুকুই গ্রহণ করতেন। অথচ তাঁর ঘরে গিয়ে দেখেছি তাঁর বিছানার চাদর তালি দেওয়া, ছেঁড়া কাপড় পাট করা, এক কৌটা সাধারণ মাজনে তাঁর ২।৩ মাস যায় আমরা ধুতি ছেঁড়ার আগে পেতাম নূতন ধুতি নূতন চাদর, প্রতিমাসের প্রথম দিনে দুতিন খানা সাবান, উৎকৃষ্ট টুথপেষ্ট, Shampoo Powder, সুগন্ধি তেল। প্রতি বছর কত ভক্ত তাঁকে বহরমপুরের গরদ, কাশীর সিল্ক, শান্তিপুরের জড়িপাড় কাপড়, অন্ধ্রদেশের উৎকৃষ্ট খদ্দর দেয়, কিন্তু তাঁর অঙ্গস্পর্শের সৌভাগ্য সেগুলির কচিৎ ঘটে। বিরাট ভোগ, বিপুল ঐশ্বর্য্য, অজস্র উপকরণ তাঁর পদতলে পড়ে রয়েছে সব সময়ে, অথচ তিনি পূর্ণ উদাসীন। তাঁর এ নির্লিপ্ততার কথা, উদাসীনতার কথা সেখানকার শিষ্যদের অবধি জানবার সুযোগ হয়না কারণ তাঁর ঘরে প্রবেশের অধিকার কারো নেই।

খুব সম্ভব সেটা ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাস যখন পূর্ণতম Conquestএর জন্য শ্রীঅরবিন্দ outer activityর থেকে retire করলেন। তখন শিষ্যেরা, ভক্তরা আর তাঁর দেখা পেলোনা। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ, তাঁর উপদেশ সকর্ণে শুনবার অধিকার তারা হারালো। তখন মীরা দেখা দিলেন মাতৃরূপে। বৃক্ষ মহীরুহ থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রতম অপোগণ্ডগুলি অবধি তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে পড়লো না। প্রত্যেককে তিনি স্নেহচ্ছায়ায় ঘিরে ফেলতে চাইলেন—শুধু তাই নয়, যারা বাইরে ছিল তারা ভিতরে এলো, খাওয়া দাওয়া থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক বিষয়ে সুন্দরভাবে বন্দোবস্ত হলো, প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তার ছোটখাটো অভাব অভিযোগগুলো অবধি তিনি নিজে দেখে দূর করে দিতে থাকলেন। সম্মিলিত ধ্যানের বন্দোবস্ত হলো, খবরের কাগজ পড়ার ঘর হলো, লাইব্রেরী ডাক্তারখানা ইঞ্জিনীয়ারীং বিভাগ সব কিছু হলো, প্রত্যেক বাড়ীতে বাগান হলো, তিনি প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে বসতে লাগলেন। ছুঁচ সুতো থেকে আরম্ভ করে Stamp Post Card অবধি প্রত্যেকে তাঁর কাছ থেকে পেতে লাগলো। রাত সাড়ে তিনটা থেকে আরম্ভ করে রাত দুটো আড়াইটা অবধি তিনি একটানা পরিশ্রম করে গেছেন। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের দেখে আসা, অভাব অভিযোগ শোনা থেকে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী, বেকারী, Carpentry কোন কিছু তাঁর মনোযোগের বাইরে রইলোনা। সবাই তাঁকে মায়ের মত দেখতো কিনা জানিনা কিন্তু তিনি প্রত্যেককে এমন কি ঝি, চাকর বেড়ালগুলোকে অবধি মায়ের মতন ভালোবাসায় ঘিরে ফেললেন। এ সময়ে তাঁকে যা পরিশ্রম করতে দেখেছি তা অদ্ভুত—ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একটানা অক্লান্তভাবে খেটে যাচ্ছেন—অথচ শরীরে ম্লানিমার লেশমাত্র নেই, মনে অবসন্নতার ছায়াটুকুমাত্র নেই, হৃদয়ে বিরক্তির আভাস নেই। পঁচিশ জন লোক, পঞ্চাশ রকম ইচ্ছা, পাঁচশো রকম অভাব অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে গেছে, তিনি সকলকে পরম যত্নে, পরম আদরে শান্তি দিয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন সুন্দরভাবে উপদেশ দিয়েছেন। যাকে সবাই তুচ্ছতম বলে

অবহেলা কর্‌তো তাঁর স্নেহে সে হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড শক্তিময়, যে ছিল নীরস, শুষ্ক, যার হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যেতোনা তাঁর ভালোবাসা পেয়ে সে হয়েছে হৃদয়বান, সরস, সুকুমার।



মীরা The Mother

তাঁর কাছে কেউ ছোট বলে অবহেলার পাত্র ছিলনা। তিনি সকলকে সমান স্নেহে, বরং দুর্ব্বলকে অধিকতর স্নেহে কোলে টেনে নিয়েছেন। একটী বিড়ালের অসুখ হোলে সারারাত ধরে তার পরিচর্য্যা কোরেছেন। তাঁর হৃদয়ে স্নেহ অতি অপূর্ব্ব। হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম তাঁর অদ্ভুত কর্ম্মের কথা। ঐ অপরিসীম পরিশ্রম অথচ তাঁর আহার ছিল না নিদ্রা ছিল না। বহুলোক সন্দেহ করেছে, আমার কাছে এসে প্রশ্ন করেছে যে তিনি কিছু খান কিনা। সন্দেহ তাদের হওয়া স্বাভাবিক—তারা তো মানুষ, কিন্তু তারাই আবার মার সম্বন্ধে বল্‌তো যে তিনি মহাশক্তি। তিনি সব জান্‌তেন কিন্তু কখনও বিরক্ত হননি, তাঁর অতুল ভালোবাসা দিয়ে সকলের হৃদয়ের কালিমা দূর করে দিতে চাইতেন। কতটা সক্ষম হয়েছেন বল্‌তে পারি না কিন্তু তাঁকে বিরক্ত হতে দেখিনি, ধৈর্য্য ছিল তাঁর অপরিসীম। আহার বা নিদ্রা-ত্যাগ করা যে খুব বড় শক্তির কথা এটা আমি মনে করি না; বনেজঙ্গলে এমন সাধু সন্ন্যাসী আছেন যাঁদের ভাগ্যে কচ্চিৎ আহার জোটে। হঠযোগী কিছুদিনের জন্য আহার ত্যাগ কর্‌তে পারেন। কোন কোন পশুও কিছুকালের জন্য নিরাহারে থাকৃতে পারে কিন্তু বিনা আহারে বিনা নিদ্রায় এত পরিশ্রম কোন শরীরধারী জীবের পক্ষে যে সম্ভব এটা আমি আর কোথাও দেখিনি। বয়স তাঁর প্রায় ৫০।৫৫ অথচ শরীর যে শুধু অম্লান তা নয় জ্যোতির্ম্ময়, শক্তিতে ভরপুর।

দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, কোন্‌টীর নাম করবো, কোন্ বিষয়টী যে তাঁর জ্ঞানের বাহিরে, তার ঠিক পাইনি। কোথায় কোন্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু মানুষের অণুবীক্ষণযন্ত্রে প্রথম ধরা পড়ে গেছল, দূর গগনের কোন্ ক্ষুদ্রতম তারকাটী কিভাবে চল্‌তে চল্‌তে কি রঙের আলো দিল, কোন্ পরমাণুটীর কেন্দ্রে কি বিশ্বসংহারী শক্তি নিহিত আছে, কোন্ বিষয়ে কোন্ মনীষীর কি মত; এ সব তাঁর নখদর্পণে। সান্ধ্যবৈঠকে অন্যের আলোচনা তিনি এমন নীরবে শুনে যেতেন, যে যেন সেই সম্বন্ধে তাঁর কিছু জানা নেই, কিন্তু তর্কের মীমাংসাচ্ছলে যখন দু'একটী কথা বল্‌তেন, তখন মহা পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিও তাঁর অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে শুধু নির্ব্বাক হোয়ে যেতো। সকলের সঙ্গে কথা কইতেন এত সহজভাবে, তাদের মত হোয়ে যে বোঝবার উপায় থাকতো না, তিনি তাদের চেয়ে প্রতি বিষয়টীতেই কত বড় জ্ঞানী। উপদেশ বড় একটা দিতেন না, আদেশ কাউকে কোনদিন করেন নি,—সেখানে সকলেরই ছিল পর্য্যাপ্ত স্বাধীনতা। বসন, ভূষণ, আহার বিহার থেকে সাধনা করা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী করতো। নিজ নিজ আধার অনুযায়ী যে প্রত্যেকে পূর্ণতর মানুষে বিকশিত হয়, এটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এত মহান্, যে সে পথে চলা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য। শ্রেষ্ঠতম মানুষী

বুদ্ধির ভিত্তির উপর মনোরাজ্যের ঊর্দ্ধতম লোকের জ্ঞানের (Supermind) প্রতিষ্ঠা, চঞ্চল প্রাণকে সংহত করে বিরাট অফুরন্ত শক্তিকেন্দ্রে পরিণত করা জরামরণশীল ভঙ্গুর দেহের প্রতি অণুপরমাণুটীকে স্থির আলোয়, অবিচলিত শক্তিতে, অখণ্ড আনন্দে রূপান্তরিত করা বোধ হয় মানুষের সাধ্যের অতীত। তিনি তাঁর এই বিরাট অভিযানে কোন্ আদর্শ অনুযায়ী মানুষ বেছে বেছে নিচ্ছেন, সেটা বোঝাও যায় না। হয়তো সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কি বুদ্ধিমান বিদ্বান তাঁর পক্ষে হোয়ে গেল unfit আবার হয়তো জগতের চক্ষে, ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ব্যক্তিও তাঁর আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হোয়ে গেল।

শক্তির কথা, তাঁর প্রচেষ্টার কথা, সাধনার কথা কিছুই আমি বল্‌তে পারবো না—তবে আমি দেখেছি এবং আমার স্থির বিশ্বাস যে নিজের অদ্ভুত চেষ্টায়, অনন্যসাধারণ ধৈর্য্যে তিনি হয়েছেন অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী, পূর্ণতম আনন্দলোকে তাঁর বসবাস, অখণ্ড শান্তি তাঁর করায়ত্ত, শক্তির রাজ্য তাঁর পদতলে।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ফ্রান্সের মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁ

"India on the March নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"Here comes Aurobindo Ghose, the completest synthesis that has been realised to this day of the genius of Asia and of the genius of Europe. The West which has been complacently picturing to itself an Orient passive, static, quietist will be surprised to see India surpassing us very soon in the zeal for progress and of activity. If with Ramkrishna, Vivekananda and Ghose, she retires at times into the farthest retreats of her thought, it is only to take a spring and bound forward further to the front. And the last of the great Rishis holds in his hand, in firm unrelaxed grip, the bow of creative energy.

"তারপর অরবিন্দ ঘোষের কথা। এশিয়া ভূখণ্ডের এবং ইউরোপের—এই দুই মহাদেশের প্রতিভার পরিপূর্ণতম মিলন আজ পর্য্যন্ত এই এক অরবিন্দ ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। যে পাশ্চাত্য দেশ প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে এক ছবি মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল যে সে দেশ শান্ত, নিষ্ক্রিয়, কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উৎসাহহীন, সেই দেশই ভারতবর্ষের কর্ম্মশক্তি এবং উন্নতির উন্মত্ত আগ্রহে আমাদের দেশকেও শীঘ্র অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সাধনা দেখিয়া বিস্মিত হইবে। যদি কাহারও মনে এই ধারণা হয় যে কখনো কখনো রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কিংবা শ্রীঅরবিন্দের সহিত ভারতমাতৃকার স্বরূপ চিন্তার অতল গহনে লুক্কায়িত হইয়া যাইতেছে, তবে তাহার অর্থ এই যে সে পুনরায় একটি সুবৃহৎ লম্ফ প্রদান করিয়া সমস্ত উন্নতির চেষ্টার পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিবে বলিয়াই এরূপ করিয়াছে। আর ইঁহাদের মধ্যে যিনি সকলের শেষ ঋষি তাঁহারই অশিথিল মুষ্টিতে ধরা আছে সৃজনপটু শক্তির ধনু।

রস-বোধ

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

ফুল যখন ফোটে তখন সে আত্মসমাহিত ভাবে আপনার বিকাশের মাদকতা নিয়েই ফোটে; সৌন্দর্য্যের বর্ণাঢ্য সুষমায় মানুষের চিত্তকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে তোলবার অপেক্ষা সে কোনদিনই রাখেনা কিন্তু মানুষ তার স্বাভাবিক প্রবণতা দিয়ে ফুলকে ভালোবাসতে শেখে এবং অনুভূতির মাধুর্য্যে তাকে মনশ্চক্ষে লোভনীয় করে' তোলে। মানুষের অন্তরের এই স্বভাব-জাত প্রবণতারই নামান্তর রস-বোধ।

রস-বোধের মূলে রয়েছে দুটী উপাদান একটী বহির্মুখী অপরটি অন্তর্মুখী। ফুলের বিকাশোন্মুখ আকুলতা বহির্মুখী, মানুষের হৃদয়ে তার শোভাবিস্তার অন্তর্মুখী। এই বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী বৃত্তি দুটোর একত্র সংমিশ্রণে যে বস্তুর উদ্ভব হয় তাকেই রস-বোধের পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

একটু সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিচার কর্ত্তে গেলে দেখতে পাবো উপরোক্ত বহির্মুখীনতার ধারার ভেতর এমন একটী গতি আছে যা হৃদয়ের কূল স্পর্শ করে' যায়। ফুলের বিকাশের বেদনায় যে তদ্‌গত ভাব ও আত্মস্থ অবস্থা সূচিত হয় হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে তার একটু নিকট সম্বন্ধ আছে বলতে হবে। এই বিশিষ্ট গতিটিকে বহির্মুখীনতার একটী উপধারা বলা চলে। অপর পক্ষে উল্লিখিত অন্তর্মুখীনতার ভেতর আবার এমন একটী বাহ্যিক এবং ব্যবহারিক ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায় যে, তাকে ও অন্তর্মুখীনতার উপধারা হিসেবে নেওয়া চলে। ফুলের বর্ণ-বৈভব, অনুপম গন্ধ মানুষের অন্তরকে স্নিগ্ধ প্রীতিরসে উচ্ছ্বসিত করে' দ্যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ভালো লাগাটা বহিরিন্দ্রিয়-সাপেক্ষ। সুতরাং স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি একই অবস্থায় দুটো জিনিষ বেশ সুন্দর ভাবে Balanced হয়ে আছে। অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখীনতার অবতারণা কর্‌লাম এই কারণে যে, পরে আদর্শবাদী রস-বোধ ও বস্তু-তান্ত্রিক রস-বোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সূত্র যোজনা করা হয়ত আমার পক্ষে কঠিন নাও হতে পারে।

যে প্রেরণায় অতি নিরক্ষর ব্যক্তিও কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে তামাসা দেখ্‌তে ছুটে যায় তার মূলে রয়েছে আন্তরিক রস-বোধ। রস-বোধ সবারই ভেতর অল্পবিস্তর গোপন আছে। বাইরের কোন বস্তুকে উপলক্ষ্য করে সময় সময় ত' তা উৎসারিত হয়ে উঠেই, তা ছাড়া পরস্পর মনের মাধুর্য্য অনুভব করি রস-বোধের সাহায্যে। সুতরাং অনুভূতির সঙ্গেও রস-বোধ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। বস্তুতান্ত্রিক রস-বোধ ব্যবহারিক জগতকে আর আদর্শবাদী রসবোধ অন্তরের অনুভূতিকে কেন্দ্র করে নিজ নিজ রূপকে মূর্ত্ত করে' তুল্‌ছে। একের রাজ্য বাহ্যিক ক্রিয়ায়, অপরের রাজ্য কল্পনায়।

রসবোধকে সূক্ষ্মভাবে বিচার কর্ত্তে গেলে তার একটা স্বতন্ত্র মানদণ্ডের প্রয়োজন। সাধারণ বিচারে যে যে প্রক্রিয়া ও প্রয়োগ অপরিহার্য্য মনের এই রস-বোধনির্দ্ধারণের দিকটাতে তাদের সাক্ষাত মেলে না। তাই রস-বোধ নির্দ্ধারণ করাটাকে ঠিক বিচার বলা চলে না। পরস্পরের অন্তরের সহানুভূতির কমনীয়তায় যে স্পর্শব্যাকুলতা ফুটে উটে তাকে বিচারের পরিবর্ত্তে রহস্যোন্মোচন বলাটাই সমীচীন হবে। বাস্তবিক একের অনুভূতির কষ্টিপাথরেই অন্যের অনুভূতি যাচাই করে নিতে হয়। এই অনুভূতির ঐক্যই মানুষের অন্তরে রস-বোধ জাগ্রত করে' তুল্‌তে সহায়তা করে।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁর যে রূপটি আমাদের চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দ্যায়, তার ভেতর

ছিদ্রান্বেষী সমালোচক-প্রবৃত্তির নাম গন্ধও নেই—আছে অপরিমেয় সহানুভূতির মধুরিমা। অনুভূতির করুণ মাধুর্য্যে সমস্ত জিনিষই তাঁর চক্ষে রস-সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। রুক্ষ রূঢ় সমালোচকের দৃষ্টিতে আলোচনা কর্লে হয়ত তাদের একটা explanation অসম্ভব হত না, কিন্তু তার ভেতর কি তেমন প্রাণের সাড়া পাওয়া যেত? রবীন্দ্রনাথের অন্তরে সদাজাগ্রত রস-বোধ তাঁকে এই ধরণের সমালোচনার কঙ্করাস্তীর্ণ ক্ষেত্র হতে সর্ব্বদাই দূরে ঠেলে রেখেছে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি; কবিতার রস-বোধ সম্পর্কে আজকাল অনেক কথাই উঠেছে। আমি এমন লোককে জানি যিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করেন যে কবিতা পড়তে তাঁর ভালো লাগেনা। অথচদেখেছি, সাহিত্যালোচনার বৈঠকে যে-কবিতার অর্থ অপরের নিকট কুয়াসাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছে, তিনি একবার মাত্র পাঠেই তা প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে গেছেন। কেন এমন হয়? কবিতা তিনি আর সবার চাইতে ভাল বোঝেন, কিন্তু কবিতাপাঠ তাঁর নিকট বিশুষ্ক ও নীরস ঠেকে এ কেমন কথা? অথচ এমনো অনেক দেখা গিয়াছে যাঁদের মনশ্চক্ষে কবিতার অর্থ তেমন স্পষ্ট উদ্‌ঘাটিত হয় না তাঁরাই আবার অভিনিবেশ সহকারে নিয়ত কবিতা পাঠে আত্মনিয়োগ করেন।

উক্ত ভদ্রলোককে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছেন যে explanation কর্ব্বার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর ভেতর পুরোমাত্রায় রয়েছে বলেই কোন জিনিষের অর্থোদ্‌ঘাটন কর্ত্তে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হয়না কিন্তু কবিতার যা সত্যিকার সম্পদ সেই অস্পষ্টতার অনুভূতিই তাঁর ভেতর নেই। কবিতার অর্থ সবটাই উলঙ্গভাবে তাঁর নিকট অনাবৃত হয়ে পড়ে, কিন্তু অবচেতনা ভুক্ত vaguenessএর অভাবে কবিতার মাধুর্য্য তিনি ঠিক তেমনভাবে উপভোগ কর্ত্তে পারেন না। চৈতন্যের সত্বা এবং অনুভূতি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একের রূপ অত্যন্ত প্রকট অপরের রূপ কুহেলি-গুণ্ঠিত, অস্পষ্ট। কবিতা অনুভূতির জিনিষ চেতনার নয়। তাই কবিতার non-expnession এর দিকটার প্রতি তিনি বারবার অন্ধই থেকে যান কবিতাও তাঁর নিকট বর্ণাঢ্য মাধুরী নিয়ে উপস্থিত হতে পারে না অথচ অপেক্ষা-কৃত অল্প বোঝেন এমন অনেক ব্যক্তির দিনরাত কবিতা নিয়ে মাতামাতি করার কারণ অস্পষ্টতা অথবা suppression এর মায়া তাঁদের চক্ষে সকরুণ স্বপ্ন-স্পর্শ যত অধিক বুলিয়ে দিতে পারে যত পারে না ভাবসম্পদের পূর্ণ চেতনা। কল্পনার পাখায় ভর করে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করার প্রবৃত্তির পিছনে রস বোধের পোষকতাই প্রচুর। জাপানী সাহিত্যে "নো" নাটক ও "হোক্কু" কবিতার পাঠকদের ভেতর আমরা এই ধরণের রসবোধের সমধিক পরিচয় পাই।

কৃষ্টি বা cultureএর সঙ্গে রসবোধের কোন ভাবগত ঐক্য আছে কিনা তা নিরূপণ কর্ত্তে গেলেই দুরূহ সমস্যা উপস্থিত হতে পারে। কেউ বল্‌বে, কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রস-বোধের standardও ক্রমশঃ উন্নত হতে বাধ্য, আবার কেউ বল্‌বে, না রসবোধ এমনই এক বস্তু যার প্রাণশক্তিটুকু জন্মের জীবনী রস হ'তে আহরিত, পারিপার্শ্বিকের আঘাতে যার ক্রম-স্ফুরণ হতে পারে না ইত্যাদি।

উপরোক্ত মতবাদ দুটোই চরমপন্থী। আমার মতে এই দুই মতবাদের ঠিক মাঝামাঝি পথে চলাই ভাল। রসবোধ জন্মগত সন্দেহ নেই, কিন্তু যাকে উপলক্ষ্য করে রস-বোধের উদ্ভব হ'তে পারে তাকে সম্যকরূপে বুঝ্‌তে হলে merit-এর প্রয়োজন। এই merit স্ফুরিত হতে পারে একমাত্র মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে। সুতরাং রসবোধের বেলায় cultureকে একেবারে negligible factor বলে উড়িয়ে দিলে চলে না। তবে এই cultureএর প্রয়োজন মুখ্য নয়, গৌণ—এই যা সান্ত্বনা। এমনো দৃষ্ট হয় অতি উচ্চশিক্ষিত ভদ্র-লোকের শিক্ষার অনুপাতে কোন কোন গ্রাম্য নিরক্ষর ব্যক্তির রসবোধের মাত্রা অত্যন্ত বেশী। মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হতে তাঁদের অনুভূতির জগত একটু বেশী ব্যাপক হয় এই মাত্র। তা ছাড়া অনুভূতির ক্ষেত্রে cultureএর আর কোন দাবী-দাওয়া নেই।

কথাটা অবান্তর হলেও না বলে পারছিনে, কিছুদিন পূর্ব্বে প্রমথবাবু বিদ্যাপতির কোন কবিতার অলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এ কবিতা যার কাণে ও প্রাণে একসঙ্গে না

বাজে তার কাছে কবিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করে' কোন ফল নেই।'

এই প্রাণে বাজাটাই হচ্ছে রসবোধের মূল কথা। কাণে অনেকেরই বাজে, কিন্তু প্রাণে বাজাতেই রয়েছে কবিতার সত্যিকার অনুভূতি ও আন্তরিক রসবোধ। কৃষ্টির সঙ্গে প্রাণে বাজার কোন সম্পর্ক নেই, এর মূলরস মানুষের জীবনী শক্তির ভেতরই আত্ম-গোপন করে' আছে জন্মাবধি।

কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ একটী প্রবন্ধে সাহিত্যের রূপ নিয়ে কতক আলোচনা করেছিলেন। তাতে তিনি সাহিত্যের সাময়িক আলোড়নকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। যে সাহিত্য মানুষের চিরন্তন রসবোধের প্রবৃত্তির খোরাক জুগিয়ে চলে, কোনরূপ সাময়িক উচ্ছলতায় আপনাকে ভেসে যেতে দ্যায় না, তাঁর মতে তাহাই শাশ্বত, নিত্যকালের সঙ্গী। বায়রণের প্রতিভা রাহুগ্রস্ত হয়েছে, কারণ তাঁর ভেতর eternal appeal ছিল না মোটেই। পক্ষান্তরে হোমর, দান্তে, গ্যয়টে, শেইক্‌স্‌পীয়্যর, হ্বিক্টর হুগো, কালিদাস, ভবভূতি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে রসবেত্তাদের চক্ষে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় প্রতিভাত হবেন, কারণ তাঁরা রচনার মধ্য দিয়ে শাশ্বত অনুভূতির প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করে' গেছেন। এই চিরন্তন রস-বোধের খোরাক জুগিয়ে যিনি চলেন তাঁর লেখাই সাহিত্যের মণিকোঠায় অম্লান জ্যোতি-সৌন্দর্য্যে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

সম্প্রতি কবিবর অনুরূপ একটী প্রবন্ধে 'সাহিত্যে আধুনিকতার' প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে আধুনিকতাকে কাল দিয়ে মাপা যায় না, একমাত্র মর্জ্জিতেই তার পরিমাপ করা চলে। এই মর্জ্জি বস্তুটি কি? মানুষের বলিষ্ঠ ও ভাবপুষ্ট রসবোধ প্রবৃত্তিই নয় কি? কোন কোন লোল-চর্ম্ম, শ্বেত-শ্মশ্রু পলিতকেশ বৃদ্ধের মুখে আমি এমন বিস্ময়কর কথা শুনেছি যার মূলগত ভাব প্রচলিত আধুনিকতার ভাবের গণ্ডীকে অতিক্রম করে' গেছে। এইসব অশীতিপর বৃদ্ধ এমন অনুপ্রেরণা পেলেন কোথা হ'তে? কাল দিয়ে নিরূপণ কত্তে গেলে ত' তাঁদের modern বলা চলে না; তবে কি বল্‌বো তাঁদের সেই প্রেরণার মূলে বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে? না, ঠিক তাও নয়। পূর্ব্বেই বলেছি মানুষের অন্তরে রসবোধ সদা জাগ্রত অবস্থায় অবস্থান কর্চ্চে, তার উদ্বেল বহুমুখী ধারার সম্মুখে কালের প্রশ্ন ভেসে যায়, শুধু বড় হয়ে দেখা দেয় অনুপম চলার ছন্দ,—অপূর্ব্ব গতি-ভঙ্গিমা। কবিবরের ভাষায় বল্‌তে গেলে সেই "শাশ্বতভাবে আধুনিক" ভাবধারা বাস্তব অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে না, মনের প্রবণতার উপরেই তার লয়-ক্ষয় বিশেষভাবে নির্ভর করে।

মানুষের হৃদয়ের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার রসবোধের পরিচয় আমরা পাই। আবার একের রসবোধের মাত্রার সঙ্গে অপরের রসবোধ তাল রেখে চল্‌তে পারে না। কারণ, প্রত্যেকের মনে রুচি বলে একটা জিনিষ আছে। আমার রস-বোধের কষ্টিপাথরে যাকে সুন্দর বলে মনে হয়, অপরের ক্ষেত্রে তা সুন্দর না-ও হতে পারে। প্রভেদটা আমার রস-বোধের মাত্রাধিক্যের জন্যে নয়, আমাদের উভয়ের রুচিগত বিভিন্নতার জন্যে।

সংস্কার-সর্ব্বস্ব একদল রুচিবাগীশ রসবোধের নমুনা স্বরূপ কথায় কথায় স্বর্গত বঙ্কিমচন্দ্রের দোহাই পেড়ে বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত অশ্লীলতাকে লোকচক্ষে অন্যায়ভাবে হীন প্রতিপন্ন কর্ব্বার চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁদের এই গলাবাজিতে আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক অদ্ভুত যুক্তি ও রসবোধের চূড়ান্ত পরিচয় যে আছে তা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে চিন্তাশীল মনীষী নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের একটী সুন্দর কথা মনে পড়্‌ল। কথাটী এই:—'সাহিত্যে অশ্লীলতার স্থান আছে, কিন্তু অসুন্দরের স্থান নাই।'

বাস্তবিক অসুন্দরকে উপলক্ষ্য করে' মানুষের রসবোধ মোটেই জাগ্রত হতে পারে না; অশ্লীলতার বেলায় পারে। কারণ, অশ্লীলতার প্রবৃত্তিটি চিরন্তন, সুতরাং তাকে কেন্দ্র করে যে অনুভূতি রসবোধের ভেতর দিয়ে নিজেকে সুস্পষ্ট করে' তোলে তার রূপটি চিরন্তন হতে বাধ্য।

পরিশেষে বস্তুতান্ত্রিক রসবোধ ও আদর্শবাদী রসবোধের সীমারেখা নির্দ্দেশ করে আমি আমার প্রবন্ধ শেষ কর্ব্ব। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখীনতা রস-বোধের দুটো বৃত্তি। এই উভয় বৃত্তির কোনটি কি

ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রথমে তাই দেখাবার প্রয়াস পাবো। আই ডিজয়্যালিজমের প্রভাবে আমাদের মন সংসারের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ না থেকে কল্পলোকের প্রতি উধাও হয়ে ছুটে যেতে চায়। কোন এক অপরূপ ভাবরাজ্যে মায়াজাল বুন্‌বার ব্যস্ততায় তার চোখে মুখে উৎকট ঔৎসুক্য ছাপিয়ে পড়ে। সাহিত্যে যে ভাবে আদর্শবাদ চিত্রিত হয় তার ধারাটি অন্তর্ম্মুখী; কিন্তু আমরা যখন এই আদর্শবাদকে নিজের অন্তরে গ্রহণ কর্ত্তে তৎপর হই, তখন স্বভাবতঃ আমরা লেখকের অনুভূতি এবং আমাদের স্বকীয় অনুভূতির ভেতর একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করি। এই সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াটি বাহির্ম্মুখী-শেলীর Hymn to Intellectual Beauty অপরূপ সন্দেহ নহে, কিন্তু আমরা যারা তাঁর পাঠক তাদের অনুভূতির গভীরতা আর কতটুকু?

অপর পক্ষে বস্তুতান্ত্রিকতার ক্ষেত্রে সংসারের অতি সাধারণ দৃশ্যমান বস্তুগুলোকে যেমন করে' পাঠকের মনশ্চক্ষের সম্মুখে এনে উপস্থিত করা হয়, তাতে রচনার ভঙ্গিমা বিশেষ ভাবে বহির্ম্মুখীনতার গণ্ডীর ভেতর গিয়ে আশ্রয় লয়। কিন্তু পাঠকালে আমরা আমাদের অন্তরের অমেয় সহানুভূতির স্নিগ্ধতায় রুক্ষ বিসদৃশ নিত্যপরিচিত বস্তুগুলোকে রসসিক্ত করে তুলি। রিয়্যালিজমের এই গ্রহণের দিকটা অন্তর্ম্মুখী। সুতরাং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আদর্শবাদী রসবোধ এবং বস্তুতান্ত্রিক রস-বোধ দুটোই সমান ভাবে balanced হয়ে আছে।

তাঁতিরাম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীআশালতা দেবী

তাঁতিরাম জাতিতে কাওরা হইলেও তাহার আচার ব্যবহার চালচলন কথা বার্ত্তায় তেমন কোনও দৈন্য প্রকাশ পাইত না। তাহার আকৃতিতে কেমন একটা শুচিতা ছিল যাহা দেখিলে ব্রাহ্মণেরও মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইত। তাহার স্বভাবগুণে জমিদার বাড়ীর দাদাবাবুদের কাছে সে একটু আধটু লেখপড়া শিখিয়াছিল, সে নাম সই করিতে জানিত। প্রাতে উঠিয়া রাধাকৃষ্ণের নাম লিখিতে জানিত, দুলিয়া দুলিয়া রামায়ণ মহাভারত সত্যপীরের পুঁথি পড়িতে পারিত এমন কি দু' একখানাচি ঠিও লিখিয়া ফেলিত।

গ্রামের কোন পাড়ায় মড়ক লাগিলে টোটকা ঔষধের পুঁটলিটি বগলে তাঁতিরাম সেখানে না ডাকিতেই হাজির হইত। গ্রামের গিন্নীদের ত তাঁতিরামকে না হইলে এক মুহূর্ত্ত ও চলিত না। খোকা খুকীর জল পড়া তেলপড়া কবচ মাদুলী হইতে গর্ভিণী বধূর গর্ভেরকল্যাণে হাজার ঝাড়ফুঁকে তাঁতিরামের জয় জয় কার।

এতে আবার তাঁতিরামের পাওনাটাই কি কম ছিল? বাগানের কলাটা কচুটা পেঁপেটা হইতে শশাটা পর্য্যন্ত তাঁতিরামকে না দিলে তাঁদের মনের খুঁৎমুতি যাইত না। হাঁসিতে হাঁসিতে তাঁতিরাম এই সকল স্নেহের দান বিলাইয়া পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভাব করিত।

সেখানে ও কি তার কাজ কম ছিল? দিন নেই দুপুর নেই তার ক্ষুদ্র কুটীর খানি জমজম করিত। কারও ঘুড়ি বানাইয়া কারও লাটাই যোগাইয়া কারও কলম বাড়াইয়া তাঁতিরামের দিনগুলি কাটিত। বালকবাহিনীর সকল আবদারই সে নির্ব্বিচারে তামিল করিত, কেবল বিরূপ হইত তখন যখন কোনও বালক তাহার কাছে পাখীর খাঁচা কিংবা

মাছধরা ছিপের বায়না ধরিত। পাড়ায় মড়া পোড়াইতে, মারামারি দলাদলির আপোষ করিতে অনাথ অনাথিনীর দুঃখে গলিয়া যাইতে তাঁতিরামের জুড়ি মিলিত না।

গুণের সেরা গুণ তাঁতিরাম বড় সুকণ্ঠ ছিল। খঞ্জনী বাজাইয়া সে যখন দ্বারে দাঁড়াইয়া গাহিত :—

"মাগো সাধ করে কি তোর গোপালে চাই মা,
তোর গুণের গোপাল কি গুণ জানে বনে বন অন্ন পায় মা"

তখন মৌন পল্লীখানার বুকে বাৎসল্যরস উপচিয়া উঠিত। যৌবনে একবার মড়কে স্ত্রীপুত্র ও দুটি কন্যা হারাইয়া তাঁতিরাম আর সংসার করেনাই, কিছুদিন নিরুদ্দেশ ভ্রমণ করিয়া সে বৈষ্ণব বেশে ফিরিয়াছিল। সেই হইতে তাহার জীবনটা পরের জন্য যত অকাজে ভরিয়া উঠিয়াছে।

তাঁতিরামের গৃহস্থালীটি নিতান্ত ছোট ছিল না। ছোট কুড়েখানি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের সুদৃশ্য উপবীতটির মত শুচিতার মূর্ত্তি ধরিয়া গ্রামের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল। গৃহের পশ্চাতে একটী কূপওছিল। তাঁতিরামের সকল কাজের ব্যতিক্রম ঘটিলেও গৃহ ও প্রাঙ্গণ খানি নিকাইতে কখনও ত্রুটি দেখা যাইত না। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি গোময়লিপ্ত তুলসী মঞ্চ ; গ্রীষ্মকালে ঝরা দিবার জন্য বংশ খণ্ডে একটি ভাঁড় ঝুলিয়া থাকে। অঙ্গনের আশে পাশে গৃহের পশ্চাতে দক্ষিণে বামে পেয়ারা জাম কুল ও লিচু গাছের বাহুল্য দেখিবামাত্র বেশ বুঝা যায় কোথায় তাঁতিরামের এত ছেলে ধরবার ফাঁদ পাতা। নিঃসঙ্গ তাঁতিরামের সংসারে আরও দুটি প্রাণী ছিল, একটি তাহার মা মরা বেরাল ছানাটি আরটি তাহার অতি যত্নের গাভী যশোদা। প্রবাস যাত্রা কালে সে এই সাথীদুটিকে নিরুর জিম্মায় রাখিয়া আসিত।

উল্লিখিত রাত্রি অবসানে অতি প্রত্যুষেই তাঁতিরাম শয্যাত্যাগ করিল। কুয়াশায় দিগন্ত ছাইয়া আছে। সেই কুয়াশা ঠেলিয়া রূপসীকে বুকে ও যশোদাকে হাতে ধরিয়া তাঁতিরাম নিরুরমার গৃহে যাত্রা করিল,দূর হইতে অত প্রতুষ্যে গৃহে প্রদীপের আলো দেখিয়া সে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া ত্রস্ত পদে অগ্রসর হইল। গুণ গুণ করিতে করিতে প্রাঙ্গণে ঢুকিয়াই উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "এত ভোরে আলো জেলে বসে আছিস কেন দিদি ?"

গৃহমধ্য হইতে উত্তর আসিল, "মার কাশিটা বড় যে বেড়ে গ্যালো দাদা, বলিতে বলিতে নিরু ঈষৎ দরজা ফাঁক করিয়া তাঁতিরামকে অভ্যর্থনা করিল। রোগিণী কাশিয়া কাশিয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়া ছিলেন একটু সুস্থ হইয়া এতক্ষণে বলিলেন "যাচ্ছিস বাবা তাকে আনতে ?"

"তাই ভেবে ত বেরিয়েছিলাম মা, তা থাক না হয় কালই যাবো কি বলিস দিদি। অসুখটা যখন আবার," তাঁতিরামের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বিধবা সোদ্বেগে বলিলেন—"না বাবা সে ভয় নেই। তাকে একবার না দেখে আমি মরবো না রে তুই না গেলে ত আমি সোয়াস্তি পাবো না বাবা। গেলে বরং আশায় আশায় বেঁচে থাকবো। আমার কাশি দেখতে দেখতে ভাল হয়ে উঠলো। এই বারে সেরে উঠবো তুই বেরিয়ে পড় বাপ, বেলা হোলো।" সত্যই এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে প্রৌঢ়া যেন একটু বল পাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁতিরাম নিঃশব্দে নিরুর চোখে চাহিল। বালিকা ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইল। তখন অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল। একটু অনিচ্ছার সহিত দাওয়া হইতে নামিয়া বলিল 'তবে যাই মা এবার তাকে না নিয়ে আর ফিরছিনা এ তুমি দেখে নিয়ো। তুই কিছু ভাবিসনে দিদি গোবিন্দকে ডাক। আমি বরং কবিরাজ মশাইয়ের বাড়ীটা হয়ে যাব'খন, মা যশোদা, আসি গো মা।" এই বলিয়া গাভীটার গায়ে সস্নেহ হস্ত বুলাইয়া ধীর পদবিক্ষেপে তাঁতিরাম পথে উঠিল।

রসুলপুরের হাটে আজ ক'দিন ধরিয়া মহোৎসব বসিয়াছে। রায়বাবুদের ঘরের বাঁধালক্ষ্মী নাকি হঠাৎ শিকল কাটিয়া বেণের পো জটাধর মল্লিকের ঘরে আসিয়া হাঁটিয়া উঠিয়াছেন। তাই নূতন কর্ত্তার হাতে পড়িয়া রসুল-পুরের হাটে আজ তিন দিন ধরিয়া আমোদ-প্রমোদের রোস্‌নাই জ্বলিতেছে। পূর্ব্ব দুই দিন মধুকাণের গান ও পান্নার কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আজ রতন ভাঁড়ারীর দল সীতার বনবাস অভিনয় করিবে। লোকে লোকোরণ্য ; নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভিঁড় জমিতেছে।

এদিকে যাত্রাদলের সাজঘরে বিষম গণ্ডগোল। তাঁবেদার নিধিরাম অধিকারী মহাশয়ের গঞ্জিকার কলিকায়

নেপথ্যে ছুটো টান দিয়া এক বিশ্রী ব্যাপার ঘটাইয়া বসিয়াছে। কলিকাটি কর্ত্তার হাতে না দিয়ে টাকে ঢালিয়াছে। ওদিকে সীতা ঠকুরাণী বাঁকিয়া বসিয়াছেন। লাল বেণারসীখানা ও বড় ফাঁদি নথটী ছাড়িয়া তিনি কিছুতেই বনবাসে যাইবেন না। ফলে সাজঘরেই এক বীভৎস রসের অভিনয় চলিয়াছে।

ওদিকে আসরে মহা উৎসাহে আখড়াই সুরু হইয়াছে। অধিকারী মহাশয় টাকের জ্বালা ভুলিয়া লোম-বহুল বিশাল ভুঁড়িটি নাচাইয়া গজেন্দ্রগমনে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথম দৃশ্যে অযোধ্যার রাজসভা। প্রজাপারিষদে মিলিয়া সিংহাসনটি ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গঞ্জিকা সেবনে তাহাদের চোখ-মুখে যেরূপ লালিমা ফুটিয়াছে তাহাতে দর্শকমণ্ডলী মা জানকীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পূর্ব্বাহ্নেই আকুল হইয়া পড়িয়াছে। কুস্তীগিরের মতই তাহাদের তাল ঠুকিবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে ভ্রম হইতেছে যেন তাহারা বিংশ শতাব্দীর প্রজাতন্ত্রের ধুরন্ধর, আজ রামচন্দ্রকে বরখাস্ত করিতে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছে; কিন্তু হায় বুঝিবা তাহাদের এ উত্তেজনা নিজের আগুণে নিজেই পুড়িয়া মরে, কারণ রামচন্দ্রের এখনও সাক্ষাৎ নাই। অধিকারী মহাশয় হইতে দর্শকমণ্ডলী পর্য্যন্ত সকলে সোৎসুক দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ সাজঘরের পথে দৃষ্টিপাত করিতেছেন কিন্তু কই সে নবদূর্ব্বাদল শ্যামরূপ ত নয়নে পড়িল না! এমন সময়ে নিধিরাম আসিয়া অধিকারী মহাশয়ের কাণে নিম্নস্বরে কি বলিল। কথাগুলি কেহ শুনিতে পাইল না বটে, কিন্তু তচ্ছ্রবণে অধিকারী মহাশয়ের 'সূর্য্যিমামার' মত গোলাকার বদনমণ্ডল যে রজনীচর পক্ষীবিশেষকেও লজ্জা দিল—তাহা সকলেই উপলব্ধি করিয়া, আশু অমঙ্গলের সূচনায় সশঙ্ক হইয়া উঠিল।

কথাটা হইতেছে এই যে রমেন বোস্ বিগ্ড়াইয়াছে। চাঁদগাঁয়ের জমিদাররা অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একখানি শাল ও ১টী গিনি বখ্সিস্ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকারী তাহাকে ৮ টাকা আর পেটভাতের বেশী এক কাণাকড়িও দিতে রাজী নহে বলিয়া সে দুটী আত্মসাৎ করিয়াছে। ফলে রমেন আজ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে যে উক্ত বখ্সিস্ না পাইলে সে রাজসভায়ও যাইবে না, জানকীকেও বনবাসে পাঠাইবে না। এই কঠোর বারতা শুনিয়া অধিকারী রাগে দশটা হইয়া বিরাট বপু দোলাইয়া যথাসম্ভব ত্বরিত গতিতে সাজঘরে ছুটিলেন। তথায় ঢুকিয়াই তিনি বুঝিবা সেতার ভ্রমেই বেচারী রমেনের কর্ণে হস্তক্ষেপ করিলেন। রমেন এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না; রাগে ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া সে অধিকারীর গণ্ডে হস্ত প্রসারণ করিয়া যখন নাগাল পাইল না তখন সেই ঢক্কা-নিন্দিত, আপন গৌরবে আপনি নিমগ্ন ভুঁড়িটির উপরে একটী বিরাশী সিক্কা ওজনের মুষ্টি প্রহার করিয়া সাজঘর ত্যাগ করিয়া সেই জনসমুদ্রে কোথায় যে উধাও হইল তাহার কোনও তল্লাস মিলিল না।

সারাদিন পথশ্রমে ক্লিষ্ট তাঁতিরাম যখন রসুলপুরের হাটে পৌছিল ততক্ষণে রমেন পগার পার হইয়াছে। রামচন্দ্র অভাবে 'সীতার বনবাস' ফাঁসিয়া যায় দেখিয়া গ্রামের কয়েকটি রসিক যুবক মিলিয়া অধিকারী মহাশয়কে লইয়া তখন অগত্যা 'কীচকবধের' পালা জুড়িয়া দিয়াছে।

বহু অন্বেষণেও যখন রমেনের কোনও সন্ধান মিলল না তখন তাঁতিরাম অগত্যা প্রত্যুষেই গৃহে ফিরিবে সংকল্প করিল। কারণ রোগিণীর অবস্থা তাহার নিকট তত আশাপ্রদ বোধহয় নাই। নিধিরামকে কিছু জলপাণি দিয়া সে একখানি বালির কাগজ ও একটি খাগের কলম সংগ্রহ করিল। সকাল হইতে দশ ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার যত না শ্রম হইয়াছিল, এই বিচিত্র পত্রখানি শেষ করিতে গলদঘর্ম্ম তাঁতিরামের মুখে তাহার দ্বিগুণ ক্লান্তি ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণপ্রাণ কলমটিও নিদারুণ পীড়নে অচিরাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ছিরি ছিরি গোবিনদো পদো ভর্ষা।

রোশুলপুর স্মুকুরবার।

মান্নোবর রমেনদোর বাবু—

বহু পথ হাঁটিয়া অপোণকার শাখাত পাই না। জানাইতেচী যে আপোণকার সাস্থরু ঠাকুরাণি নীমোনী রোগে

শর্গাসাই। জিবোণ শঙশএ দেখিতে চাহেন জোদি শত্তর কোরে আশীবেন। ওনোথা না হয়। ইতি—

শেবোক
ছিরি তাঁতীরাম।

সদ্যজাত শিশুটির আপাদ মস্তক বারংবার দেখিয়াও যেমন জননীর তৃপ্তি হয় না, চিঠিখানি নানা ভঙ্গীতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়াও তেমনি তাঁতিরামের স্নেহের ক্ষুধা মিটিল না। সে অতি অনিচ্ছার সহিতই অগত্যা সেখানি নিধিরামের জিম্মা করিয়া প্রত্যুষে রসুলপুর ত্যাগ করিল।

তাঁতিরাম প্রস্থান করিবার প্রাক্কালে বিধবার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনপ্রদীপ একবার উজ্জ্বল হইয়া আবার ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিল। বালিকা মাতার এই অবসাদে শঙ্কিতা হইয়া তাহাদের ধনী জ্ঞাতিবর্গের দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া ফিরিল। কিন্তু ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে কাহারও তেমন আগ্রহ দেখা গেল না; বরং অকস্মাৎ গৃহে গৃহে পেটকামড়ানি, মাথাধরা, বাতের ব্যথা প্রভৃতি নানারূপ রোগের আবির্ভাব হইল, এই ত গেল বয়স্কদের কথা। ওদিকে আবার বাড়ীর গিন্নিরা তাঁহাদের ষষ্ঠীর দাসদের কল্যাণ চিন্তায় অতিমাত্র সজাগ হইয়া উঠিলেন। ফলে মুমূর্ষুর অন্তিম শয্যাটী প্রতিবেশীদের কোলাহলে শরশয্যায় পরিণত হইল না। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে তিনি শিশু দুটিকে বুকে চাপিয়া পরম মুক্তির শেষ নিশ্বাসটি লইলেন। কিন্তু নিরু তাহা বুঝিল না। সারাদিনের রোগ-যন্ত্রনীয় শ্রান্ত জননীকে নিদ্রাতুরা কল্পনা করিয়া সে পরম তৃপ্তি অনুভব করিল। অলক্ষ্যে কোন নিষ্ঠুর দেবতা যে তাহাদের লইয়া কঠোর পরিহাস করিলেন শিশু দুইটিও তাহা বুঝিল না। তাহারা মৃতার বুকে নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায় সাহিত্য সরস্বতী

জন্মতঃ কেহই বড়, কেহই ছোট নয়। সেই সামাজিক সুব্যবস্থাই সুব্যবস্থা, যাহা জন্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে তাহার শক্তি ও চেষ্টা অনুসারে যে কোন দিকে ভাল ও বড় হইবার, সমাজ-সেবক হইবার সমান সুযোগ দেয়। এইজন্যই আচার্য্যদেব তীব্র ঘৃণা ও আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন যে, এ সমাজ পূতিগন্ধময়—ইহাতে প্রলেপ চলেনা, ইহার Surgical Operation চাই। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বাঙ্গালী নাকি একদিন অগ্রণী ছিল—আজ অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছাইয়া পড়িতেছে। কংগ্রেসের একজন নেতা পরলোকগত পরমেশ্বর পিলে এই জন্য তাঁহার "Representative Indians" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে দেশে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকের জন্ম হইয়াছে—বাঙ্গালী জীবনের দৈনন্দিন ইতিহাস ও কার্য্যপদ্ধতি আলোচনা করিলে মনে হয় সে দেশ হইতে সমাজ সংস্কার ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। এই সংস্কার জন্য চাই, বিদ্রোহ এবং সেই বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণের জন্য আচার্য্যদেব দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল বাঙ্গালী যুবককে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আচার্য্যদেব ১৯০৬ অব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "বাঙ্গালী যুবক নিজের স্বার্থের জন্য

নয়—যশের জন্য নয়—দেশোদ্ধার হইবে এই ধারণার উপর কার্য্য করিয়া অম্লানবদনে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে শিখিয়াছে, কিন্তু সমাজসংস্কার কার্য্যে তাহাদের পাওয়া যায় না ইহার কারণ কি? যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের সম্মুখে যে বুক ফুলাইয়া এগিয়ে যায় সে বীরপুরুষ বটে, কিন্তু যাঁহারা সমাজকে টানিয়া তুলিতে গিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া, বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে গিয়া, আজীবন সমাজের অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করেন, তাঁহাদের বীরত্ব অতুলনীয়, যদিও সাধারণের চক্ষে এই বীরত্বের সম্মান অনুভূত হয় না।" সমাজের ভিতর গুণ্ডামি ও কপটাচরণের অন্তঃসলিলা প্রবাহিত হইবার পথ রুদ্ধ করিবার বাসনায় আচার্য্যদেব উল্লিখিত বাণী জাতির প্রাণ যুবক-সম্প্রদায়ের কর্ণে পৌছাইয়া দিয়াছেন। আচার্য্য দেব ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে Indian Social Conferenceএতে সভাপতির অভিভাষণে সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তাঁহার প্রাণের দরদ দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। আজ শুভক্ষণে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাঁহার বাণী ও মহৎ আদর্শের রেখাপাত হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজ তার হৃত বিশিষ্টতা ও উদারতা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে এবং ত্যাগ ও বীরত্বের মহিমা বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস উজ্জ্বল করিবে।

এস্থলে কিন্তু ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আচার্য্যদেব সংস্কার-প্রয়াসী হইলেও ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া অন্ধসংস্কারের বশবর্ত্তী হন নাই বা প্রশ্রয় দেন নাই। পুরাদস্তুর খাঁটি স্বদেশীই রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সংস্কার-প্রয়াসীর চরিত্রের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি পাঁচ বার ইউরোপ গিয়াছেন এবং প্রায় আট বৎসর তথায় কাটাইয়াছেন তথাপি তিনি পাশ্চাত্য দেশীয় ফ্যাশন দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার একেবারে অনাড়ম্বর, বিলাসিতা-বর্জ্জিত। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরবময় স্যর. (knight) উপাধি দ্বারা ভূষিত হইলেও দেশবাসীর নিকট তিনি স্যর পি, সি, রায় রূপে পরিচিত না হইয়া প্রাচ্য দেশোচিত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রূপে সমধিক পরিচিত হইয়াছেন। আচার্য্যদেবের সরল ঋষিজনোচিত প্রকৃতি ও চরিত্র তাঁহার ছাত্রগণের চরিত্রগঠনে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। plain living and highthinking তাঁহার জীবনেরআদর্শ এবং পুরাদস্তুর এই আদর্শের কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আচার্য্যদেব প্রকৃত পক্ষেই আচার্য্য। নিজের আচার বা কার্য্যের দ্বারা তিনি প্রকৃত আচার্য্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রাচীনকালে গুরু শিষ্যের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল বর্ত্তমান যুগে আচার্য্যদেব ও তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

কি ভাবে অবাঙ্গালীর হস্ত হইতে বাঙ্গালীর ধন রক্ষা করা যায়, কি ভাবে বাঙ্গালী দু'টো অন্ন সংস্থান করিয়া নিজেদের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখিতে পারে তাহাই দেশবাসীর নিকট ত্রিশ বৎসর যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন চীৎকার করিয়া আসিয়াছেন। এমন একদিন ছিল যখন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সহজে চাকুরী জোটা। ভবিষ্যতের আশার আনন্দে সুখের স্বপন দেখতে দেখতে ৭।৮ বৎসর আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে খুব জাঁকাল রকম ডিগ্রি নিয়ে বাঙ্গালী যুবক যখন কলেজ, অধ্যাপক, আর্টস, সায়েন্স প্রভৃতির হাওয়া থেকে আসিয়া একেবারে শক্ত মাটির পৃথিবীতে দাঁড়াইত তখনই বুঝিত যে এই বস্তুর হাটে সে নিতান্তই নিঃসম্বল —এ বাজারে বেচাকেনা করিতে হইলে যে যোগ্যতার দরকার মল্লিনাথের টীকায় বা এম, এ ক্লাসের অধ্যাপকের পাশকরানো নোটে কোথায়ও তার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। ত্রিশ বৎসরের বাঙ্গালী যুবক সংসার-জ্বালায় জর্জ্জরিত, চক্ষু নিষ্প্রভ, দুর্দ্দশাগ্রস্ত, মুখে আনন্দ চিহ্ন নাই,—দেখিয়াথ সত্য সত্যই প্রাণ কাঁদিয়াছিল আচার্য্যদেবের এবং তাই তিনি এই জীবনসন্ধ্যায় তাঁহার জীবনের বড় আদরের বিজ্ঞান-পরীক্ষাগার থেকে বাইরে এসে বাঙ্গালীর উৎকট অন্নসমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর আজ পেটের দায়। 'আগে পেট ভরে খাও তবে ধর্ম্ম হবে' বিবেকানন্দের এই বাণী তিনি প্রচার করিয়াই নিরস্ত হইলেন না—নিজে দাঁড়ালেন আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে। আজ তারই ফলে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন আরম্ভ করেন তখন কুলির মতন নিজে খাটিতেন।

কয়েক বৎসরের সঞ্চয় হইতে মাত্র ৮০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া বেঙ্গল কেমিক্যাল আরম্ভ করেন,—এখন তার মূলধন অনেক লক্ষ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাঙ্গালীর প্রখর মস্তিষ্কের ও সমবায় প্রণালীতে কার্য্য করিবার শক্তি জগতের নিকট প্রমাণিত হইয়াছে! বেঙ্গল কেমিক্যাল Calcutta Soap Works, Bengal Canning and Condiments Works, Bengal Miscellany ইত্যাদি কয়েকটী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানে ইতর ভদ্র অসংখ্য লোক নিযুক্ত হইয়া অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিতেছে।

প্রকৃত পক্ষে আচার্য্য দেবের দৃষ্টান্তে আজ বাঙ্গালীর মিথ্যা সম্মানের মোহ কাটিয়া গিয়াছে। এখন ধোপ-দুরস্ত অথচ জরাজীর্ণ বাঙ্গালীর 'বাইরে কোঁচার পত্তন ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন' আর বরদাস্ত হয়না। এখন বাঙ্গালী পোষাকী জীবনে ও আটপৌরে জীবনে পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টা পাইতেছে। গৃহে অন্ন-সংস্থান নাই অথচ ডান হাতে খাইবে কি বাম হাতে খাইবে তার গবেষণায় মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতেছে না। এখন বাঙ্গালী বুঝিতে পারিয়াছে যে, 'পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়লে আর পাখীর ডাকে জাগলে' চলিবে না। এখন তাহারা শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। আচার্য্য দেবের সংস্পর্শে ও প্রেরণায় আজ বাঙ্গালী "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ, উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।" কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উক্তি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছে।

আচার্য্য দেবের দেশ-সেবা ও দানশীলতার কথা বাঙ্গালাদেশের সকলই অবগত আছেন। কত অসংখ্য দরিদ্র ছাত্র যে তাঁহার সাহায্য পাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাঁহার দানও অল্প নহে। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠদান খাদি ও চরখা প্রচার। তিনি এইজন্য তাঁহার জীবনের যথা সর্ব্বস্ব দেশের কাজে উৎসর্গ করিয়াছেন, বাঙ্গালী কেন সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার এইরূপ দান ও স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি কারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির উপযোগিতা বুঝিয়াও, চরখার শক্তিতে আস্থাবান হওয়া ও তার প্রচার উদ্দেশ্যে যথাসর্ব্বস্ব দান তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মহাত্মা গান্ধীর চরখা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যে অদম্য চেষ্টা ও উৎসাহের সহিত ইহার প্রচার কার্য্যে আচার্য্যদেব আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা একদিন জাতির ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে স্থান পাইবে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীদের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন কল্পে তাঁহার গঠিত রিলিফ কমিটি বর্ত্তমান যুগের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে কোন স্থানে বন্যা বা ঝটিকা প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপ্লবে দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারী গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিত আর এই জাতি জাতিরই দুরবস্থার কথা সংবাদ পত্রের স্তম্ভে পাঠ করিয়া বৃথা সহানুভূতির ভাণ প্রদর্শন করিত। আচার্য্যদেব এই বৃদ্ধ বয়সে নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও খুলনা, উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গ প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িতের করুণ আর্ত্তনাদে স্থির থাকিতে পারেন নাই। দেশের লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত ভাই ভগ্নীদের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আচার্য্যদেবের অনুকরণে অসংখ্য যুবক স্কুল কলেজের পাঠ স্থগিত রাখিয়া তাঁহার পশ্চাদনুবর্ত্তী হইয়াছিল। এমন কি বারাঙ্গনাগণও তাঁহার আহবানে স্থির থাকিতে পারেন নাই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভাই ভগ্নীদের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক আচার্য্যদেবের হস্তে প্রদান করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে ইহাতে জাতির ভাবধারা বদলাইয়া গিয়াছে।

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আচার্য্যদেবের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও নানাপ্রকার কার্য্য সূচীর আলোচনা করা অসম্ভব। আচার্য্য-দেব প্রকৃতপক্ষে গীতার একজন সত্যকার নিষ্কাম কর্ম্মযোগী। সপ্ততিবর্ষাধিক বয়ঃপ্রাপ্ত রুগ্ন আচার্য্যদেবের কর্ম্মোন্মাদনা সমগ্র ভারতবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছে। আজি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম শুধু বাঙ্গালা দেশে কেন ভারতের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। তাঁহার জ্ঞান গরিমা

অসাধারণ বিজ্ঞানচর্চ্চা, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদগুণরাজি সর্ব্বোপরি তাঁহার অনাড়ম্বর ঋষিকল্প পূত চরিত্র, সরল কোমল অন্তঃকরণ সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল ছাত্রসমাজের একাধারে গুরু বন্ধু ও সহায় তাঁহার ন্যায় আর কে আছেন ? দেশ-হিত ব্রতে তাঁহার কঠোর অথচ অনাড়ম্বর স্বার্থত্যাগ, জাতীয় শিল্পের ও বিজ্ঞান চর্চ্চার উন্নতিকল্পে তাঁহার অসীম উদ্যম ও আজীবন চেষ্টা, সমাজের সংস্কার সাধনে তাঁহার উদ্যম ও অকুতোভয়তা প্রভৃতি বর্ত্তমানযুগে একাধারে অতি বিরল।

শ্রাবণ

শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঘোষ

ক্ষ্যাপা শ্রাবণ এল ফিরে মেঘে মেঘে তার
এলায়ে মলিন রুক্ষ দীর্ঘ জটা ভার।
বজ্রমুখে বম্ বম্ উচ্ছ্বাসে আকুল,
রুদ্রকরে শোভে ভীম ঝঙ্কার ত্রিশূল।
ক্রোধবিকম্পিত বাম করধৃত তার
ভৃঙ্গার উছলি' ঝরে বাদলের ধার।
কুটিল কটাক্ষে বহ্নি বিদ্যুৎ বিভায়
অভিশপ্ত বিশ্বপানে তীব্র বেগে ধায়।
মেঘগর্জ্জে ঘন ঘন, প্রলয় বিষাণ
বাজায়ে নাচিছে ক্ষ্যাপা নিশি দিনমান।
সে নৃত্য-চঞ্চল-চল পদতলে পড়ি,
ছিন্নমূল দ্রুমদল যায় গড়াগড়ি—
গড়া গড়ি যায়—বিশ্ব রসাতলে যায়,
ক্ষ্যাপা শ্রাবণ এল ফিরে রুদ্রের লীলায়।



উদয়-তারা

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)

শ্রীসুনীলকুমার ধর

নরেন বলিল—বছর কয়েক আগে আমিও একজন মস্ত-বড় প্রেমিক ছিলাম ভাই, তখন মনে হোত যে কোন সুন্দরী মেয়েকেই আমি সর্ব্বান্তকরণ দিয়ে ভালবাসতে পারি—এবং এমনও ভেবেছি আমার ভালবাসা কোন একটি মাত্র মেয়ের জন্যেও নয়! এখন মনে হয় 'প্রেম, প্রয়োজন' মাত্র—আজ রাতের প্রেমকে কালকের দিনের আলোয় আর খুঁজে পাওয়া যায় না—এমনি ছোট সে প্রয়োজন!

—আমার মনে হ'চ্ছে নরেন, কোন একটি মেয়েকে তুমি একান্তভাবে ভালবাসবার চেষ্টা কোরেছিলে—কিন্তু ছেলেবেলায় কল্পনার তুলী দিয়ে যে একটি মেয়েকে নিজের মনের উপর তুমি এঁকে রেখেছ, সে আজও তোমায়···

প্রকাশের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাধা দিয়া নরেন বলিল—কথাটা কতকটা ঐ ধরণের বটে, কিন্তু ঠিক ও নয়। শয্যাসঙ্গিনী হবার মত অনেক মেয়ে এসে জুটেছে, অথচ যাকে নিয়ে বেঁচে থাকা চলে এমন একটি মেয়ের দেখা আজও পেলাম না—

প্রকাশ বলিল কিন্তু তোমার জীবনে একটি মেয়ের ভালবাসার একান্ত প্রয়োজন, নইলে...

কথা শেষ না করিয়াই প্রকাশ নরেনের মুখের দিকে তাকাইয়া ম্লান একটু হাসিল। অন্ধকারে নরেন সে হাসি দেখিতে পাইল না বটে কিন্তু অনুভব করিল।

—সকল পুরুষের জীবনেই নারীর ভালবাসার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজনকে সংক্ষিপ্ত কোরে নিতে না পারলে আমি পট এঁকে আর তুমি পদ্য লিখে দিন কাটালে ত' কোন ক্ষতি ছিল না—

প্রকাশ বলিল—কথাটা সত্যি, নরেন। এখন মনে হ'চ্ছে এমনি ভাবে আত্মবঞ্চনা কোরে এ পথে না এলেই যেন ভাল হোত—

নরেন বলিল—তার মানে তুমি এখন ফিরে গিয়ে আর সকলের মত হ'তে চাও—দিন আনা, দিন খাওয়া!

—এই সঙ্কীর্ণ দিন গুজরানের মধ্যে দুঃখ-দৈন্য অনেক আছে জানি—ওরকমভাবে দিন কাটানো মানে আত্মহত্যা, তাও স্বীকার করি—কিন্তু আত্মবঞ্চনা নেই, ভাই! পরকে বঞ্চনা কোরে রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয় না—কিন্তু নিজেকে ছদ্মবেশ পরানর চেয়ে বড় জ্বালা আর নেই—ঠিক রাজার ভূমিকায় অভিনয় করার পর ময়লা বিছানায় বিনিদ্র বাকি রাতটুকুর মত!—সে কি দুঃসহ অস্বস্তি......

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নরেনকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রকাশ বলিল—উঠ্‌লে যে?

—এখানে আমার থাকবার উপায় নেই—

বিস্মিত হইয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

—কেন, সে কথা কি তোমাকে এখনও বুঝিয়ে বোলতে হবে—এরি মধ্যে কি সব ভুলে গেছ প্রকাশ !

—কোন কথাই ভুলিনি, ভাই, তবুও আত্মবঞ্চনা কোরতে পারব ন,—

প্রকাশের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাধা দিয়া নরেন বলিল—তার মানে তুমি বরুণার সঙ্গে বাকী আয়ুটুকু কাটাতে চাও, বেশ, কিন্তু তুমি কি মমতাকেও ভুলে গেছ ; যে মমতাকে নইলে তোমার একটি সন্ধ্যাও কাটত না এবং সন্ধ্যা বেলা যার সঙ্গে নিরিবিলিতে বেড়াবার লোভে নানা উপায়ে আমাদের চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা কোরেছ ?

প্রকাশ বলিল—জীবনের পথে কত লোকের সঙ্গেই ত' দেখা হ'য়েছে সকলকেই কি আর মনে আছে, না, রাখা সম্ভব। তবুও মমতাকে ভুলিনি কিন্তু প্রয়োজনের পর তাকে মনে কোরে রাখবারও দরকার মনে করিনি—

বেশ একটু ব্যঙ্গের সুরে নরেন বলিল—ভাল, বরুণার সঙ্গেও তোমার প্রয়োজনের একদিন ঠিক এমনি কোরে শেষ হবে, না ?

—নিশ্চয়, এর চেয়ে প্রবলতর প্রেম যদি কোন দিন আমাকে পাগল কোরে তোলে, বরুণার চোখের দিকে বা তার দেহের দিকে তাকিয়ে এতটুকু মোহ আমার হবে না।

ক্যাম্পের দুয়ারের দিকে আগাইয়া যাইতে যাইতে নরেন বলিল—বাংলাদেশে না জন্মে তোমার প্যারীতে জন্মান উচিত ছিল। কি বিশ্বাসী দেশ-সৈনিক !

নরেন চলিয়া গেল। প্রকাশ তাহাকে ডাকিল না বারণও করিল না। ও জানে নরেনের মত ছেলেদের পিছনে ডাকিয়া ফিরান যায় না, ওরা প্রকাশ নয়। কবি প্রকাশ, যে প্রকাশ নারীর দেহ ঘিরিয়া স্তব গান করিয়াছে আর তাহার নাম দিয়েছে দেশ সঙ্গীত !

অত্যন্ত অবসন্নের মত শয্যার উপর দেহ এলাইয়া দিয়া প্রকাশ ভাবিতে লাগিল, যে মানুষ দেহের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া নিজেকে একটি বৃহৎ আদর্শের জন্য পাগল করিতে পারে তাহার জীবনে কি অবসাদ নাই, বিশ্রাম-আকাঙ্ক্ষা নাই। পৃথিবীতে বাস করিয়া মাটির আকর্ষণ সে কি করিয়া উপেক্ষা করে !

ভাবিতে লাগিল—আর ঐ অবনী, বন্ধুত্বের চেয়ে পৃথিবীর সকল সুখের চেয়ে বড় কোন্ নেশায় নিজেকে একেবারে পরিচিত পৃথিবীর আড়ালে ঢাকিয়া রাখিয়াছে অথচ একদিন তাদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল এক, লক্ষ্য ছিল এক। আজ এ রাত্রে সে হয়ত কোথাকার কোন এক কুলীবস্তিতে হতভাগ্য ভিখারীদের সঙ্গে ছিন্ন শয্যা আশ্রয় করিয়া তাহাদের তন্দ্রাতুর চোখের সামনে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সে এক অদ্ভুত পৃথিবীর কথা, যে পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বড় কেহ নাই—যে পৃথিবীতে মানুষ মানুষের টুটী টিপিয়া ধরে না। কিন্তু নরেন বলিয়াছে গতবার যখন তাহার সঙ্গে অবনী হাজতে ছিল, বিচারের শেষ দিন সে তাহাকে বলিয়াছে—বহুদিন পূর্ব্বে অবনী নাকি একটি মেয়ের পাণি-পীড়ন করিয়াছিল। তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় ছিল না, অবনীকে লইয়া জেলের গাড়ী তখন চলিতে সুরু করিয়াছে নইলে নরেন বলিয়াছে, সে জিজ্ঞাসা করিত কতদিন পূর্ব্বে অবনী বিবাহ করিয়াছে এবং কেনইবা সে এতদিন এ কথা গোপন রাখিয়াছিল।

প্রকাশ ভাবিতেছে—অবনী এতদিন বিবাহের কথা গোপন রাখিয়া সেদিনই কেন নরেনকে সে কথা জানাইল আর এমন সময় জানাইল, যখন একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিবার সময় ছিল না। না জানাইলে যখন কোন ক্ষতিই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না তখন সে বলিলই বা কেন ? কোথায় সেই অবনীর স্ত্রী...

প্রকাশ যখন এইসব কথা ভাবিতেছে বরুণা ধীরে ধীরে আসিয়া প্রকাশের ক্যাম্পে প্রবেশ করিল। বরুণাকে অমন নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতে দেখিয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—এত রাত্রে অমন ভয়ে ভয়ে তুমি কি মনে কোরে বরুণা ?

একটু পূর্ব্বে বরুণা নরেনকে ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছে এবং সে মনে করিয়াছিল—প্রকাশ এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাই প্রকাশের এই আচমকা প্রশ্নে সে নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন ও লজ্জিত অনুভব করিল। প্রকাশের শয্যার দিকে আর এক পাও আগাইতে না পারিয়া স্তব্ধভাবে

মাঝপথে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—আমি এখান থেকে পালাতে চাই, প্রকাশ।

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া প্রকাশ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—পালাতে চাও, কোথায় পালাতে চাও? দাঁড়িয়ে রইলে কেন এগিয়ে এসে বসো—

কুণ্ঠিতভাবে প্রকাশের শয্যার এক পাশে বসিয়া বরুণা বলিল—আমি কলকাতায় ফিরে যেতে চাই—

বরুণার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ বলিল—কিন্তু তুমিত জানো পুলিশ আমাদের চায়, আর পুলিশের হাত এড়িয়ে তুমি কোথায় যাবে!

অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে বরুণা বলিল—কিন্তু যে রকমেই হোক পুলিশের হাত এড়িয়ে আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে।

একটু ম্লান হাসিয়া প্রকাশ বলিল—পুলিশের হাত এড়িয়ে কোথায় যাবে বরুণা, কলকাতায় কি পুলিশ নেই!

প্রকাশের ঐ ম্লান হাসিটুকু বরুণার দৃষ্টি এড়াইয়া গেল না। সে প্রকাশের দু'খানি হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ও আমি জানি তবুও যা কোরেই হোক আমাদের পালাতে হবে—

বরুণার হাত হইতে নিজের হাত দুখানি ইচ্ছা করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—আমাকেও কি তোমার সঙ্গে যেতে হবে নাকি?

মুখ নীচু করিয়া বরুণা বলিল, হ্যাঁ।

—অদ্ভুৎ তোমার অভিনয়, বরুণা! কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারব না। কাল সকালে আমি ধরা দেব।

—কি কোরলে তুমি বিশ্বাস কোরবে,প্রকাশ, যে, এতদিনের অভিনয় আজ সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ধরা দিতে পারব না, তুমিও না—

ম্লান হাসিয়া প্রকাশ বলিল—বেশ তুমি কাল কলকাতায় চলে যাও, আর—

—আর তুমি?

—একজনকে ত ধরা দিতেই হবে—

কিছুক্ষণ বরুণা কোন কথা কহিল না তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল—কোন উপায়েই কি আমাদের দুজনের একসঙ্গে পালানো চলে না—

—পালানো হয়ত যায়, কিন্তু আমি পালাতে চাইনে।

—কেন?

—কেনর জবাব নেই বরুণা। আজ সকালেও তুমি যদি আমাকে কোথাও যাওয়ার কথা বোলতে আমি হয়ত অস্বীকার কোরতে পারতাম না, কিন্তু এখন—

—থামলে কেন প্রকাশ, বলো, এখন কি—

—এখন তোমার সঙ্গে যাওয়া অসম্ভব—

কিন্তু কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশের মনে হইল, কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে বোধ হয় ভাল হইত এবং বরুণা আরও স্পষ্ট করিয়া তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিত। বরুণা বলিল—এইবল্লে পালানো যায় কিন্তু তুমি পালাবে না; আবার বোলছ অসম্ভব। কি তুমি বোলতে চাও স্পষ্ট কোরেই বলোনা—

প্রকাশ বলিল, আমি যাব না এর চেয়ে স্পষ্ট করে আমি বোলতে পারি না—

—কিন্তু এর চেয়ে স্পষ্ট হোতে তুমি যদি বোলতে, বরুণা, সস্তায় নাম করার যে সুযোগ আমি পেয়েছি সে সুযোগ আমি ছাড়তে পারব না এবং আরও স্পষ্ট হোত যদি বোলতে —কিছুদিন পরে তোমার মত অনেক মেয়ে আমাকে ঘিরে চারিপাশে গুঞ্জন করে বেড়াবে, অতএব তুমি বিদায় হও—

বরুণার কণ্ঠস্বরে এমন একটা তিক্ততা ও ঝাঁঝ ছিল যে রাগের মাথায় প্রকাশ তাহার প্রতিবাদ করিতে গেল কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না। অথচ কিছু বলিতে না পারিয়া সে যে কি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল বলা যায় না।

বরুণা বলিল, কেমন এই ত তোমার মনের কথা?

মৃদুস্বরে প্রকাশ বিলল, তোমার কাছে কথাটা হয়ত এমনি দাঁড়াবে—

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বরুণা বলিল, মিথ্যা কেন কথাটা ঘুরোবার চেষ্টা কোরছ!

—কিন্তু আমিও বলি, বরুণা, তোমার সঙ্গে আমার কি এমন সম্পর্ক আছে যার জন্যে তোমার কথা আমাকে শুনতে হবেই; আর আমি ক'লকাতায় ফিরে যাই বা ধরা দিই তার জন্যে তোমারই বা এত মাথাব্যথা কেন?

বরুণা এর উত্তরে কি বলিতে গেল কিন্তু একটি কথা বলিবার পূর্ব্বেই প্রকাশের ক্যাম্পের দুয়ারে আসিয়া যে দাঁড়াইল, সে নরেন। বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে ও বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—আসতে পারি কি ?

প্রকাশ হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম—না জানি এতক্ষণে কতদূরে গেলে—

প্রকাশের কথায় কান না দিয়া নরেন বরুণাকে একটি ছোট নমস্কার করিয়া বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলিল—অত্যন্ত অন্যায় করিচি, ক্ষমা করুন! এবং বরুণাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—আপনিই বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন না ?

বরুণা মাথা দুলাইয়া স্বীকার করিল।

নরেন বলিল—ছিঃ, ছিঃ —আপনি হয়ত ভাবছেন যে আমি ইচ্ছা কোরেই ফিরে এসেছি, কিন্তু সত্যি কোরে বলছি......

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল—আহা, তার জন্যে এত লজ্জিত হবারই বা কি আছে !

নরেন বলিল—এত তোমার কথা, কিন্তু অপর পক্ষের ত......

মৃদু হাসিয়া বরুণা বলিল—আমি কিন্তু তার জন্যে এতটুকুও বিব্রত হইনি, নরেনবাবু, বরং আপনি যে ফিরে এসেছেন এটা ভালই হোল—

বিস্মিতভাবে নরেন জিজ্ঞাসা করিল—কেন বলুন ত ?

—আপনার বন্ধুর এত বড় একটা ত্যাগ আপনি নিজের চোখে দেখে যেতে পারবেন !...

বরুণার স্বরে টিপ্পনীর এমন একটা গর্ব্বিত ও উদ্ধত ভঙ্গী ছিল যে নরেন বিস্মিত না হইয়া পারিল না—আর তাহার কাঁটা প্রকাশকে ঠিক তেমনি তীব্রভাবে বিঁধিল। প্রকাশের দিকে তাকাইয়া নরেন জিজ্ঞাসা করিল—ঠিক বুঝ্‌তে পারছি নে......

বরুণা মনে করিয়াছিল নরেনের এ প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ যা হোক একটা জবাব দিবেই কিন্তু মিনিট দুই কাটিয়া গেলেও প্রকাশকে নীরব দেখিয়া বরুণা বলিল—তোমার লজ্জা কোরছে বোলতে, আমি বলছি! এই স্বল্পান্ধকার ঘরে আমাদের প্রেমাভিনয় কেবল সুরু হয়েছিল, একটি 'চুম্বন বিনিময়' পর্য্যন্ত তখনও হয়নি, এমনি সময় আপনি ভগ্নদূতের মত হাঁকলেন, আসতে পারি কি, অর্থাৎ জানিয়ে দিলেন ওটা কিছুক্ষণের জন্যে—হয়ত বা চিরকালের জন্যে মুলতুবি থাক—

কথা শেষ করিয়াই বরুণা এমন কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল যে তাহার সেই ধারালো হাসির প্রতি টুক্‌রা গিয়া বিঁধিল প্রকাশ ও নরেনের বুকে। অপমানের বেদনায় প্রকাশ বিবর্ণ হইয়া উঠিল আর নরেন ভাবিল কোন রকমে ক্যাম্পের বাহিরে যাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে !

প্রকাশ কোন প্রতিবাদ করিল না এবং নরেনও নীরব রহিল দেখিয়া বরুণা পুনরায় বলিল—ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার কোরে বোলতে গেলে এই দাঁড়ায়—আপনার বন্ধু দেশ সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেটের জন্যে কাল সকালে পুলিশের হাতে ধরা দেবেন বোল্‌ছেন, আমি বলছি কাজ নেই ওসব ঝঞ্ঝাটে, তার চেয়ে কলকাতায় চলো—কিংবা অন্য কোন যায়গায়—যেখানে গিয়ে দু'জনে—আপনাদের কবির ভাষায় যাকে বলে 'নীড়' রচনা করা যাক্‌। কিন্তু হঠাৎ দেশপ্রেম ওঁর এত প্রবল হ'য়ে উঠেছে যে, এত রাত্রে আমার মত মেয়ে একা একা ওঁর ঘরে এসে সাধ্য-সাধনা কোরেও মত বদলাতে পারছে না! আপনার বন্ধু একজন প্রকৃত—মার্ট্যার! সত্যি, আমি যদি কবিতা লিখতে পারতাম......

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিয়া উঠিল—বড্ড বেশী এগিয়ে যাচ্ছ, বরুণা,

—বড্ড বেশী, না!

প্রকাশ আর কোন কথা কহিল না। নরেনের দিকে ফিরিয়া বরুণা বলিল—দেখুন, সত্যি কথা বোলতে কি, দেশ-সেবা আমার দ্বারা হবে না—এর চেয়ে আশ্রমে ফিরে গিয়ে কাঁথা সেলাই বা তরকারী কোটা এমন কি মালা জপাও ঢের ভাল !

এতক্ষণে বরুণাকে যেন হাতের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে মনে করিয়া বরুণার কথা শেষ হইতেই প্রকাশ গলার স্বর বেশ একটু বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—কেন গো, তোমার স্ত্রী-স্বাধীনতা, 'স্ত্রী-সাম্যবাদ' এসব গেল কোথায় ?

বরুণাও ভাবিল এতক্ষণে সে প্রকাশের গোপন দুর্ব্বলতাকে আঘাত করিতে পারিয়াছে, তাই সেও কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক নাটকীয় করিয়া বলিল—তোমার মত পুরুষ যে দেশে ঘরে ঘরে—আর যারা পথের মোড়ে মোড়ে কথার জাল দিয়ে মেয়ে ধরার ফাঁদ পেতে রেখেছে, সে দেশে মেয়েরা কাঁথা সেলাই, তরকারী কোটা—রান্না-বান্না আর মালা জপা ছাড়া কি কোরবে ?

নরেন বলিল—কিন্তু একটু আগে আপনিই ত বলছিলেন যে,—

—কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস কোরতে পারবেন যে, আপনার বন্ধু চান আমরা দু'জনে একসঙ্গে জেলে যাই, তাতে দেশ-সেবকের সভায় ওঁর সম্মানও বাড়বে অথচ রোমান্সও হোল ?

বাধা দিয়া প্রকাশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিল—বরুণা ?

বরুণা তখনও হাসিতেছে, বলিল—নইলে কলকাতা থেকে আমাকে এখানে টেনে আনা এবং আজকের সন্ধ্যায় গোলঘরের ছাদে আমাকে প্রেমের কবিতা না শুনিয়ে জন-গণের কাব্য শোনাবার আর কোন মানে হয় না, প্রকাশ—

প্রকাশ বলিল—কিন্তু আমি ত তোমাকে জোর কোরে ধরে আনি নি কিংবা নিজে যেচে তোমাকে কবিতা শোনাই নি, তুমিই ত'—

বরুণা বলিল—মুখে না বলে প্রকারন্তরে ঐ ত তুমি আমার কাছে চাচ্ছিলে

বরুণার বাড়াবাড়ি দেখিয়া প্রকাশ মনে মনে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়াছিল তাই এবার বেশ একটু চড়া সুরেই বলিল—অপরের মনের কথা বুঝে দান করবার মত উদারতা তোমার কবে থেকে হোল, বরুণা—

বরুণা বুঝিল বাণ ঠিক জায়গায় বিঁধিয়াছে, তাই বেশ একটু ফ্লার্টিং-সুরে বলিল—অমরেশকে যে দিন ঘর থেকে ফিরিয়ে দিয়ে দেখি আর একজন আমার দোর গোড়ায় কৃপা-প্রার্থী হ'য়ে বসে আছে! অমরেশকে ফেরান গেল কিন্তু এ এমনি না-ছোড়-বান্দা......

আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু দিনের আলোয় দেখা যাইত প্রকাশের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেছে এবং এই শীতের রাত্রে ওর সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। আর বেচারী নরেন, ফিরিয়া আসিবার সময় মনে মনে এই বরুণার বিপক্ষে যত কটু ও কঠিন কথা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল সব যেন ভুলিয়া গেছে এবং সর্ব্বোপরি সে যে সমিতির পণ-ভঙ্গ করার অপরাধে প্রকাশকে মৃত্যু-শাস্তি দিতে আসিয়াছিল একথা ভাবিয়াই তাহার যেন আর লজ্জার অন্ত রহিল না! তাহার এ অহেতুক লজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত কোন কথাই বলিতে পারিবে না, তবুও এটা ঠিক যে বরুণা ও প্রকাশকে পরস্পরের নিকট হইতে ছিন্ন করা এখন তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার মনে হইতেছে পৃথিবীর সীমারেখা যেন এই ঘরের বাহিরে শেষ হইয়া গেছে—এবং এদের দু'জনের পৃথিবীতে হঠাৎ সে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে! যেন অজ্ঞাতে কত বড় অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে এমনি অসহায়ভাবে নরেন বলিল—আমি যাই—

এবং সত্যিই সে চলিতে সুরু করিল। বরুণা বলিল—পিছু ডাকছিনে, তবুও শুনুন—

নরেন থমকাইয়া দাঁড়াইল, বরুণা আগাইয়া গিয়া বলিল—আশ্চর্য্য হবেন না, আমাকে কলকাতায় পৌঁছে দিতে পারেন!

মিনিট দুই তিন স্তব্ধভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নরেন বলিল—কিন্তু পুলিশ ত' সত্যিই আপনাদের কাউকেই গ্রেপ্তার করবে না—

বরুণা কিন্তু এ খবরে এতটুকু বিচলিত হইল না উপরন্তু সে যেন এ খবর অনেক আগে হইতে জানিত এমনি শান্তভাবে বলিল—তা হ'লেও, আপনি আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে চলুন—

প্রকাশের মুখের দিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যে তাকাইয়া নরেন বলিল—তাতে আপত্তি ছিল না কিন্তু আমাকে যে অনেক জায়গায় ঘুরে যেতে হবে—

বরুণা বলিল—আমারও কলকাতায় পৌঁছবার এমন কিছু তাড়া নেই, বেশ ত, অনেক জায়গা ঘুরেই না হয় যাব—

নরেন বলিল—দেখুন মিছে, কথা কাটাকাটি কোরে কোন লাভ নেই, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আমি কোথায়ও

যেতে পারব না! তা ছাড়া এত দিনের পরিচয়ের পরও প্রকাশকে যখন আপনি বিশ্বাস কোরতে পারছেন না... ..

নরেনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বরুণা বলিল—বিশ্বাস আপনাদের কারও উপরেই নেই। দেশ সেবা করুন আর নারীসঙ্গ-বিনিময়ে মৃত্যু-শাস্তির ব্যবস্থাই করুন, নারীর এক কণা কৃপার জন্য আপনারা না পারেন এমন কাজই নেই। বিশ্বাসঘাতকতা থেকে আরম্ভ কোরে বন্ধু হত্যা পর্য্যন্ত—

প্রকাশ এতক্ষণ নীরব ছিল এইবার বরুণার দিকে আগাইয়া আসিয়া তাহার ডান হাত খানা চাপিয়া ধরিয়া বেশ কঠিন কণ্ঠে বলিল—পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বোলতে তোমার একটু লজ্জা, এতটুকু ভয় কোরছে না?

মৃদু একটু হাসিয়া বরুণা বলিল—দেহের জন্য ভয়, সঙ্কোচ বা লজ্জা থাকলে কি তোমার সঙ্গে এতদূরে আসতে পারতাম।

ঘৃণায় লজ্জায় বরুণার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া প্রকাশ বলিল—তুমি এত নীচ, এত ছোট বরুণা!

—চমৎকার প্রকাশবাবু, নারী যখন স্পষ্ট কথা ও সত্য কথা বলে তখন সে হয় নীচ ছোট, কিন্তু আপনি ও আজ পর্য্যন্ত অনেক মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন, না?

নরেন বলিল—আমি যাই। রাত থাকতে বেরুতে না পারলে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত আমাকেই জেলে যেতে হবে—

বরুণা বলিল—কিন্তু এখনও আপনার বন্ধুর বিষয়ে সব কথা বলা হয়নি, শেষ পর্য্যন্ত শুনে যান!

—ক্ষমা কোরবেন, আপনাদের প্রণয়-কাহিনী শোনার মত প্রচুর সময় সত্যিই আমার নেই বরুণা দেবী!

নরেনের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর যেন এতক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে।

—বেশ, কিন্তু যাবার আগে আমার একটা কথার সত্যিকার জবাব দিয়ে যাবেন?

—ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলে সত্যি কথা বোলতে ত আমাদের মানা নেই—

—চলে গিয়ে কি জন্যে অপনি আবার ফিরে এসেছিলেন বলুন ত?

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নরেন বলিল—এর ঠিক সদুত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, সত্যি—

—থাক যা পারবেন না তা নিয়ে বাড়াবাড়ি নাই বা কোরলেন কিন্তু আমি জানি কেন আপনি এসেছিলেন। আমাদের প্রেমাভিনয় দেখবার একটা লোভ আপনার মনে মনে ছিলই কিন্তু তার চেয়ে আমার সামনে নিজের সঙ্গে বন্ধুর তুলনা কোরে বাহবা নিবার লোভ ছিল বেশী, কেমন সত্যি নয় কি?

বরুণার ঠোঁটের কিনারে আবার সেই ধারালো হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশ এতক্ষণ নীরব ছিল, এই বার বলিল—সত্যি কথা বোলতে ভয় পাচ্ছ কেন নরেন, বলোনা আমাকে গুলী কোরতে এসেছিলে।

প্রকাশের কথা শুনিয়া রাগে বরুণার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিল সদ্য শাবকহারা বাঘিনীর মত। বলিল—কিন্তু হঠাৎ ভাল মানুষের মত ফিরে যাওয়ার মত মতি কেন হোল জিজ্ঞাসা কোরতে পারি কি?

গম্ভীরভাবে প্রকাশ বলিল, না।

বরুণা বলিল—কথাটা যাকে জিজ্ঞাসা করছি তিনিই জবাব দিন—

নরেন বলিল—না,

এবং বরুণাকে কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া প্রকাশ ও নরেন দুই জনেই ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়া গেল। হতবাক বরুণার একবার ইচ্ছা হইল দৌড়াইয়া গিয়া ওদের দুই জনের সামনে দুই বাহু মেলিয়া পথরোধ করিয়া বলে—না, জবাব দিতেই হবে।

কিন্তু বরুণা সেখান হইতে এক পাও নড়িতে পারিল না। ঐ ছোট একটি কথা যেন তাহার পায় শিকল পরাইয়া দিয়াছে এবং আঘাতের এই অস্পষ্ট অবচেতনায় আজ সে নিজের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ এমনি মুষড়িয়া পড়িল যে সে নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। তাহার মনে হইল ঐ দুইটি ছেলে যদি সত্যই আর কোনদিন ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে তাহার জীবনযাত্রা দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। কেন যে তাহার এই অপ্রত্যাশিত দুর্ব্বলতা, এ হয়ত সে নিজেও জানে না।

রাত্রি তখন প্রভাতের দিকে চলিয়াছে কিন্তু এতক্ষণের

মধ্যে বরুণার চোখে এতটুকুও ঘুম নামে নাই। নিজের ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শুইয়া অবধি কত কথাই যে বরুণা ভাবিতেছে তাহার আর শেষ নাই, না আছে তাদের কোন সামঞ্জস্য। নিঃসঙ্গী ঘরে একা একা শুইয়া আজ তাহার মনে একাধিকবার এই প্রশ্ন জাগিতেছে কিসের জন্য সে সকল নিয়ম-কানুন ও বাধা-নিষেধের গণ্ডি ডিঙাইয়া আশ্রমের বাহিরে আসিয়াছে, আর কেনই বা এত জনকে এমন নির্ম্মমভাবে নিজের নিকট হইতে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। অথচ এদের যে কোন এক জনকেও লইয়া সে বেশ নির্ব্বিবাদে জীবন কাটাইতে পারিত অন্ততঃ কিছুদিন ত কাটিত। আবার মনে হইয়াছে কিছুদিনের জন্যে নিজেকে অমনভাবে বিলাইয়া দিলে আজ আর তাহার দাঁড়াইবার মত এতটুকু স্থান থাকিত না। কিন্তু এমনিভাবেই বা আর কতদিন চলিবে! নিজের অন্তরকে যে চেনে না ক'দিন সে আর এমনি অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরিয়া মরিবে। অথচ কি যে সে চায়, কি পেলে যে সে সুখী হইবে তাহাও সে নিজে জানে না। পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লইবার জন্যে পুরুষের গড়া সমাজের বিরুদ্ধে যে অভিযান সে সুরু করিয়াছিল আজ নিজের সেই পাগলামীর কথা মনে করিয়া সে আপন মনে একটু হাসিল। হাসিল এই জন্যে যে সে কি করিতে পারিয়াছে! পুরুষের সমাজ ঠিক তেমনি চলিয়াছে, নারীর অসংখ্য লাঞ্ছনার কাহিনী আজও প্রতিদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। অল্পবয়স্ক ছেলেদের মাঝে যে ছোট ঢেউ সে তুলিয়াছিল দেশমাতার উদ্ধার স্বপনের আড়ালে ডুবিয়া যাওয়ার মত—আর কতটুকু ঝড় সে তুলিয়াছে! কত যে লাঞ্ছিতা অসহায়া নারী আজ ঘরে ঘরে নানা অত্যাচার, অবিচারে কাঁদিয়া মরিতেছে সে ক্রন্দন তাহারা শুনিতে পাইতেছেনা, স্বাধীনতার স্বপ্নে তাহারা পাগল।

এখন বার বার অমরেশকে মনে পড়িতেছে।

—ছয়—

নরেন ভাবিয়াছিল কলিকাতায় গিয়া মমতা তাহার মামার বাড়ীতেই উঠিবে কিন্তু কলিকাতায় পৌছিয়া শুনিল এতদিন পরে মমতা তাহার সংসার কাছে ফিরিয়া গেছে। আশ্চর্য্য সে কেবল একা হয় নাই, এ বাড়ীর প্রতি ছেলে মেয়েটি পর্য্যন্ত। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় তাহার অসুখের সময় মামারা কেহই যাইতে পারে নাই বলিয়াই নাকি এ রাগ কিন্তু যাওয়ার উপায় থাকিলে কেহ কি আর ইচ্ছা করিয়া যায় নাই! কিন্তু এ সব কথায় ভুলিবার বা বুঝিবার মেয়ে মমতা নয়। এ বাড়ীতে একটি রাত্রিও সে কাটায় নাই উপরন্তু যাওয়ার সময়ে বলিয়া গেছে—মা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর সঙ্গে আমারও সম্বন্ধ যে শেষ হয়ে গেছে এ কথা আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল—

এবং যাইবার সময় আরো বলিয়া গেছে, এ বাড়ীতে সে আর ফিরিয়া আসিবে না।

কথা বলিতেছিলেন মমতার বড় মামা।

বলিলেন—ওর কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আমরা কেউই আশা করিনি, তা ছাড়া ট্রেন থেকে নেমেই সেদিন ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ও এমনি চেচামেচি আরম্ভ কোরলে, সত্যি, ওর এরকম মেজাজ আমরা আর কখনও দেখিনি।…কিন্তু এসব কথা এখন থাক নরেন, তোমার খবর বলো। কতদিন পরে দেখা—প্রকাশ, অবনী ওরা সব কোথায়, বিয়ে থা কোরেছে?

—অবনী শুনছি মাস দুয়েক আগে জেল থেকে বেরিয়ে পশ্চিমের কোথাকার একটা মিলে চাকরী নিয়েছে, প্রকাশ আমার সঙ্গে আজ সকালে পাটনা থেকে কলকাতায় ফিরেছে। বিয়ে আমাদের কারও হয় নি—

মমতার মামা হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—বলো কি হে! এখনও তোমাদের পাগলামী গেল না। আমরা দুভাই কিন্তু তোমরা ধরা পড়বার পরেই বিয়ে থা কোরে দিব্যি সংসারী হইছি। কি দরকার বাবা ও সব বাজে ঝঞ্ঝাটে যে কদিন বাঁচবে রোজগার কর; খাও দাও—দশজনের একজন হও—

মৃদু হাসিয়া নরেন বলিল—আমিও ঠিক ঐ কথা ভাবছি ভাই, কিন্তু আজ আর সময় নেই। আর একদিন এসে এসব বিষয়ে আলোচনা করা যাবে

নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। মমতার বড় মামা প্রতাপ

নরেনের পিট চাপড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আমি কিন্তু তোমার right girlএর সন্ধান দিতে পারি।

—পার না কি ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় ?

—নাম কি বলো ত, কোথায় থাকে ?

—নাম তোমার মোটেই অজানা নয়, মেয়েটিকেও তুমি চেনো, এমন কি একদিন···

প্রতাপের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নরেন বাধা দিয়া বলিল—তুমি বোধ হয় মমতার কথা বোলছ কিন্তু কাগজে পড়িছি ট্রেণ কলিশনে তার নাকি একটা চোখ কানা হয়ে গেছে—

মুহূর্ত্তের জন্যে প্রতাপ যেন একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল তাহার পর বলিল—না এমন কিছু নয়, তবে তুমিও যদি আর সকলের মত খুঁৎ ধরো তা হলে—

কিন্তু নরেন এ কথার কোন উত্তর না দিয়া ততক্ষণে ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতাপও কথা শেষ না হইতে চুপ করিয়া গিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে নরেনের পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কোন কথা খুজিয়া না পাইয়া আপন মনে বার তিনেক বলিল—সে ২১ নম্বরে থাকে, ২১ নম্বর···২১ নম্বর—লেন···

(ক্রমশঃ)

গান

তোমার শাসন,
আমার পুরস্কার।
যতই পারো
ততই মারো,
আঘাত পরে আঘাত করো,—
করো যতই তিরস্কার,—
তোমার শাসন,
আমার পুরস্কার।
তব চরণ বাজে
মরণ মাঝে
ভয় তরাসে দুঃখে লাজে
অভয় পরশ চমৎকার।
তোমার শাসন, আমার পুরস্কার!

রাজটীকা সে কলঙ্ক ভার,
স্নিগ্ধ সোহাগ তোমার প্রহার
লাগে শিহর বারংবার—
তোমার শাসন,
আমার পুরস্কার।
তোমার ও শর আমার বুকে
পুষ্প হ'য়ে ফুটলো সুখে,—
কুসুম ধনু।
জুড়ায় তনু,
লুকায় অহঙ্কার (কোথায়)
তোমার শাসন,
আমার পুরস্কার।



তর্পণ—দেশ-প্রাণ শ্যামসুন্দরের তিরোধানে আমরা আর একজন প্রবীণ দেশসেবক ও নেতাকে হারাইলাম। যাঁহারা আরাম কেদারায় বসিয়া দুনিয়াময় তাঁহাদের সন্ধানী আলো ফেলিয়া মানুষের সকল চেষ্টা ও কর্ম্মের মধ্যে গোপন ছিদ্র আবিষ্কার করেন তাঁহাদের কাছে শ্যামসুন্দর ত ছার, স্বয়ং ভগবানও নিষ্কৃতি পাইবেন না। সুখের বিষয় দেশে এমন লোকেরও অভাব নাই যাঁরা শ্যামসুন্দরের জীবনজোড়া আত্মাহুতির মূল্য বুঝিয়া শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিবেন।

স্বাগত!—বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধানমতে প্রবেশিকা পরীক্ষার সকল বিষয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা বঙ্গভাষায় হইবে। এই সন্ধিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের সংযোগ অনেক শুভ-সম্ভাবনার সূচনা করিতেছে। এমন পরিণত বয়সে নূতন করিয়া স্বেচ্ছায় গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ আর একবার প্রমাণ করিলেন যে দেহে বৃদ্ধ হইলে কি হয়, মনেপ্রাণে তিনি চিরতরুণ!

সমান্তরাল—জ্যামিতির দুই সমান্তরাল রেখার ন্যায় হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবধান কায়েমী হইয়া উঠিয়াছে, মিল আর কোথাও হইতেছে না। রসুল, লিয়াকৎ, চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দিকপালগণ যে মিলন ঘটাইতে পারিলেন না, পর পর দুই গোল বৈঠকে যে প্রশ্নের সমাধান হইল না, ম্যাকডোনাল্ড তথা বৃটিশ মন্ত্রিসভা হঠাৎ ১৭ই জুলাই তারিখে সেই অসাধ্য সাধন করিবেন এ আশা আমরা করি নাই। কাজেই আশাভঙ্গের পশ্চাত্তাপও আমাদের ঘটে নাই। তৃতীয় পক্ষের শান্তিবারির ছিটায় যখন ভাই ভাইএর বা পিতাপুত্রের কলহ মিটাইবার প্রয়োজন হয় তখন লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকেনা। তাই অতি দুঃখেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "I hate to appeal." কথামালার গল্পে দুই বিড়ালের পিষ্টক ভাগের বিড়ম্বনার কথা পড়িয়া বাল্যকালে কতই না হাসিয়াছি। জাতির জীবনে সেই আখ্যায়িকার পুনরভিনয় দেখিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়! রাজনৈতিক দাবা খেলার বিচিত্র চাল দেখিলে অব্যবসায়ী লোকের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। মুসলমানের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব দোষে হিন্দুর পক্ষে যে ব্যবস্থা অস্পৃশ্য, তাহাই আবার গজনবী প্রমুখ আদুরে ছেলেদের পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে হারাম। ৺দেশবন্ধু মুসলমানদের প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছিলেন, মহাত্মা ত সাদা চেক সহি করিয়া দিতেই প্রস্তুত। আমরা কিন্তু এর কোনটাতেই স্বাস্থ্যের বা শান্তির লক্ষণ দেখিতে পাইনা। যে ব্যবস্থা একের জবরদস্তী বা জিদ এবং অপরের দুর্ব্বলতা, উদারতা বা বিষয়বিরাগের বশে গড়িয়া উঠে তাহা পাকা ব্যবস্থা নহে, যে কোন মুহূর্ত্তে ফাঁসিয়া দাঁড়াইতে পারে।

আমাদের যত দুঃখ ও লজ্জার কারণই ঘটুক না কেন, তৃতীয় পক্ষের কিন্তু জয়জয়কার!

জলধর সম্বর্দ্ধনা—রবিবাসরের উদ্যোগে সেদিন প্রবীণ সম্পাদক জলধর সেন মহাশয়ের উদ্দেশে যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বিপুলতাই তাহার একমাত্র পরিচয় নহে। এই সম্বর্দ্ধনাসভায় আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাভালবাসার পাত্র কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সভাপতি স্বয়ং শরচ্চন্দ্র ও সাহিত্যরথী প্রমথ চৌধুরী মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্যতম সাহিত্যানুরাগী পর্য্যন্ত সকলেই বাংলার সাহিত্যিক 'দাদা'কে স্ব স্ব শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। মামুলি বাগবিস্তারের ঘটা এখানে ছিল না। কেমন একটা সহজ প্রীতির আভাষ সমবেত নরনারীর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সম্পাদকরা যেন কতকটা কাব্যের উপেক্ষিতের মত। রাসায়নিক catalytic agentএর ন্যায় ইহারা লেখক ও পাঠকে মিল ঘটাইয়া দেন, কিন্তু নিজেরা থাকিয়া যান অন্তরীক্ষে। জলধর দাদা যে উপেক্ষিত নহেন তাহার ভূরি প্রমাণ পাইলাম রামমোহন লাইব্রেরীতে। তিনি শতায়ু হইয়া বাংলা সাহিত্যের সেবা করুণ এই আশাই আমরা করি। বাঙ্গালার গণ্যমান্য সম্পাদকদিগের দুই চারিজনকে সে সভায় উপস্থিত দেখিলে আমরা খুসী হইতাম। রবিবাসরের সম্পাদক তাঁহাদের ডাকিতে ভুলিয়াছেন বলিয়াও ত মনে হয় না!

কারান্ধকারে—আরামে বিলাসে তুচ্ছতার সেবায় যখন আমাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে তখন কারার অন্ধকারে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন তিল তিল করিয়া ক্ষয় পাইতেছেন ওদিকে ইউরোপে আর এক দৃশ্য, মহাপ্রাণ টট্‌স্কি রুগ্নশীর্ণ দেহমন লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে একটু মাথা রাখিবার আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন! অথচ ইহাদের এ দুঃখ-বরণ নিতান্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, শুধু মানুষেরই দুঃখ মোচনের জন্য। সেই মানুষই আবার ইহাদের নিষ্ঠুর কারারক্ষী! এ বিড়ম্বনার শেষ কোথায়?

শরৎ বন্দনা—আগামী ৩১শে ভাদ্র বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে দেশের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইবে। ৩১শে ভাদ্র তারিখে সন্ধ্যা ৬টার সময় টাউন হলে মহিলাগণ তাঁহাকে বরণ করিবেন এবং মানপত্র পাঠ করিবেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঐ তারিখে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবেন। পরদিন ১লা আশ্বিন টাউন হলে বেলা ৫টার সময় সাহিত্য সম্মিলন হইবে। দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ রচনার ভিতর দিয়া শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ, শরৎচন্দ্রের প্রত্যভিভাষণ, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, রাধারাণী দেবী, হুমায়ুন কবির, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের লেখা একত্র ছাপিয়া "শরৎ-বন্দনা" নাম দিয়া একখানি বই প্রকাশ করা হইতেছে। শ্রীগুরু লাইব্রেরী এই বইখানি ছাপিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১লা আশ্বিন সাহিত্য সম্মিলনের দিন এই বইখানি মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যাইবে। ২রা আশ্বিন সাধারণ সম্পাদক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে এক প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন হইয়াছে। ৩রা আশ্বিন চিত্রায় "পল্লীসমাজ" চলচ্চিত্রে দেখান হইবে এবং ৪ঠা আশ্বিন ষ্টার থিয়েটারে "ষোড়শী" অভিনীত হইবে।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বেশি কিছু লেখা আজ বাহুল্যমাত্র। দেশের সমবেত নরনারী যে এই সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছেন তাহা হইতে বোঝা যাইতেছে তাহাদের মন কত গভীরভাবে তিনি অধিকার করিয়া আছেন।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ

পত্রাবলী—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। শ্রীদিলীপ কুমার রায়, বীরবল এবং শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত লিখিত কয়েকখানি খোলা চিঠির সমষ্টি, মূল্য ১৲। প্রকাশকের নামের উল্লেখ নেই।

১৪৪ পৃষ্ঠার এই বইখানি নানাদিক দিয়েই উল্লেখ যোগ্য। 'সংসাহিত্য'—ভারাক্রান্ত বাংলা দেশের পাঠকের কাছে এতে আলোচিত বিষয়গুলি দুর্ব্বোধ্য এবং রসহীন লাগলেও লাগ্‌তে পারে; কিন্তু জিজ্ঞাসু পাঠকের মন যে প্রতি পৃষ্ঠায়ই চিন্তার খোরাক পেয়ে আনন্দিত হবে, একথা নিশ্চয় করে' বলা যায়।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার—যা'কে গুপ্ত মশায় "বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শন" বলে' অভিহিত করেছেন—কেমন করে' মানুষের মনের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মচেতনাকে জোর করে' অবরুদ্ধ করেছে, সে সম্বন্ধে বাংলা দেশের একজন চিন্তাশীল তরুণ এবং দুইজন সুপক্ক চিন্তাবীরের আলোচনা পরম উপভোগ্য, একথা বলা বাহুল্য। এই

পত্রগুলির সঙ্গে হয়ত পাঠক অল্প-বিস্তর পরিচিত আছেন, কারণ এগুলি বিভিন্ন বাংলা মাসিক পত্রে বেরিয়েছিল; এবং যতদূর স্মরণে আসে, বাংলা সাহিত্যে ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পর বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা এই প্রথম। এই কারণে সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে বইখানির একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে।

পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের কুসংস্কার কেমন করে' জনসাধারণের এবং দু'চারজন বিখ্যাত ব্যক্তির মনে ধর্ম্মের স্থান করে' বস্‌ল, তার মূল আলোচনা করতে গেলে প্রায় আশী বৎসর পেছিয়ে গিয়ে ডারুইনের ক্রমাভিব্যক্তিবাদ এবং পরমাণু আবিষ্কারের যুগে গিয়ে পড়তে হয়। সহসা বিজ্ঞানের নবজ্ঞানের আলোকে বাইবেলের গাল-গল্পের ভুল আবিষ্কার করায় লোকের মনে চলিত ধর্ম্মের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা এসে' যায়। তারপর বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যত উন্নতি হ'তে লাগল, ততই বিজ্ঞানের মতবাদের উপরে লোকের শ্রদ্ধা বেড়ে' যেতে লাগল; ফলে দাঁড়াল এই, বিজ্ঞানের অঘটন-ঘটন ক্ষমতার ওপরে লোকের হো'ল অসীম বিশ্বাস—এমন কি কোন কোন বৈজ্ঞানিকও এমন আশা করে' বস্‌লেন যে বিজ্ঞানের দ্বারা হয়তো জগতের সব রহস্যের দ্বার একদিন উদ্‌ঘাটিত হ'তে পারবে। যাকে Scientific materialism বা বৈজ্ঞানিক জড়বাদ বলে, তার মূলে আছে এই আশা— পাশ্চাত্য এ'কেই করে' নিল তার বিশ্বাসের বনিয়াদ। এই বনিয়াদের পরে মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-ভরসার বাসা বাঁধতে গিয়ে দেখা গেল, ধর্ম্ম বিশ্বাসের ইমারতের চেয়ে এই নববিশ্বাসের মাল-মস্‌লা অনেক কম। কাজেই এমন সব জিনিষ দিয়ে ফাঁক ভর্ত্তি করতে হ'ল—যাকে' ইংরাজীতে বলা যায় Conjectural belief অর্থাৎ আনুমানিক বিশ্বাস। এটার প্রকৃতি হ'ল স্বতন্ত্র—না ধর্ম্ম, না বিজ্ঞান। ধর্ম্মের কুসংস্কার দূর করতে গিয়ে আমদানী হ'ল বিজ্ঞানের টিকিট-মারা কুসংস্কার।

কিন্তু বিজ্ঞান যতই পদার্থের বিশ্লেষণ করতে লাগল, ততই দেখা যেতে লাগ্‌ল, জড় তার সূক্ষ্মতমরূপে গিয়ে আর জড় থাকছে না, একটা সমধর্ম্মী বিদ্যুৎকণায় গিয়ে পরিণতি লাভ করছে। তখন যাঁরা বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাসের ভিত্তি খাড়া করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও দার্শনিক গোলযোগ সুরু হ'ল। এই গোলযোগটাকেই বোধ হয় দিলীপকুমার "বিজ্ঞানের ট্র্যাজেডি" বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ ট্র্যাজেডির ফল হ'ল ভালই—বৈজ্ঞানিকের মনে সর্ব্বজ্ঞতার যে একটা আত্মম্ভরিতা ছিল, সেটা একটু একটু করে' খসে' পড়ল। এদিকে জীববিদ্যা ও মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন যতই এগুতে লাগল, ততই দেখা যেতে লাগল, মনের ও প্রাণের ধর্ম্ম জড়বিজ্ঞানের তথাকথিত নিয়ম কানুনের মধ্যে ধরা পড়ে না। এদিকে জড়বিজ্ঞানও শক্তির হাতে পড়ে শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চত্ব লাভ করল।

এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের প্রদর্শিত পথে চলা—অর্থাৎ বিশ্লেষণ করা—সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু এখন মনীষী মহলে প্রশ্ন উঠল, জড় যে শক্তিরই একটা রূপ, সেকথা মানুলাম; কিন্তু শক্তির এত বিচিত্র রূপায়নই বা কেন, আর এ শক্তির খাঁটী রূপটাকে উপলব্ধি বা অপর কোন উপায়ে গোচরীভূত করা যায়ই বা কেমন করে'? ইথারের সমষ্টি এই জড়জগতে মুহুর্মুহু রূপই বা বদলাচ্ছে কেন, আর ইথার—বিমুক্ত মনেই বা নব সৃষ্টির অনুভূতি জাগছে কেন? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করতে হ'য়েছে বিশ্বাসের ওপরে। অবশ্য বিশ্বাসের ওপরে নির্ভর করা বিজ্ঞানের পক্ষে আজ নতুন নয়—কারণ, বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র কয়টাই হ'চ্ছে নিছক বিশ্বাস বস্তু। বৈজ্ঞানিক মন তাই এখন আর বিচারের বাইরে যেতে আপত্তি করছে না—বিচারের বাইরে, হয়তো বা যে একটা স্বতঃপ্রাণোদিত সত্যের ইঙ্গিত মানব মনে আছে, সেটাকে অবলম্বন করতে তুচ্ছ করছে না। এইখানেই বিজ্ঞানের হ'চ্ছে "সুমতি"।

কিন্তু একথা মানতেই হ'বে যে যে ধর্ম্মের আসনে পূর্ব্বে বিজ্ঞান বসে' রাজত্ব করেছিল, তার সঙ্গে আজ যে ধর্ম্ম রচিত হ'চ্ছে তা'র আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা যাবে। সে ধর্ম্ম ছিল লোকাচার প্রপীড়িত, এ ধর্ম্ম হ'বে মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত। হয়তো সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে কোন দিন কোন জাতি এই ধর্ম্মে বলীয়ান হ'য়ে "মহতো মহীয়ান্" হ'বে—কিন্তু আমার বিশ্বাস, ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন হ'বার দিন এগিয়ে আস্‌ছে। নব ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তি ব্যক্তির প্রতি অন্ধ ভক্তি নয়; এর ভিত্তি হ'চ্ছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার মুক্ত জ্ঞানের মধ্যে, দেহহীন আদর্শের মধ্যে। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষের কোন বিরোধ থাকছে না, বিশ্বাসেরও কোন বিরোধ থাকছে না। এ ধর্ম্ম বিশ্বাস "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"। কিন্তু এর মূলের কথা হ'চ্ছে—বিজ্ঞান নয়, বিশ্বাস।

জীবন বীমা

জীবন বীমার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইহার ইংরাজী নাম "লাইফ ইনসিয়র"। আমাদের দেশে ইহার প্রসার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা মঙ্গলের বিষয়। বীমার উপকারিতা সকলেরই বোঝা উচিৎ। ইহা একটী জাতীয় উন্নতিকর প্রতিষ্ঠান—বীমা দ্বারা একদিকে যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান হয়, অপরদিকে তেমনি সহস্র সহস্র লোকের চাঁদার টাকা একত্রিত হইয়া কোম্পানীতে একটী বিপুল অর্থশক্তি দাঁড়ায়। এই অর্থ দ্বারা দেশের কল-কারখানা তৈরী প্রভৃতি নানাপ্রকার উন্নতি মূলক কার্য্য হইয়া থাকে। এইজন্য ইহা জাতীয় উন্নতিকর প্রতিষ্ঠান।

বীমা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতা যত বৃদ্ধি পাইবে সমাজের ও জাতীর পক্ষে তত মঙ্গলজনক হইবে। অনেকে মনে করেন বীমা করিয়া যে টাকা গচ্ছিত রাখিবেন তাহা অপেক্ষা ব্যবসায়ে লাভ অধিক হইবে। সে সকল লোকের ধারণার উত্তরে বলা যাইতে পারে—ব্যবসায়ে অধিক লাভ হয় সত্য কিন্তু বীমা ভবিষ্যতের সংস্থানের উপায়। এই হিসাবে তাঁহারা বীমাকে না দেখিলে ইহার যথার্থ উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন না।

প্রতি মাসে যে অর্থ সাংসারিক খরচের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে তাহা হইতে দু এক টাকা কমাইয়া কোন ব্যবসা ত' হয়ই না, পক্ষান্তরে সে টাকাও কোনরূপে জমা রাখিলে অনটনের সময় খরচ হইয়া যায়। বীমা করিলে নিয়মিত চাঁদা একপ্রকার বাধ্য হইয়াই দিতে হয়। ইহা একপ্রকার বাধ্যতা মূলক সঞ্চয় এবং কিছুদিন দেওয়ার পর ইহা আমাদের সাংসারিক খরচের ন্যায়ই গণ্য হইয়া যায়। এইরূপে কিছুকাল পরে বা মেয়াদন্তে দেখা যায় যে এক কালীন একটী বড় রকমের মূলধন পাওয়া যায়। বার্দ্ধক্যে অথবা মধ্য বয়সে এইরূপ একটা বড় রকম মূলধন পাইলে সকলেই ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া উন্নতি করিতে পারেন বা নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করিতে পারেন। দৈবাৎ বীমা করা অবস্থায় মৃত্যু হইলে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহার বিষয় বর্ত্তমানে আর কাহারো অবিদিত নাই বলিলেই চলে। বীমার প্রধান উদ্দেশ্যই এই যে অকালমৃত্যু হইলে নাবালক পুত্রকন্যাগণ ও বিধবা পত্নী যাহাতে নিঃসহায় অবস্থায় পথে আসিয়া না দাঁড়ায় তাহারই উপায় নির্দ্ধারণ। যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের নগদ অর্থ ব্যবসা বা জমিদারী আছে, তাঁহাদেরও বীমা করার প্রয়োজন হয়, কারণ ঐ সকল ব্যবসা ও নগদ অর্থ যখন আছেই তখন সামান্য কিছু জমাইয়া ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে দোষের কিছু হয় না, উপরন্তু, বাঁচিয়া থাকিলে মেয়াদন্তে বীমার টাকাগুলিও ব্যবসা জমিদারী বা অন্য কারবারে খাটান চলিতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে যে জমিদারই হউক মহাজনই হউক মৃত্যুর পর তাঁহাদের ব্যবসা জমিদারী, মহাজনী কিরূপভাবে চলিবে, নাবালক পুত্রকন্যা, বিধবা পত্নীকে কি ভাবে কাটাইতে হইবে, দেনদারগণ তাঁহাদিগকে কি ভাবে ফাঁকী দিবে না দিবে তাহা কিছুই বলা যায় না—সে ক্ষেত্রে বীমা করা থাকিলে লব্ধ অর্থ হইতে ভবিষ্যতের সমস্ত বিপদ কাটাইয়া উঠিয়া তাঁহারা অনায়াসে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এমনও দেখা যায় যে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বা বড় ব্যবসাদারের নাবালক পুত্র নগদ টাকার অভাবে তাহার পিতার মৃত্যুর পর সকল দিক খোয়াইয়া দেনার দায়ে পথে বসিয়াছে। এই সকল কারণে আজকাল ধনী, দরিদ্র, ব্যবসায়ী জমিদার, মহাজন সকলেই কিছু না কিছু টাকার বীমা করিয়া রাখিতেছেন।

রাজকর্ম্মচারী বা চাকরীজীবিদিগের ত কথাই নাই। মৃত্যুর পর বা চাকরী নষ্ট হইলে এক দিবসের আহার্য্যের সংস্থান হয় এমন লোক তাঁহাদের মধ্যে কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে সকলের মধ্যেই বীমা করার জন্য একটা আগ্রহ দেখা দিয়াছে ও দেশের মধ্যে বীমা সম্বন্ধে আন্দোলনের বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার কারণ হইতেছে বীমার যথেষ্ট উপকারিতা ক্রমেই লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

বীমার প্রসার হওয়ার আরও কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। বীমাকোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি তাহাদের মধ্যে প্রধান—তদ্ভিন্ন পূর্ব্বে যে সকল কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে অল্প টাকার বীমা লওয়া হইত না এমন কি কোন কোন কোম্পানীতে দু'হাজার টাকার কম বীমাপ্রস্তাব গ্রহণ করা হইত না। একহাজার টাকার বীমা করিলেও যে চাঁদা দিতে হইত তাহার হার কিছু উচ্চ ছিল। ইহা জনসাধারণের পক্ষে সকল সময় সম্ভব হইয়া উঠিত না। ইহা ভিন্নও ১ কিস্তির টাকা না দিতে পারিলে বীমার সমস্ত টাকাই বাতিল হইয়া যাইত।

বর্ত্তমানে এই সকল অসুবিধাই দূর হইয়াছে। এখন এমন অনেক কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে যাহাতে প্রতি মাসে আট আনা বা এক টাকা চাঁদা দিয়া একশত টাকা হইতে পাচশত টাকা পর্য্যন্ত বীমা করা যায়। এই সকল কোম্পানীতে যে কেহ ইচ্ছা করিলে একটী পলিসি করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান করিতে পারেন। এমন কি মাসিক ১০৲।১৫৲ টাকা আয় যাঁহার আছে তিনিও একটি বীমা করিতে পারেন। ভবিষ্যতের সংস্থান ও পুত্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় সকলেরই করিতে ইচ্ছা হয়। এই নিয়ম দ্বারা সকলেরই বীমা করার সুবিধা হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত বীমার সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বীমা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অনেক ভুল ধারণা আছে ইহা দূর হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ যে সকল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জনসাধারণ বীমা করিতে সন্দেহ করেন তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে, কোম্পানী গভর্ণমেণ্টের দ্বারা রেজিষ্টারীকৃত কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাদের জানা দরকার যে **রেজিষ্ট্রী না করিয়া কোন বীমা কোম্পানীই স্থাপিত হইবার উপায় নাই**। প্রতি কোম্পানীই গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষক (actuary) দ্বারা প্রতি বৎসরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হয় ও গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহার সংবাদ (Report) দাখিল করা হয়।

প্রধান কথা হইতেছে বীমার নিয়ম এরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈয়ারী যে উহার তহবিল ঘাটতি পড়িবার কোন উপায় নাই—উহা ক্রমে বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। কোম্পানী বীমাকারীর নিকট হইতে টাকা নিয়মিতকাল পর্য্যন্ত লইবে ভিন্ন দিবে না। উক্ত টাকা সুদে খাটাইয়া বীমাকারীকে যে দাবীর টাকা দিতে হইবে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইবেই এমনই কৌশলে উহার চাঁদার তালিকা প্রস্তুত এ সকল প্রসঙ্গ বিস্তৃত আলোচনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত টাকা একটা নাম মাত্র বিশ্বাসের হেতু প্রকৃত কথা হইতেছে সততা। সততার সহিত না চলিতে পারিলে সকল কোম্পানী বা ব্যবসায়ই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে—সে হিসাবে ধরিতে গেলে ভয় বা সন্দেহ নাই এমন কোন ব্যবসা বা কারবারই হইতে পারে না।

এই সম্পর্কে আমরা **দি এশিয়া মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড**এর কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কোম্পানী ১৯৩০ সালে রেজেষ্ট্রি হয়। হেড অফিস ১৫ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। ইহা এই দুই বৎসরের মধ্যে সন্তোষজনক কার্য্য করিয়াছে। ইহার ম্যানেজিং এজেণ্টস মেসার্স বোস এণ্ড কোং। ইহার প্রথম ম্যানেজিং এজেণ্টস ছিলেন মেসার্স ইষ্টার্ণ ফাইন্যান্সিয়ার্স। তাঁহারা প্রাথমিক খরচের অসুবিধার জন্যই হউক আর অপর যে কোন কারণেই হউক কোম্পানী হাতে লইয়া পলিসি গ্রহণ না করিয়াই বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেণ্টসের হস্তে সমর্পণ করেন। সেই কারণে ১ম বৎসর রেজেষ্ট্রি অবস্থায় কোন কাজ না লইয়া পড়িয়া থাকে।

অতএব কোম্পানীর বয়স দুই বৎসর হইলেও যে সময়

হইতে বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেন্টস কোম্পানী হাতে লইয়াছেন সেই সময় হইতে (গত ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে) কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৯৩২ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত পূর্ণ এক বৎসর কার্য্য হইয়াছে।

এই পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর কার্য্যবিবরণী দেখিলে ইহার পলিসি হোল্ডারগণ ও জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইবেন। কোম্পানী বীমা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে ১০০০টি এবং পলিসি বিতরণ করিয়াছে ৭১০টি। ইহার অধিকাংশ পলিসিই পাঁচশত টাকার এবং মেয়াদী। আট বৎসরের মেয়াদী একটী তালিকা আছে, অধিকাংশ বীমাই সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব গড়ে প্রায় ৩৷৹ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার পলিসি বিতরিত বীমা গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাংলা দেশের সকল স্থান হইতে এবং বাংলার বাহিরে গয়া, পাটনা, কাশী, আসাম প্রভৃতি স্থান হইতে বীমা প্রস্তাব আসিতেছে।

যশোহর, মাগুরা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে কোম্পানী এক একটী ব্রাঞ্চ অফিস খুলিয়াছেন এবং সম্প্রতি নবদ্বীপে আর একটী ব্রাঞ্চ অফিস খোলার ব্যবস্থা হইতেছে।

ম্যানেজিং এজেন্টসগণের সততায় ও ব্যবহারে কর্ম্মীগণ সকলেই সন্তুষ্ট। এজেন্টগণকে উচ্চহারে কমিশন ও বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বীমাকারীগণকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা এই নূতন কোম্পানীর মঙ্গল কামনা করি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভাদ্র সংখ্যায় "ইঙ্গিতের" একাদশ সংখ্যা শেষ হইল, যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অদ্যাপি তাঁহাদের চাঁদার টাকা পাঠান নাই বা আংশিক দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ তাঁহারা যেন আগামী সংখ্যা বাহির হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের দেয় চাঁদা আমাদের আফিসে পাঠাইয়া দেন।

বিনীত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীসরোজরঞ্জন মিত্র কর্ত্তৃক ৩০নং হরিতকি বাগান লেন, কালিকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত, ও মেহেরপুর, গোপসেনা পোঃ, জেলা যশোহর হইতে প্রকাশিত।



১ম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৯ | ১২শ সংখ্যা

শেষ প্রশ্নের জের

শ্রীআশালতা দেবী

"ইঙ্গিত" সম্পাদক সমীপেষু ঃ—

সঙ্গে 'শেষপ্রশ্ন' সম্বন্ধে একটি পত্র পাঠালাম। লেখিকার বয়স খুবই কম কিন্তু লেখার ভঙ্গীতে, মননশক্তিতে শ্রদ্ধায়, দরদে, চিন্তাশীলতায় তিনি প্রবীণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছেন অতি অল্পদিনে। (রবীন্দ্রনাথ এঁর সম্বন্ধে আমাকে বলেছিলেন ও লিখেওছিলেন, 'আশার মননশক্তি বিস্ময়জনক—অসামান্য') আমি এই শ্রেণীর সমালোচনা ভালোবাসি। শেষপ্রশ্নকে কারুর ভালো যদি না লাগে বলুক—লাগ্‌লো না—কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে বলুক—দরদের সঙ্গে বলুক। শুধু নিরপেক্ষ scientific criticismএর দোহাই দিয়ে অর্হণীয় মানুষকে অপমান করা অকর্ত্তব্য। সেদিন প্রতিভাবান চিন্তাশীল কবি বুদ্ধদেবও আমাকে এই কথা লিখেছেন ঃ—"আমি scientific mode of criticismএ বিশ্বাস করি না। সমালোচনার মধ্যে যদি প্রাণস্পন্দন ফুটিয়ে তুলতে হয়, তবে তাকে পার্সনাল হ'তেই হবে।" এই কথাই এমার্সন ব'লেছেন বড় সুন্দর করে যে সেই লেখাই লেখা যার মধ্যে দিয়ে লেখককে দেখা যায়। সাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক—impersonal নয়—নিবিড়ভাবে ব্যক্তিক—personal, subjective. আশালতার লেখার মধ্যে দিয়ে লেখিকাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাই ওঁর লেখা এত লোকের ভালো লাগে—ওঁর মতের সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক। এই জিনিষটাই আমাদের দেশে অত্যন্ত বিরল—বিশেষ ক'রে সমালোচনায়। কারণ বিশেষ করে সমালোচনায়ই আমাদের দেশে লোকে চায় প্রাণপণে বিজ্ঞ হ'তে—objective হ'তে। কেন? যা ভেবেচিন্তে মনে

হয়েছে গুছিয়ে বল্‌ব সাধ্যমত—নিজেকে লুকোবো কেন, প্রাণপণে নিরপেক্ষ হ'তে গিয়ে? Aldous Huxleyর নানা সমালোচনা প'ড়ে যখন মুগ্ধ হই তখন ভাবি—কেন মুগ্ধ হ'লাম? ওঁর মতের সঙ্গে তো অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না। কিন্তু তাতে কি? ওঁর লেখার মধ্যে দিয়ে লেখকের হৃদয়স্পন্দন মেলে যে—এর বেশি চাই কি? চরম ও পরম সত্য ঋষির দেয়—সাধারণতঃ লেখকের কাছে চাই রস এবং এ রস ফুটে ওঠে যখন লেখক লেখার মধ্যে দিয়ে একটু স্পষ্ট উঁকি মারেন। আশালতার ও লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর শেষপ্রশ্ন-পাঠে সাড়া দেওয়ার ভঙ্গীটি দেখ্‌তে পাই, তাই ভালো লাগে—শেষপ্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁর মতামতে সায় দেবার দরকার করে না সব সময়ে।

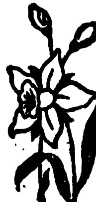
আশালতার চিঠির সর্ব্বত্র তাঁর বক্তব্যটি ফোটেনি। একটু যত্ন করে লিখলে ফুটত। আশা করি ভবিষ্যতে এ যত্ন তিনি নেবেন।

একটা কথা শুধু আমি বল্‌তে চাই—আর্টে formএর perfectionএ সাড়া দেয় না কে? ফর্মের—রূপের—পিছনেও একটা সত্য আছে একথা মান্‌বে না কে? আমি কেবল বলি যে শুধু রূপই শিল্পের চরম কথা নয়, রূপ মূল্যেও গুরভেদ আছে। ভীষ্মের রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে ফলালে তার যে মহিমা—সে মহিমা শকুনির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপের চেয়ে বড় এই কথাই শুধু আমি বলতে চেয়েছি। এবং এত জোর করে বল্‌তে চেয়েছি, কারণ আধুনিক art for art's sake রূপ অসার ধুয়োকে অনেকে বেদবাক্য ব'লে মনে করেন। মনে করেন শুধু formএর perfection হ'লে আর কিছুরই দরকার নেই। আমি বলি একথা সত্য নয়। আর্টে শুধু বলার ভঙ্গীই না—বক্তব্যেরও দাম আছে—এবং দু'জনার বলার ভঙ্গী যদি সমান সুন্দর হয় তবে যার বক্তব্য গরিমা বেশি তার সৃষ্টিই বেশি বড় হবে। লা' মিজারেব্‌লএ জীন ভালজীনের চরিত্রও সুন্দরভাবে আঁকা—অর্থলোভী থেনার্ডিয়ারেরও। কিন্তু আর্টিষ্ট বলেন যেহেতু থেনার্ডিয়ারের চরিত্রের রূপায়ন-সৌন্দর্য্য জীন ভালজীনের রূপায়ন-সৌন্দর্য্যের চেয়ে কম নয়—সেহেতু ও দুই-ই তুল্যমূল্য। একথা সত্য নয়। শেষপ্রশ্নে অক্ষয়ও ফুটেছে, কমলও। কিন্তু কমল ঢের বড়। আর্ট ফর আর্ট সেকিষ্ট রা একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যখন ন্যাপকিনের ছবি দেখ্‌ব তখন শুধু দেখ্‌ব তার ন্যাপকিনত্ব ফুটেছে কিনা! এতেই আলডুস আপত্তি করেছেন। প্রেমের সুন্দর ছবি ঈর্ষার সুন্দর ছবির চেয়ে বড়, মহত্ত্বের ছবি কার্পণ্যের চেয়ে, আত্মদানের ছবি সাবধানতার চেয়ে, সরলতার ছবি বিজ্ঞতার চেয়ে। এ মরালিটি না—মূল্যভেদ। বড় উপলব্ধিতে যে আনন্দ ছোট উপলব্ধিতে তার চেয়ে কম আনন্দ। কাজেই বড় উপলব্ধির সুন্দর চিত্রণ ছোট উপলব্ধির সুন্দর চিত্রণের চেয়ে বেশি মর্ম্মস্পর্শী, যেহেতু আর্ট জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অদ্ভুত mushroom গোছের পদার্থ নয়—জীবনের valuesকে অবজ্ঞা করতে পারে না সম্পূর্ণ।

কিন্তু একথা বলার মানে নয় গাধার ছবি সুন্দর ক'রে আঁকা হ'লে রাফাএলের মাদোনার ভক্ত তার পানে ফিরেও চাইবে না। কেবল বল্‌বেন মাদোনা বেশি বড় সৃষ্টি। আশালতা ঠিকই বলেছেন, জীবনে প্রত্যেকেরই অভীপ্সা হবে ছোট থেকে বড়র পানে যেতে চাওয়া—কাছে থেকে দূরের অভিসার। আধুনিক শিল্পসর্বস্ব মন গভীরতার সৌন্দর্য্য হারাচ্ছে ব'লেই বলার সময় এসেছে যে রূপায়নেও ছোট বড় আছে ও formই "একমাত্র" বস্তু নয়। এটুকু আশালতার পত্রের সঙ্গে ছাপবেন দয়া করে। ইতি

বশংবদ

শ্রীদিলীপকুমার রায়



শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

করকমলেষু

ভাগলপুর ৪ঠা আগষ্ট

শ্রীচরণেষু

মণ্টুদা ভাই, এ'মাসের ইঙ্গিতে, আপনার 'শেষপ্রশ্ন' নিয়ে লেখা চিঠি পড়লেম। এ নিয়ে ইতিপূর্ব্বে অনেক লেখা পড়িচি, শেষপ্রশ্নের বিপক্ষে এবং সপক্ষে এত যুক্তিতর্ক উঠেচে যে যুক্তির ধূলিতে, আসল জিনিষটির মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করতে যেন বাধচে। 'শেষপ্রশ্নের' রচনারীতি যে অবিসংবাদিত শরৎচন্দ্রের চির-পরিচিত এবং চির-মধুর ষ্টাইল, তা'ত এক নিমিষেই বুঝতে পারবেন। লেখার 'ফর্ম্ম' নিয়ে আপনি অনেক কথা লিখেচেন এবং পরিশেষে 'Aldous'এর বই থেকে যে সুন্দর উদ্ধৃত অংশটুকু দিয়েচেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার শেষ পাইনে। বস্তুতঃ ওই ক'টি লাইন পড়েই ওঁর ওই বইখানি পড়তে লোভ হচ্ছে। কিন্তু 'ফর্ম্ম' নিয়ে যা লিখেচেন তার সহিত মূলত: আমার কোথাও মতভেদ নেই। তাই শেষপ্রশ্ন নিয়ে কিছু বলব ভেবে বসা সত্ত্বেও আগে ফর্ম্মের সম্বন্ধে আমার যা' মনে পড়চে একটু বলতে ইচ্ছা করছে। অথচ এই সমস্ত নিরতিশয় সত্য কথাকে মেনে নিয়েও 'ফর্ম্মের' সৌন্দর্য্য এবং একান্ত আকর্ষণ আমার কাছে লেশমাত্র কম বোধ হচ্চে না। 'Aldous Huxley' একস্থানে লিখেচেন 'you must paint with passion and the passion will stimulate your intellect to create the right formal relations' কিন্তু মনে করুন প্রত্যেকের passion নানাবিধ ভাবে দেখে, নানাপ্রকারে অনুভব করে, আবেগের এই বহুরূপই প্রত্যেকের স্বতন্ত্র রচনারীতির কারণ। একই বস্তু দু'জনে বলতে বসলে এক রকম করে বলতে পারে না। প্রতিজনের বলার ভেতর তার অনুভব, তার চিন্তার বিশেষ ধারা, তার ব্যক্তিত্বের নানা ছায়াময় দিক্ তার বলার ভঙ্গীকে বিশিষ্টতা দেবেই।

রবীন্দ্রনাথের যে কোন প্রবন্ধ পড়লেই মনে হয় না কি, তাঁর লেখার ধরণ যে কেবল তাঁর স্বকীয় চিন্তাকে রসে সিক্ত এবং সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ করেচে এই শুধু নয়, তাঁর রচনারীতির বিশেষ ভঙ্গী—কোন কথার ওপর বেশী জোর দেওয়া কোন চিন্তাকে একটু এগিয়ে নিয়ে আসা, এমনি নানারকমের, বলা যায়না গোছের সাজাবার অপূর্ব্বরীতিতে তাঁর মানসিক জগতের অনেকখানিকে প্রকাশ করচে। তাঁর মানসিক জগতের সে ব্যক্তিত্বকে আমরা সেই 'ফর্ম্মের' ভেতর দিয়ে না পেলে ধরতে পারতুম না।

আলডুস হাকসলিই ত তাঁর 'Music at night' প্রবন্ধে লিখেচেন "The substance of a work of art is inseparable from its from ; its truth and beauty are two and yet mysteriously one." আপনি অস্কার ওয়াইল্ড এবং টলষ্টয় টুর্গেনিভ এবং রোঁলা এই সকল নিয়ে তুলনা করেচেন। ওরও গোড়াকার কথাটা ত দাঁড়াল সেই অনুভব। রোঁলা এবং টলষ্টয়ের অনুভবজগত দিগন্ত প্রসারিত, তাঁদের চিন্তা মানবরাজ্যের আকাশ এবং সমুদ্রকে নিয়ে, সেখানকার বিচিত্ররূপ। সেখানে কেবলই সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা নেই আলো-অন্ধকার, ঝড় শান্তি, সৌন্দর্য্য, কুরূপ সকলই রয়েচে। এই বিশাল অনুভবের প্রকাশরীতি কেমন হবে বলুন? রোঁলার 'John Christopher'এর ষ্টাইল কি টুর্গেনিভের 'Smoke'এর রীতিতে লেখা হতে পারে? না টলষ্টয়ের 'Resurrection' 'অস্কার ওয়াইল্ড'এর 'Lady Windmere'sfan'এর রচনা-ভঙ্গীতে লেখা হবে? প্রত্যেকের অনুভব-জগতের ওপর তাঁর ষ্টাইলের গঠন নির্ভর

করে। মনে হয় যেন অ্যালডুস হাকসলে এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন তাঁর নানা প্রবন্ধে এবং নানা উপন্যাসে। আপনি যে 'art for art's sake' কথাখানা নিয়ে এত রাগ করেচেন তা 'ফর্ম্মের' সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করতে নয় তা হচ্ছে মানুষের অনুভব জগতকে ছোটর থেকে বড়তে নিয়ে যেতে। সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীথেকে আরও ঢের বেশী দূর প্রসারিত করতে। অ্যালডুস হাকসলেও আধুনিক মনের এই অনুভব-কৃপণতা নিয়ে দুঃখ করেচেন এবং তার কারণও দেখিয়েচেন ভারি সুন্দর।

ওঁর 'Art and the obvious' প্রবন্ধখানি এই নিয়ে লেখা। উনি বলেন মানুষের বড়ো অনুভব, বড়ো চিন্তা, বড়ো স্নেহসম্পর্ক, যা কিছু উচ্চ আর্ট হয়ে প্রকাশ পেতে পারত তা এই ডিমক্রাসির যুগে এই সার্ব্বজনীন অক্ষর পরিচয়ের তাড়াতে আগেকার চেয়ে অধিকাংশের অবসর এবং অর্থ প্রচুর হয়ে পড়াতে, অজস্র ছাপার বহির মারফতে, যেমন করে প্রকাশ পাচ্ছে তা এতই কুশ্রী এত তৃতীয় শ্রেণীর হয়ে প্রকাশ পেতে বসেচে, যে কেবল এই কুরূপ প্রকাশভঙ্গীর জ্বালাতে, যাঁদের প্রতিভা রয়েচে, সত্যকার দেবার কিছু রয়েচে, তাঁরাও জীবনের এই সব বড়ো অনুভব থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছেন, এবং যে সকল বস্তুতে নিবদ্ধ করচেন তা আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে মথিত করে না। সুখদুঃখের আন্তরিকতায় আলোড়িত করে তোলে না—এক কথায়, তারা বেশীর ভাগ জীবনমূলের ছোটখাট অবান্তর ডালপালা—মূল কেন্দ্রগুলি না—তাই ওঁদের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয়ে পড়েচে কেবল 'শক্তি নিয়ে নিস্ফল খেলা' শুধু রূপায়নের চর্চ্চা করা।

তাই লিখচেন না উনি "The excesses of "Popularart" have filled them with a terror of the obvious—even of the obvious sublimities and beauties and marvels. Now about nine-tenths of life are made up precislly of the obvious. Which means that there are sensitive modern artists who are compelled, by their disgust and fear, to confine themselves to the exploitation of only a tiny fraction of exsitence." জীবনের যে কথা আমরা গভীরভাবে অনুভব করি, যা আমরা পরম বেদনার ভিতর দিয়ে বুঝেচি, যেভাব এত গোপন যা প্রকাশ করতে বাধে, এমনিতরো আমাদের জীবনের করুণাশ্রুজলে ভেজা মণিমাণিক্যগুলি যদি 'popular art'এর দৌরাত্মিতে এমনি ঝুটো মতি, আর রঙ মেখে বাজারে এসে দাঁড়ায়, ইচ্ছে করে না কি তাদের লুকিয়ে রাখি? কিছু না বলে উড়িয়ে দিই।

গভীর কথাকে হালকাকরে ভাসিয়ে দিয়ে চোখের জলকে চোখে কুটো পড়েচে বলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে গভীর স্নেহের বস্তুকে, লীলালাস্যে চটুল কথায় নিঃশেষ করে দিয়ে—যা কিছু না, যা অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর অতিশয় ক্ষুদ্র, ভারি সাধারণ তাদেরকে নিয়েই বাড়াবাড়ি করি। মন্টুদা 'art for art's sake' কথাটায় এইদিক থেকেই বেদনা পাবার রয়েচে। 'ফর্ম্মকে' তাচ্ছিল্য করে কখনই নয়—আজ প্রাণ অন্তর্হিত হয়েছে বলেই না দেহের সমস্ত লাবণ্য বিলাসই কদর্য্য ঠেকচে। কীটস্ "Grecian Urn" নিয়ে কবিতা লিখেচেন তার দেহসৌষ্ঠব দিয়েই সে দেহাতিরিক্ত কিছুকে প্রকাশ করেচে কিন্তু সে রূপময় পাত্রের ভিতরে জলই থাক বা গোলাপ জলই থাক কীটসের কবিতা লেখার প্রেরণার অভাব হোতনা। কিন্তু মানুষের বেলায় কেবল সুরূপ এবং সুবিন্যস্ত দেহের সুষমা নিয়ে চোখের তৃপ্তি হবে (তাও হবে কিনা সন্দেহ!) অথচ মন সাড়া দেবে না কারণ মনের নানা ব্যঞ্জনা, নানা অনুভবের লীলা, বুদ্ধির গভীরতা ধীশক্তির প্রশান্তি এইত সেরূপের ধারাবাহিক ইতিহাস, একে বাদ দিয়ে রূপ, রূপ নয় থাক না তার যতই নিখুঁত সমালোচনার বহির সহিত মেলার—লক্ষণ। তাই 'ফর্ম্মকে' দোষ না দিয়ে আজকের দিনের আর্টিষ্টের অনুভব-দৈন্য, অনুভব-শূন্যতাকে দোষ দিন। ভিতরের যে আবেগ নিজের অন্তর্বাষ্পের পথ করে নেয় সে আবেগ যে সৃষ্টি হয়ে উঠবে না—আপনি কি মনে করেন, বড়োবড়ো লেখকের ষ্টাইল একটা ভেবেচিন্তে বেছে নেওয়া পদ্ধতি? তা বোধ হয় না। তাঁদের বলবার কথাই, তাঁদের বলবার ধারাকে কেটে নিয়ে চলে।—"You must paint with passion and the passion will stimulate your intellect to create the right formal relations." (Aldous Huxley)

তাই না? তাই বলুন আজকের দিনে সত্যিকার passion নেই, যে সকল বস্তু চিরন্তন কালের, যা নিয়ে সর্ব্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেও তার স্বরূপ চিনতে ইচ্ছে করে তাদের এত সস্তা, এত প্রগল্‌ভ এত অদ্ভুত করা হচ্ছে যে সে আবেগের বাষ্প মেঘ হয়ে কারও মনে জমতে পারচে না, যদি বা জমচে, ত স্বল্প এবং বিচ্ছিন্ন এবং বিতৃষ্ণায় ও বিরাগে আপনার মধ্যেই আবদ্ধ, তা একীভূত হতে পারচে না, তাই এ শুষ্কতা ঘুচিয়ে বর্ষণও দিতে পারছে না।

কিন্তু 'শেষপ্রশ্নের' কথা যা নিয়ে সুরু করেছিলেম, এ বইখানির রচনারীতিতে শরৎবাবুর চিরজনের প্রিয় এবং চিরমধুর ষ্টাইলের একটুখানিও ক্ষুন্নতা ঘটেনি। এবং 'কমলের' চরিত্র ওঁর সৃষ্টির বিস্ময়। (অবশ্য কমলের আশ্রমের কথা নিয়ে বাক-বিতণ্ডাগুলো বাদে) কমলের চরিত্র এক বাণ্ডিল তর্ক নয় সে য়ুরোপীয়ান সমাজের বাসি নকলও নয়, সর্ব্বোপরি সে সাধারণ নয়। কমল কি এদেশে, কি পশ্চিমের দেশে কোথাও পথেঘাটে, রাশি রাশি চোখে পড়েনা। সে দুর্লভ। হয়ত কমলের দেখা পেতে, কি ভারতবর্ষে, কি য়ুরোপে বহুদিন থেকে চোখ পেতে বসে থাকতে হবে। মুচিপাড়ায়, মাতাল ছোটলোকের মহল্লায় একেবারে একাকী এবং নিঃসহায় হয়ে দিব্য মনের স্ফূর্ত্তিতে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেবার মত সাহস এদেশের এবং কোন দেশের খুব বেশী মেয়ের নেই। টাকাকড়ির দিক থেকেও এমন অনন্যনির্ভরপরায়ণতা, এমন দৃপ্ত আত্মসম্মান এমন কঠোর শ্রমশক্তি কজন মডার্ণ মেয়ের রয়েচে বলুন, রূপের কথাটা না হয় এখন তোলা থাক। কমল যে মডার্ণ নয় এবং কমল যে য়ুরোপের সন্তানকল সব চেয়ে কম—একথা বোধ করি অসংশয়ে বলা যায়।

প্রেম-ব্যাপারে তার দুঃসাহসেরও যেমন অবধি নেই তেমনি তার নিষ্ঠুর ধৈর্য্য, তার অপূর্ব্ব সম্ভ্রম তার কল্পনাতীত মহাশক্তি এরও ত আর তুলনা দেখা যায় না। কমলের সহিত মডার্ণ মেয়ের যে কত তফাৎ তা কী সুন্দর করেই না দেখিয়েচেন শরৎবাবু বেলাকে নিয়ে এসে। কমল আর যাই করুক কোন সুবিধা কোন সুনাম কোন অর্থের খাতিরেই যে কথা তাদের দুজনের, তাকে অসম্মানের লাঞ্ছনার ধুলোয় টেনে এনে সকলের করতে পারত না। যে প্রেম একদিন সত্য ছিল, তা আজ মিথ্যে জানবার যখন অবকাশ এ'ল কমল নিঃশব্দে বিনা ক্ষোভে তাকে মেনে নিয়েচে কিন্তু যার একদিন সমাদরের অবধি ছিলনা, তাকে নীরবেই বিদায় দিয়েছে, মনের মাঝে ক্ষণকালের পাওয়া স্মৃতির টুকরাগুলি তেমনি স্নিগ্ধ এবং সুন্দর করে রেখেই সে বিদায় দিয়েছে,—একে অসম্ভ্রমে, নির্দ্দয় প্রতিশোধ নেবার নিষ্করুণতায় এতটুকু মলিন হতে দেয় নাই। তাই মনে হয় কমলের জীবনে এত আনন্দ-উৎস এল কোথা থেকে! জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে, নিদারুণ বঞ্চনা পেলে bitterness কাটিয়ে উঠতে পারেনা—কিন্তু কমল যদি বারংবার নিষ্ফল হয় তবু ওর রসভারাক্রান্ত চিত্তে কোন দিন এতটুকু সরসতার অভাব হবেনা। যার চিত্তসম্পদ এত বেশী তারই এত সাহস সাজে, অন্যকে মানাতনা। তাছাড়া ওর সত্যপ্রিয়তা এরকমই বা কে কোথায় দেখেচে বলুন—অজিত যখন কিছুই না জেনে এই কঠোর সংযমে অভ্যস্ত সুন্দরী তরুণীর প্রতি শ্রদ্ধায় আবেগে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলচে "যারা অকারণে আপনার গ্লানি ক'রে বেড়ায় তারা কিন্তু আপনার পাদস্পর্শেরও যোগ্য নয়। সংসারে দেবীর আসন যদি কারও থাকে সে আপনার।" বলতে পারেন, একাল সেকাল, পূর্ব্বদেশ, পশ্চিমদেশ, কোথায় কোন অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী—তরুণের মুখের 'এই ভাব-বিহ্বল প্রশংসামদিরা নিঃশেষ ক'রে পান করেচে? কাছে পেয়েও কেবল সহনাতীত সত্যভাষণে একে বিনষ্ট করে দিয়েছে? কমল এই "দেবীর আসন" শুনে কেবল অকৃত্রিম বিস্ময়ে চেয়ে রইল, মেলোড্রামাটিক ভঙ্গীতে তার দীপ্ত গ্রীবা উন্নমিত করে এই দেবীর আসন বজায় রাখতে এতটুকু চেষ্টা করলোনা। তার পূর্ব্বজীবনের, তার জন্মগ্রহণের অসংবৃত ইতিহাস স্বেচ্ছায় বলে গেল, এতে যদি একজনের "স্নেহে ও শ্রদ্ধায়বিস্ফারিত হৃদয়, বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ" হয়ে যায় তাতে তার কিছু আসে যায় না।

'কমল' শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তাকে যদি কেউ য়ুরোপ থেকে আমদানী এক বাণ্ডিল তর্ক ছাড়া আর কিছু মনে না করেন, তবে সেটা একান্তই ব্যক্তিগত মতামত।

কমলের দেখা পেতে হ'লে ওদেশের এবং এদেশের পথপ্রান্তে দু'টি চোখ পেতে বসে থাকতে থাকতে ক্ষয়ে গেলেও ওর দেখা বেশী পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটা কথা বলি শুনুন, কমল চরিত্র হিসেবে অতুলনীয় হয়েচে, ওর স্পন্দন রয়েচে, ও শরৎচন্দ্রের অপর সমস্ত চরিত্র সৃষ্টির মতই সজীব, কিন্তু ওর তর্কগুলো কী বলুন ত? শরৎচন্দ্র যে ইতিপূর্ব্বে 'পল্লীসমাজ' এবং এমনিতরো বহিতে নানা প্রশ্নের নানা সমস্যার চিন্তার দিক থেকে কিছু উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েচেন, তা উপভোগের হয়েচে, কারণ সে সমস্ত ব্যথা সত্য, সে সব সমস্যা বড় বেশী আপনার, অথচ শেষপ্রশ্নের পাতার পর পাতা যে নিয়ে তর্ক আজকালকার দিনে মূল রয়েচে তার কোথা? ভারতবর্ষময় কেবলই আশ্রমের ডালাপালা ছড়াচ্চে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম খোলা ছাড়া লোকের মাথায় আর দ্বিতীয় চিন্তা নেই এ ভাবনা তাঁর হঠাৎ বেশী করে মাথায় এ'ল কেন? তাই কমলের কথাবার্ত্তা এবং কমলের তর্কের স্রোত যেন একটা কাল্পনিক সমস্যার কাল্পনিক প্রশ্নোত্তর মালা। সত্যিকথা বলতে কি, আশ্রম নিয়ে আর সনাতন ধর্ম্ম নিয়ে কেবলই তর্কের পুনরুক্তি পড়তে মাঝে মাঝে বেশ কষ্ট হয়। আর এক সত্য যে চিরকাল চলে না এযুগের সত্য যে আর এক যুগে অচল একথাটা আজকাল এত সোজা এবং যাদের একটুখানি বুদ্ধি রয়েছে তারা এতই নিঃসন্দিগ্ধ করে বুঝতে পারে যে, আশুবাবু—অজিত, যাঁরা দেশ-বিদেশে যথেষ্ট ঘুরচেন, উচ্চশিক্ষায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে, জীবনের অভিজ্ঞতায় কারো চেয়ে কম নহেন, তাঁদের বুঝতে এত কষ্ট হবে? এবং সেই কথা গজাল দিয়ে গোঁজবার ভার কমলকে নিতেই হবে। যুগের কথা আর কি! দশ বিশ বছর আগে যা সত্য বলে লোকে অসংশয়ে মেনে নিয়েচে যা নিয়ে dogmatism, orthodoxyর সীমা ছিলোনা আজ তারাও অচল, এইত কিছুদিন আগে বিজ্ঞানের চরম অধিকার নিয়ে লোক কত না মেতেছিল, আজ সকলেই অস্পষ্টভাবে অনুভব করচে, এবং বড় বড় বিজ্ঞানের কর্ত্তারাও বলেচেন অনেক কিছু রয়েচে, যা বিজ্ঞানের বাইরে এবং তারা টেষ্টটিউবে আঁকজোক কষে প্রমাণ না হলেও সত্যের দিক থেকে হয়ত লেশমাত্র কম নয়। মানুষে সকল সময়ে একরকম moodএ থাকে না, তার সত্যোপলব্ধি তার সভ্যতার ইতিহাস জীবনের ধারা এরাও কখনো একটা অপরিবর্ত্তনীয় moodএ স্থির হয়ে থাকতে পারেনা, এক যুগের mood আর এক যুগে বদলাবে, দশ বছর আগেকার সত্য দশ বছর পরে অসত্য হয়ে যাবে, এই সোজা কথাটা বোঝাবার ভার নিয়ে কমলের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মেয়ে কেবলই চৌকি টেনে নিয়ে বসে বোঝাবে, আর বাকী সকলে আকর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করে শুনবে কেউ দেবে বাহাবা, কেউ করবে পঞ্চমুখে নিন্দা—এ যুগের শিক্ষিত পুরুষ কি এত বোকা? তা কখনো নয়। শরৎবাবু ভুল করেচেন এখানে। আমাদের রামায়ণ মহাভারতে পাইনে কি, এক এক রাজার প্রায় এক কুড়ি বিয়ে, কোন রাণীর একশ' ছেলে। তখনকার যুগে সভ্যতা বিস্তারের প্রথম দিনে স্বল্প লোকসংখ্যায় যা ছিল পরম সত্য আজ ভারতবর্ষের সনাতনরীতির মাঝে ডুব মারবার সহিত তাকেও মানতে কেউ বলে নাকি? আজ সে কথার চেয়ে অসত্য আর কি আছে বলুন? কোন সুশিক্ষিত ভদ্রলোকে সে কথা শুনে আজ ভয়ে না শিউরে উঠবে? এবং কোন শিক্ষিত বা শিক্ষিতা আজ birth-control না করে বলুন? তাই বলে কি প্রমাণ হয়ে যায় রামায়ণ মহাভারত অসত্য বা তার কাব্য হিসেবে অমূল্য মাধুর্য্য নেই? অজিত, হরেন, যে সব মনীষিগণের উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত হয়ে বারংবার করজোড়ে নমস্কার করচে, বারংবার আবেগে তাদের চক্ষুর পল্লবপ্রান্ত সজল হয়ে আসচে, সেই সব মনীষিদেরই বা তারা বোকার মত অত করে অভিনন্দন করতে গেল কেন? তাঁরা করেচেন কি? প্রত্যেক বস্তুর প্রথম সংস্পর্শ এবং প্রথম প্রভাব মোহের সৃষ্টি করে অথচ সেটা সাময়িক। আগেকার দিনে যখন লোকে প্রথম প্রথম বিলেত যেত তখন ওর আবেশ ছিল দুর্ব্বার মনে হত নিজের যা কিছু সব ছেড়ে দিয়ে ওদের যা কিছু সবই নিই। এটা যে একদিন অদূর ভবিষ্যতে কেটে উঠতই সেটা স্বতঃসিদ্ধ। তা কোন মনীষির আবির্ভাব না হ'লেও হোত, ওঁরা উপলক্ষ্য মাত্র। শরৎবাবু কি মনে করেচেন, আশুবাবুর মত লোকে যাঁর জীবনের নানা দিকের অভিজ্ঞতা এত অপরিসীম, যিনি দরদ দিয়ে সব সত্যকে বুঝতে চান, তিনিও এ সকল নিরতিশয়

সহজ সত্যকথাগুলো কমলের মুখ থেকে না শুনলে বুঝতে পারেন না। এইত হোল তর্ক-বিতর্কের কথা—তর্কের দিক থেকে এ বইখানা নিষ্ফল—এতে প্রতি তর্কে 'গোরার' মতন ঝড় উথলে ওঠেনা,—গোরা এবং বিনয়ের কথোপকথনের মাঝে যে প্রবলতা, যে স্বাভাবিকতা, যে একান্ত সৌন্দর্য্যময় প্রতিযুক্তির তীক্ষ্ণতা ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট, তার কিছুই নেই এক কথায় একে intellectual নভেল কোন মতেই বলতে পারিনে। Intellectual অংশটুকু বাদ দিয়ে 'কমলের' চরিত্র বড় সুন্দর। কমলের যে দিকটা যে ভাবে স্ফুট করতে চেয়ে বেলা এসেচে তা'ও বেশ।

নীলিমাকেও বড় ভাল লেগেছে,—বোকা পুরুষের দলকে বাদ দিয়ে ওই মেয়েটিই একমাত্র কমলকে কিছু বুঝেছিল, তাই বেলার স্বামীত্যাগের কাহিনী বলতে যেয়ে সাহস এবং মনের জোরের কথা নিয়ে আশুবাবু যখন কমলের সঙ্গে বেলার তুলনা তুললেন, নীলিমা আহত হো'ল, এখানে বেলা ও নীলিমায় যে কাথাবার্ত্তা হয়েচে, তা ভারি সুন্দর।

"বেলা প্রশ্ন করিল কিন্তু তার স্বামী থাকলে সে কি কোরতো? নীলিমা বলিল, তাঁর সেবা কোরতো, রাঁধতো বাড়তো, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করত, ছেলে হলে তাদের মানুষ করত; বস্তুত, একলা মানুষ, টাকাকড়ি কম, আমার বোধ হয় সময়ের অভাবে তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারত না। বেলা কহিল তবে? নীলিমা বলিল, তবে কি? বালয়াই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল কাজকর্ম্ম করবোনা, শোক-দুঃখ অভাব-অভিযোগ থাকবেনা, হরদম ঘুরে বেড়াবো এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? আপনি বরঞ্চ এইখানটি পড়ে দেখবেন, নীলিমার কমলকে ভালো লেগেছিল কিন্তু ও আচ্ছন্ন হয়নি, তাই কমলকে ও যতটা বুঝেছিল আর বোধ করি কেউ অমন করে বোঝেনি। তা'ছাড়া নীলিমার জীবনের সমস্যা, কোন কাল্পনিক সমস্যা নয় তা নগরে নগরে আশ্রম বিস্তারের ভয়ের চেয়ে আমাদের ঢের বেশী আপনার, তাই ওই সংক্ষিপ্ত চরিত্রটি অমন করে মনে লাগল। কমল প্রেমের কথা নিয়ে যে সমস্ত কথা যেমন করে বলেচে তার সবই অভ্রান্ত নয়, কমলের পক্ষে যা সত্য, যারা কমল নয় তাদের পক্ষে তা তেমনই ভুলে ভরা। নীলিমা এই সহজ সত্যটুকু বুঝেছিল, তাই ও যে দু'এক জায়গায় কমলকে প্রতিবাদ করেচে তাই হয়েচে যথার্থ ব্যক্তিত্ব সমেত প্রতিবাদ।

তারপর কমলের সব চেয়ে যেটা গভীর কথা, যা নিয়ে আশুবাবুকে সে বারংবার আঘাত করেচে যাকে সে মনের জরা বলেচে, সে কথাও ত আজকের দিনে সোজাভাবে অনেকেই অনুভব করচে। প্রেমের ব্যাপকতার চেয়ে স্থিতির চেয়ে তার প্রগাঢ় মুহূর্ত্তগুলি কমলের কাছে আদরের ধন। এর খাতিরে সে অনেক কিছু ছাড়তে পারে—কোন বন্ধনের স্থায়ীত্ব সে স্বীকার করেনা, করে কেবল এই অপূর্ব্ব ক্ষণকাল এই তার কাছে মণিমাণিক্য। কিন্তু প্রেমের মত প্রত্যেক বড় শিল্পিরও ত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ইতিহাস সমান উজ্জ্বল নয়। আকাশের তারার মত অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে এই উদ্ভাসিত মুহূর্ত্তগুলি চকিতে দেখা দিয়ে যায় কিন্তু এদের গাঁথবে সে কি দিয়ে? স্থায়ীত্বর ইতিহাসই প্রেমের সবটা নয় জানি, কিন্তু কোন সূত্র নেই গোত্র নেই নাম নেই বৃন্ত নেই, পরম্পরা নেই কেবল মদিরতাময় গভীরতম গুটিকতক ক্ষণকালের স্মৃতি এতেই কি সবটা ভরে ওঠে? এই সম্পর্কে 'অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার' কয়েকটি লাইন মনে পড়ে নাকি?

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসরের প্রাত্যহিক সাধনা তাঁকে অমরতা দিয়েচে, কিন্তু এর প্রতিদিনই কি তিনি প্রেরণা পেয়েচেন? তা হয়ত পাননি, তাঁর প্রতিদিনের সাধনাই তাঁর great moment গুলিকে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অমরতায় বিধৃত করে রেখেচে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলও ত প্রেমসম্পর্কের কথা লিখতে যেয়ে বলেচেন প্রেমের এই great moment গুলিকে একগাছি মালার মত করে গেঁথে তুলতে গেলেই, একটা common life চাই, common interest চাই, এবং পরস্পরের ব্যক্তিগত জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে এক common interest সৃষ্টি করে তুলতে হবে বলেই সন্তান চাই কিন্তু তবু আশ্রমের এবং ভারতবর্ষের বিগত ধর্ম্মের তর্কে কমল যে পরিমাণে নীরস, এই প্রেমসম্পর্কের কথাবার্ত্তায় তার কথাগুলি স্থানে স্থানে তেমনই অপূর্ব্ব, দু'এক জায়গায়

দেখুননা কী সুন্দর তার কি তুলনা রয়েচে? নীলিমা প্রশ্ন করচে "কমল তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, সত্যিকার ভালোবাসাও যদি ভুলের মতই সহজেই ভেঙ্গে পড়ে, মানুষে তবে দাঁড়ায় কিসে? তার আশা করবার বাকী থাকবে কি?" কমল তার উত্তরে বলবে "যে স্বর্গবাসের মিয়াদ ফুরুলো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র" এই ধরণের ভাবনায় এবং এই ধরণের উত্তরে হয়ত প্রশ্নের জবাব মেলেনা কিন্তু মনের মাঝে যে সুরের রেশ রেখে যায়, তা সকল প্রশ্নের অতীত।

কমলের প্রতিপক্ষ হিসেবে একটি লোককে নামান হয়েছিল রাজেন, তার নিষ্কলুষ শুভ্রতা তার কর্ম্মের বিস্ময় সব্যসাচীর, এবং উপেন্দ্রর চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু সব্যসাচীর মত রাজেন্দ্র অত মধুর হ'য়ে ফুটতে পায়নি। কারণ সোজা—রাজেন্দ্র সত্যই কুমার, নারীবর্জ্জিত চরিত্র মাধুর্য্য হিসেবে মনকে আমাদের ততখানি দোলা দেয় না, যেমন দিয়েছিল সব্যসাচী সুমিত্রার সহিত তার প্রচ্ছন্ন অথচ কূলহীন সম্বন্ধের আভাময় হয়ে। সব চেয়ে শেষে একটা কথা আপনি নীরেন্দ্রনাথ এবং অন্নদাশঙ্করের লেখার অত প্রতিবাদ করতেই বা গেলেন কেন? ওঁরা বলেচেন শরৎচন্দ্রের এবার থামা উচিত। এই ত? কিন্তু মনে করে দেখুন যদি, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার, কিংবা অন্নদাশঙ্কর বা নীরেন্দ্রনাথ 'শেষপ্রশ্নের' মত একখানা বই লিখতে পারতেন লোকে কি স্বপ্নেও ভাবত বা কখনো লিখতে পারত, "তোমরা এবার থাম!" তা পারতনা। বরঞ্চ বলত, তোমরা খুব লেখ-সব কাজ ছেড়ে বেশী সময় করে নিয়ে লেখ।" অথচ শরৎচন্দ্রের বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে কেন? তার কারণ যিনি শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব্ব লিখেচেন, যিনি লিখেচেন গৃহদাহ তাঁর কাছে 'শেষপ্রশ্ন' অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের বস্তু পাওয়া নয় বরঞ্চ নিরাশ হওয়া। তিনি শরৎচন্দ্র বলেই লোকে তাঁকে থামতে বলেছে! (যদিও আমার মনে হয় এ বলাটা অনধিকার চর্চ্চা, কারণ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এখনো 'শেষপ্রশ্নের মত একখানা উপন্যাস লিখতে পারতে পারেন এমন লেখক কাউকে দেখতে পাইনে।) ভেবে দেখুন ত শাজাহান যদি তাজমহল গড়ার পর, তার চেয়ে ছোট কিছু রচনা করতেন লোকে মনে মনে কি বোলতনা যে তোমার অক্ষয় সৌন্দর্য্য লোকের দান যে এখনো আমাদের মনকে ভারাতুর করে রেখেচে, এর পর দৃষ্টিকে নামিয়ে আনতে যে বাধে। কিন্তু সত্যি শ্রীঅন্নদাশঙ্করের এবং কিছু পরিমাণে নীরেন্দ্রনাথের সমালোচনা আমার বড় খারাপ লেগেছিল। তাতে অসহিষ্ণুতা, কেবল ব্যক্তিগত মতামতের দম্ভ, এত বেশী করে প্রকাশ পেয়েচে। শেষপ্রশ্ন শরৎবাবুর সর্ব্বোত্তম সৃষ্টির অন্তর্গত নয়, কিন্তু এতেও যে সৌন্দর্য্য এবং রচনারীতির যে মাধুর্য্য মাঝে মাঝে ছড়িয়ে রয়েচে তা একটুখানি শ্রদ্ধা মনের মধ্যে রেখে চোখ কাণ খোলা রেখে পড়লে ভালো করেই উপভোগ করা যায়। কিন্তু আর লিখবনা। একে ত এই পড়তে আপনার ধৈর্য্য থাকবে কিনা জানিনে বেশী বড় করে আর পীড়া দেব কেন? কিন্তু আরও অনেক কথা হয়ত বাকী রইল।

আমার বিনম্র প্রণাম গ্রহণ করেন। ইতি



মায়া

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

১

পাশের বাড়ীর কালিন্দি গাইটাকে দেখিলে ফটিকের একবার তাহার দোলায়মান কণ্ঠটায় হাত বুলান চাই। কালিন্দিও ঠিক তেমনি—সে মাথা নেড়ে, গা চেটে, নানারূপ ভাব-ব্যঞ্জনার দ্বারা এই দরদী লোকটির নিকট হইতে আদর কাড়িয়া লয়। আর ফটিকের কাজকর্ম্ম সব চুলায় যায়।

ফটিক ভদ্র গৃহস্থের ছেলে। কিন্তু সে নিজের হাতে শাক সব্জী—লাউ কুমড়া—বেগুন শশা—আলু কপি—ক্ষেত ভরিয়া তৈয়ারী করে, প্রাণ ভরিয়া খায় আর গাঁয়ের লোককে বিলাইয়া দেয়। সে যখন সকালে জলযোগ শেষ করিয়া কোদাল কুড়ুল লইয়া বাগানে যায়, তাহার মাতা হরিমতি যদি ডাকিয়া বলেন, "বাবা! গোলা থেকে ধামা কতক ধান পেড়ে দিয়ে যা" ফটিক ক্ষেপিয়া উঠে। তাহার সময় হয় না। কিন্তু সেই পায়ে বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে যদি কালিন্দিকে দেখে তাহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। হাতের কোদাল কুড়ুল ফেলিয়া রাখিয়া সে তাহার গলদেশের লোমগুলি কুরাইয়া আরাম দিতে থাকে। কতটা সময় কাটে এই নগণ্য জীবের প্রতি অস্পষ্ট স্নেহের জড়িমায় খেয়াল থাকে না। আবার বাগানের কাজ সারিয়া বড় এক ঝাঁকা কচি ঘাস স্কন্ধে লইয়া যখন ঘরে ফিরে—কালিন্দিকে চোখে দেখিলে তাহার মুখে কতক অংশ গুঁজিয়া দিয়া আসিতেও ভুল হয় না। বাস্তবিকই গরুটির নধর সুঠাম চেহারা যেমন—তেমনি কাল কুচ্‌কুচে লোমগুলি দিয়া যেন তেল গড়াইয়া পড়ে। দেখিলে অনেকেই চোখ পাকাইয়া থাকে। কিন্তু ফটিকের মত এমন গলা জড়াইয়া ধরিতে কাহাকেও দেখা যায় না।

ফটিকদের রান্নাঘরের পিছনেও শাকসব্জীর ছোট একটি ক্ষেত ছিল। এই ক্ষেতটিতে ঠিক দুপুর বেলাটায় কালিন্দির একদিন নির্ব্বিবাদে ঢুকিয়া পড়িবার সুবিধা হইল।

রান্নাঘর হইতে অমলা সব্জীবাগের দিকে সচঞ্চল নজর দিয়া ব্যস্ততার সঙ্গে ফটিকচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল,

"দাদা, তোমার সব্জীবাগে গরু পড়েছে। ধেই—ধেই এঃ! একেবারে মাঠ করে ফেল্‌লে যে!"

ফটিক তখন সুক্তের তরকারীগুলি একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া ভাতের সঙ্গে ঝোলটুকু কেবল মাখাজোকা করিয়া লইতেছিল। সে হাত উঁচু করিয়া পিঁড়ির উপর সোজা হইয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল,

"কাদের গরু?"

"কনকদাদের কালিন্দি। এঃ! শেষ করে ফেল্‌লে যে! তোমার এত সাধের আলুর গাছ একটাও রাখ্‌লে না। কুমড়া গাছের তকৃতকে ডগাগুলি কিভাবে মুড়িয়ে মুড়িয়ে শেষ করছে দেখ।"

ফটিক রাগিয়া বলিল, "তোর হাঁটুতে কি বাতে ধরেছে? তাড়িয়ে দিতে পার্‌লিনে?"

"আমার হাত জোড়া—মা ঘাটে গেছে।"

ফটিক এবার গ্লাসের জলটা হাতে ঢালিয়া উঠিয়া পড়িল। একখানা বংশখণ্ড লইয়া যেন ক্ষেপিয়া সব্জীবাগের দিকে ছুটিল। ফটিককে ধাওয়া হইয়া আসিতে দেখিয়া কালিন্দি চঞ্চল হইল। তবুও চলিবার পথে সচঞ্চল মুখখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ফটিকের ক্ষেত-পাট উজাড় করিয়া তাহাকে পরিহাস করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। ফটিকের তখন খুন চড়িয়া গিয়াছিল। সে সেই লাঠি দিয়া পিটাইতে পিটাইতে প্রায় পোয়াখানেক রাস্তা তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। তারপর রণে ভঙ্গ দিয়া একটা গাছতলায় আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। ক্রোধদীপ্ত চক্ষু দুটি হইতে তখন অনল বিস্ফুরিত হইতেছিল। এইরূপে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সে বাড়ীর পথে ফিরিয়া আসিল।

অমলা বসিয়া বসিয়া ইহার ভাতের থালা চৌকি দিতে-

ছিল। ফটিক তথায় না উঠিয়া সম্মুখের ঘরের দাওয়ার উপর জলচৌকিখানা টানিয়া লইয়া তাহার উপর আসিয়া বসিয়া পড়িল। অমলা চাহিয়া দেখিল, ইহার ক্ষুধার্ত্ত চক্ষু দুটি তখনও যেন শিকার অন্বেষণে ফিরিতেছে। সে ডাকিতে সাহস করিল না। ভাত আগলাইয়া সেইরূপই বসিয়া রহিল। আর মাঝে মাঝে ইহার ঘনান্ধকার মুখখানা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও ইহার ক্রোধ শান্তির লক্ষণ যখন সে দেখিল না, তখন সে বলিল, "দাদা, ভাত যে শুকিয়ে গেল।"

ফটিক উত্তর দিল না।

তখন সে তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দাদার ভাত কিন্তু কড়ি কড়ি হয়ে গেল মা!"

মাতা রান্নাঘর হইতে বলিলেন, "এখনও খেতে বসিসনি ফটিক? খেয়ে ফেলেছে তার আর করবি কি। মুখের ভাত ফেলে উঠে গেলি—খেয়ে নে।"

ফটিক এবার অমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুই যা'ত একবার কনকদাদের বাড়ীতে। গরু যেন বেঁধে রাখে। না বাঁধতে পারে ত অমন দজ্জাল গরু বেচে ফেলে দিক্।"

ভাইটি যে কি রুক্ষ প্রকৃতির অমলারই জানা ছিল অধিক। যা' কিছু হুকুমদারী এই মেয়েটিকে সে করিত। আর ভাল-মন্দ সে খাটিয়া খাটিয়া মরিত। তাহাও আবার মুখের কথা মুখে থাকিতে সম্পন্ন না করিলে রক্ষা থাকিত না।

সে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরিয়া আসিল।

ফটিক জিজ্ঞাসা করিল, "বলেছিস্?"

"হাঁ।"

"কাকে?"

"জ্যেঠাইমাকে।"

"কি বল্লেন তিনি?"

"ওমা! তিনি দেখি আরও পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলেন।"

ফটিক রাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্লেন?"

"বল্লেন,—ফটকে ত আর ঘেরা-বেড়া করবে না। গরুর আর দোষ কি মা? এখন ক্ষেত-পাটের ধান উঠে গেছে, সকলের গরুই ত ছাড়া—আমরা বা বেঁধে খাওয়াব কেন?"

ফটিক উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাবা মেয়ে কোথাকার! তুই বুঝি তাই শুনে এলি?"

অমলা বলিল, "আমি বল্লাম,—দাদা ত চব্বিশঘণ্টা ঘেরা-বেড়া নিয়ে পড়ে আছে। সকাল বেলায় ক্ষেতে ঢোকে —আর এসে চান্ করে। আবার গা গড়িয়ে যায়—আর সন্ধ্যেবেলায় ফেরে।"

"তার জবাব কি পেলি?"

"তিনি ত হেসেই লুটিপুটি। বল্লেন—ফট্কের ঘের-বেড়া? ও আমার কপাল! সেই বুঝি বছর চারেক আগে একবার বাঁশ কিনেছিল। সেই পচা বাখারি দিয়ে আর কতকাল তালি দেবে? তাতে মা, গরু রাখা যায় না—পয়সা খরচ করতে হয়।

অমলা যেভাবে হুবহু কথাগুলি বলিয়া গেল, ফটিকের মনে হইল, কনকের মাতা বিধুমুখী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহার সঙ্গে যেন এই বাদ-প্রতিবাদ করিতেছেন। তাহার চক্ষু দুটি জলিয়া উঠিল। সে উত্তেজিত হইয়া ডাক্ দিল,

"নিধে!—নিধে!"

নিধিরাম বাড়ীর ভৃত্য। সে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। ফটিক বলিল,

"তুই যা ত, কনকদাদাদের লাল গাইটা যেখানে পাবি বেঁধে আন্বি। যা—এক্ষুনি যা।"

নিধিরাম চলিয়া গেল। ফটিক তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

কালিন্দিকে লইয়া সে ফিরিয়া আসিলে অমলা বলিল, "আহা! দাদা, গরুটা যে নেই—কি মারই মেরেছ?"

ফটিকও চাহিয়া দেখিল। তাহার দুর্জ্জয় ক্রোধের সমস্ত চিহ্নটাই গরুটার পৃষ্ঠদেশে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও দড়ার মত ফুলিয়া উঠিয়াছে—কোথাও বা ক্ষতচিহ্ন প্রকট হইয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

মেয়ের কথা শুনিয়া হরিমতি ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। গরুটিকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন, "আহা! এ করেছিস্ কি! অবলা জাত—এর উপর

আর বাঁধা-ছাঁদা করে মুন্নি জড় করিস্নে। আমার মাথা খাস ছেড়ে দে।"

মাতার কথা শুনিয়া ফটিক আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কোন জবাব দিল না। রাগে ফুলিতে ফুলিতে গরুর দড়িগাছটি হাতে লইয়া জোরে টানিতে টানিতে তাহাকে বাগানের ভিতরে লইয়া গেল। সব্জীবাগ অতিক্রম করিবার সময় ক্ষেতটির সে শ্মশান-দৃশ্য দেখিয়া তাহার ক্রোধ আবার দ্বিগুণতর বেগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

হরিমতি যখন দেখিলেন ছেলে তাঁহার কথা মানিল না, গরুটি লইয়া বাগানে ঢুকিল, তিনি আর কিছু বলিলেন না। ইহার একগুঁয়েমির নিকটে সকলকেই হার মানিতে হইত। তিনি এই গায়ের জ্বালা মেয়েটির উপর ঝাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন,

"হা করে দাঁড়িয়ে দেখ্ছিস্ কি? ভায়ের কীর্ত্তি? কাকে এঁটো কাঁটা নিয়ে ছড়াছড়ি লাগিয়েছে—চোখের মাথা খেয়েছিস্? যত অকল্যাণ সবই ভাই বোনে টেনে আন্বি। এ গৃহের মঙ্গল হবে? কখ্খন না।"

অমলা থালা বাসন লইয়া ঘাটে গেল। ফটিক বাগানে ঢুকিয়া গভীর জঙ্গলে ঝোপের মধ্যে গরুটি বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল।

২

বাগানে জামগাছ তলায় ঝোপের মধ্যে কালিন্দির পাশে ফটিক একলাটি বসিয়া। গরুটির পৃষ্ঠের এই দগ্ধচিহ্নগুলি তাহার নিজের হাতের সৃষ্ট। লুব্ধ মক্ষিকার দল খুঁটিয়া খুঁটিয়া ক্ষতর পরিসর বাড়াইয়া তুলিতেছে। গরুটির দুইচোখ দিয়া জলের ধারা বহিয়া শুকাইয়া আছে। প্রাণ তাহার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল কিন্তু মাটির উপর বসিয়া আজ আর গলদেশ বেষ্টন নয়—মাছিগুলি তাড়াইয়া দিতেও যেন তাহার মাথা কাটা পড়িতে লাগিল। আহা! এই কালিন্দি যে তাহার কত আদরের! ইহাকে ত সে কোনদিন তুচ্ছ করিয়া দেখে নাই। ইহার পৃষ্ঠে দগ্ধচিহ্ন আঁকিয়া দিতে পূর্ব্বের এমন কোন চিহ্নই সে রাখে নাই যাহার ফলে সে আজ ইহার নিকটে মাথা তুলিয়া বসিতে পারে। কালিন্দি কি তাহাকে চিনিতে পারিতেছে? ফটিকের সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। গতদিনের মমতাহীন ঘটনাগুলি মনে উঠিয়া বেদনায় তাহাকে একান্ত কাতর করিয়া তুলিল।

কিন্তু কালিন্দির মুখখানা ক্রোড়দেশে তুলিয়া লইয়া সে যখন তাহার গলদেশ পূর্ব্বেরই মত চুলকাইয়া দিতে লাগিল, তখন তৃপ্তিতে কালিন্দির দুই চক্ষু বুজিয়া আসিল। এবং সে তাহার কণ্ঠদেশ ইহার ক্রোড়ের উপর আরও অধিক বাড়াইয়া বাড়াইয়া ধরিতে লাগিল।

ফটিক দেখিল ইহার সহিত আত্মীয়তা তখনও ছিন্ন হয় নাই। তাহার চক্ষু হইতে কয়েক ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া নির্জ্জনে বনস্থলী ভিজাইয়া দিল। কালিন্দির চোখের শুষ্ক ধারা দুটি পুঁছিয়া দিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। সে কয়েকবার তাহার মুখে মুখ মিলাইয়া গোয়ালঘরে চলিয়া আসিল।

হরিমতী রান্না চাপাইয়াছিলেন। গো-শালা রান্নাঘর হইতে বেশী দূরে ছিল না। মেয়েকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বিচালি কাটে কে রে?"

অমলা বলিল, "দাদা বোধ হয়।"

"এখন বিচালি কাট্বে—গরু মাঠে যায়নি?"

"গেছে।"

"তবে?"

অমলা বটি ছাড়িয়া ঘরে আসিল। মায়ের কাণের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিল, "কালিন্দির জন্যে বোধ করি।"

হরিমতী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "হাঁ, দরদে ত আর টানায় না। যা না দেখে আস্বি, কে?"

অমলা পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিল ফটিকই বটে! বিচালি কাটিয়া খৈল দিয়া মাখাজোকা করিতেছে। তাহার পর সে যখন চুপড়িখানা স্কন্ধে লইয়া বাগানে গেল, অমলাও পিছু পিছু তাহার অনুসরণ করিল।

ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া দরদের সঙ্গে হাতে তুলিয়া সে

যখন কালিন্দিকে খাওয়াইতেছিল, অন্তরের কোন্ একান্ত সম্বন্ধের সহিত জড়িত হইয়া সমস্ত মায়া মমতা চক্ষুদুটিতে জল হইয়া যেন মুক্তা ঝরিয়া পড়িতেছিল। অমলা বাড়ী ফিরিয়া বলিল, "মা! কালিন্দির কিন্তু গো-জন্ম কেটে গেল। দরদ ঢেলে কি সোহাগ জানান হচ্চে একবার দেখ এস।"

হরিমতী জবাব দিলেন না। অমলা আবার তরকারী কুটিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল, ফটিক ঘর্ম্মাক্ত দেহে ঘরে ঢুকিয়া কেরোসিনের বোতলটি লুকাইয়া লইয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছে। দুষ্ট হাসিতে অমলার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাহা লুকাইবার জন্য হাঁটুর উপর মাথাটি নত করিয়া রাখিল।

ফটিক চলিয়া গেলে কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেও বাগানের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল। ঝোপের ফাঁক দিয়া দেখিল, কালিন্দি তথায় বাঁধা রহিয়াছে। ফটিক তাহার ক্ষতের উপর কেরোসিনের পটি আঁটিয়া দিতেছে। অমলার হাসি পাইল। সে মুখে কাপড় দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বটির উপর আসিয়া বসিয়া মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল, "মা, আমি ত তোমার কেরোসিন ঢাল ফেলি—আলোয় তেল ভর্‌তে জানিনে। আজ আবার তেল কিন্‌তে হবে তা বলে দিচ্ছি।"

"কেন?"

"কাল গোটা বাঁশটা পিঠের উপর ভাঙলে—আজ আবার কেরোসিন ঢেলে—খাবার দিয়ে আদর জানান হচ্চে।"

অমলার কথা শেষ না হইতেই ফটিক আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার সামনাসামনি আসিয়া বসিল। বলিল, "কি টিপ্পনি কাটা হচ্ছে? তেলের ভাবনাটাই তোর কিছু বেশী। আবার ক্ষেতের ফসল যা নষ্ট করেছে সে ভাবনাটাও আমারই বেশী। যাক্—তোর আলো ভরতে যে তেল নষ্ট করেছি তার বেশী পেলে ত কথা নেই?"

অমলা মুখ ম্লান করিয়া কহিল, "আমার দরকার কি? মা বকে যে!"

ফটিক একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দ্যাখ্, কাল রাগের মাথায় যে কাণ্ডটা করে ফেলেছি, তোদের দয়ার শরীর—খোঁটা দিতে তোরা ছাড়িস্ নি। কিন্তু আজ তার গায়ে একটু তেল ঢেলেছি বলে তোরাও যে সেই পাষাণ হয়ে উঠেছিস্। শোন্—নিজের দোষটা একটু দেখ্‌তে শিখিস্।"

অমলা বলিল, "আমরা ত পাষাণ আছি। গরু অবলা জাত, তার পিঠের উপর তোমার মত নাঙল চষ্‌তেও কেহ পারে না।"

ফটিক হাসিয়া বলিল, "সে কথা ঠিক্ বলেছিস্। কিন্তু তোদের মত হাত গুটাতেও ত কেউ পারে না। কালকের মত মাথা গরম হবার কোন কারণই ত তোদের ঘটেনি। এত মায়ার শরীর তোদের—একটু তেলের মায়া ত্যাগ কর্‌তে পারিস্‌নে কেন?"

অমলা এবার ভিন্ন পথে ফটিককে কাহিল ক'রতে যেন উদ্যত হইল। বলিল, "এখন গরুটা ছেড়ে দেবে—না বেঁধে রেখে বিচালির গাদাটা শেষ করাবে?"

"ওঃ! তাতেও তোদের বেজে উঠেছে?"

"তাতে বাজেনি। তুমি ছেড়ে দিলেও সে খেতে পাবে। যারা গরু পুষেছে—তাদের বিচালিও আছে। কাল থেকে বনে জঙ্গলে গরুটাকে বেঁধে রেখেছ, পোক মাকড়ে পিঠখানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, তাতে বুঝি দরদ হয় না?"

গরুটিকে আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া আসিয়া তাহার অন্তরের ব্যথা কেবল জুড়াইয়া উঠিতেছিল, অমলা যেন তাহার উপর আবার একটি বিষাক্ত দ্রব্য ছুঁড়িয়া মারিল। সে অত্যন্ত কঠোর হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, গরুটি বাগানের মধ্যে না খাইয়া শুকাইয়া মরিলেও সে তাহার গলার দড়ি নামাইবে না।

অমলা কিন্তু তাহার দাদাকে রূঢ় কথা বলিয়া কিছু থম্‌কিয়া গেল। সে স্বর নরম করিয়া কহিল।

"গরুটা যে ক্ষতি করেছে, সত্যই রাগ হয়—তা'বলে অত রাগ?"

সমবেদনা জানাইতে গিয়াও সে একটু মোচড় দিল। হয়ত সেটা ইচ্ছাকৃত নহে।

গায়ের রক্ত জল-করা এতদিনের পরিশ্রমের বস্তু যে লুটিয়া খাইল তাহার উপর ভগিনীর বিচার-বুদ্ধি দেখিয়া সে বিরক্ত হইল। ক্রোধ-বিকৃত মুখখানা নামাইয়া লইয়া সে বসিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে কনকের মাতা বিধুমুখী গরুটার খোঁজে একবার অমলাদের বাড়ীতে আসিলেন। দূর হইতে অমলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"অমলি, মা, ফটিক বাড়ী আছে?"

অমলার মুখের অন্ধকার-ভাব তখনও কাটে নাই। সে অমনি বিশুষ্ক মুখে বলিল,

"আছেন।"

বিধুমুখী অঙ্গনে পা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফটিক, বাবা, গরুটি ত কাল থেকে পাচ্ছি না, বেঁধে রাখিসনি ত?"

ফটিকের দুই চোখে আবার সেই উদ্দীপ্ত চাহনি। অন্তর তখন আবার উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,

"আমি বাঁধ্‌ব কেন?"

বিধুমুখী বলিলেন, "কাল তোদের ক্ষেতে এসে পড়েছিল, তারপর আর তাকে দেখিনি। সমস্তদিন খোঁজাখুঁজি করেছি, রাত্রেও সবাই আলো জেলে খুঁজেছে। বাবা, বেঁধে থাকিস্ ত ছেড়ে দে। বাছুরটা ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে।"

ফটিক কহিল, "যে শান্ত গরু তোমাদের, অপর কার ফসল পয়মাল করেছে, হয়ত খোয়াড়ে দিয়েছে। সবাই ত আর ফটিক নয়।"

বিধুমুখী বলিলেন, "শান্ত সে কথা মিথ্যা নয়। কালগরুমাত্রই শান্ত হয়। তা ছাড়া আমাদের কালিন্দি ত শিং দিয়ে চটাখানা সরাতে জানে না। একেবারে আলগা পেলে গরু জাত্—সে ভিন্ন কথা।"

ফটিকের কালকার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সে বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "জ্যেঠাইমা, টাকা কেবল তোমাদেরই আছে। আমরা ঘেরা-বেড়া করতে পয়সা কোথা পাব? যা-ত অম্‌লি, ঘেরাটা একবার দেখিয়ে আন্‌বি?"

বিধুমুখী মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, সে কথাও বুঝি দাদার কাণে দেওয়া হয়েছে। কি মেয়েই হয়েছিস্ যে! ঘেরার আর দেখ্‌ব কি? দুবেলাই দেখ্‌ছি। কতকগুলো ফুলের কাঁটা এনে ঠেসে রেখেছিস—তার উপর বাখারী পড়্‌লে না আঁট-সাঁট থাকে?"

রান্নাঘর হইতে হরিমতী মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "তাই বলে যাও দিদি! আমরা ত ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে সাহস পাইনে। এত করে বলি যে,—ফটিক, ভালমত ঘেরা-বেড়া না করতে পারিস্ ত এ সকল করিসনে। হাতের তৈরী ফসল নষ্ট হলে পুত্রশোকের মতই লাগে। বছর বছর কি কম ফসলটা তৈরী করে? হাতখানাও সেই রকম, যে বীজটে ছড়াবে—রক্তবীজ হয়ে বেড়ে উঠ্‌বে। তারপর যখন ফলফুলে ছেয়ে ফেলে, ঠিক সেই সময় এসে গরু পড়ে একদিনেই সব শেষ করে দিয়ে যায়। এই ত চিরদিন দেখে আস্‌ছি।"

বিধুমুখী বলিলেন, "সেত আমরাও জানি। শরীরের ত এই দশা—রোদ নেই বিষ্টি নেই—চব্বিশ ঘণ্টা গাছ-গাছালি নিয়ে পড়ে আছে।"

হরিমতী বলিলেন, "শরীরের কথা আর বলোনা দিদি! মাসের মধ্যে পাঁচটা দিনও কি ওর ভাল যায়! পেটটা পিলেতে যেন রাম-রাজত্বি করে বসে আছে। চব্বিশ ঘণ্টা ওর গা দিয়ে জ্বর বইছে। বল্‌লে হেসে উড়িয়ে দেয়। আমাকে কি সুখী হতে দেবে ওরা?"

বিধুমুখী বলিলেন, বাস্তবিক দিদি, ও পেটটি দেখ্‌তে আমাদেরও ভয় হয়। এত খাটুনি খাটাও ত ভাল নয়।"

"খাটুনি বলে খাটুনি। আলুর ক্ষেতে ভাঁড়-ভাঁড় জল টেনে যখন ভর্ত্তি করে, তখন মনে হয় পুকুরটাই বুঝি ধরে এনে জমীর উপর ঢালে।"

বিধুমুখীর মনে গরুটার কথাই জাগিতেছিল। তিনি দেখিলেন, ফটিকের সঙ্গে যে ভাবে কথাটি শেষ করা হইয়াছে, পুনর্ব্বার ঐ কথার উত্থাপন করিবার যেন কোন সূত্র নাই। বলিলেন,

"যাই। গরুটির ভাবনাই বেশী হয়েছে। বাছুরটা গলা শুকিয়ে মারা না যায়।"

তিনি যখন ফটক পার হইবেন, ফটিক ডাকিয়া বলিল, "চল্‌লে নাকি জ্যেঠাই মা ?"

"যাই বেলা হল—রান্না বান্না রয়েছে। গরুটার জন্যে মনে আর স্বস্তি নাই।"

"সকাল বেলায় খালি হাতে যাচ্ছ—কিছু তরকারীপত্তর নিয়ে যাও।"

তিনি এক পায় দু' পায় ফিরিয়া আসিলেন। ফটিক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সব্‌জীবাগের নিকটে গেল। অর্দ্ধকর্ত্তিত ডালগুলির ম্রিয়মান অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন,

"আহা! বড্ড ক্ষতি করেছে যে!"

ফটিক কোন কথা বলিল না। সে নানাবিধ তরকারীতে চুপড়ী পূর্ণ করিয়া কালিন্দির মনিবের হাতে তুলিয়া দিয়া প্রাণ যেন কিছু হাল্‌কা করিয়া লইল। বিধুমুখী চলিয়া গেলেন। ফটিকও সেই পায়ে চুপি চুপি বাগানে ঢুকিয়া কালিন্দির শিংএর দড়ি খুলিয়া দিয়া আসিল।

৩

"মা, দাদা কিন্তু আবার লেপ মুড়ী দিলে।"

ফটিকের লেপ মুড়ী দেওয়া নূতন নয়। মাসের মধ্যে এক আধবার সে শয্যার আশ্রয় লয়। হরিমতীর ইহা সহিয়া গিয়াছিল। মায়ের প্রাণ—উৎকন্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আবার জ্বর এল? কাল রাত্তিরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সারারাত ছট্‌ফট্ করেছে। বাসন মেজে কবরেজ মশায়কে একবার ডেকে আন্‌বি, যা।"

মাতার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দুঃখিনী জননীর ঐ একটি মাত্র ছেলে। একটু উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলে অত্যাচার করিতেও ছাড়িবে না। গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন জ্বরটা কিছু বেশী হইয়াছে। মাতার শীতল হস্তের স্পর্শ পাইয়া সে বলিল, "পিলেটা বড় টাটাচ্ছে, মা।"

হরিমতী তাহার সমস্ত দেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

ফটিক এবার বেশ একটু ভোগাইল। জ্বরটা বাঁকিয়া তাহাকে অচৈতন্য করিয়া ফেলিল। বিকারের ঘোরে কখন সে বলে, "অমলি কালিন্দিকে ছেড়ে দে—বেঁধে রেখে আর কষ্ট দিস্‌নে। কখন বলে, একটুখানি কেরোসিন দাও মা। গরুটা যে মাছ্‌তে প'ড়ে মারা যায়!"

কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধে কোন ফল হইল না। হরিমতী শিওরে বসিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহার জীর্ণ বক্ষের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া বাহিরে আসিবার প্রয়াস পাইতেছিল। আশা নিরাশার এমনই একটা দ্বন্দ্বের দিনে গ্রামের নিম্নশ্রেণীর একটি লোক আসিয়া একটা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেল। হরিমতী কবিরাজী ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেন। নূতন ঔষধের ব্যবহারে এক সপ্তাহের মধ্যে রোগের অর্দ্ধেক কমিয়া গেল।

ফটিক দেখিল অমলা মেঝের উপর বসিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছে। সে কহিল, "কি বিট্‌কেল ঔষধ গেলাচ্ছিস্ রে! চনার গন্ধে যে বাঁচিনে?"

অমলা একটু হাসিয়া বলিল, "চনাইত।"

"চনা কেন? কে বলেছে খেতে? কবরেজ মশায়?"

"না, আর একজনে। এই খেয়েই ত পেটের পিলে অর্দ্ধেক কমে গেছে। বছর ধরে কবরেজী ঔষধ খেয়েছ কি ফল হয়েছে তাতে?"

ফটিক কেমন অসচ্ছন্দভরে কহিল, "চনাই ওষুধ হল রে?"

অমলা বলিল, "শুধু চনা কেন—আরও কি সমস্ত শিকড় বিকড় দিয়ে গেছে। তাও আবার বলে গেছে সুলক্ষণযুক্ত কাল গরুর চনা চাই।"

কাল গরুর নাম শুনিয়া ফটিক কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চনা কোথায় পাস্?"

"কনক দাদের বাড়ীতে—কালিন্দির।"

ফটিক আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ঔষধ প্রস্তুত হইলে অমলা তাহা লইয়া ফটিকের নিকটে আসিল। বলিল, "দাদা! ঘুমুলে নাকি?"

ফটিক চক্ষু মেলিয়া বলিল, "না—দে।"

অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যে মুখ শিকট বিকট করলে না ?"

"গন্ধটা কম লেগেছে।"

"তা অমন হয়। বন বাদাড়ে ছাই ভস্ম খেয়ে এলে দুধে চনাতে গন্ধ হয়। দুধে গন্ধ পাও ? দুধও যে খাচ্ছ তার।"

ফটিক চক্ষু বুজিয়া কহিল, "না।" একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের গরুতে দুধ হয় না ?"

"দুধ আর হয় কৈ ? তুমি অসুখে পড়ে রইলে। ভাল খাবার দাবার ত পাচ্ছে না একটা।"

সে ঔষধের সাজ সরঞ্জাম নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। ফটিক ডাকিয়া কহিল, "কালিন্দি বেশ সেরে উঠেছে ?"

"ওমা। কালিন্দির আবার কি হল ?"

"সেই যে—"

ফটিক চুপ করিয়া গেল। বলিল, "যা—যা, সুক্তটা আগের ভাগে বেঁধে দিতে বলিস্।"

ফটিক বালিসের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

৪

ফটিক সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর কাজ কর্ম্মও কিছু কিছু করিতে লাগিল। দেখিল কালিন্দি বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। পিঠের দাগগুলি মিলাইয়া গিয়াছে। কোন চিহ্নই আর নাই।

তাহার মুখে দারুণ অরুচি হইয়াছিল। মাতা যেখানে যে ভাল জিনিসটি পাইতেন ছেলেকে আনিয়া খাওয়াইতেন। কিন্তু মেয়েলোক হইয়া তাহার রুচিমত সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

সে দিন সকালে হাতে মুখে জল দিয়া ফটিক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল! অনেকটা পথ হাঁটিয়া সে বছির সেখের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বছির তখন ক্ষেতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ফটিককে দেখিয়া কহিল, "বড় বাবু যে ? দণ্ডবৎ হই। তা' এই পেরাতককালে ? দেহ যে শেষ করে ফেলেছাও।"

ফটিক বলিল, "হাঁ বছির! এবার মরে বেঁচে উঠেছি। মুখখানা এমন খারাপ হয়েছে—কিছুই খেতে ভাল লাগে না। শুন্‌লাম, তোমার ক্ষেতে নাকি পটল ধরেছে ?"

"ধর্‌তে কেবল সুরু করেছে।"

"ক্ষেতে হাত দাওনি ?"

বছির হাতের হুকাটায় দু'তিনবার টান দিয়া কহিল, "মিথ্যে বলে গো-জন্ম নেব কেনে ? একটা হাট করেছি। আষ্টগণ্ডা পয়সায় সের বিকিয়েছে। সকাল বেলাটায় যখন মুখ ফুটে বলে ফেলেছাও—একটু বস, আমি ক্ষেত হয়ে আসি।"

তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া বছির ক্ষেতে চলিয়া গেল। এবং কিছু পটল কাঁচা পেঁপে ও ডুমুরে ছোট একখানা চুপ্‌ড়ি ভর্ত্তি করিয়া আনিয়া দিল। ফটিক বলিল, "এ করেছ কি ? না—না, তুমি ছা-পোষা মানুষ; এত সব রেখে দাও।"

বছির হাসিয়া কহিল, "বড় বাবু তোমার হাতের দেব্য বারজনা খায়—মুই বুঝি আর কিছু জানে না। মাঝে অনেক দিন তরকারিপত্তর দিতে পারিনি, নিয়ে যাও।"

ফটিক তরকারির বোঝা লইয়া ঘামিতে ঘামিতে অনেকটা দূরে যখন মাঠের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল চারজন বাহকে যেন একটা মৃতদেহ বাঁশে ঝুলাইয়া লইয়া চলিয়া আসিতেছে। সে চলিতে চলিতে এক একবার নজর দিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাহকেরা নিকটে আসিলে সে তাহাদের চিনিতে পারিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের গরু ?"

"কনক বাবুদের।"

সে ভীত ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কালিন্দি ?"

"হাঁ বাবু।"

"কি হয়েছিল ?"

"বসন্ত।"

ফটিকের হাতের চিহ্নগুলি কালিন্দির দেহে মিলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান রোগের ক্ষতগুলি যেন তাহারই হাতের নিদর্শনরূপে সমস্ত দেহটার উপর জ্বলিতেছিল। এই মাঠে এইখানে দাঁড়াইয়াই সে তাহাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়াছিল। বাহকেরা যখন কালিন্দিকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, সে তখন হাতের ঝুড়িটার উপর সজোরে এক পদাঘাত করিয়া তরকারীগুলি রাস্তার উপর ছড়াইয়া দিয়া রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

জন্মান্তর

শ্রীমনোহর মৈত্র

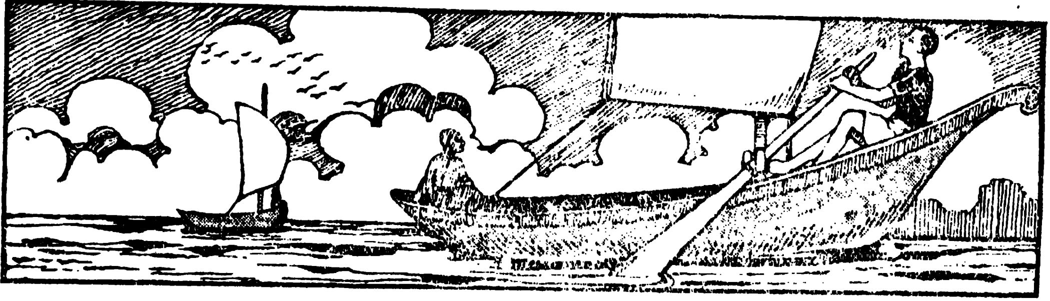
জন্মান্তর মানিনাকো আমি,
তবু যদি ফিরে আসি তব ধরণীতে
ভগবান, আর মোরে পাঠায়োনা এই মরা দেশে !

প্রকৃতির শ্যাম-শোভা, চাঁদ আর তারা,
আকাশ বাতাস ফুল, এই লয়ে রব চিরদিন !
মানুষেরে ভালবাসিবনা ?
চাহিবনা উদার সমাজ ?
নারী আর নরে কভু হবেনা মিলন ?
দেহের কামনা শুধু বড় হবে হায় !
হবেনা মনের পরিচয় ?

একে একে গেছে মোর তেইশ বছর,
এরি মাঝে বুড়া হ'য়ে গেছি,
দেহেতে লেগেছে ঘুণ, তা'রো আগে মন মরিয়াছে,
বুড়া দেহে বুড়া মন আর আমি পারি না বহিতে।

উদার জীবন আমি চাহি
অগাধ অবাধ ওই আকাশের মতো,
বিরাট উদার নীল বারিধির মতো,
মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মতো
নিশি-দিন যথা খুশী করি বিচরণ,—
এই শুধু কামনা আমার।

আবার আসিতে হয় যদি
ভগবান, আর মোরে আনিওনা এ পোড়া ভারতে।
চাহি আমি সেই দেশ খানি
যে দেশ হয়নি বন্দী দাসত্বের জালে,
যে দেশে মানুষগুলি আজো তাজা আছে—
নীতি ও শাস্ত্রের চাপে যায়নি শুকায়ে,
যে দেশে নারী ও নর হাতে হাত রেখে
একান্ত বন্ধুর মতো পাড়ি দেয় জীবনের বন্ধুর সরণি,
অনর্থক বৈরাগ্যের ক্লেশে
আপনারে করে না বঞ্চনা,
ক্ষণস্থায়ী জীবনেরে পূর্ণ করে যারা
প্রেম-প্রীতি-হাসি-গানে, নব নব মাধুর্য্যের রসে,
জন্ম লব তাহাদের মাঝে।



মনো-মর্ম্মর

শ্রীহিমাদ্রিনারায়ণ বসু

মানুষ জীবনে চায় শান্তি, কিন্তু সর্ব্বত্র না হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায় সে অশান্তি। নিগূঢ় তাহার কারণ জানিবার তাহার কোন বালাই নাই; সে জানে ব্যক্তিগত শান্তি সমাধান নিয়ন্ত্রণে তাহার আছে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অধিকার। অন্তরায় বিঘ্ন যাহা কিছু আছে তাহা ত্রিবিধাত্মক রহস্যের—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিধানই সে-সবের জন্মদাতা। মানুষের কল্যাণ-শক্তি সেখানে পঙ্গু, নির্ব্বোধ—"ভুজবল জ্ঞানবল বালকের বালুখেলা অনন্তের কালসিন্ধুনীরে।"

তাই বলিয়া সে-অশান্তিদানবের প্রতিকার প্রতিবিধান করিতে, নিষ্কৃতি অব্যাহতি পাইতে মানুষের চেষ্টা, সতর্কতার কি ত্রুটী আছে? তাহার জন্য মানুষ পাঁজিপুঁথি দেখিয়া পা ফেলিতেছে, সত্যনারায়ণ মনসা চণ্ডীর সিন্নি দিতেছে, রাজা পরীক্ষিতের মত আপদ-নির্ম্মুক্ত সৌধ-প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিতেছে, ভাইটামিন এ, বি, সি, ডি খাইয়া দেহের প্রতিরোধ বাড়াইতেছে; আবার রুদ্রদেবতার দ্বারে জোড়া ছাগ-বৎস মানৎ করিতেছে, শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা হইতেছে—সা মা শান্তিরেধি।

কিন্তু কি দুর্দ্দান্ত এই অশান্তি দানব!! তাহার চক্ষুলজ্জাটীও নাই। অতিকায় ঘটোৎকচেরই মত মানুষের জীবনের কুরুকুল জাঁতিয়া পড়িয়াই আছে!

মানুষ আপনাকে বহুরূপে দিয়া ও পাইয়া তৃপ্তিবোধ করিবার জন্য ঘর সংসার রচনা করিতেছে কিন্তু বিনিময় প্রতিদানের আসক্তি এবং বিচ্ছেদের সংঘাত আসিয়া তাহার সকল স্বপ্ন, সকল স্থৈর্য্য, সমতা, শান্তিই কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। নতুবা কালচক্রনেমির নির্ম্মম নিয়তির করাল আবর্ত্তন আসিয়া তাহার তাসের ঘরের স্বপ্নটুকুও লুটাইয়া দিয়া যাইতেছে।

নিছক আত্মসম্ভোগের পথ ছাড়িয়া মানুষ ধরিল পরার্থপরতা,—দ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা, স্বাধিকার প্রমত্ততা বর্জ্জন করিয়া গ্রহণ করিল উদারনীতির পরাকাষ্ঠা—সত্ত্বগুণের সকল প্রেরণাগুলিরই করিল সাধনা; তবুও হায়, সেখানেও রহিয়া গেল ঐদারিক অহমিকার উচ্চাঙ্গের স্বপ্ন-কামনা, সেখানে রহিয়া গেল ব্যক্তিগত রুচি, কল্পনা, সাধ, আকাঙ্ক্ষার একান্ত নির্ব্বন্ধতা, রহিয়া গেল অশেষের নিরুপশম পিপাসা, নিঃশেষেরও আশঙ্কা।

পারিবারিকতার, সঙ্কীর্ণ মানসিক ঘূর্ণী, ও সন্তাপকে ছাড়িয়া দিয়া মানুষ উঠিল নৈতিকতার চেতনায়; দশের ব্যথা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিল, দশের কর্ত্তব্যকে সে নিজেরই বলিয়া বরণ করিয়া লইল। পাইল যাহা তাহা শান্তি নয়, অশান্তিরই নামান্তর—তাহার কল্যাণ প্রেরণা আত্মসামর্থ্যের মানস-উপকূলে আছাড় খাইয়া কেবল হাহাকার, আর্ত্তনাদ, আস্ফালনই তুলিল—"যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়।"

মানুষের মধ্যে চলিয়াছে উদ্দেশ্য বিধেয়র একটা চিরন্তন প্রহেলিকা; তাহাদের গরমিল গোঁজামিল হইতেই মানুষের জীবনের আসিয়া পড়িয়াছে মানুষের স্বাতন্ত্র্যের দুঃখময় অধ্যায়টা; আসিয়াছে দুর্ভোগ, অস্বস্তি, বিদ্রোহ অথবা পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের শাশ্বত দ্বন্দ্ব—অসিয়া পড়িয়াছে দুর্নিবার অশান্তি। মানবপ্রকৃতির এই চিরন্তন অবস্থাটা আঁকিতে গিয়া বেদ বলিলেন 'দেবাসুর সংগ্রামের' কথা, জোরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্ম্মে (Zoroastrianism) তাহাই বর্ণিত হইল আহুরমজদা ও অহ্রিমানের সংগ্রামরূপে, আবার বৌদ্ধেরা বলিলেন 'মারের' আক্রমণ এবং কোরাণ বাইবেল বলিলেন ঈশ্বর ও সয়তান বা ইব্‌লিসের সংগ্রাম।

ইহার সমাধান বা নিবারণ যাহা হইল, তাহা হইতে সৃষ্টি হইল ভারতের বৈরাগ্য ধর্ম্মের মায়াবাদ; ভগবানের বাহ্যরূপ, প্রতিভাসিক উদ্দেশ্য সার্থকতাকে, জীবনজগতের অর্থ উপযুক্ততাকে অস্বীকার করিয়া, এড়াইয়া চলিয়া মুক্তির, শান্তির পথ নির্দ্ধারিত হইল—জীবনজগত থাকিল অসুরেরই অবাধ একাধিপত্যের জন্য। আবার মানুষের মন, প্রাণ, চিত্তের প্রত্যেক বৃত্তিটাই জীবনের সমতার পরিপন্থী জানিয়া গ্রীক্ ষ্টোয়িক (stoic) আদর্শ তাহাদের সর্ব্বথা নিগ্রহ বা উচ্ছেদ করার উপরই মানুষের শান্তির একমাত্র পন্থা নির্দ্দেশ করিল—মানুষ হইল দারুভূত মুরারী। পারস্যের ম্যানিকিয়ান তত্ত্ব (Manicheanism) মানুষের অকল্যাণ, ব্যর্থতার মূলে আবিষ্কার করিল 'শয়তান' নামে দ্বিতীয় একজন স্রষ্টা। ফলে মানুষের মনের উপর রহিয়া গেল শয়তানের ভগবত্তুল্য প্রভাব, সাধনার অনাবিল সার্থকতায় আসিয়া পড়িল একটা শঙ্কা, ত্রাস, নিরর্থকতার প্রপীড়ন।

জীবন ত সংগ্রামই বটে—সংগ্রামেরই আধার; কিন্তু মানুষ এই সংগ্রামকে পরিণত করিয়াছে শত্রুতারূপে—দ্বেষ, হিংসাকে করিয়াছে তাহার অস্ত্র, সহচর, পাথেয়। ব্যষ্টির স্বার্থের নীতিকে করিয়াছে মানুষ সংগ্রামের মানদণ্ড, তাহার চেতনাকে—চেতনার সামর্থ্য, পারগতা, দৃষ্টি, উপভোগকে করিয়াছে সংগ্রামের নিয়ামক, প্রবর্ত্তক। তাই আত্মার এই লাঞ্ছনার নামকরণ হইয়াছে 'শয়তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা', আর আত্মমোহের দুষ্কৃতি আখ্যা লইয়াছে "অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।" নিরহঙ্কার, নিষ্কামতার সে সিদ্ধবীর্য্য মানুষের কর্ম্মাধারে নামিয়া আসিয়া তাহাকে তাই দ্বন্দ্বের আবিলতা, দ্বন্দ্বের অশেষ সন্তাপ হইতে মুক্তি দেয় নাই।

জীবনের সংগ্রাম হয় যদি মহত্তর উদ্দেশ্যে এবং মানুষের সব-কিছু সার্থকতার মূলে থাকে যদি সেই বিধানের অব্যর্থ হস্ত—মানুষ যদি বিশ্বনিয়ন্তা কর্ত্তৃক সেই যুদ্ধ হইতে জয়ী হইয়া উঠিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, যেমন শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—Is it not so that in nature Pain is a possibility which has to be exhausted and man has been selected as the instrument to bring it into existence, in a limited space, for a limited time and, work it out of the cosmos—তাহা হইলে মানুষের কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্ম হইবে সেই বিরাট উদ্দেশ্যের আনুগত্য; তাহা হইলে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, দুর্ভোগ নির্য্যাতন, শোকদুঃখ, জরা মৃত্যুতে মানুষের থাকিবে না কোন ব্যক্তিগত বিক্ষোভ। সে সকলের মধ্যে মানুষ দেখিতে পাইবে বিপুলতর মঙ্গলের ইঙ্গিত। বিঘ্ন, অন্তরায়, প্রতিকূলতা তাহাকে নিরুদ্যম হীনবল না করিয়া, তাহাতে আনিয়া দিবে তাহাকে খাঁটী হইয়া উঠিবার অসামান্য ও অশ্রান্ত দক্ষতা। তখন যুদ্ধই যদি তাহাকে করিতে হয়, তাহা হইলে সে-যুদ্ধ সে করিবে সাংখ্যের পুরুষের নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার দ্বারা নহে—স্বকীয় স্বকীয় প্রয়োজনের দ্বারা সে-যুদ্ধকে সে আলিঙ্গন করিবে সকল কল্যাণতর সিদ্ধির জন্মদাতারূপে। তখন নিজের জীবনকে সে বিবেচনা করিবে দিব্যাভিব্যক্তির একান্ত সহায়ক, একমাত্র যন্ত্র—শুদ্ধতা, শক্তি, আলোক, প্রসারতা, শান্তি, আনন্দই তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য, তাহার জীবনের সকল ধৃতি, প্রগতির উৎস।........."For this step carries you back beyond border-line-from the life of stress and suffering in the ignorance into the truth of your spiritual being, into its deep peace and its intense Ananda."—Sri Aurobindo.

———

অপ্রত্যাশিত

শ্রীহাসিরাশি দেবী

রাতদিন হাসিই যেন ওর রোগ ;

বড়যা' নন্দিনী তাই রাজুর ওপোরে সময় সময় বড় রাগ করে, বলে—দাঁতে কুটো নিস্ ছোট বৌ, বিধবা মানুষের অত হাসি কি লা ? লোকেই বা হঠাৎ ব'লবে কি ? সবদিক দেখে শুনে চ'লতে হবে তো ?

ছোট বৌ রাজু তবু হাসে ; বড় যা'য়ের ছোট ছেলেটাকে কোলে টেনে নিয়ে উত্তর দেয়—

"তোমার যেমন কথা মেজ্‌দি, হাসি কি কখনও থামান' যায় ? লোকে বলুক, আর নাই বলুক, হাসি বাধা মানবে কেন ? ভাল জ্বালায় পড়েছি বাপু !"

রাগ হয়, দুঃখ হয় ; নন্দিনী তাই আর উত্তর দেয় না,—মুখ ভার করে নিজের মনে বলে

"মরগে যা, আমার তাতে কি !"

কিন্তু তবু মনটা কেমন করে ! আহা:—ওযে অনেকদিন আগে, তার সন্তান হবার আগেই স্নেহের ভাগ নিয়েছিল, ওযে সম্পর্কে ছোট বোনও হয় ।

নন্দিনী বলে

"আমার ও শাঁখের করাত হ'য়ে রইল, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে। রেহাই আর এ জীবনে পাব না।"

* * *

পাশের বাড়ীতে বিয়ের নিমন্ত্রণ ;

কাপড় জামা বার করবার জন্যে চাবীটা রাজুর হাতে দিয়ে নন্দিনী ছেলেকে দুধ খাওয়াতে ব'সলো ;—

"মাগোঃ মা, ছেলেটাও কি দুষ্টু, ছোট বৌয়ের কাছে ছাড়া কেন যে দুধ পর্য্যন্ত তার মায়ের কাছে খেতে চায়না কে জানে ?" ছোট বৌ কিন্তু এদিকে একবার তাকালেও না, চাবিটা নিয়ে সরাসর ওপোরে চ'লে গেল ।

নন্দিনীর বড় রাগ হ'লো, কিন্তু ওকে তো ডেকে আর ফেরানও যায়না, তাই ছেলের পিঠে গোটাকতক কিল-চড় বসিয়ে সে ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, শুনলে ছোট বৌ বাক্সের তালা খুলছে ।

নানা রং বেরংএর কাপড় জামা একপাশ ক'রে রাখতে রাখতে রাজুর হাতে একখানা ফটো ঠেকতেই সে তুলে নিলে, দেখলে সে একটি যুবকের প্রতিকৃতি। অনেকদিন আগে এই ফটোখানাই দেখিয়ে নন্দিনী বলেছিল,

"তোর সোয়ামী, প্রণাম কর্ ।"

সে আজ অনেকদিনের কথা, বিয়ের বছরেই। মনে পড়ে বিয়ের কয়েকদিন পরেই স্বামীর মৃত্যুর কথা। উঃ সেদিন চ'লে গেলেও মনের ওপোর থেকে তার পায়ের চিহ্ন মোছেনি ।

শিউরে উঠে, রাখতে গিয়েও সে ফটোখানকে রাখতে পারলে না, আড়ষ্টের মত চেয়ে রইল ।

কতক্ষণ এমনি ক'রে ছিল তার খেয়াল ছিলনা,—হঠাৎ নন্দিনীর ডাকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে নন্দিনীর মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে হ'য়ে উঠেছে ; রাজু একটু হাসতেই তাকে সরিয়ে দিয়ে নন্দিনী নিজেই কাপড়-জামা বেছে গুছাতে বসলো ।

রাজু একটা কথাও ব'ললে না, ফটোখানা নন্দিনীর পাশে রেখে, খোকাকে উঠিয়ে নিয়ে নির্ব্বাকে ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল ।

ছোট বড় এমনি আঘাত দিনের মধ্যে প্রায় পাঁচ ছয় বার রাজুকে অন্যমনা ক'রে ফেলতো। যাবার আর স্থান নেই,—সম্পর্কেও আর কেউ কোথাও নেই যার কাছে দুদিন অন্ততঃ গিয়েও জুড়ানো যায়। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ে, তবু মুখের ওপোরে হাসি ভেসে উঠে,—কেন কে জানে ! ওটা বুঝি বিধাতার দেওয়া অভিশাপ ।

সেদিন ওপোর থেকে নীচে নেমেই রাজু শুয়ে প'ড়েছিল,—মনে হ'চ্ছিল বুকের মধ্যে বুঝি এক সঙ্গে একশোটা ঢেঁকির পাড়' পড়ছে।

খোকা তার রুক্ষ চুলগুলোকে নিয়ে খেলা করছিল; এমন সময়ে দরজার কাছে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল

"রাজু—"

মুখ তুলে রাজু দেখলে তার ছোটবেলার সই—সরি। অতিকষ্টে "বোস্" বলেই হঠাৎ মাথাটাকে আবার নুইয়ে ফেললে।

সরি এসে ব'সলো, কিন্তু হঠাৎ কথা কইতে পারলে না, নির্ব্বাকে রাজুর যন্ত্রণাবিকৃত মুখখানার দিকে চেয়ে রইল।

সরি বুঝেছিল সবই,—কিন্তু না বোঝার ভাণ ক'রে শুধু বললে

"কি হ'য়েছে আমায় বলবি ভাই?"

রাজু একটু সামলে নিয়ে মুখ তুলে হাসলে—

আবার সেই হাসি!

বিরক্ত হয়ে সরি বলে উঠ্লো

"ওমুখে আর হাসি মানায় না সই, বরং কান্নাটাই দেখাবে ভালো।"

হাসিমুখে রাজু জবাব দিলে

"কিন্তু কাঁদতে যে ভুলে গেছি ভাই!"

দুজনেই নির্ব্বাকে ব'সে রইল; কেই বা কি ব'লবে? বলার মত কি কথাই বা আছে?

নির্ব্বাকে উঠে দাঁড়িয়ে, সরি হঠাৎ ব'লে উঠ্লো

"একটা কথা রাখবি ভাই?"

রাজু ব'ললে

"সাধ্য হ'লে রাখতে পারি, বল।"

"বিশেষ কিছু নয়, যখন এসব অসহ্য বোধ হবে তখন সরিকে ভুলিস্নে রাজু,—তার কাছে যাস। সুখ না হোক, প্রাণপাত ক'রেও সে তোকে একটু শান্তিতে রাখবার চেষ্টা ক'রবো।" সে চ'লে গেল,—রাজু উত্তর দিলেনা।

২

ছোট বৌ যে গৃহত্যাগ ক'রেছে এ কথাটা প্রথমে নন্দিনীই পাড়ায় প্রচার ক'রে কাঁদতে ব'সলো। কিন্তু সে কান্না বেশীক্ষণের নয়, শীঘ্রই থেমে গেল।

* * *

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই রাজু যখন এসে সরির দরজায় দাঁড়ালো তখন সরি ঘরের কাজকর্ম্ম সেরে ছেলেটাকে নিয়ে দরজার দিকেই আসছিল। রাজুকে দেখে প্রশ্ন করলে

"কার সঙ্গে এলে?—"

অভিভূতের মত রাজু উত্তর দিলে

"কার সঙ্গে আবার? একাই।—"

"একাই? এই দূরের পথে?"

সরি যেন চ'মকে উঠেই বিমর্ষ হ'য়ে পড়লো; তারপরে হাত ধ'রে বললে

"এস।"

আড়ষ্টের মত রাজু গিয়ে সরির কাছে রান্না ঘরে ব'সে প'ড়লো—জ্বলন্ত আঁচটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবলই মনে পড়তে লাগলো কেমন ক'রে সে এই জীবনে প্রথম পথে বার হ'য়েছে, কেমন ক'রে টিকিট কেটে ট্রেণে উঠেছে, আর কেমন ক'রেই বা এতদূরে হেঁটে এসে সরির বাড়ীতে উঠেছে!

সরি প্রশ্নের পরে নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, কিন্তু দুই একটার ছাড়া উত্তর পাচ্ছিল না। বিরক্ত হয়ে সে চুপ ক'রে গেল, রাজু চুপ করে উনুনের আঁচের দিকে চেয়ে ব'সে রইল। কাজের ছুতো ক'রে গিয়ে সরি তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা ক'রলো—

"ও পাগল হ'লো নাকি?"

স্বামী মুখভঙ্গী সহকারে উত্তর দিল—

"পাগল না আরও কিছু, বরং কত লোককে পাগল ক'রে দিতে পারে ও, দেখে নিও।"

সেদিন সরির ঘরের দিকে বড় গণ্ডগোল হচ্ছিল, রাজুর মনে হ'লো সেও একবার গিয়ে দেখে আসে ব্যাপারটা কি? কিন্তু যেতে গিয়ে তার পা উঠ্লো না, জানালা দিয়ে দেখলে সরির স্বামী টল্‌তে টল্‌তে সরির বালা দুগাছি খুলে

নিয়ে বার হ'য়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে এক মূহুর্ত্ত দেরী হ'লোনা। নিজের অজ্ঞাতেই সে উচ্চারণ করলে—

"ভগবান !—"

ভগবানের বদলে সরির ছেলেটা চীৎকার ক'রে শুধু কেঁদে উঠ্‌লো।

একঘুমের পরে যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে রাজু চ'মকে উঠ্‌লো;—মনে হ'লো সরি যেন কি ব'লতে এসেছিল, ফিরে গেল;—দ্রুতপদে ছাদের দিকে অগ্রসর হতেই পাশ থেকে হঠাৎ যে তার হাত চেপে ধ'রলে তাকে দেখেই রাজুর চমকে উঠ্‌লো—সে সরি নয়, তার স্বামী।—

রাজু হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রলে—

"শীগ্‌গির ছাড়ো ব'লছি—"

"—না ছাড়লেই বা কি করতে পারো তুমি ?"

সে হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজুর ধাক্কা লেগে ছিট্‌কে প'ড়ে চীৎকার উঠ্‌লো—

"খুন ক'রলে রে,—বাবারে !"

নিজের ঘর থেকে সরি বার হ'য়ে এলো,—রাজু সেখানে আড়ষ্টের মত দাঁড়িয়েছিল সেদিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্বামীর কাছে ছুটে গেল, বেদনারুদ্ধ স্বরে সেও চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—

"আমার একি হ'লো গো······

আবার পথ······

রাজু চলেছে, কোথায় যাবে ঠিক নাই, হাতে পয়সাও নাই। পথ ডাকছে,—তাকে যেতেই হবে যে,—নাই বা জানলো পথের শেষ কোথায় !

চোখের সামনে অগণিত মনুষ্যস্রোত, ট্রাম, বাস, মোটর, বাইক কত কি চ'লেছে,—সেও চ'লেছে—। একবার যেন কাণে এলো নন্দিনীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সরি ডাকছে—

"ওরে ঘরে আয়,—ফিরে আয়।"

কিন্তু যাবার পথ যে সে ভুলে গেছে—তাই আর সেখানে ফিরবে না,—ফিরতে ইচ্ছে হ'লও না। সে চ'লছিল······পথ······পথ······কেবল পথ······দেড় দিনের উপবাসক্লিষ্ট দেহ আর চ'লতে পারছিল না, ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এসেছে তাও সে জানতো না. হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠতেই সে সেইখানে ব'সে পড়লো;—একবার সামনের জনসঙ্ঘের দিকে তাকাবার চেষ্টা ক'রলে তাও পারলেনা। জ্ঞানহীন দেহখানা পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়লো।

দিন তিনেক পরে যেদিন সরির চিঠি রাজুর মৃত্যু-খবর বহন করে তার ভাসুরের বাড়ী পৌছাল সেদিন আকাশে ঘনঘটা দেখে নন্দিনী তার দুষ্ট ছেলেমেয়েকে ভয় দেখাচ্ছিল—

বাইরে বেরিওনা, এক্ষুণি ছোটমা এসে মারবে।

চিঠিখানা পড়েই নন্দিনী যেন পাথর হ'য়ে গেল, একফোঁটা চোখের জল তো দূরের কথা, একটা দীর্ঘশ্বাসও তার বুক কাঁপিয়ে বার হ'য়ে এলোনা। নির্ব্বাকে, নিঃশব্দে শুধু চোখ মেলে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। যেন বলার ভাষা আজ তার ফুরিয়ে গেছে।

বৈকালী ভোগ

শ্রীকালিদাস রায়

মম নিকুঞ্জের পুষ্পে পূজিয়াছি তোমায় বার বার,
ফল শস্যে রচিয়াছি তোমা লাগি ভোগ আয়োজন,
তারাই পেয়েছে তোমা হইয়াছে প্রসাদী তোমার।
আমি দূরে থেকে গেছি কলুষিত ছিলাম কেমন।
পূজারী প্রসাদ পায় দেবতায় নিজে নাহি লভে।
জীবনেরে অর্ঘ্য যদি করিতাম পাইতাম তবে।

একথা ভাবিনি যবে ফুলসাজি ছিল এ জীবন।
ভাবিনি যবে তা ছিল সোপচার নৈবেদ্যের মত।
তোমার প্রসাদী হতে আজি প্রভু করি নিবেদন।
দাহতপ্ত এজীবন চঞ্চুক্ষত ধূলি ঝঞ্চাহত।
যৌবন বসন্ত অন্তে বৈশাখের বিকাল বেলায়।
হউক বৈকালী ভোগ এ জীবন তব বেদিকায়।

তাঁতিরাম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীআশালতা দেবী

নিরুদ্দিষ্ট রমেনের প্রতীক্ষায় বিধবা অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, দরিদ্রের দারিদ্র্যের অপরাধ যদি বা সহ্য হয়, তার তেজস্বিতার অপরাধ কখনও মার্জ্জনা পায় না, ধনী জ্ঞাতি গোত্রের সূক্ষ্ম নিক্তির পাল্লায় নিরুর মার তেজ নাকি তাঁর দৈন্যের অনুপাতে অনেক বেশী ছিল। শ্বশুরের ভিটায় অতি অনুরাগের অখ্যাতিও তাঁর কম ছিল না। তাই জীবনে যাদের ছায়া তাঁর ত্রিসীমানায় পড়েনি, জীবনান্তেও তারা সযত্নে তাঁর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিল; তার উপর সেরা অপরাধ নিরুর মা ঘরে মরিয়াছিলেন। এরূপ অশাস্ত্রীয় মৃত্যু প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষা রাখে, কাজেই জ্ঞাতিত্ব ও রক্তের দোহাইকে ছাপাইয়া উঠিল শাস্ত্রের দোহাই। গাঁয়ের একটি কোণে অতি সঙ্কোচে বাস করিত ঘর কয়েক ভাঁড়ারী কায়েত। তাঁতিরামের তদ্বিরে তাহারাই আসিয়া বিধবার সৎকারের ব্যবস্থা করিল, সেই দিন থেকে বালিকা নিরু শিশুভাই দুইটির হাত ধরিয়া তাঁতিরামের শুচিশুভ্র কুটিরে যাইয়া গৃহস্থালী পাতিয়া বসিল। এতক্ষণে বাসুকির মাথা নড়িল। পাশের বাড়ীর জ্যেঠামশাই এর আভিজাত্য এ কদাচারের প্রশ্রয় দিতে নারাজ, পাড়ার মোড়লদের ডাকিয়া বৈঠক বসিল, তাঁতিরামের উদ্দেশে অনেক কটু কাটব্যও বর্ষিত হইল, কিন্তু শ্রাদ্ধ বেশী দূর গড়াইবার পূর্ব্বে রমেন আসিয়া সকল গোলযোগের অবসান করিয়া দিল।

নিধিরামের জিম্মায় তাঁতিরাম যে পত্রখানি রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারই সূত্র ধরিয়া রমেন অবশেষে সত্যই একদিন ফিরিল। নিজের অপরাধের ভারে তার মন প্রাণ এত পীড়িত ছিল যে পাড়া পড়শীর অপরাধ বিচার করিবার ইচ্ছাও তাহার হইল না, কেবল তাঁতিরামের প্রতি একটা মুগ্ধ কৃতজ্ঞতায় সে অভিভূত হইয়া রহিল।

গ্রামের পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে জ্যেঠামশাইএর চণ্ডীমণ্ডপে, ছোট বড় অনেক মুরুব্বি আসিয়া আসর জমকাইয়াছেন। রমেন ও তাঁতিরামের তলব হইয়াছে। আসরের এককোণে গরুড় পক্ষীর ভঙ্গীতে হাত দুটি জোড় করিয়া বসিয়া আছে তাঁতিরাম, কিন্তু রমেনের সাক্ষাৎ নাই। যমের তলবের দিনে যারা তার মুমূর্ষু শাশুড়ীর মুখে এক ফোটা জল আগাইয়া দেয় নাই, তাহাদের তলবকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না, কিন্তু তাঁতিরাম রেহাই পাইবে কিসে? সাতপুরুষ ধরিয়া বাবুদের হুকুম তামিল করিয়া করিয়া কাওরা পাড়ার স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলিয়া কিছু ছিল কিনা সন্দেহ। সেই পাড়ার লোক হইয়া তাঁতিরাম না আসিয়া পারিল না।

"না হয় মড়া দু'দিন বাসিই হ'ত, তুই ব্যাটা কাওরা কোন সাহসে এসে চৌধুরী গুষ্টির হওয়া মড়ার সাথী হ'তে চাস? বুকের পাটা—"

জ্যেঠামশাই এর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অতি বিনীত কণ্ঠে তাঁতিরাম ত্রস্ত ব্যস্তে বলিয়া উঠিল "আজ্ঞে সে কি কথা কর্ত্তা, গরীবকে অপরাধী কর্বেন না, আমরা চিরটাকাল আপনাদের শ্মশানের কাঠ জুগিয়ে আস্‌ছি, হুকুম পাবার আগেই যে কাজ এতদিন ক'রে এসেছি, তার বেশী ত কিছু করিনি, দেবতা। পাড়ার লোকে যখন মা ঠাকরুণকে—।"

"রাখ তোর মা ঠাক্‌রুণ" বলিয়া মিত্তির মশাই ফোঁস করিয়া ফণা তুলিলেন। "ব্যাটার কথা শুন্‌লে পিত্তি জলে ওঠে, এদিকে বেশ মিষ্টি মিষ্টি আজ্ঞে, মশাই করা আছে দেখি, পেটে পেটেই যত বজ্জাতি! যখনি দেখি সারা গায়ে পোষ্টাফিসের সিল মেরে পাড়া কুড়ুতে চলেছে, ভাবি কাওরাটার আস্পর্দ্ধার কথা!"

তাঁতিরামের বেদনা-বিবর্ণ মুখে কি একটা কথা উচ্চারণ হইয়াও হইতেছিল না এমন সময়ে ঝড়ের বেগে রমেন আসিয়া ঘটনার স্রোত একেবারে ফিরাইয়া দিল। রাগে সে ফুলিয়া আট্‌টা হইয়াছিল। আজ আর তাহাকে দেখিয়া সেই উচ্ছৃঙ্খল উৎপীড়িত যাত্রার আসামী বলিয়া চেনা যায় না।

তাঁতিরামের হাত ধরিয়া রূঢ়ভাবে একটা ঝাঁকানি দিয়া সে ক্রোধ ও অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলিল "রামদা তোমায় আমি অত করে বল্লুম এসোনা এখানে, শুনলে কি আমার কথা? কায়েতের মড়া বাসি হোক, পচুক, তাতে কিছু যেয়ে আস্‌বে না, সংস্কৃত পুঁথিতে তার ভাষ আছে, কিন্তু তার ত্রিসীমানায় মাড়াবার অধিকার কোনো কেতাবই তোমায় দেবে না, দ্যায়নি।" জ্যেঠামশাই এর—দিকে ফিরিয়া রমেন উগ্রকণ্ঠে বলিয়া চলিল "আপনি যা চেয়েছিলেন, তাইত হ'লো জ্যেঠামশাই, তবে আর কেন আমাদের কাওরা-সংসর্গ থেকে উদ্ধার করার ভাণ কর্চ্ছেন! আমরা যদি ফিরে এসে ঐ ভিটেয় জুড়ে বসি, তা' হ'লে টেনিসকোর্ট অসম্পূর্ণই থেকে যাবে যে—"

তাঁতিরাম এতক্ষণ বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের মত বিবর্ণমুখে একবার বাবুদের আর একবার রমেনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতেছিল। সর্ব্বনাশ কোথায় গড়াইতেছে অনুমান করিয়াই যেন হঠাৎ সম্বিৎ পাইল। মুখর রমেনকে ব্রস্ত করিবার বৃথা চেষ্টায় সে তার গায় হাত বুলাইয়া কি বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু রমেনের কণ্ঠে আজ দুষ্ট সরস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁতিরামকে মৃদুভাবে সরাইয়া দিয়া সে উত্তেজিত স্বরে বলিল "না দাদা আজ আমায় সবটা বলে যেতে দাও। হ্যাঁ, আমি কাওরাকেই বেছে নিলুম জ্যেঠামশাই। পর্ব্বতের আড়ালে থাকবার একটা বড় বিপদ আছে, সেটা হচ্ছে পর্ব্বতের গ্রাস। যে আওতায় থেকে মার গতি হ'ল কাওরার হাতে সে আওতা আর নয়! ভিটে কিন্তু আমি অবেদ মিঞার কাছে না বিকুই ত কি বলেছি! রামদা আজ থেকে আমি কাওরা পাড়ারই একজন হলুম, তোমাদের আশ্রয়েই আমার সব চেয়ে নিরাপদ আওতা! এই বলিয়া ভীত বিস্মিত তাঁতিরামের হাত ধরিয়া রমেন প্রস্থান করিল।"

শেষ

'আমির' ঋগ্বাণী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

নই আমি ক্ষুদ্রত্বের বন্ধন কারণ।
বাধা, ভয় ক্লেশ হয় মায়ায় বিকাশ লয়—
বুদ্বুদ নাইকো যেথা নাই আলোড়ন
সম্পূর্ণ প্রশান্তিরূপে আমি নারায়ণ॥
প্রপঞ্চ-অতীত জ্ঞানে আমার আসন।
রোগ শোক, দৈন্যভরা অহমের ব্যথা-কারা
ভাঙ্গে গড়ে আমারই সে ভেদমূঢ় মন—
আমি নই, সে আমাতে* তাইত এমন!!

আমি অজ, আমি নিত্য ব্যক্ত সনাতন।
'বহুস্যামি'-ভাব ধ'রে কামনা পৃথক করে—
বদ্ধ হয় নামরূপে জীব সে অধম
এতই ভীষণ তার বুদ্ধির বিভ্রম॥
লীলারূপে আমি তার নর্ম্ম সহচর।
কোথায় আমার ঘর—কেবা সে আপন পর?
বিশ্বযাগে আমি তাঁর ঋত্বিক পূজার
তাঁরি দেওয়া অধিকারে মোর অধিকার॥



---

* ন চাহং তেষ্বর্বস্থিতঃ।



খোলো দ্বার!—যুগের পর যুগ হিন্দু-মন্দিরের পাষাণ প্রাচীরে ধ্বনিত হইতেছিল অন্ত্যজের করাঘাত। আজ সেই করাঘাত অন্তরের মন্দিরে গিয়া পৌঁছিয়াছে শুধু মহাত্মারই প্রেমের গুণে। তাই বহুদিনের রুদ্ধ দরজা আজ সহসা উন্মুক্ত! জাতির ভাগ্যবিধাতা করুন সে দ্বার যেন মুক্তই থাকিয়া যায় শাশ্বত কালের জন্য! ভাবালু বলিয়া প্রাচ্যের অপবাদের অন্ত নাই। কিন্তু জীবনে যে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, ভাবরাজ্যেই হয় তার অধিবাস বা উদ্বোধন!

প্রেমা!—সাতটি দিনে বিশ্বের চিত্তলোকে যে ঢেউ উঠিয়াছে তাহার দোলা সাত শতাব্দীতে থামিবে কিনা কে জানে! এমনি ঢেউ একদিন উঠিয়াছিল মগধে, জেরুসালেমে, নদীয়ায়। ছবিঘর রংমহলের দরজায় ভিড় সমান চলিয়াছে, পূজার বাজারের বিকিকিনিতে মন্দা পড়ে নাই—তবু অস্বীকার করিবার যো নাই যে দেশের আপামর সাধারণের অসাড় মনে একটা গভীর সাড়া জাগিয়াছে। আজ মহাত্মাজীর উপবাস ব্রতের উদ্‌যাপন হইল, আমাদের জীবনস্রোত কাল হইতে আবার তেমনি পঙ্কিল আবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে থাকিবে, খাইয়া পরিয়া বঞ্চিত হইয়া ও বঞ্চিত করিয়া আবার আমাদের দিন কাটিতে থাকিবে! তবু ভবিষ্যবংশের কাছে আমাদের গর্ব্ব করিয়া বলিবার অধিকার থাকিবে "আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছি সে দিব্য দৃশ্য!" ডাক্তার আম্বেদকরের জিদের আশঙ্কায় আমরা কণ্টকিত হইয়াছিলাম, মহাত্মার যাদু-মন্ত্রের কাছে তাঁহাকেও নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত ফণা সংবরণ করিতে হইয়াছে, ধরা দিতে হইয়াছে—প্রেমে এমনই হয়!

সুভাষচন্দ্র।—সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসকগণ সুভাষচন্দ্রের রোগ নির্ণয়ে একই রায় দিয়াছেন। তিনি তিলে তিলে ক্ষয়রোগে ক্ষয় পাইতেছেন। কিন্তু শুধু রোগ-নির্ণয়েই কি সরকারের সব দায়ীত্বের সমাপ্তি হইল! আজ কতদিন হইয়া গেল, কিন্তু সুভাষ-চন্দ্রের সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা হইল না! যে বিষম রোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছেন, আলো বাতাস সূর্য্যোত্তাপই তার একমাত্র ঔষধ! সুভাষচন্দ্র ধনীর দুলাল, আশৈশব আরাম বিরামে অভ্যস্ত, কয়েক বৎসর যাবৎ দীর্ঘ কারাবাসে যে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? স্বেচ্ছায় সুখ সৌভাগ্য উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল মাত্র একটা উচ্চভাব বা আদর্শের প্রেরণায় শতেক দুঃখকে বরণ করেন তাঁহারা জগদ্বরেণ্য। কিন্তু ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা যে, যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁহাদেরই জীবন লইয়া যত নিষ্ঠুর খেলা চলিয়া আসিতেছে! আমরা আশা করি সরকার এখনও এ বিষয়ে ঔদাসীন্য ত্যাগ করিবেন; বাংলার নয়নের মণি সুভাষচন্দ্র—তাঁরই মহার্ঘ্য জীবন আজ সরকারের নিকট গচ্ছিত এই কথাটি যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন!





২য় বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৩৯ | ৭ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ—“নিরুদ্দেশ যাত্রায়”

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকের ইন্দ্রানী নিয়ন্ত্রী যিনি, তাঁহার স্বপ্নাভিসারের শ্রেয়সী প্রেয়সী যিনি তিনি শুধু নীরস গতিময়ী, কেবল চলশালিনী নহেন। তাঁহার চলন-বলনে আছে অপরূপ সুষমা—তাঁহার আকার ইঙ্গিতে হাস্যে-লাস্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে খুলিয়া ধরিয়াছে এক গন্ধর্ব্ব-জগতের কী একটা, ইন্দ্রজাল! কী এক স্বপ্ন-পীড়িত দিব্য-আবেশে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়তন্ত্রী উন্মুখ, সমঝঙ্কৃত—তাহার লীলায়িত মূর্চ্ছনায় তাঁহার সমস্ত সত্তা স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মানসীকে সম্বোধন করিলেন “সুন্দরী”—“আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি।”

কিন্তু এ সৌন্দর্য্য ইহের অনুভব্য-বস্তু নয়—এ-“সুন্দরী”ও স্থূল রক্ত-মাংসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌরিণী শরীরিণীও নয়। সাধারণ মানুষ সৌন্দর্য্যকে যে চোখে, যে অর্থে দেখে, যে সার্থকতায় ফলাইয়া তুলে ইনি সৌন্দর্য্যের সে সহজলভ্য সহজসিদ্ধ পাত্রী বা আধেয়া নহেন ; ইঁহার সৌন্দর্য্য তুরীয়ের, ইন্দ্রিয়াতীত অস্পৃত্রের রহস্য লাঞ্ছনায়। ইহার উদ্দেশ্য অর্থের অপরূপ অভিব্যঞ্জনায় ধরণধারণের অপূর্ব্ব সৌকুমার্য্যে, গতি-প্রকৃতির বিপুল গাম্ভীর্য্যে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধানত। রবীন্দ্রনাথ সন্তানসুলভ ভাব-বৈদগ্ধ্যে, বালকের কৌতূহলীতে প্রশ্ন করিতেছেন—

হোথায় কি আছে আলয় তোমার
উর্ম্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণ তলে?

কি অপরূপ দিব্য অভিযানের কম-চিত্র রবীন্দ্রনাথের মানস পটেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে!

তবে এখানে একটা কথা উঠে। নিরুদ্দেশ পথযাত্রীর অজানিতের গানে, সুরে, টানে, মদির রবীন্দ্রনাথের, সুন্দরের হাতের রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবন-পরিণাম সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এত সংশয়, শঙ্কা, এত নিরাশ কাতরতা, এত জড়িমা অস্বচ্ছতা কেন? তাঁহার—

"সংশয়ময় ঘননীল নীর
কোনদিকে চেয়ে নাহি হেরি
তীর" প্রভৃতিতে—

যেন একটা অপূর্ণতার, একটা ব্যর্থতার, আঁধার কুহেলিকার, একটা করুণ রসই ফুটিয়া উঠিতেছে; যেন বিশ্বের প্রাণের স্পন্দন, একটা "অসীম রোদন" ঘন নিবিড় হইয়া রবীন্দ্রনাথের হৃদয় তন্ত্রীকে তীক্ষ্ণ, বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে।

একথা, এভাব, এ অবস্থায় প্রত্যেক ভাববাদী সুন্দর কামীই ন্যূনাধিক ওতপ্রোত! জীবনের রৌদ্রদগ্ধ আঘাত-ক্লিষ্ট বেলাভূমির ছন্দহীন বিক্ষুব্ধতাকে আপনার না করিয়া, সহজ স্বচ্ছন্দ না করিয়া যাঁহারা তাহা এড়াইয়া চলিয়াছেন, উধাও হইয়া চলিয়াছেন শুধু সুদূরের, গভীরের ঐ অতলস্পর্শী হিল্লোল প্রবাহে, গুঞ্জনকলকাতে আপনাদের ভরাইয়া রাখিতে —ইহের দুর্ভোগ নগ্নতা, চলন-বলন, প্রশ্ন-আকাঙ্ক্ষাকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন অমূর্ত্তের প্রহেলিকায় অবগুণ্ঠনে, জিজ্ঞাসু-মনের বোঝাপড়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যকে ইতি দিয়া, অস্পষ্ট উদাসীন, কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন অবাঙ্‌মনসো-গোচরের প্রহেলিকায়—তাঁহাদের প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর এই দশাপন্ন; প্রত্যেকেরই এই কথা—এই সমস্যা।

সুন্দরের এইরূপ রহস্যলাঞ্ছনায়, সেথানকার আলেয়ার সম্মোহনে রবীন্দ্রনাথও যে কিছু-না-কিছু বিব্রত হন নাই, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ "নিরুদ্দেশ যাত্রায়" তাঁহাকে দেখিলে সেই ধারণাটীতে আর সন্দেহের স্থান থাকে না। তবে হয়ত বা তাঁহার রূপদেব অন্তর-পুরুষের অপূর্ব্ব স্পর্শানু-কূল্যে সে-ভাবটী ভাষা-সুরের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলে নাই সাধারণ সৌন্দর্য্য পিপাসুর মত সন্দেহ অবিশ্বাস, নৈরাশ্য নিরুত্তমতার একটা অজ্ঞাতঙ্কের ছায়াচিত্র; তাহাতে কাতরতা, কুহেলিকা, নিরাশ্বাস হয়ত মিলিবে, তবুও তাহাতে আছে চন্দনের ন্যায় শীতল, সুস্নিগ্ধ, বিগলিত প্রলেপ, যাহাতে আনিয়া দেয় দেবলোকেরই ঘ্রাণ উদাস উন্মনা।

তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ
তারি পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি…

সেইজন্য আবার এখানে দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ফলিয়া উঠিয়াছে দুই পুরুষের দুইটী তত্ত্বের, দুইটী ভাবের অঙ্গাঙ্গী সমাবেশ; একটী 'নেতির'—অন্যটী 'ইতির'; একটীতে তিনি গন্ধর্ব্বরূপে, অপরটীতে মানুষরূপে; এই দুই লোকের, দুটী পুরুষের, দুটী ভাবের আলো আঁধার পড়িয়া মাঝখানে যে ঝিলিমিলির সৃষ্টি হইয়াছে, যে বাঙ্‌ময় পুরুষ আত্মবিকাশ করিয়াছেন, তাহাই হইতেছে কবি রবীন্দ্রনাথের "নিরুদ্দেশ যাত্রায়" আত্মস্বরূপ।

কবি রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চিত্তপুরুষ রহস্যবাদী (mystic)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে স্বতন্ত্র একটা সত্ত্বা আছে, যেটীকে আমরা মানুষ রবীন্দ্রনাথই বলিব, অর্থাৎ যেটী মানবীয় অপূর্ণতা, হিসাব নিকাশের অধীন—সেটী অনেকাংশে অজ্ঞতাবাদী (Agnostic)। কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অনুভূতি সজাগ তীব্র হইয়াছে, ছুটিয়া চলিয়াছে সৌন্দর্য্যের রহস্যাগার মন্থন লুণ্ঠন করিতে—তুরীয়ের, অবাঙ্‌মনসো-গোচরের কিন্নির কিন্নির স্পর্শে মুগ্ধ থাকিতে; তাঁহার ভাষাতেই বলি:—

আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
শান্ত মনের শুদ্ধগহনে ধ্যানের বীণার সুরে।

কিন্তু যেখানেই সৌন্দর্য্যের শিল্পরাণী সে দৃশ্য ঢাকা দিয়া অজ্ঞাত দৃশ্যান্তরে প্রবেশ করিতেছেন—সেই নয়নাভিরাম পরিচিত সুষমাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সূক্ষ্মতর সুন্দরতর বস্তুর সৃষ্টি করিতেছেন, তাহার অঙ্গে অঙ্গে লীলায় প্রক্রিয়ায়, গতি প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠিতেছে যেন একটা অসুন্দরেরই কুসীম-করাল কালিমামণ্ডিত রুদ্রশ্রী, অথবা তাহাতে বিরাজ করিতেছে শুধু নীরব গম্ভীর নিস্তব্ধতা—তখনই মানুষ রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতে চোক কান ফিরাইয়াছেন। সে

রহস্য তত্ত্বের যবনিকা ভেদ করিতে, তাহাকে বুদ্ধিগম্য প্রোজ্জ্বল করিতে কবি গররাজী হইয়া পড়িয়াছেন। সে রহস্য-তত্ত্বকে রহস্যের দ্বারাই রহস্যময় করিয়া রাখিতে তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন। সেখানে যেন মানুষ রবীন্দ্রনাথের পশ্চাত্তাক্ত অনড় নির্ব্বিঘ্ন জীবনভূমির সহজ নিশ্চিন্ততার ভিত্তি হাতছানি দিয়া তাঁহার কবিপ্রাণে শঙ্কা-কুলতার স্পন্দনই জাগাইয়া তুলিতেছে। তাঁহার সুন্দরতমের পরিপ্রেক্ষিতে (Perspective) জীবনের আলেখ্য, জীবনের সঙ্গতি (compatibility) যেন আরও বিসদৃশ অনুপযোগিতার দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। তাই অভিমান অনুযোগের সুরেই বলিয়াছেন—আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা।

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নিকট আখ্যা পাইয়াছে—The mystic orient ; সেই mysticism এর কবিত্ব ভাবুকতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লাভ করিয়াছে বোধহয় পরাকাষ্ঠা। আবার কবিত্বের যে ত্রিবিধ ধারায় ইউরোপের, ইউরোপ নয়, সমগ্র জগতের কবি প্রতিভা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে কেল্‌টিকের (celtic) সেই অনন্তের দ্যোতনা, সেই অশরীরিণীর মোহন মূর্চ্ছনা, সেই অনির্ব্বচনীয় ইন্দ্রজাল, সেই অচিন্ত্য অপ্রকাশ দিব্য-চেতনা যেন তাহাদের তর্‌তরে ঝর্‌ঝরে ভঙ্গিমা লইয়া কবি সম্রাটের অন্তর-লোকে সুপ্রকটিত হইয়াছে সেখানে আছে গ্রীক্‌দক্ষতার স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা ত বটেই, অধিকন্তু বস্তুর ভাবের উপলব্ধিতে ততোধিক নির্ম্মলতা, তদপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধতা,—অনাবিলতা। তাঁহার অসীমের অভিব্যঞ্জনাকে ঠিক যেন একখানি স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে সুচারুঠামে প্রতিবিম্বিত করিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের "নিরুদ্দেশ যাত্রায়" এর কয়েক পংক্তিতে কবিত্বে গ্রীক্ প্রতিভার সেই দক্ষতা যেন আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। যথা :—

ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা
ঝলিতেছে জল তরল অনল
গড়িয়া পড়িছে অম্বর তল
দিগ্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে॥

অবশ্য কাব্যে গ্রীক্ প্রতিভা যে আদর্শ দিয়াছে তাহা খুব সমুন্নত নয়—তাহা দৈন্য সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ। বস্তুকে ভাবকে সে করিয়াছে খুবই স্বচ্ছ স্পষ্ট, ধারণা কল্পনাকেও সে ছাটিয়া কাটিয়া স্থূলবুদ্ধির উপযোগী ও এত মর্ত্ত্যভাবগম্য করিয়াছে যে, সাধারণ তরুণ-ভাবপ্রবণ চিত্ত তাহাতে হারাইয়া ফেলে তাহাদের সমস্ত ঊর্দ্ধমুখীন্ প্রেরণা কল্পনা। যেমন ম্যাথু আর্ণল্ডে :—

The day in his hotness
The strife with the Palm
The night in her Silence
The stars in thier Calm.

এখানে তাহারা পায় না সে অনির্ব্বচনীয়তার প্রহেলিকা, ভাবের আভা, কল্পনা উপলব্ধির ঔদার্য্য—একটা ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্নছায়া, কল্পনার একটা ইন্দ্রজাল একটা গগনবিসারী ইন্দ্রধনু। কবিত্বের সহজবোধ্য ভাবটীকে সম্মুখে পাইয়া সমুচ্চের সম্ভবনাকে তাহারা অনেক সময় উপেক্ষা করে।

গ্রীক্ প্রতিভার এই অসম্পূর্ণতা, এই দৈন্য অভাব ক্রটীটুকু-রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যে পাইয়াছে, বিকাশ করিয়াছে শুদ্ধতর, পূর্ণতর সমৃদ্ধতর রূপ। বস্তুকে, ভাব উপলব্ধিকে সুবোধ্য পরিচ্ছন্ন করিবার যে গ্রীক্ প্রেরণা, দক্ষতা তাহার সহিত আসিয়া মিলিয়াছে রবীন্দ্রনাথে কেল্‌টিকের সেই বিপুলের স্বপ্ন, ভূমার সেই আবছা হাতছানি—"চঞ্চল আলো আশার মত কাঁপিছে জলে।" অথবা—"আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোণার ফলে ?" এই দুই প্রতিভার দুটী প্রেরণা দুটী উপযুক্ততা মিলিয়া মিশিয়া রবীন্দ্রনাথের আরও সুন্দরতর, আরও মহনীয় শুদ্ধতর সার্থকতর হইয়াছে ; এবং সেটী আরও রহস্যময় আরও কৌতুহলোদ্দীপক—বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিবার ঔৎসুক্যে নিবিড় উদগ্রীব স্ফুটতর মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সুন্দরীর নীরব ইঙ্গিতে—

"যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস শুধু মধুর হাসিনী
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
তোমার মনে ?"

আবার কেবল সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, কবি

শিবসুন্দরের শুভ্র বিগলিত ঝর্ণায় ভাসিতেই চাহিয়াছেন। তাহাতে যুক্ত হইতে চাহিয়াছেন, সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চলিয়াছেন আপন চিত্তলোকের মৃদুল হিল্লোলের, আবেশের, ভাবমাদকতার মধ্য দিয়া। জানিবার, বুঝিবার, ধরিবার তেমন চেষ্টা করেন নাই। তাহার অর্থকে, অবয়বকে তেমন দ্যুতিময় সজীব প্রাণবন্ত করিয়া তুলেন নাই—যতখানি করিয়াছেন ছায়াময়, স্বপ্নময়, ভাবময়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রপ্রভাব বস্তুতে রোমক প্রতিভার মত দেয় নাই দৃষ্টি কল্পনার, ভাব উপলব্ধির সে জলন্ত বজ্রসার স্থৈর্য্য,—মন্ত্রের, প্রাণশক্তির সে বিদ্যুন্ময়ী উদ্দীপনা। সেটি দিয়াছে কাব্যে রোমক প্রতিভা।* রোমক প্রতিভা শুধু ভাব আবেগের যাদু দেয় নাই, দিয়াছে ভাবসিদ্ধতন্ত্র, দিয়াছে তপঃশক্তির তীব্রলেখা, দিয়াছে প্রাণের স্পর্শ, ওজস্, বীর্য্য—দিয়াছে সৃজন কারিগরী। রোমক আদর্শের এই প্রেরণা স্বামিজীর মধ্যেই পাইয়াছিল সমুচ্চগ্রাম, বিকাশ করিয়াছিল শ্রেষ্ঠতর পরিণতি :—

> শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি
> জীবনে সত্য সার—
> তরঙ্গ আকুল, ভব-ঘোরে, একতরি
> করে পারাপার ॥

অথবা—

> জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন
> ভয় কি তোমার সাজে ?
> দুঃখভার, এভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
> প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥

অথবা মিল্‌টনের—Fall'n cherub! to be weak is miserable.

কিন্তু "নিরুদ্দেশ যাত্রায়" রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে যেন চিন্তিত সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছেন। অজানা অনিশ্চয়তার সম্ভাবনায় তাঁহাকে যেন পীড়িতও করিতেছে। তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যরাণীর সাথে সাথে দিব্য-লোলুপতা লইয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়াছেন বটে, কিন্তু যখনই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে নিজের দিকে, সেই খণ্ডিত দৃষ্টির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে ব্যক্তিগত অসুন্দর অসঙ্গতির চিত্র—জীবনজগতের পরিণামশীলতার হতাশ-চিত্র। তখনই তাঁহার ভঙ্গ হইয়াছে চিরসুন্দরের একতানতা, সুর তাল কাটিয়া গিয়াছে, চলনবলনে ধ্বনিত হইয়াছে কেমন যেন নিঃসহায়তার একটা উদাস ছন্দ।

> সংশয়ময় ঘন-নীল নীর
> কোনদিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর—
> অথবা—আঁধার রজনী আসিবে এখনি
> মেলিয়া পাখা,
> সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
> পড়িবে ঢাকা—

তাই বলিয়া এ চিত্ত-চাঞ্চল্য, এ বেসুর ছন্দপতন রবীন্দ্রনাথের জীবনজগতের নশ্বরতা নৈরাশ্যমূলক প্রতিক্ষেপনা নয়, অথবা স্বকীয় অপদার্থতার আত্মাভিব্যক্তিও নয়। আবার ইহা দীনহীনতার আত্মবিলাসও না। এ চিত্ত-চাঞ্চল্য অবশেষের—অশেষের মাঝে নিঃশেষ করিয়া বিশেষ হইয়া উঠার। এ বেসুর সুরেরই নবজন্মের ক্রন্দন—কণ্ঠকে নীরব করিয়া ঋকময় করিবার সুভাষ স্পন্দন—এপ্রতি নিস্যুতং। এ পতন শুধু আপন ছন্দের নয়, অসুন্দরেরই পতন—"খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দরে।" সর্ব্বত্রই দেখি বাহ্যগত (Phenomenal) অস্বাচ্ছন্দ্য অশোভনতাকে সহজ সুন্দরের চিরন্তন রাগিণী লাস্যে বাঁধিয়া দিবার অশ্রান্ত অথচ অকুণ্ঠ ঝঙ্কার—অস্য মহিমানমিতি বীত শোকঃ।"

---

* রোমক প্রতিভার ন্যায় রবীন্দ্রপ্রতিভা যে পায় নাই কোন তাপস্ শক্তি, স্থৈর্য্য সুদৃঢ়তা, সে কথা বলিবার আদৌ কোন অভিপ্রায় নাই এ প্রবন্ধের। বরং রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইতে পারি তাহার বিপরীতটাই। দেখাইতে পারি যে, রোমক আদর্শ রবীন্দ্র প্রতিভায় বিকাশ করিয়াছে একটা নূতনতর সার্থকতা—ভিন্ন একটা রূপ। এ প্রবন্ধে আমরা দেখাইতেছি রবীন্দ্রনাথের অন্ত দুই একটা দিক। বিশেষভাবে যে সুরটী ভঙ্গীটী ফুটিয়া উঠিয়াছে "নিরুদ্দেশ যাত্রায়"।

রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন বিরাটের বিরাটত্ব বিপুলের বিপুলত্ব, সুদূরের সুদূরত্বটুকু; চাহিয়াছেন অনন্তের আনন্ত্য টুকু—বস্তুর নিবিড় রহস্যটুকু। সৃষ্টির যে সান্দ্র ইন্দ্রজাল, যে অব্যক্ত প্রহেলিকা তাহার মধ্যে রাখিতে চাহিয়াছেন তিনি একতানতা, তাহাতে তাঁহার চিত্তচকোর বিভোর। পাছে সে একতানতা, সে বিভোরতা, সে প্রহেলিকা ইন্দ্রজাল কাটিয়া যায়, সেই জন্য তাহাদের পূর্ব্বাবয়বের দিকে তিনি চোখ মেলিয়া তাকান নাই; হয়ত বা দৃষ্টির আপাদমস্তক তাকাইবার সে রূঢ়স্পর্শে সে প্রশান্তি, সে সুসঙ্গতি ক্ষুণ্ণ নষ্ট হইয়া যায়।

এইরূপ অতিমাত্র সংরক্ষণতার ফলে তাঁহার অনুভূতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে অতি-সাবধানতা, একটা অতি সন্তর্পণ সতর্কতা। সেখানে সত্য স্বপ্রতিষ্ঠ সাবলীল ভঙ্গী না লইয়া অনেক স্থলেই লইয়াছে যেন একটা বিড়ম্বনার সশঙ্ক রাগিণী বিরহের এলায়িত অঝোরা—

বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি।"

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা, রবীন্দ্রনাথের দুর্গতদের দুর্গতি নিবারণের মধ্যেও দেখিতে পাই সৌন্দর্য্যবোধের অনুরূপ ধর্ম্ম। পরাধীনতার যে স্থূলরূপ, যে বাস্তবতা—মনুষ্যত্বের যে অবমাননা লাঞ্ছনা, দারিদ্র্যের মধ্যেও যে নিঃসহায়তা বুভুক্ষা, উদরের তাড়না তাহার জন্য ঠিক তাঁহার অনুভূতি তেমন পীড়িত হয় নাই; হইলে হয়ত তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন, কিম্বা ভিক্ষা পাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, অথবা সঙ্কট-নিবারণী সঙ্ঘ করিয়া চরকায় সূতা কাটিতে বসিতেন। কিন্তু তাহার কোনটাও তিনি করেন নাই। তাঁহার স্বাদেশিকতা, তাঁহার দুর্গতদের দারিদ্র্য-পীড়া উদ্বুদ্ধ সজাগ হইয়াছে সেইখানে যেখানে তিনি পরাধীনতা দাসত্বের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন মনুষ্যত্বের ঐক্যের শ্রীহীনতা, দারিদ্র্যের মধ্যেও অসুন্দরতা,—কদর্য্যতা। তিনি জানেন দাসত্ব, অস্বাচ্ছল্য অস্বাচ্ছন্দ্যের কোন নিজস্ব কর্ত্তব্য বা সার্থকতা নাই যদি তাহা সুন্দরের ক্রমে গড়িয়া না উঠে। সেই জন্য বস্তুতন্ত্র অপেক্ষা ভাব-তন্ত্রের উপরই জোর বেশী দিয়াছেন। তাহার সুর তাল কাটিবার শঙ্কাও তাঁহার খুব তীব্র—সেইজন্য অতি-সতর্ক।

পরাধীনতায়, জীবনের অপরিসরতা গতানুগতিকতায় ভারতবাসীর মনপ্রাণ, উৎসাহ উদ্যম গুমটে—মৃতকল্প। শুধু ভারতবাসী বলিব কেন, সমগ্র ইউরোপও কলকারখানা, যন্ত্র যান্ত্রিকতার রূঢ়তায় আইঢাই; রবীন্দ্রনাথ তাহাতে আনিয়া দিলেন ফাল্গুনের পরশ—লোকন্তরের বার্ত্তা—নূতন আশা ভরসার সঞ্জিবনী আবহাওয়া। পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথ যে এতটা সমাদর পাইলেন তাহার একমাত্র কারণই ইহা—

দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মত
কাঁপিছে জলে।

যে সুর, যে রাগিণী তিনি ধরিয়াছেন তাহা অশ্রুতের—গ্রীকদের সেই Music of the Spheresএর। কীট্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে হয়—But those unheard are sweeter". যে ভাষা তিনি পাইয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব, অনুপম—অনবদ্য; আপন গৌরবেই সে যেন লতাইয়া লতাইয়া বিলাইয়া বিলাইয়া মণ্ডনের উপর মণ্ডন দিয়া সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে উড়িয়া চলিতেছে।



বনাম

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কথায় বলে ঘরকন্না… !

এর ঝঞ্ঝাট, হাঙ্গামা, আপদ বালাই অনেক !

সেদিন বুলু তার স্বামীর ওপর হঠাৎ রাগ করে চির প্রচলিত প্রথানুযায়ী নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করতে যাবে, এমন সময় কি মনে করে মত বদলিয়ে সে স্থিরভাবে শোফারকে বললে—"গাড়ী নিয়ে বিনয় বাবুদের বাড়ী যান, আর আমি একটা চিঠি দিচ্ছি—সেটা তাঁর বড় মেয়েকে দেবেন—তিনি এই গাড়ীতেই চলে আসবেন, বুঝেছেন ?"

ইনি হচ্ছেন আমাদের বুলুর রাণুদি ! বিনয় বাবুর বড় মেয়ে—বি, এ পাশ করে বসে আছেন। বুলু তার একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত ! বুলুর মতে—রাণুদি জানেনা বা বলতে পারে না—এমন বিষয়ই নেই ; ঐ তো সেবার মিনতির স্বামী চিঠি দিচ্ছিলো না, রাণুদিই পরামর্শ দিয়ে সব ঠিক করে দিল। ঐ তো রাণুদির ছোট বোন মিনু—কে এক তরুণ কবি নলিন না পুলিন—তাকে দেখবার আর আলাপ করবার জন্য একেবারে হন্তদন্ত বল্লেই হয়—রাণুদিই ত' ইত্যাদি ইত্যাদি !

এ হেন রাণুদির জন্য যখন বুলু আজ বিশেষ পত্রসহ ও মোটরসহ 'কল্' পাঠালো তখনই ব্যাপারটা যে একটু গড়িয়েছে সেটা বুঝতে বাকী রইল না।

একটা কথা বলতে ভুলেছি। আমাদের এই রাণুদির কথা প্রসঙ্গে এটুকুও বলে রাখা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না, যে, 'চোখে দেখলাম আর প্রেমে পড়লাম' যাকে বলে 'Love at'—এসব রাণুদি মানেন না। তিনি বলেন—'প্রেমের গতি হবে শুক্লপক্ষের চাঁদের মত। প্রতিপদের দিন থেকে কলায় কলায় বেড়ে ক্রমে পূর্ণিমায় পরিণতি প্রাপ্ত হবে। মাঝে মাঝে মেঘলা রাত হয়—হোক্, কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঐ মিনুর মতো—দেখলুম না, মিশলুম না, জানলুম না, চিনলুম না—গোটা কতক কবিতা পড়েই—ব্যস্! নাক উঁচু আর ভুরু ছোট ক'রে মেঘদূত হাতে আরাম কেদারায় বসেপড়লুম 'ওডিকলোন' আর 'স্মেলিংসল্টের' শিশি সঙ্গে নিয়ে,—আর কেউ কাছে এলেই, 'যাবোনা যাও, কিছু ভালো লাগছে না,—খিদে নেই—এখন ঘুমুবনা ঘুম আসছে না—না, বলছি অসুখ করেনি ইত্যাদি,—এসব রাণুদির দ্বারা হবে না বাপু।

রবীন্দ্র রায়, এম, বি,—মেডিক্যাল কলেজের হাউজ ফিজিশিয়ান, বয়স—সাতাশ কি আটাশ। ভালো খেলোয়াড়, নার্শদের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। এ হেন লোভনীয় ও বরনীয় সুপাত্রটি আপাততঃ আমাদের রাণুদির তথাকথিত "প্রতিপদ—পূর্ণিমা—পরিণয়—প্রগতির"—মক্কেল ! রাণুদি বলেন—"মিঃ রায় এখনো ছেলেমানুষ! তত স্মার্ট নয়, হ্যাঁ—তবে একেবারে 'হোপলেসও নয়, তাইতো আমি এখনো"—ইত্যাদি !

* * * *

রাণুদি এলেন বুলুদের বাড়ীতে—।

বুলু—আঠারো উনিশ বছরের রূপসি ম্যাট্রিক্-পাশ করা গাইয়ে তরুণী,—সুধীরের নব-পরিণীতা। সুধীর বসু,—বি, এ, আপাততঃ কোন সলিসিটরের সহকারী, ভবিষ্যৎ—রোদে-পড়ে-থাকা-অভ্রের মতোই উজ্জ্বল।

বুলু ব্যস্ততা সহকারে রাণুদিকে চা ইত্যাদি খাইয়ে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। রাণুদি বললেন—"ব্যাপার কি বলতো বুলু ? এত জরুরী 'কল্' করেছিস্ কেন ?"

বুলু মুখখানা আষাঢ়ের আকাশ করে তুলে তার 'কেশ' বিবৃত করতে সুরু করল'। রাণুদি বিচক্ষণ চিকিৎসকের মত গম্ভীর ভাবে শেষ পর্য্যন্ত শুনে কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হলেন। তারপর নিরিবিলি পরামর্শ চলল অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে দু'চারটি যা' দরকারী কথা হ'ল, তা' এই "তোকে মরতে হবে—" !

"—এঁ্যা—" ?

"মরতে পারবি ? মানে—এই—যখন সুধীর বাবু বিকেলে ঘরে আসেন—সেই সময়। মাথা পর্য্যন্ত চাদরে ঢাকা দিয়ে বিছানায় পড়ে উঃ, আঃ করবি, মাথার কাছে টেবিলে একটা আধখোলা মর্ফিয়ার শিশি আর একটা মোটা খোলা চিঠি সুধীর বাবুর নামে—পড়ে থাকবে। চিঠিটা কি রকম হবে—তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিস ? এই যেমন—তোমার দোষ দিই না, দোষ আমার মন্দ অদৃষ্টের ! বিধাতা কপালে আমার স্বামী সৌভাগ্য লেখেননি—কি করব' ! আমার মৃত্যুই ভালো,—স্বামীর ওপর সন্দেহ রেখে আমি বাঁচতে চাইনে। যখন স্বামীর প্রেমই হারিয়েছি, তখন আর—, এই সব থাকবে আর কি, বুঝেছিস্ —পারবি ?"

বুলু সাগ্রহে ঘাড় নাড়লে !

সেইদিন—অর্থাৎ—যেদিন মধ্যাহ্নে বুলু রাণুদিকে ডেকে পাঠায়, সেই দিন সুধীর যদিও অফিসে যাবার নাম করেই মোটর বাইকে চড়ে ঘর থেকে বার হ'ল, সে সোজা গেল কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের ইনডোরওয়ার্ডের হাউস ফিজিশিয়ান রবিদার কাছে। রবিদা তখন রোগীদের 'ডায়েট-কার্ড' নিয়ে অবস্থানুযায়ী একটু আধটু অদলবদল কচ্ছেন—এমন সময়ে সুধীর চোখ মুখ লাল করে ওয়ার্ডের মধ্যে এসে হাজির! একবার এদিক ওদিক চেয়ে সোজা রবিদার কাছে গিয়ে কাঁধের ওপর আস্তে আস্তে চাপড় মেরে বললে—"তোমার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে রবিদা, একবার বাইরে এসো—শীগ্গীর।"

রবিদা সুধীরকে ভালো করেই জানেন : একটু তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে তিনি বাইরে এলেন। সুধীর অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বললে—

"তখনই বলেছিলাম তোমায়, তুমি শুনলে না—নিজে ঘটকালি করে আমার বে' দিলে,—আর এখন এইসব গোলমাল, অশান্তি, একেবারে প্রত্যহ আমার অসহ্য ! তোমার কথায় বে' করে—নাঃ—আমি নিরুদ্দেশ হবো !"

হেসে রবিদা বল্লেন—"ওরে ঠাণ্ডা হ'। ব্যাপারটা কি বল দেখি, বুলু কি মাসীর বাড়ী চলে গ্যাচে ? দাম্পত্য কলহটা বাধল কি নিয়ে ?"

"বুলু আমাকে সন্দেহ করে !"

"সন্দেহ করে ? কিসের ?"

"বুলু বলে—'আমি ওকে আর ভালবাসিনা, বাইরে বেশী সময় কাটাই, সব কথার ঠিক মতো জবাব দিই না—and what not ! আর এদিকে বোধ হয় রাণুদির সঙ্গে এতক্ষণ ফন্দী ফিকির আঁটা সুরু হয়েছে…"

"বটে !"—রাণুদির নামে রবিদার মুখে একটু তরল হাসি চিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌লো। খানিক ভেবে বলে উঠল "ঘাবড়াও মৎ…ওঝারও ওঝা আছে বন্ধু…."

বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা…সুধীরের অফিস্ থেকে ফিরবার সময় হয়েছে, রাণুদি গম্ভীরভাবে একটি সোফায় গা এলিয়ে বিশ্রাম ক'চ্ছেন। বুলু বিছানায় চাদর গায়ে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে পড়ে আছে। তার মাথার কাছে সুধীরের নামে খামে মোড়া একটা মোটা চিঠি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। টেবিলে একটা খালি শিশি গড়াচ্ছে…গায়ের লেবেলে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা 'পয়সন্'…ওডিকলনের শিশিটাও তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে…টেব্‌ল-ফ্যান্‌টা খুব জোরে ঘুরছে। বল্‌তে গেলে আয়োজন একরকম সর্ব্বাঙ্গীন ! এখন সুধীর এলেই হয়। মোটর বাইকের শব্দ কাণে এলেই—রাণুদির শিক্ষা মতো বুলু নাক পর্য্যন্ত চাদরটা টেনে দেবে।…চোখ মুখ বিকৃত করে—"উঃ—গেলুম—বাবারে—আঃ—মাগো—" এই সব সুরু করে দেবে… রাণুদি ঘন ঘন মাথায় জলপটি দেবেন। তার পর সুধীর ঘরে ঢুকলেই রাণুদির কাজ শেষ…বুলুর কাজ আরম্ভ। বুলুর দু'চোখে দু'ফোঁটা 'গ্লিসারিণ' দেওয়াই আছে—অশ্রুধারার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

নিস্তব্ধ নীরব ঘরটির মধ্যে একমাত্র টাইম পিস্‌টাই জীবনের সাড়া দিচ্ছে। রাণুদি ধীরে ধীরে নড়ে বস্‌লেন। তার পর ঘড়ির দিকে চেয়ে বল্লেন, "এবার বোধ হয় বেচারা আসবে…বুলু, সব ঠিক ঠিক মনে আছে তো! সহজে কিছুতেই যেন গলিসনে………ওকে কাঁদাবি আগে ………তারপর—যখন দেখ্‌বি একেবারে হাটু গেড়ে

কাকুতি মিনতি কচ্ছে—তখন আস্তে আস্তে সুর বদ্‌লাবি।"

বুলু চাদরটা একটু নামিয়ে বললে—"রোজ তো ও এই সময়েই আসে, আজ দেরী হচ্ছে কেন? অফিস ফেরোৎ সে তো কোথাও যায় না!"

"হতে পারে পথে কারোর সঙ্গে দেখা হয়েছে—কি—এখনও অফিসেই আছে, ওদের যা কাজ।"

আরও মিনিট পনেরো কাটলো—এই ভাবে নিঃশব্দে …। বুলু চাদর-ঢাকা অবস্থায় পড়ে থেকে ঘামতে লাগলো…রাণুদি ক্রমেই সময় ঘনিয়ে আসছে মনে করে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন…ছ'টা বাজলো…

এই রকম নীরবে আরও মিনিট তিনেক যেতে না যেতেই পাশের ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো ঝন্-ঝন শব্দ ক'রে…।

বুলু নিরাশ হয়ে বলে উঠলো—"দেখলে রাণুদি, আমি বলেছিলুম? নিশ্চয়ই কোন বন্ধুর সঙ্গে বায়স্কোপ দেখতে গ্যাছে—বলতে চায় বাড়ী ফিরতে রাত হবে—যাওতো ধরোগে রিসিভারটা—"

রাণুদি একটু পরে গম্ভীরভাবে ফিরে এসে বললেন—"বুলু, তোকে ডাকছে—তুই আয়,—আমায় বলতে চায় না"—বুলু এদিক ওদিক তাকিয়ে সন্তর্পণে উঠে রাণুদির সঙ্গে গ্যালো পাশের ঘরে…

* *

নিতান্ত অসহায় ভাবে রাণুদির মুখের দিকে চোখ্ তুলে বুলু আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো—"কি হবে রাণুদি—"

রাণুদি একটু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—"চল্, আগে সেখানে গিয়ে দেখি—উনিতো বললেন তেমন ভয়ের কিছু নেই—"

বাধা দিয়ে বুলু কাঁদতে কাঁদতে বললে—"আমি জানি রাণুদি আমি জানি, আমাকে ভুলিও না,—ডাক্তাররা ঐ রকমই বলে—"

"আচ্ছা নে, তুই সব জানিস,—এখন চট্ করে যা'—কাপড়টা ব'দলে নে' আগে—"

মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গনে গাড়ী ঢুকতেই বুলু রাণুদির হাতে নাড়া দিয়ে বলে উঠলো কাঁদ কাঁদ স্বরে—"ঐ ভাখো রাণুদি—"

"কিরে?" বলে রাণুদি সেই দিকে চোখ ফিরাতেই দেখলেন—একটা ভাঙ্গা-চোরা মোটর বাইক প'ড়ে আছে।

কোন রকমে স্থির হয়ে রাণুদি বললেন—"অতটা উতলা হসনে বুলু—গাড়ী ভেঙ্গে গ্যাছে বলেই হয়তো সে খুব সিরিয়াসলি উন্‌ডেড্ নাও হাতে পারে—"

…সিঁড়ির কাছেই রবিদা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে এসে দেখা দিলেন। তাঁর মুখচোখের ভাব দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল' যে ব্যপার বিশেষ গুরুতর!

বুলু আর রাণুদি কাছে আসতেই তিনি বলে উঠলেন—"নমস্কার মিস চ্যাটার্জ্জি—এই যে বুলু এসেছিস্, এইদিকে আয়।"

"সেজদা—অ্যাকসিডেণ্টটা কখন হয়েছিলো?"

"প্রায় সাড়ে-পাঁচটা আন্দাজ—বোধ হয় অফিস থেকে ফেরবার পথে। রাস্তার লোক আর বাস-ড্রাইভারের কথা থেকে বোঝা যায় যে সুধীর খুব 'কেয়ারলেশ্‌লি' বাইক চালিয়ে রং সাইড্ দিয়ে আসছিল,—এই যে ছ'নম্বর ক্যাবিন, দাঁড়া একটু, আমি আগে দেখে আসি—"

একটু পরে রবিদা ক্যাবিনের বাইরে এসে ম্লানমুখে বললেন—"এখনও 'সেন্‌সলেশ্'! বুলু, ভয় পাবার বিশেষ কিছু নেই—বাঁচবে তবে একটা পা বোধ হয় অ্যাসপুটেট্ করে ফেল্‌তে হবে"—বুলুর বুকের মধ্যে কে যেন একটা মোচড় দিলো! ভয়ে, দুঃখে তার মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হ'য়ে গেল!

"—কি কর্বি বুলু—ওর অদৃষ্টে ছিলো, এতে দুঃখ করা উচিৎ নয়,—"

রাণুদি জিজ্ঞাসা কর্লেন—"আমরা কি ভিতরে আসতে পারি?"

তিনি বললেন—"হ্যাঁ, যদি আপনারা রোগীর পক্ষে কোন রকম উত্তেজনার সৃষ্টি না করেন—তা হলে—"

সুধীর অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে! মাথার প্রায় সমস্তটাই ব্যাণ্ডেজে ঢাকা, মায় একটা চোখ পর্য্যন্ত! ডান

পাশের পাঁজরের কাছে একটা কাঠ দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা! বাঁ পায়ের হাঁটুর ব্যাণ্ডেজের অবস্থা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেখানটায় আর বিশেষ কিছুই নেই। ঘরের চারদিকে দুটি নার্শ, তিনটি ছাত্র আর গোটা দুই হাউজ ফিজিশিয়ান নিঃশব্দে চলাফেরা কর্চ্ছেন!

বুলুর মাথা ঘুরে উঠলো। সে প্রায় হতচেতন হ'য়ে রাণুদির গায়ে এলিয়ে পড়ল'।

রাণুদি বুলুকে নিয়ে বাইরে এলেন। বুলু নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলো। রবিদা ও একটি নার্শ বাইরে এলেন। বুলুকে সেই নার্শের তত্ত্বাবধানে দিয়ে রাণুদি বল্লেন—

"দেখুন, আমাদের একটা বসবার জায়গা পাওয়া যায় নাকি? বুলুকে নিয়ে আমি ও ঘরে বসতে মোটেই সাহস কর্চ্ছিনে।"

রবিদা কোন উত্তর না দিয়ে আবার ক্যাবিনে ঢুকলেন। একটু পরে বাইরে এসে বললেন "শীঘ্র জ্ঞান ফেরবার কোন আশা নেই, তবে যদি ফেরে, তাহলে জানবো যে এযাত্রা ও বেঁচে গ্যালো। ততক্ষণ—আচ্ছা আসুন আমার সঙ্গে—"

বুলু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে "সেজদা, তোমরা যাও আমি এইখানে নার্শের সঙ্গেই থাকবো।"

'ভিজিটারস্ রুমে' এসেই রাণুদি বললেন—

"মিষ্টার রায় সত্যিই কি সুধীর বাবুর পা কেটে ফেলা দরকার হবে? কোন উপায়েই কি ওটা এড়ানো যায় না—?"

রবিদা প্রবীন চিকিৎসকের মত গাম্ভীর্য্যের সহিত বললেন "আমাদের মেডিক্যাল সায়েন্স অনুসারে এতক্ষণ ওটা সেরে ফেলাই উচিত ছিলো, কিন্তু কেবল বুলুর মুখ চেয়েই এতক্ষণ আমি দেরী করেছি—ওরা বোধ হয় এতক্ষণ সে সমস্ত প্রিপারেশন্ শেষ ক'রেছে—"

রাণুদি আর থাকতে না পেরে টেবিলের ওপর রবিদা'র হাতটি সজোরে চেপে ধরে বললেন—কম্পিত স্বরে "রবিবাবু আপনাদের সমস্ত বুদ্ধি—সমস্ত শিক্ষা দিয়েও যদি সুধীর বাবুকে কোন রকমে ওটা থেকে বাঁচাতে পারেন ত করুন, বন্ধুভাবে এ কেসটা আপনি ট্রিট্ করুন। নৈলে বুলু বেচারীর অবস্থা অসহ্য হবে! আর এদিকে আমি কিনা ওকে সুধীর বাবুর বিরুদ্ধে—" রাণুদি হঠাৎ নীরব হ'লেন!

রবিদা বললেন,—"আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে বুলু আমার পিশতুতো বোন, বোনের জন্ম কি কর্ত্তে হবে না হবে সে সম্বন্ধে উপদেশ নেওয়া আমি কারোর কাছ থেকেই দরকার মনে করি না,—তাছাড়া সুধীরও আমার মস্ত বন্ধু, সেদিক থেকেও আমার কর্ত্তব্য আমি ভাল বুঝি—!"

৫

রাত্রি প্রায় তিনটের সময়ে রবিদা ক্যাবিনের বাইরে এসে খবর দিলেন—"সুধীরের জ্ঞান ফিরেছে, বুলু—কথা বলতে চাস তো আয়, কিন্তু খবর্দার, কান্নাকাটী করিসনে যেন লক্ষ্মী দিদি—।"

"না সেজদা, কাঁদবো না—" বলে রবিদার সঙ্গে বুলু ক্যাবিনে ঢুকলো। সুধীর বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলে কাতরভাবে বুলুর দিকে তাকালে! বুলুর কচি বুকখানি সুধীরের সমবেদনায় হাহাকার কর্ত্তে লাগলো! প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ ক'রে সুধীরের পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো। সুধীর অল্প হাত নেড়ে বুলুকে আরও কাছে আসতে ইসারা করল। বুলু আরো কাছে সরে এসে একবার রবিদার মুখের দিকে চাইলো। রবিদা বুঝতে পেরে অন্য একটি হাউজ ফিজিশিয়ানের সঙ্গে নিম্নস্বরে দু একটা কথা বলে আর একবার সুধীরের পাল্‌স্ দেখে বাইরে গেলেন।

সুধীর ক্ষীণ দুর্ব্বল স্বরে বলল—"এসেছো বুলু? আমি মনে করেছিলুম তুমি মাসীমার কাছে কালই চলে গ্যাছো!"

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বুলু বললে—"না যাইনি, ঘরেই ছিলুম—!'

বেদনা-করুণ কণ্ঠে সুধীর থেমে থেমে বললে...

"বিদায় বুলু...চললুম্ আমি..."

বুলু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো—"কোথায় যাবে তুমি?"

"যে—দেশের রাতে কখনো চাঁদ ওঠে না, যেখানে প্রিয়া নেই,—সেই দেশে!...আমার মৃত্যুর পর তুমি সুখী হ'য়ো......ওঃ, বুলু, তুমি কি কষ্টটাই না পেলে আমায় বিয়ে ক'রে—!"

বুলু তার স্বামীর একটা হাত ধরে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে

বললে—"কেন ওই সব ব'লে আমায় কাঁদাচ্ছ? আমি কি করেচি?"

সুধীর নিরাশার মলিন হাসি হেসে বললে—"তুমি করোনি কিছুই বুলু—মানিক আমার, তোমার কোন দোষই নেই। আমায় নিয়ে সুখী হবে, এ বোধ হয় বিধাতার ইচ্ছা নয়। তা না হ'লে তোমার বিড়ালটাই বা কেন আমার গালে কপালে আঁচড়ে দেবে, আর তাকে জানালা গলিয়ে পাশের ছাতে ফেলে দেওয়ার জন্য তুমিই বা কেন সারারাত আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে দেবে? দোষ কারোরই নয়। বিধি ব'লে একটা কিছু আছে বুলু, এ তারই বিধান! উঃ, কত সাধের স্বপ্ন আমার বাতাসে মিলিয়ে গ্যালো, বুলু—!"

বুলু চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মিনতি-করুণ-কণ্ঠে বললে "তুমি আমায় ক্ষমা কর্ত্তে পার্বে না তা হলে?...আমি যদি তোমার কাছে হাতযোড় ক'রে ক্ষমা চাই···?" বল্‌তে বল্‌তে বুলু সত্য সত্যই তার হাতদুটি জোড় করে দাঁড়ালো, —অপরাধীর মত, সজল নয়নে শত ব্যাকুল প্রার্থনা ও আবেদনের আভাষ মাখিয়ে···

...এর পরেও সুধীরের সংযমের বাঁধ আর বাগ মানলো না। তড়াক্ ক'রে রোগশয্যা থেকে লাফিয়ে উঠে বিস্ময়বিমূঢ়া বুলুকে বাহুবেষ্টনে বন্দী ক'রে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠ্‌লো—"প্রার্থনা মঞ্জুর তব অয়ি প্রাণেশ্বরী—!"

* * * *

ক্যাবিনের বাইরে এসে রবিদা রাণুদিকে বললেন—

"আসুন মিস চাটার্জ্জি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই—ওরা আলাদাই আসুক—"

একটা ট্যাক্সির মধ্যে রাণুদিকে বসিয়ে নিজেও গম্ভীরভাবে উঠে পাশে বসলেন। ট্যাক্সি মেডিক্যাল কলেজের গেট্ পার হতেই রাণুদি একটি সবিস্ময় প্রশ্ন করলেন, "সুধীর বাবু কি তাহলে সত্যিই য়্যাক্‌সিডেণ্ট করেন নি?"

"নিশ্চয়ই না।"

"তবে—?"

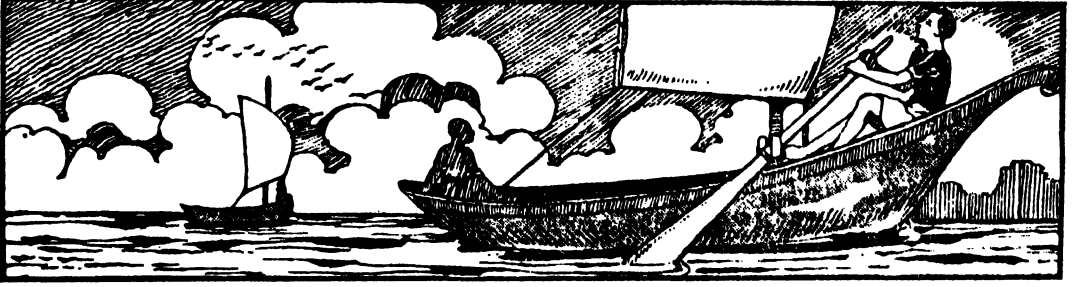
দুষ্ট ছেলের মতো মুচ্‌কে হেসে রবিদা বললেন—

"দাম্পত্য-যুদ্ধে পরাজয়ের লজ্জা থেকে বেচারী সুধীরকে বাঁচাবার জন্য এই অভিনয়টুকুর দরকার ছিলো। ভাঙ্গা মোটর বাইকটা যে সুধীরের নয়, আপনারা এতক্ষণ তা লক্ষ্যই করেন নি।···যতই নারী প্রগতি আর স্ত্রী জাগরণের কথা বলুন মেয়েরা চিরকালই মেয়ে এবং ছেলেরাও চিরকালই ছেলে !"

রাণুদি নিতান্ত অপ্রস্তুত এবং অবাক হ'য়ে রবিদার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন!

রবিদা ধীরে ধীরে বাঁ হাত দিয়ে রাণুদিকে জড়িয়ে কাছে টেনে এনে ডানহাত দিয়ে তাঁর চিবুক তুলে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খুব মিষ্টি ক'রে বললেন—"তুমি হেরে গ্যাছো রাণু,—আমি তোমায় জিত্‌লুম।···এবার স্বীকার করচ' তো—আমি স্মার্ট···?





বিংশ শতাব্দী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রীপ্রণব রায়

উপলব্ধি আর ব্যাখ্যা—এ দু'য়ে তফাৎ যথেষ্ট। ভালো লাগাটা সহজ, কারণ ভালো লাগে মনে মনে; কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয়—'কেন ভালো লাগ্‌ল?' মুস্কিল বাধে তখনই। ফুল ভালো লাগে সকলেরই, সুগন্ধটুকু উপভোগ করে' বড় জোর বল্‌তে পারা যায় 'চমৎকার!' কিন্তু ফুলের সমালোচনা যদি করতে বলা হয়, তা' হ'লে বাগানের মালীর চেয়ে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে কোনো কোনো ব্যক্তির লজ্জায় অধোবদন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না—। মানুষের নিগূঢ় অনুভূতিলোকে কথা স্তব্ধ; সেই অনির্ব্বচনীয়তাকে ব্যাখ্যা করার মতো দুঃসাধ্য ব্যাপার আর নেই।

তবু, বিচার ও তর্ক যখন উঠেচে, তখন আসরে যোগ দেওয়া যাক্—।

এক কথায় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বিংশ শতাব্দীর চারণ বলা চলে। তাঁ'র কবিতায় আমরা শহরের ধূমকলঙ্কিত আকাশ, ধূলিরুক্ষ রাজপথ, আর বিজ্ঞান জগতের যন্ত্রজটিলতার একটি বিরাট মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেলাম। আধুনিক যুগ হচ্চে ব্যস্ততার যুগ, প্রতিযোগিতার যুগ এবং আত্মহত্যার যুগ। এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা, মূঢ় দর্প নিস্ফল প্রয়াস থেকে আধুনিক কালের মানুষের মুক্তি নেই—একথা প্রেমেন্দ্র অনুভব করেচেন। আত্মার সৌন্দর্য্যলোক থেকে এক সর্ব্বনাশা নেশায় মানুষ নিজেকে রূঢ় বস্তুজগতে অন্তরীণ করে' রেখেচে; সেই নির্ব্বাসিত ও নিপীড়িত মানবাত্মার ব্যাকুলতা কবির হৃদয়কে এমনভাবে স্পর্শ করল যে, তিনি বিংশ শতাব্দীর জগত থেকেই তাঁ'র কাব্য-পরিমণ্ডল বেছে নিলেন! একথা ঠিক যে, অনুভূতিই হ'ল কাব্যের সর্ব্বস্ব,—বিষয়বস্তু নয়।

আরও সংক্ষেপে বলা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কারবার মাটির জীবন নিয়ে, স্বপ্নের ফিরি করা তাঁ'র পোষায় নি। কেননা:—

"সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপ্নবাসরে বিরহিনী বাতি মিছে সারা রাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই!"

আধুনিক জীবনের মূল মর্ম্মকথাটি হচ্চে 'হায় সময় নাই'! এ যুগের সাম্রাজ্যবাদ আর ধনবাদ, শক্তি ও অর্থের উন্মত্ত নেশা মানুষকে বিশ্রামের অবকাশ দিচ্চে না,—স্বপ্নবিলাসের অবসর তা'র নেই।

স্বপ্ন প্রবণতার চেয়ে প্রেমেন্দ্রের কাব্যে দার্শনিকতাই বেশী, মনে হয়। তিনি অনুভব করেচেন যত, চিন্তাও করেচেন তত! তাঁ'র কবিতা মস্তিষ্কের দ্বারপথে হৃদয়ানুভূতির গহনলোকে প্রবেশ করে।

জীবন-ব্যাপারে তাঁ'র দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ এবং বোধশক্তি আশ্চর্য্যরকম প্রখর। যে মানুষ "তারকালোকে

ছন্দ, সূর্য্যোদয়ের বাণী জেনেচে, ভালোবাসা সৃজন করেচে; তবু সে-ও যে হিংসার অন্ধকারায় শুধু বাঁচবার আশাটুকু সভয়ে লালন করে", প্রেমেন্দ্র তা লক্ষ্য করেচেন। জন্মালে মানুষের মৃত্যু যে একদিন ঘট্‌বেই, এর চেয়ে পুরাতন প্রত্যক্ষগোচর ঘটনা পৃথিবীতে আর নেই। তবু যখন পড়ি :—

"ভুখ্ দিলে যে, বুক দিলে যে,
দুখ দিতে সে ভুল্‌ল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।"

তখন মনে হয়, একটি নতুন রহস্যের আবিষ্কার হ'ল। কবি প্রেমেন্দ্র নয়, দার্শনিক প্রেমেন্দ্র বল্‌চেন :—

"নিখিল ভুবন ভরি' খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা
অনাদি অতীত কাল ধরি'।"

এখানে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—জীবন সম্বন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতবাদ কি? তিনি দুঃখবাদী, না আনন্দবাদী?

প্রেমেন্দ্রকে দুঃখবাদী বল্‌লে, চট্ করে' এ-কথার প্রতিবাদ করবার যো নেই। কেন না তিনি বল্‌চেন, দেবতার জন্ম হ'ল সুন্দর সুপবিত্র প্রভাতে—মাটির কোলে, বিধাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে।***

তারপর চেয়ে দেখি,
কোথা মোর ভগবান?
জীর্ণ গৃহে, আবর্জ্জনা চারিদিকে,
তা'রি মাঝে আলোহীন, বায়ুহীন কক্ষে
ছিন্ন শয্যা'পরে শুয়ে,
রোগরুগ্ন ক্ষুধাক্ষীণ দেহ ল'য়ে
দেবতা আমার ফেলে দীর্ঘশ্বাস!"

এ পৃথিবী তাঁ'র কাছে "বেনামী বন্দর"; "যন্ত্রের জটিল পথে বিকলাঙ্গ জীবনের শুধু ব্যঙ্গ-সমারোহ"ই তাঁর চোখে পড়চে।

কিন্তু এর পরেই তিনি বলেচেন!

"পশ্চাতে আসিছে যা'রা
তারা যেন ধরণীর এ কলুষ দেখিতে না-পায়;
মোদের চোখের জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি
শেষ হোক মানব-আত্মার এই কাতর কাকুতি
আমাদের বেদনায়।"

প্রেমেন্দ্রের কবিতায় দুঃখবাদ আছে বটে, তবে তিনি একচক্ষু হরিণের মতো দুঃখবাদী নন। তাঁর দুই চোখই খোলা, একচোখের দৃষ্টি এই পাপপঙ্কিল পৃথিবীর দিকে, অপর চোখের দৃষ্টি যেখানে "অন্ধকার রন্ধ্র ভরি' আলোকের আর্ত্তস্বর কাঁদে প্রতি তারকায়—।"

দুঃখের অন্ধকার রাত্রে তিনি শুভকামনার একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেচেন! তাই তিনি বল্‌চেন :—

"পৃথিবী সুন্দর হয় যেন!"

জীবনের অপচয় ও অপমৃত্যু তাঁকে যেমন ব্যাকুল করেচে, জীবনের সমারোহও তাঁকে তেমনি অভিভূত করে' তুলেচে। তিনি দেখচেন, মৃত্যু-শোকস্তব্ধ গৃহদ্বারেও নব জন্মের শঙ্খ বাজ্‌চে, কবরের মাটি ফুঁড়েও তৃণশিশু আবার মাথা তুল্‌চে; তখন তিনি বললেন :—

"রচ গান যৌবনের।"

দার্শনিক এখানে কবি হ'য়ে উঠলেন। আসল কথা প্রেমেন্দ্র দুঃখবাদীও নন, আনন্দবাদীও নন,—আশাবাদী বললেই তাঁকে ঠিক বোঝা যাবে।—

বিংশ শতাব্দীর এই নাগরিক সভ্যতা ও যন্ত্রজগতের পাপ, কদাচার, অবিশ্বাসের মধ্যেও তিনি এক অনাগত সৌন্দর্য্যময় যুগের দিকে ইঙ্গিত করচেন। থাকলই বা তাঁর কবিতায় পশ্চিমের ছায়া; পশ্চিম থেকে ভারতবর্ষের জীবনে যে সমস্যা আর গ্লানি এল, আমাদেরও সঙ্কীর্ণ সাহিত্যে তা'কে রূপ দেওয়া হয়েচে,—এ-ই আমাদের সৌভাগ্য।



কত দূরে ?

শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ

জাতিতে সে ডোম, তিনটী মেয়ে লইয়া অল্পদিন হইল বিধবা হইয়াছে।

নীচু জাতি হইলেও তারা ঠিক ভদ্রলোকের মতই চলিত। বাহিরের হাওয়ায় স্বাধীনভাবে কেউ কখনো তাদের চলিতে দেখে নাই। কিন্তু আজ নিরুপায়। স্বজাতীয় পাঁচজনের ন্যায় আজ তাহাকে চলিতেই হইবে। স্বামী কিছুই রাখিয়া যায় নাই।

দাওয়ায় বসিয়া সে কাঁদিতেছিল—ঘরে কিছুই নাই। ছোট মেয়ে তন্বী যখন খাইতে চাহিবে, আঁচল ধরিয়া কাঁদিবে, তখন তার অবোধ নিরুপায় মনকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে ?

"মণিয়া !"—

সে চমকিয়া উঠিল। সম্মুখে ফন্তু, সম্পর্কে দেবর। তার লালসাপূর্ণ সতৃষ্ণ চাহনি মণিয়ার বুকে শতশেল বিদ্ধ করিল। সে যে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে সে ভরসাও কি ভগবান তাহাকে দেন নাই ? স্বামীর সঙ্গে জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সবই গিয়াছে, রাখিয়া গিয়াছে জ্বালাময় অনন্ত শোক। তাহাতেও নিবৃত্তি নাই। আরো যে কত জ্বালা সহিতে হইবে কে জানে ?

"মণিয়া, আজও তুই কাঁদছিস ? কত ক'রে বলছি, আমার ঘরে চল্, রাণী হয়ে থাক্‌বি......"

উত্তরে রোষদৃপ্ত কণ্ঠে সে বলিল, "রাণী হ'তে হলে আর সে ব্যবস্থা তোমার কর্ত্তে হ'তনা........."

"হবেনা কেন ? আমি যে তোকে ভালবাসি মণিয়া।"

"আমায় ভালবাস ? সে ভালবাসার মান একবার রাখ দেখি।"

মণিয়ার অন্তরের শুভ্র আলো ফন্তুকে পথ দেখাইতে পারিল না, সে তার বিপরীত অর্থ করিয়া মণিয়ার হাতখানি ধরিয়া আবেগময় কণ্ঠে বলিল "সেই মান রাখ্‌বার জন্যেই ত তোকে নিকে করতে চাই মণি !"

এক ঝট্‌কায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া মণিয়া বলিল "যাও এখান থেকে, তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে।"

ফন্তু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

মণিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল "ফের্ যদি ওরকম কথা আমায় বল আর গায়ে হাতদিয়ে অপমান কর তবে আমি পুলিশ ডাকবো—ঠিক জেনো।"

ফন্তুরও ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমিও দেখে নেব, এত তেজ তোর কোথায় থাকে।"

* * *

বিধাতা দরিদ্র করিয়াছিলেন তো রূপ দিয়াছিলেন কেন ? এই রূপই মণিয়ার কালস্বরূপ, পথে ঘাটে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বিপদ গ্রস্ত করিতে ছাড়িল না।

কিন্তু নিরুপায়, পথে তাহাকে বাহির হইতেই হইল।

মরিবার সময়ে স্বামীর শেষ কথা কয়টি আজও তার মরম কোণে প্রতিধ্বনি তোলে "মণিয়া !—মণি, চলছি কিন্তু যা দিয়েছিস তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে !"

মণিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে ছিল, তখন তার উত্তর দিবার শক্তি এতটুকুও ছিল না।

মণিয়ার অশ্রু-সজল মুখের পরে স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া সে বলিল "জানি অনেক কষ্ট পাবে, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক গঞ্জনা সইতে হ'বে। তবুও এই শেষ মিনতি, ইহ জীবনের খেলাই খেলা নয়। যেখানে অবিচার, অত্যাচার নেই সেস্থান দুরূহ হলেও তার সহজ, শ্রেষ্ঠ পথ তুমি বেছে নিতে পারবে না ? বল মণি ! আমার বুকে হাত দিয়ে, এ অমূল্য দানের সম্মান রাখ্‌বে ?"

স্বামীর শেষ মিনতি—অশ্রু বন্যায় কথা বলিবার শক্তি লুপ্ত। সে নিরুত্তরে স্বামীর বুকে হাত রাখিয়া শপথ

করিতেই হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল "এই টুকুর জোরেই আবার তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে—মণি!"

ঐ টুকুর জোরেই যদি তাকে ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে কেমন করিয়া সে তার শপথ প্রত্যাহার করিবে? রাস্তা ঝাঁটে নিমগ্না মণিয়ার কাণে আসিল দুইজন ভদ্রলোকের অস্পষ্টবাণী।

"দেখ্, মেয়েটী কি সুন্দর"!

"তোর পছন্দ হয়?" "দূর গাধা, ও যে ডোম" "হলোই বা ডোম, মানুষ ত?—তাছাড়া লাভের পক্ষে সুবিধা অনেক খানি।"

"ছিঃ।—এরা আবার ভদ্রলোক" মণিয়া নীরবে চোখ মুছিয়া কাজে মন দিল।

এমনি রোজই শুনিতে হয়। বাহির হইয়া যে তার কত অশান্তি, কত বিভ্রাট, সে তাহা এতদিন অনুভব করিতে পারে নাই। যার জন্য আজ তাহাকে এমনি অপমান সহিতে হইতেছে তার পায়ে প্রাণের অর্ঘ্যরূপে বিকাইয়া দিতে চায় তার শেষ সম্বলটুকু। হায় সে কোথায়? কতদূরে?

* * *

রূপের বাজারে মেয়ে তিনটীর নাম থাকিলেও সব চেয়ে মাথা বাড়াইয়া উঠিয়াছিল ছোট মেয়ে তন্বী।

মায়ের সঙ্গে সেও মায়ের কাজের সহায়তা করে। মিউনিসিপ্যালিটীর বাবুরা তার স্বভাবসুন্দর সরল বাক্যে ও অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় আকৃষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে খাবার কিনিয়া দেয়, তাই সবাইকে দিয়া নিজে খায়।

মণিয়ার মাহিয়ানা মাত্র আটটী টাকা। এই দিয়াই চারজনের পেট চালাইতে হয়। বড় মেয়ে লক্ষ্মী—সে জন্ম-খুলো, মেঝো-মেয়ে শূলীর ওপরে তার কাজের নির্ভর, তন্বী ও লক্ষ্মী তার কাজের কি সহায়তা করিবে?

ফাগুয়ার উৎসবে ফক্করর বাড়ীতে বড় রকমের ভোজ। উৎসবে সকলেই যোগ দিয়াছে কেবল তন্বী ও তার মা বোনেরা দেয় নাই।

প্রাঙ্গনে উনুনের উপর প্রকাণ্ড ডেগচিতে মাংস সিদ্ধ হইতেছিল। তার আশেপাশে পাড়ার সকলে হৈ—চৈ করিতেছে। তন্বী ম্লান মুখে বলিল "মা! ভেব্বী ওখানে যাচ্ছে।"

"ওদের খেতে বলেছে, তোকে তো বলেনি।"

বাতাসে তন্বীর ফুরফুরে চুলগুলি দুলিতেছিল মাথা নাড়িয়া সে বলিল "না বল্লে খেতে হয়না—না?"

"না।—আর না যাওয়াই ভাল। ফাগুয়ার ওসব মাংস টাংস খাওয়া পছন্দ করি না।"

"এ ছিঃ! মা—আমি ও মাংস খাইনা।" মণিয়া নিরামিষ খায়। তন্বীও তার সঙ্গে খাইয়া অভ্যস্ত। ক্বচিৎ কখনো মাছ মাংসের যোগাড় হইয়াছে তো বরাহের মাংস এ বাড়ীতে কখনো আসে নাই।

একটা মাংসের টুকরা খাইতে খাইতে ভেব্বী বেড়ার ধারে অগ্রসর হইয়া ডাকিল "তন্বী"—

তন্বীর প্রাণ ছুটিয়া যাইতে চাহিলেও মায়ের অনুজ্ঞায় সে কথাটী পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না, আর পূজার দিনে ঐ মাংসের কাছে যাইতেও তার ঘৃণা হইতেছিল।

ঘরের মধ্য হইতে মণিয়ার কাণে ফক্করর উচ্চ ডাক হাঁক শোনা গেল। সে যে কি উদ্দেশ্যে এই বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়াছে তা পাঁচজনে ফাগুয়ার উৎসব মানিয়া নিলেও মণিয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না।

* * *

বাহিরে তন্বী খেলিতেছিল। দাবায় বসিয়া লক্ষ্মীর পা ব্যথা হইয়া গিয়াছে, উঠিতেই ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল। শূলী ফুলতলায় ফুল কুড়াইতে গিয়াছে। আঙ্গিনায় মণিয়া। বেতের ঝুড়িটা তার প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর পতন শব্দে ছুটিয়া আসিল।

হায়রে! জন্ম-খুলো চিরকালই দুঃখ সইতে হবে, তবে এগিয়ে সে রইল না কেন!

মনে একবার আসিতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। "না—না—থাক রয়েছে—রয়েছে।"

তন্বী ছুটিয়া আসিয়া দুটী টাকা দেখাইয়া বলিল "এই দেখ—! কে দিয়েছে বল ত?"

মণিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া বলিল "কে দিয়েছে রে?"

"জানিনা!—আবার দেবে বলেছে—আবার দেবে!"

ব্যাপারটা যেন মণিয়ার কাছে তেমন সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইল না।

সেই দিন বৈকালে তাদের দ্বারে একখানি জুড়ি গাড়ী দাঁড়াইল, তল্লী কলহাস্যে বলিল, "ঐ দেখ মা সে এসেছে।"

"কেরে—কে ?"

বুকের মধ্যে এমনি স্পন্দন আরম্ভ হইল যে, তার স্পষ্ট অনুমান হইল যে এ আর কিছুই নয়, রোজকার অভিনয় আজও দেখিতে হইবে।

টাকা দুইটী হাতে লইয়া মণিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গাড়ী হইতে যে নামিল, তার দিব্য সুদর্শন কান্তি, বিলাস ব্যসনে ধনবানের পুরা পরিচয়।

মণিয়া নাক সিঁটকাইয়া মুখ ফিরাইয়া নিল।

"তল্লী, এ টাকা কার ?"

তল্লী আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

"দিয়ে দাও। আমি না ব'লে দিয়েছি যে যা দেবে ফিরিয়ে দেবে।"

তল্লী ভয়ে ভয়ে টাকা ফিরাইতে গেলে সে সহাস্যে বলিল, "দিয়েছি কি ফিরিয়ে দেবার জন্যে ?"

মণিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "দেবার মানুষের ত অভাব নেই, তাদের দিনগে, দুঃখিনীর মেয়ে.......”

"দুঃখিনীর মেয়ে বলেই তো দিয়েছি মনিয়া। কিন্তু এ দুঃখ ত' তোমার থাকবে না—"

ছিঃ!—ছিঃ। একি শুনিতে হইতেছে তাকে। রাগে দুঃখে—মণিয়ার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভগ্ন হৃদয় তার আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল "ওগো কই গো তুমি—কতদূরে ? তোমার সম্মান রাখতে গিয়ে আজ আমার এত শাস্তি।"

"মণিয়া, কাঁদছো ? দুঃখ কি ? তোমার দুঃখ সারাতেই তো এসেছি, মেয়েদের নিয়ে চল আমার বাড়ীতে, রাণীর হালে থাকবে।"

"উঃ—ভগবান একি শোনালে ?"

মণিয়ার হাতখানি হাতের মধ্যে পুরিয়া লইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সে বলিল "ভয় কি মণিয়া ?—মণিয়া !"

আবার সেই হাতের অবমাননা—এই হাতে যে তার শেষ স্মৃতি বিজড়িত। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেও এই হাতের স্পর্শ আবার তাহাকে সচকিত করিয়া কর্ত্তব্যের পথে টানিয়া নিতে প্রয়াস পাইল। হোক্ সে ধনী রাজাধিরাজ, তার কাছে নিজের বাড়ীতে নিজেকে অপমানিত হইতে দিবে না, সে হাতটা সবলে ছিনাইয়া লইয়া দ্বারে খিল আঁটিয়া দিল।

গভীর বিস্ময়ে আগন্তুকের মুখে নির্গত হইল "আশ্চর্য্য !"

* * *

এমনি করিয়া স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায় সকলেই মণিয়ার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

লক্ষ্মী আর ঘরের বাহির হইতে পারে না। চারিদিক হইতে ইট পাটকেল আসিয়া তার কোমল অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়।

শূলীর একটা কাজ ঠিক হইয়াছিল, শত্রুরা পিছনে লাগিয়া সে আশাও নির্ম্মূল করিয়া দিল।

তল্লী মায়ের অনুজ্ঞায় কারো নিকট হইতে খাবারটী পর্য্যন্ত নেয় না। বাড়ীতে যে ডালা সাজী প্রস্তুত করিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন হইত তাও আজকাল হয় না—বিকায় না।

তেল অভাবে তল্লীর কালো চুলের বর্ণ পিঙ্গলে দাঁড়াইয়াছে।

শূলীর হৃষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা অনাহারে কৃশ হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মীতো জন্ম-মুলো।—অযত্নে তার বড় টানা চোখ, আরো জলন্ত—বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন তিনজনেই রাস্তায় বাহির হইয়াছে।

লক্ষ্মী ধীরে পা টানিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মণিয়া ভয়ে আকুল।

"লক্ষ্মী ! বাড়ী যাও মা !"

লক্ষ্মীর মুখ দিয়া অনেক খানি লালা বাহির হইয়া পড়িল। জলন্ত চক্ষু টানিয়া, বিকট দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "ম্মা—দাবনা।" "এই তোর নাম কিরে ?"

"আমাম্মা—ম্—লক্ষ্মী—হ—" দাঁত মুখের কি বিকট ভঙ্গী। হায় সেতো স্বেচ্ছায় করে নাই, এ যে বিধাতার দান— কর্ম্মফল, এও তার অপরাধ ?

উত্তরে দুরন্ত বালক ছুটিয়া আসিয়া বলিল "ভ্যাংচাচ্ছিস ? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।" বলিয়া ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী তা সামলাইতে না পারিয়া নর্দ্দমায় পড়িয়া গেল। নর্দ্দমায় গভীর খাত, তাতে কাদা কাদা জল।

উন্মাদিনী মণিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিল—পারিল না। শূলী ও তল্লীকে ডাকিল।

তিনজনে বহুকষ্টে অচৈতন্যা লক্ষ্মীকে টানিয়া পাড়ে তুলিল। যেন কাদায় গড়া সংমূর্ত্তি। শিশি ভাঙ্গা কাচ গায়ে ফুটিয়া জমাট রক্ত কাদায় মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

মণিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, কেউ সাড়া দিল না। দুই একজনের চোখে পড়ায় তারাও অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "ওর দফারফা। গ্যাছে তো গ্যাছেই; নুলো মেয়েটার জন্য এত দরদ!"

হায়রে!—মায়ের কাছে নুলো আর সুস্থ?

অঙ্গহীন, অকেজোও যে মায়ের কাছে মাণিক!

প্রতিবাদে তার বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল নুলো হইলেও সে রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তারও ব্যথা, বেদনা, অনুভূতি আছে।

* * *

তারপর অনেক বছর কাটিয়া গিয়াছে। তল্লী আর লক্ষ্মী তাহাকে ভাবনা হইতে মুক্তি দিয়া অনেক দূরে কোন অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

শূলীর বিবাহ হইয়াছে এক মাতালের সঙ্গে। খাবার যোগাড় করিতে না হইলেও শূলীর ভাবনা ভাবিয়া আজও তার চোখে জল আসে।

শীতের সন্ধ্যা! মেটে পাতিলের আগুনে মণিয়া তার কর্ম্মক্লান্ত শীতল দেহ উষ্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল।

সহসা কে আসিয়া নীচু হইয়া প্রণাম করিল।

মণিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল—শূলী! এতক্ষণ শূলীরই ভাবনা ভাবিতেছিল, অনেক দিন তার সহিত দেখা নাই। শূলীকে পাইয়া আনন্দে মনটা সজীব হইয়া উঠিল।

"উঃ! এত রোগা শুকনো কেনরে?" শূলীর নিরুত্তর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া মণিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল "ওকি শূলী! তোর কাপড়ে ও কিসের দাগ? শূলী সেস্থান সামলাইয়া লইতে যাইতেছিল, মণিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল "শূলী! হতভাগী! সবাই আমায় মুক্তি দিয়েছে, তুই কেন দিলিনে?" শূলী অবাক হইয়া গেলো। যে মা নুলো রুগ্না মেয়েকে বাঁচাইবার জন্য জীবন পণ করিয়াছিল তাঁর মুখে আজ একি বাণী?

শূলীর কপালের রক্ত মণিয়ার হাত বহিয়া পড়িতে লাগিল।

অশ্রু সজল কণ্ঠে মণিয়া কহিল "এমনি রোজই মারে বুঝি?"

দরদর ধারায় রক্ত ঝরিয়া পড়িল। "হায়! হতভাগী, কেন তোকে ডাকাতের হাতে দিয়েছিলুম্। আর তোকে যেতে দেবনা—আট টাকার জায়গায় চৌদ্দ টাকা হয়েছে। আমাদের কিসের অভাব শূলী?"

অজস্র রক্তপাতে শূলীর ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীর আরো দুর্ব্বল হইয়া মায়ের বুকে ঢলিয়া পড়িল।

* * *

শূলীও তাকে মুক্তি দিতে বসিয়াছে। রুগ্না শূলীর শিয়রে বসিয়া সে কত কী ভাবিতেছিল।

ভাবনার শেষ নাই। সেই নর্দ্দমায় পতিতা লক্ষ্মীর ভাঙ্গা হাতখানি!

উঃ! সে যে কি কষ্ট কি যাতনায় রাত্রিদিন মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে স্বেচ্ছায় মুক্তি পাইতে চাহিয়াছিল তাই বুঝি ভগবান তাহাকে মুক্তি দিয়াছিল, সেইটী জানিয়াও আজ আবার মুখ দিয়া সেই কথাটী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যার জন্য অভিমানে শূলীও তাকে মুক্তি দিতে বসিয়াছে।

হায় ভগবান! মুখের কথাটীকে সত্য সত্যই সত্যে পরিণত করিবে? সে যে কত বড় দুঃখে অশান্তিতে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে সেইটা একবার ভাবিয়া দেখিলে না? সেওতো মানুষ, কত সইবে?

তাই বা কেন? তল্লী তাহাকে মুক্তি দিক। এ কথাটা ভুলেও মুখ দিয়া বাহির হয় নাই তবে তাকেই বা ভগবান তুলিয়া নিলেন কেন?

"আমায় মেরোনা গো!—মেরোনা!"

"শূলী, কি বল্‌ছিস মা?—আর আমি ওখানে পাঠাব না, তুমি সেরে ওঠো।"

শূলী মায়ের কথা শুনিল কি না কে জানে! সে তখন প্রলাপের মাথায় উত্তর করিল "মা! আমাকে দিদি ডাকছে।"

ওপারের ডাক আসিয়াছে। শেষবার মা বলিয়া মায়ের কোলে শূলী জন্মের মত চোখ বুজিল।

মণিয়া আর্ত্ত চীৎকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "অনেক হয়েছে গো! অনেক হয়েছে—এখনো কি আমার পাপের ভোগ ফুরোয় নি? ওগো! বলগো বল কোথায় তুমি "কত দূরে?"



বার্ত্তাবাহী

(একাঙ্ক নাটিকা)

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর বি, এ

—ঃ পরিচয় ঃ—

বাগানে—

জনৈক বৃদ্ধ

জনৈক অপরিচিত

উষা }
আভা } বৃদ্ধের পৌত্রীদ্বয়

জনৈক চাষা

জনতা

গৃহমধ্যে—

জনৈক গৃহস্বামী
ঐ পত্নী
গৃহস্থের দুই কন্যা
ও
শিশুপুত্র
} নির্ব্বাক চরিত্রাবলী

[অনেক দিনের পুরাণো একটি বাগান। পিছন দিকে একটি বাড়ী, নীচের তলের তিনটি খোলা জানালা দিয়ে বাহিরে আলো এসে পড়েছে, ঘরের মধ্যে আলোর চারিদিক ঘিরে একটি পরিবার বসে আছে—বাহির হতে তাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার ভাবে। পিতা বসে আছেন অগ্নিকুণ্ডের পাশে, মাতা টেবিলের উপর হাত রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনের পানে। শুভ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত দুটি মেয়ে চুপ করে বসে সেলাই করছে, তারা হাসছে যেন স্বপ্ন দেখছে জেগে জেগেই। ঘরটি শান্তিপূর্ণ। মায়ের কোলে একটি শিশুপুত্র ঘুমুচ্ছে, একটি মেয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পদচারনা করতে লাগলো ধীরে ধীরে—তার ভাবে যেন কোন সুদূরের আহ্বান। জানালার শার্শীগুলো ঝক্ ঝক্ করছে উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হয়ে]

(জনৈক বৃদ্ধ এবং জনৈক অপরিচিত বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলো সন্তর্পনে)

বৃদ্ধ। এইটাই বাড়ীর পিছনকার বাগান, ওরা এখানে কখনও আসে না। ওদের প্রবেশ দ্বার ওদিকে। ওদিককার দরজা বন্ধ, এদিকটা খোলা—ওই আলো দেখা যাচ্ছে।...হাঁ, ওরা আলো জেলে বসে আছে। আমরা এসেছি জানতেও পারেনি, ওদের মা এখুনি হয়তো বাহিরে আসবে তাহ'লে আমরা কি করবো?

অপরিচিত। আমাদের কি করতে হবে?

বৃদ্ধ। দেখি, ওদের সকলেই ঘরের মধ্যে আছে তো! —হ্যাঁ, ওদের পিতা আগুনের ধারে বসে আছেন হাঁটুর উপর হাত রেখে—মাও বসে আছেন টেবিলের উপর হাত রেখে...

অপরিচিত। ওদের মা আমাদের দিকে চেয়ে আছেন।

বৃদ্ধ। না, উনি দেখছেন না কিছুই, তাকিয়ে আছেন শূন্যদৃষ্টিতে শুধু। দেখতেও তিনি আমাদের পাবেন না, একটি বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি যে আমরা। কিন্তু আর কাছে যেও না......ওই—ওরা দু'জন মৃতা মেয়েটির বোন্—ওরা সেলাই করছে ধীরে ধীরে, শিশুটি ঘুমিয়ে পড়েছে, ওই দেওয়ালের কোণের ঘড়িটায় ন'টা বেজেছে... কোন দুর্ঘটনার কল্পনাও ওরা করতে পারে নি, আর ওরা কথাও কইছে না।

অপরিচিত। আমরা কোন রকম ঈসারা করে ওদের

পিতাকে ডাকিনা কেন?—উনি তো এদিকে মুখ ফিরিয়েছেন, একটি জানালায় গিয়ে আঘাত করবো? সকলের আগে একজন তো শুনতে পাবে……

বৃদ্ধ। কি করবো, তা এখনও ঠিক জানি না…… আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে।—ওদের পিতামাতা দুজনেই বৃদ্ধ এবং রুগ্ন—বোন দুটিও বালিকা মাত্র।……ওরা সকলেই তাকে ভালো বাসতো খুবই। এমন সুখী পরিবার এর আগে আমি দেখিনি কখনও……না না জানালার কাছে যেও না। ওদেরকে সাদাসিদে ভাবে কথাটা বলে ফেলাই আমাদের ভালো যেন অতি সাধারণ একটি ঘটনা ঘটেছে। আমরা শোকার্ত্ত হয়েছি এ ভাব যেন ওদের কাছে না দেখাই, তা'হলে তারা মনে করবে তাদের দুঃখ আমাদের চেয়েও বেশী হওয়া উচিৎ তাই তারা আরও শোকার্ত হয়ে পড়বে। চল আমরা দরজায় গিয়ে knock করিগে—যেন বিশেষ কিছুই ঘটেনি! আমিই প্রথমে ঘরে ঢুকবো। আমাকে দেখলে ওরা অবাক হবে না মোটেই, কেননা আমি এখানে প্রায়ই আসি গল্প গুজব করতে।

অপরিচিত। তা'হলে আমি এখানে অপেক্ষা করি, ওরা তো আমায় কখনো দেখেনি!

বৃদ্ধ। না, আমার একা যাওয়াটা ভালো দেখাবে না। সামান্য দুটো কথায় শোনা শোক-সংবাদ কি দারুণ তুমি তা' জানো না। আমি সমস্ত পথটা এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এসেছি—আমি যদি একা যাই তা'হলে প্রথমে আমাকেই কথা বলতে হবে, সামান্য ক'টা কথায় ওরা সব বুঝতে পারবে, তখন আমি কি বলবো!—একটা অসহ্য স্তব্ধতা, তারপর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস!—না না, তখন সেখানে আমি একলা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না, আমার হৃদয় তা'হলে বিদীর্ণ হয়ে যাবে! তারচেয়ে আমদের দুজনের যাওয়াই ভালো, অনেক বাজে কথার মাঝে এই খবরটা বলবো, নানা বাজে কথার মধ্যে এই মর্ম্মান্তিক শোকটা অনেকটা হাল্কা হয়ে যাবে। একবার ভেবেছ—আমি একা গেলে আমার প্রথম কথাটা কি ভীষণ শোনাবে! কিন্তু আমরা দুজনে গিয়ে নানা বাজে কথার ফাঁকে কথাটা বলবো তা'হলে এই নিদারুণ শোক একেবারে ওদের বুকে গিয়ে লাগবে না, তার তীব্রতা অনেকটা লঘু হয়ে যাবে বাজে কথার মাঝে।—তাইতো শোকদুঃখের সময় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গল্প গুজবে মেতে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজেকে নিঃসঙ্গ করে রাখলে শোক বুকের মাঝে গুমরে ওঠে—বুকটাকে বিদীর্ণ করে দেয়। আমি তো এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি—তোমার কাপড় ভিজলো কি করে কোমর পর্য্যন্ত—

অপরিচিত। আমি এক কোমর জলে নেমেছিলুম যে।

বৃদ্ধ। আমার কতক্ষণ আগে তুমি ওকে দেখেছিলে?

অপরিচিত। একটু আগে। আমি ওই গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। অস্তগামী সূর্য্যের লালিমা তখন নদীর বুকে ঝলমল্ করছিল; নদীর সেই সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো, কাছে গিয়ে দেখি তার এলোমেলো চুলগুলো ভাসছে।

[ঘরের মধ্যে দুটি মেয়ে জানালার দিকে ফিরলো]

বৃদ্ধ। ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখ তার বোন দুটির চুলও কেমন ঘাড়ের ওপর নাচছে যেন।

অপরিচিত। ওরা যে এই দিকেই চাইছে দেখছি—আমি বোধ হয় জোরে কথা বলছিলুম।

[মেয়ে দুটি মুখ ফিরিয়ে সেলায়ে মগ্ন হোল]

ওরা আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কি বলছিলুম—হ্যাঁ, তারপর আমি কোমর পর্য্যন্ত জলে নেমে তার হাতদুটি ধরে পারে নিয়ে এলুম—সেও ছিল ঠিক এই মেয়ে দুটির মতই সুন্দরী!

বৃদ্ধ। সে এদের চেয়েও বেশী সুন্দরী ছিল বলে আমার মনে হয়। কিন্তু আমি যেন ক্রমেই সাহস হারিয়ে ফেলছি।

অপরিচিত। সাহসের কথা কি বলছেন? মানুষে যা করতে পারে তা আমরা করেছি; আমি দেখবার প্রায় ঘণ্টা খানেক আগে তার মৃত্যু ঘটেছিল।

বৃদ্ধ। আজ সকালেও সে ছিল। সে যখন গির্জ্জা থেকে বাইরে আসছিল তখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বল্লে সে আজ নদীর ওপারে যাবে মামার বাড়ীতে। হায়রে! তখন কি সে জানতো যে আমার সঙ্গে তার সেই শেষ দেখা! তার চোখের পানে তাকিয়ে মনে

হয়েছিল কি যেন সে বলতে চেয়েছিল আমাকে কিন্তু সাহস করে নি।

অপরিচিত। ক'জন চাষা আমায় বল্লে যে সারা বিকেলটা ওই মেয়েটিকে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে তারা দেখেছে; তারা ভেবেছিল বোধ হয় সে নদীর শোভা দেখছে, কিন্তু ওই নদীতেই যে সে—

বৃদ্ধ। না—না, কি করে তার মৃত্যু ঘটেছে তা কেউ বলতে পারবে না। লোকে জানবে কি করে! মানুষের জীবনের স্পন্দন অনেক রকমেই তো থেমে যেতে পারে! ওই ঘরের ভিতরটা যেমন ভাবে তুমি দেখতে পাচ্ছ বুকের ভিতরটা তো তেমন করে দেখতে পাও না!—সকলেই তোমার আমারই মত শুধু অন্ধকারেই ঘোরে। মানুষের সামর্থ্যই বা কতটুকু! সুখের স্বপ্নই শুধু তারা দেখতে জানে! বহুদিন ধরে যার সঙ্গে তুমি বাস করেছ, সে আজ আর নেই। তার আদরের নাম ধরে যতই ডাকাডাকি করনা কেন—কোন ফল হবে কি?—জগৎটাই এই! কেউ কিছু নয়—কেবল কতকগুলো প্রাণহীন পুতুল, নিজেকেই তার চেনেনা, নিজেদের বুকের ওপর দিয়ে কত কি ঘটে যাচ্ছে তা তারা জানেনা!—যে আজ মরেছে সে হয়তো কাল একটা শুকনো ফুলের পানে তাকিয়ে তার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে!

অপরিচিত। দেখুন, ঘরের ভিতর ওরা হাসছে।

বৃদ্ধ। ওদের দুর্ভাবনা হয়নি মোটেই, আজতো তার ফিরে আসবার কথা নেই।

অপরিচিত। ওরা সব চুপ করে বসে আছে, ওদের বাবা মুখে হাত দিয়ে বসে আছেন।

বৃদ্ধ। উনি স্ত্রীর কোলের ঘুমন্ত ছেলেটির পানে চেয়ে আছেন।

অপরিচিত। আর ওঁর স্ত্রী, পাছে ছেলেটির ঘুম ভেঙ্গে যায় বলে মাথাটি তুলতে সাহস করছেন না।

বৃদ্ধ। মেয়েদুটিও হাতের কাজ বন্ধ করেছে—এখন সব চুপচাপ!

অপরিচিত। ওদের হাতের জামাগুলোও নামিয়ে রেখেছে।

বৃদ্ধ। সকলে শিশুটির পানে চেয়ে আছে।

অপরিচিত। ওরা জানেনা আমরা ওদের পানে এমন করে দেখছি।

বৃদ্ধ। আবার আমাদের ওপরও আর একজন চেয়ে আছেন।

অপরিচিত। ওই, ওরা এদিকে চাইছে—

বৃদ্ধ। কিন্তু ওরা কিছুই দেখতে পাবে না।

অপরিচিত। মনে হচ্ছে ওরা বেশ সুখেই আছে—তবু যেন কেমন একটা থম্‌থমে ভাব!

বৃদ্ধ। ওরা ভেবেছে ওরা বুঝি সব বিপদের বাইরে—দরজা বন্ধ, লোহার গরাদ দিয়ে জানালা তৈরী, ঘরের দেওয়ালগুলোও শক্ত, দরজার খিলটাও বেশ মজবুত।—আগে থেকে যতটা সাবধান মানুষ হতে পারে তা ওরা হয়েছে কিন্তু—

অপরিচিত। আগেই হোক আর পরেই হোক আমাদের তো বলতেই হবে। কেউ হয়তো এখুনি এসে হঠাৎ ওদের খবর দেবে। মেয়েটির শবটিকে ঘিরে একদল চাষা জড়ো হয়েছিল তাদের কেউ এসে এখনি হয়তো দরজায় ধাক্কা দেবে—

বৃদ্ধ। উষা ও আভা শবের কাছে আছে। চাষারা প্রথমে একটা মাচার মত তৈরী করবে তারপর তারা আসবে। উষাকে বলে এসেছি তারা আসবার আগেই সে যেন আগে এসে আমায় খবর দেয়। উষার না আসা পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো—সেও যাবে আমাদের সঙ্গে। [কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে] দেখ, এমন ভাবে সুবিধে হবে না, এর চেয়ে ওদের কাছে গিয়ে অল্পকথায় একেবারে সব বলে ফেলাই যেন ভালো!

[উষার প্রবেশ]

উষা। দাদাভাই, ওরা আসছে।

বৃদ্ধ। এখন কতদূরে?

উষা। যেখানে রাস্তাটা নেমে গেছে—ওই খানটায়।

বৃদ্ধ। বেশ নিঃশব্দে আসছে তো!

উষা। আমি ওদের চুপিচুপি আসতে বলেছি, আভা ওদের সঙ্গেই আসছে।

বৃদ্ধ। সঙ্গে অনেক লোক আছে ?

উষা। সারা গাঁয়ের লোক ওদের সঙ্গে আসছে। সঙ্গে আলোও আছে—আমি নিভিয়ে দিতে বলেছি।

বৃদ্ধ। কোন্ দিক দিয়ে তারা আসবে ?

উষা। তারা ওই সরু পথটা দিয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

বৃদ্ধ। কতক্ষণে তারা এসে পড়বে ?

উষা। ওদের খবর দিয়েছ, দাদাভাই ?

বৃদ্ধ। না, এখনও তাদের কিছু বলিনি, এখনও ওরা আরামে আগুন পোহাচ্ছে! দেখলেই বুঝতে পারবে জীবন—

উষা। আহা, এখনও ওরা কত শান্তিতেই না আছে—মনে হচ্ছে যেন ভুল দেখছি।

অপরিচিত। দেখ, মেয়েদুটি উঠে দাঁড়িয়েছে।

উষা। হ্যাঁ, বোন দুটি উঠেছে।

অপরিচিত। ওরা জানালার কাছে আসছে বোধ হয়!

[দুটি বোন দু পাশের জানালায় এসে দাঁড়ালো।
দুজনেই বাহিরের অন্ধকারের পানে
তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে]

বৃদ্ধ। মাঝের জানালায় কেউ এল না ?

উষা। দু'জনে বাহিরের পানে চেয়ে আছে। হয়তো ওরা শুনছে—

বৃদ্ধ। বড় বোনটি হাসছে—

অপরিচিত। ছোটটির চোখে ভীতিব্যাকুল দৃষ্টি---

বৃদ্ধ। কে বলবে আত্মা দেহের কতখানি অধিকার করে থাকে—

[দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। উষা বৃদ্ধের কোলে মাথা রাখলো]

উষা। দাদাভাই !

বৃদ্ধ। কেঁদোনা দিদি—লক্ষ্মিটি! কাঁদবার পালা আমাদের হয়তো একদিন আসবে।

[আবার নিস্তব্ধতা]

অপরিচিত। মেয়ে দুটি অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে—

বৃদ্ধ। যদি শত শত বছরও এম্নিভাবে ওরা চেয়ে থাকে তাহলেও এই অন্ধকারের মধ্যে ওরা দেখতে পাবেনা কিছুই। ওরা চেয়ে আছে এদিকে কিন্তু ওদের বিপদ ঘনিয়ে উঠছে অন্যদিকে।

অপরিচিত। ওই পাহাড়ের ধার দিয়ে কারা যেন এদিকে আসছে।

উষা। ওরাই বোধ হয় শব নিয়ে আসছে—দূর থেকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

অপরিচিত। ওরা যখন পথের ওই উঁচু জায়গাটায় আসবে, চাঁদের আলোয় তখন সবই দেখতে পাওয়া যাবে স্পষ্ট করে।

উষা। অনেক লোক আসছে। আমি যখন এলুম তখনও নতুন নতুন লোক এসে জড়ো হচ্ছিল। অনেকখানি পথ ওরা ঘুরে আসছে।

বৃদ্ধ। শেষ পর্য্যন্ত ওরা এসে পৌঁছবেই। ওদের আমি দেখতে পাচ্ছি ওই পাহাড়টার কাছে—ছোট ছোট পুতুলের মত দেখাচ্ছে, যেন কতকগুলো পুতুল চাঁদের আলোয় নাচছে। ওদের দেখলেও মেয়ে দুটি কিছুই বুঝতে পারবে না—বিপদ এগিয়ে আসছে কেউ তাকে থামাতে পারবে না। শত বাধার মধ্য দিয়েও বিপদ আসবে, যারা বিপদ নিয়ে আসছে, তারাও ওকে থামাতে পারবে না—তাদের ব'য়ে নিয়ে যেতেই হবে। নিজের পথ অদৃষ্ট নিজেই তৈরী করে নেয়।

উষা। দাদাভাই, দেখ বড় মেয়েটি আর হাসছেনা।

অপরিচিত। ওরা চলে গেল জানালা ছেড়ে।

উষা। ওরা মায়ের কাছে গেছে।

অপরিচিত। বড় মেয়েটি ঘুমন্ত শিশুটির গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ওদের বাবা ঘড়িটার পানে চেয়ে আছে।

উষা। দাদাভাই, আজ ওদের বলো না।

বৃদ্ধ। তুমি ক্রমশই সাহস হারাচ্ছ—ওদিকে আর চেয়োনা। এই আশী বছর বয়সে আজ আমি জীবনের সত্য বুঝতে পারলুম এই প্রথম। আর সকলের মত শীতকালে ওরাও আগুন পোহাচ্ছে, কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে ওরা এ জগতের নয়। এর চেয়ে রহস্য জীবনে আর কি

আছে! ঘরের দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে ওরা বসে আছে, মনে করেছে দরজা বন্ধ করলে বিপদ আর আসতে পারবে না। কিন্তু জগৎ তো আর ওদের ওই ঘরটার মধ্যেই শেষ হয় নি। ওরা জানেনা আমি বিপদের খবর এনেছি—ওদের দরজা থেকে কতটুকুই বা দূরে! ওদের অবিচ্ছিন্ন শান্তিটুকু আমিই আজ আড়াল করে আছি আহত পাখীকে হাতের মধ্যে ধরে থাকার মত; ছেড়ে দিতে ভয় হচ্ছে!

উষা। আজ আর বলোনা দাদাভাই, ওদের ওপর একটু করুণা কর—

বৃদ্ধ। ওদের উপর আমরা করুণা করতে পারি ভাই, কিন্তু আমাদের উপর তো কেউ করুণা করবে না।

উষা। কাল বলো দাদাভাই—সকাল হলে সূর্য্য উঠলে তারপর বলো, তা'হলে ওদের তত কষ্ট হবে না হয়তো।

বৃদ্ধ। সত্যি দিদি, আজ রাতে ওদের এসব না বললেই হয়তো ভালো হয়! দিনের শোক লঘু হয়ে ওঠে, কিন্তু তা'হলে ওরা আমাদের বলবে কি? শোকসংবাদ সামান্য কারণেই মানুষকে ক্ষুব্ধ করে। যাদের কারুর মৃত্যু হয় তারা সকলের আগেই সে খবরটা জানতে চায়, অন্য লোক তাদের আগে জানলে তাদের কষ্ট হয় আরও বেশী।—শোকটাকে তারা সম্পূর্ণ নিজের করে রাখতে চায়! আজ এ খবর যদি ওদের না দি, তা'হলে ওরা মনে করবে ওদের সর্ব্বস্ব বুঝি আমি চুরি করে রেখেছিলুম।

অপরিচিত। গোপন করবার সময়ও নেই আর। শববাহকদের গুঞ্জনধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি।

উষা। ওরা পাহাড়ের নীচে এসে পড়েছে।

[আভার প্রবেশ]

আভা। আমি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলুম দাদাভাই, ওই পাহাড়ের নীচে ওদের অপেক্ষা করতে বলে এসেছি। ওর হাতের আংটিটা আমি নিয়ে এসেছি। তাকে মাচার উপর এম্নিভাবে শুইয়ে দিয়েছি যেন ঘুমুচ্ছে। ফুলের মালা দিতে পারলুম না, ওখানে তো ফুল পাওয়া গেল না। চুলগুলো এত এলোমেলো যে কিছুতেই সেগুলোকে গোছাতে পারলুম না। তোমরা এখানে কি করছো?—ওদের কাছে বসনি কেন? [জানালার মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতরটা লক্ষ্য করে] ওরা ত কেউ কাঁদছে না—এখনও ওদের বলনি বুঝি?

বৃদ্ধ। এখনও তুমি ছোট মেয়ে আভা, আনন্দপূর্ণ তোমার প্রাণ! তুমি বোঝ না।

আভা। কেন বুঝবো না আমি? [কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে] কিন্তু এতো ভালো করনি দাদাভাই!

বৃদ্ধ। তুমি জানোনা আভা—

আভা। আমি যাই তা'হলে, আমি ওদের বলবো—

বৃদ্ধ। একটু দাঁড়াও, ওদের পানে একবার চেয়ে দেখ!

আভা। কিন্তু আর তো চুপ করে থাকবার সময় নেই!

বৃদ্ধ। কেন?

আভা। তা' জানি না, কিন্তু তা' অসম্ভব!

বৃদ্ধ। এখানে এস আভা—

আভা। ওরা এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে যে—

বৃদ্ধ। ফিরে এস আভা—

আভা। [ফিরে দাঁড়িয়ে] তুমি কই দাদাভাই? আমার মাথা ঘুরছে, তোমায় তো দেখতে পাচ্ছিনি! কি করবো দাদাভাই, কিছুই তো আমি ঠিক করতে পারছিনি!

বৃদ্ধ। ওদের পানে আর চেয়ো না, যতক্ষণ না ওরা সব শুনছে—

আভা। তোমার সঙ্গে যাবো আমি দাদাভাই!

বৃদ্ধ। না দিদি, তুমি এখানেই থাকো। তোমার দিদির পাশে ওই পাথরটার উপরে বসো—ওদিকে চেয়ো না। তোমরা ছেলেমানুষ, এ দৃশ্য দেখলে কখনো ভুলতে পারবে না। তোমরা জাননা চোখে যখন মৃত্যুর ছায়া পড়ে, মানুষের মুখের ভাব তখন কেমন হয়। ওরা কেঁদে উঠবে হয়তো,—তবু ওদের পানে তাকিয়ো না। না হলে হয়তো কোন শব্দই হবে না ওখানে—যদি কোন শব্দই না হয় তা'হলেও ওদিকে তাকিয়ো না, সাবধান! শোকে মানুষকে কতখানি ব্যাকুল করে তোলে আগে থেকে কেউ তা বলতে পারে না, কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভিতর থেকে—তাতেই সব শেষ হয়ে যায় সাধারণতঃ!

[পাহাড়ের নীচ থেকে শববাহকদের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি ভেসে এল। কজন লোক বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলো তাদের কথা ও পদশব্দ শোনা গেল]

অপরিচিত। [লোকগুলোর প্রতি] জানালার কাছে যেও না, ওখানে দাঁড়াও, শীগ্‌গির।

অনেক চাষা। ওপারের পথ ধরে তারা দরজার দিকে গেছে।

[বৃদ্ধের প্রস্থান]

[উষা ও আভা পাথরের উপর বসলো। লোকগুলোর মধ্যে অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি হতে লাগলো]

অপরিচিত। [লোক গুলোর প্রতি] চুপ, কথা বলো না।

[ঘরের ভিতরে বড় মেয়েটি উঠে দরজার কাছে গিয়ে খিলটি ভালকরে দেখে এল]

আভা। ওরা দরজা খুলছে।

অপরিচিত। খুলছে না, বন্ধ করছে।

[নিস্তব্ধতা]

আভা। দাদাভাই এখনও ঘরের মধ্যে যায় নি ?

অপরিচিত। না। সে মেয়েটি দরজা বন্ধ করে এসে মায়ের কাছে বসেছে।

[নিস্তব্ধতা]

আভা। দিদি, তোমার হাতটা দাও।

উষা। ভয় কর ? আভা ?

[দু'বোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো]

অপরিচিত। তোমাদের দাদাভাই বোধ হয় দরজায় ধাক্কা দিয়েছেন—সবাই চমকে উঠে দরজার দিকে চেয়ে পরস্পরের মুখের পানে চাইছে।

আভা। দিদি আমার কান্না পাচ্ছে—

[উষার বুকে মুখ রেখে আভা কেঁদে উঠলো]

অপরিচিত। বোধ হয় আবার ধাক্কা দিয়েছেন, ঘড়িটার পানে একবার তাকিয়ে ওদের বাবা দরজার পানে এগিয়ে যাচ্ছেন—

আভা। দিদি, আমিও যাই দিদি—

উষা। না, না আভা

[জোর করে আভাকে ধরে রাখলো]

অপরিচিত। ওদের বাবা এবার খুব সাবধানে দরজা খুলে দিচ্ছে—

আভা। আপনি ওদের দেখতে পাচ্ছেন ?

অপরিচিত। কাদের ?

আভা। যারা শব আনছে ?

অপরিচিত। না। দরজাটা উনি একেবারে খোলেননি, একটু ফাঁক করেছেন মাত্র। আমি ওই উপত্যকার খানিকটা অংশ আর ঝর্ণাটা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছিনি। দরজার ফাঁক দিয়ে তোমাদের দাদাভাইকে দেখে ওদের বাবা বল্লেন—'ওঃ আপনি।' তোমাদের দাদাভাই ঘরের মধ্যে এলেন, ওদের বাবা দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলেন।

[লোকগুলো জানালার কাছে গেল, উষা আর আভাও গেল জানালার কাছে। বৃদ্ধকে ঘরের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। মা উঠলেন ঘুমন্ত শিশুটিকে ভাল করে শুইয়ে রাখলেন; মেয়েগুটিও উঠলো। একটি মেয়ে বৃদ্ধকে বসতে বললো, বৃদ্ধ বসলো না, জানালার পানে তাকিয়ে রইলো। গৃহকর্তা বৃদ্ধকে এমন অসময়ে আসতে দেখে বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে রইলো]

অপরিচিত। তোমাদের দাদাভাই বলতে সাহস করছেন না, আমাদের দিকে চেয়ে আছেন—

[লোকগুলো অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি করে উঠলো]

চুপ।

[লোকগুলোকে দেখে বৃদ্ধ জানালার দিক হতে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। শেষে বসলেন হাতের উপর মাথা রেখে]

তোমাদের দাদাভাই বসেছেন।

[ঘরের ভিতরে সকলেই বসলো, তারপর বৃদ্ধ বলতে আরম্ভ করলেন—হঠাৎ ঘরের ভিতরে সকলেই চমকে উঠলো]

আভা। এইবার দাদাভাই বল্লেন বুঝি—

[জানালার কাছ থেকে সরে এসে দুহাতে সে মুখ ঢাকলো]

অপরিচিত। চুপ। এখনও বলেন নি।

[ঘরের ভিতরে মা প্রথমে বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলেন কেমন যেন সন্দিগ্ধভাবে, তার পর ঘরের ভিতরে সকলেই বৃদ্ধকে প্রশ্ন করতে লাগলো। বৃদ্ধ কয়েকটি কথা বললেন, শেষে মাথা হেলিয়ে জানালেন—হ্যাঁ]

এইবার উনি সব বলে ফেলেছেন—এককথায় সব বলে ফেললেন।

সকলে। বলে ফেলেছেন—বলে ফেলেছেন—

অপরিচিত। আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

[ঘরের ভিতর বৃদ্ধ উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে দরজার কাছে গেল। গৃহস্বামী কম্পিত হস্তে দরজা খুলে দিলেন। ছুটে বাহিরে চলে যাচ্ছিলেন, বৃদ্ধ বাধা দিলেন।

সকলে। ওরা বাইরে আসছে—

[বাগান থেকে বাহির হয়ে সকলে গেল দরজার দিকে, শুধু অপরিচিত লোকটিই দাঁড়িয়ে রইলো জানালার কাছে।

ঘরের ভিতরের সকলেই বাহিরে চলে গেল, শুধু ঘুমন্ত শিশুটি ঘুমাতে লাগলো। অসীম আকাশের বুকে নক্ষত্রগুলো ঝল্‌মল্‌ করছিল, চাঁদের আলোয় পাহাড়ের বুকে ঝর্ণাটি আগের মতই বয়ে যাচ্ছিল তেমনি ঝির ঝির করে সুন্দর ভাবে]

অপরিচিত। শিশুটি ঘুমোচ্ছে এখনও আগের মতই!

[তিনিও চলে গেলেন] *

—o—

বেকার সমস্যা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

চন্দ্র

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে নন্দরাণী দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল—রাস্তার ওপর একখানা মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে, দুজন লোক অজামিলকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে।

স্বামীর তাদৃশ অবস্থা দেখে নিস্তারিণী একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ ক'রে দরজার কপাট দুখানা একেবারে খুলে ফেলে, চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—"এই দিন দুপুরেও শান্তি নেই। হায়!—লজ্জা ব'লে কি একটা পদার্থও তোমার নেই—

অজামিল মাথাটা একটু উঁচু ক'রে কি বলতে গেল, কিন্তু—পরমুহূর্ত্তেই তার মাথাটা আবার নেতিয়ে পড়ল।

যারা তাকে ধরা-ধরি করে আনছিল তাদের একজন বলল—"কিছু ভয় নেই মা—বিশেষ আঘাত লাগেনি—সামান্যই—"

"উঃ—মাঃ—বাবারে"—অজামিল গোঁঙাতে লাগল। নিস্তার আঘাতের কথা শুনে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল—"ব্যাপার কি?—কি হয়েছে?"

"বিশেষ কিছুই নয়—মোটরের একটু ধাক্কা লেগে বাবু—" লোকটার মুখের কথা শেষ হবার আগেই নিস্তার চীৎকার করে উঠল—"হ্যাঁ—মোটর চাপা—ওরে বাবা—কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো—ওগো আমি কোথায় যাব গো—"

চীৎকার শুনে বাড়ীর জগন্নাথ বেরিয়ে এসে বলল—"কি—কি—কি হয়েছে বৌদি—একি অজাদার এ অবস্থা কেন—খুব মদ খেয়েছে বুঝি—?"

* মেতারলিঙ্কের Interior এর অনুবাদ।

"ওগো না গো না—মদ খাওয়া যে ছিল ভাল—এযে একেবারে সাক্ষাৎ যম রে বাবা—"

সঙ্গের লোকটি বলল—"আপনি অধীর হবেন না,আঘাত সামান্যই লেগেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ডাক্তার দেখেছেন পিঠে একটু ধাক্কা লেগেছে—দু এক দিনেই সেরে যাবে। উনি কিছুতেই হাসপাতালে থাকতে রাজী হলেন না, তাই বাবু নিজের গাড়ী করে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।—দুদিন হাসপাতালে থাকলেই আরাম হয়ে বাড়ী ফিরতে পারতেন, কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না, বললেন আমি মরি যদি তবে বাড়ীতে আমার স্ত্রীর কোলে মাথা রেখেই মরব—তাই—"

নিস্তার এবার গলা ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌ল—"ওগো এমনি ভালবাসাই আমাকে বাসে গো—"

অজামিল কাতরকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—"না—না—হাস-পাতাল নয়—পা কাটবে—পিঠ কাটবে—মরে যাব—মরে যাব—আমি বাড়ী যাব আমি নিস্তারের কাছে যাব—"

"এই যে গো আমি তোমার পাশেই রয়েছি—তুমি কথা বোলনা গো—"

ধরাধরি ক'রে অজামিলকে তার শয্যায় শুইয়ে দিয়ে লোকটা বলল—"কোন চিন্তা করবেন না আপনারা,—বাবু ডাক্তার খরচ যা লাগে সবই দেবেন। তা ছাড়া—যে কদিন ওঁর কাজকর্ম্ম কামাই হয়—তাও পুষিয়ে দেবেন। বাবু তাঁর নিজের বড় ডাক্তারকেও পাঠিয়ে দেবেন—। খুব ভাল লোক—বড়লোক—আপনারা একটুও ব্যস্ত হবেন না—কালকের মধ্যেই উনি আরাম হয়ে উঠ্‌তে পারবেন।"

লোকটা যাবার সময় দশটা টাকা নিস্তারের হাতে দিয়ে নমস্কার করে বলে গেল—"কাল বাবু হয়ত' নিজেই ডাক্তার সঙ্গে করে আসবেন। আপনারা একটুও ভাববেন না।"

লোকটা চলে গেলে নিস্তার কম্পিত কণ্ঠে বলল—"হাঁগো উঠে বসতেও পারছ না?"

অজামিল বিকৃত কণ্ঠে বলল—"উঃ নিস্তার আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না—তার চেয়ে ঐ জগন্নাথকে দিয়ে মোড়ের বিধু ডাক্তারকে বরং ডেকে পাঠাও—"

"ঐ ছোঁড়া ডাক্তার—"

"আঃ যা বলছি, নিস্তার তাই কর,—আমাকে আর জালিওনা—শুনছো?"

"কিন্তু—"

"আবার বলে কিন্তু—বলি উঠ্‌বো?—জান রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না—উঠ্‌বো নাকি?" বলতে বলতে অজামিল উঁচু হয়ে উঠে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল—"যাও বলছি—যা বলছি তাই কর—"

"এই না বললে তোমার পিঠের শিরদাড়া ভেঙে গিয়েছে—"

"বলি ভাঙলেই কি বাঁচতে"—বলতে বলতে অজামিল পুনরায় বিছানার উপর ধপাস ক'রে শুয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল।

নিস্তার আর বাক্যব্যয় না করে ডাক্তার ডাকাবার বন্দোবস্ত করতে জগন্নাথের খোঁজে গেল।

পঞ্চ

দস্যু অজামিল মৃত্যুকালে নারায়ণের নামকরে নরকের রাজাকে ফাঁকি দিয়েছিল, আর অজামিল চক্রবর্ত্তী দুনিয়ার হাটে ফাঁকি দিয়ে বেচাকেনা ক'রে—দিন কাটিয়ে দেবার ফিকিরে ঘুরত। বাল্যকাল হ'তে সে এই নীতি অবলম্বন করেই চল্লিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে। ফাঁকির কারবারে সে যে একজন পাকালোক, তা যে তার কাছে ঠকত সে মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করে যেত। এ হেন অজামিল—যে মোটরের ধাক্কা খেয়ে—নীরবে হজম করবে, একথা একেবারেই—পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য বস্তুর মতন!

জগন্নাথ মোড়ের বিধু ডাক্তারকে ডেকে আনল। ডাক্তার অজামিলকে দেখে ঔষধের ব্যবস্থা পত্র লিখে দিয়ে চলে গেলে জগন্নাথ অজামিলের কাতরানি আর গোঙানী দেখে জিজ্ঞাসা করল—"হাঁ দাদা—আঘাতটা কি বড্ড লেগেছে—"

"নাঃ—সখ করে বিছানায় পড়ে তামাসা করছি! যাও—যাও—তোমার আর আদিখ্যাতা করতে হবে না—আপন চরকায় তেল দাওগে—"

অপ্রস্তুত জগন্নাথ—আমতা আমতা করে বলল—"না

দাদা তাই বলছিলাম—কোথায় ব্যথাটা বেশী লেগেছে তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম—"

অজামিল চোক বুঁজে বলল—"সর্ব্বাঙ্গে! আচ্ছা যাও আমাকে একটু ঘুমুতে দাও—"

জগন্নাথ চলে গেল। নিস্তার এসে জিজ্ঞাসা করল "কি খাবে?"

"তোমার মুণ্ডু—মানুষ খায় কি?"

"আমার মুণ্ডু ত আজ বিশ বছর ধরেই খাচ্ছ'—ডাক্তার বলে গেল—শুধু দুধ সাবু—তাই বলতে এলাম—"

"দুধ সাবু তোমার ঐ ফচ্‌কে ডাক্তারকে খেতে বলগে, পাঁচ সিকের ডাক্তার—ও জানেই বা কি আর বোঝেই বা কি? হাসপাতালের ডাক্তার বলল—মাংস রুটী খেতে আর ঐ হেতুড়ে বেটা বলে কিনা—দুধ সাবু—আমি কচিখোকা—দুদু খাব—।"

"তা মানুষের অসুখ করলে—"

"অসুখ আবার কি? পিঠের ভেঙ্গেছে শিরদাড়া তার পেটের অপরাধ কি?"

"আচ্ছা তবে তাই খেও। তুমিই ওকে ডাকতে বললে আবার তুমিই বলছ—পাঁচসিকের ডাক্তার। যা ভাল বোঝ কর"—বলে নিস্তার মুখ খানাকে দ্বিগুণ গম্ভীর করে চলে গেল।

নেত্র

পরদিন একজন ডাক্তারকে নিয়ে পূর্ব্ব দিনের সেই মোটরের অধিকারীর লোকটি বেলা দশটার সময় এসে উপস্থিত হল। ঔষধের থালি ও ভর্ত্তি শিশি, সাবুর বাটী, চায়ের কাপ, ঔষধ খাওয়ার গেলাস, থারমোমেটার প্রভৃতি দিয়ে রোগীর ঘরের আবহাওয়া ঠিক তৈরী করাই ছিল। ডাক্তার এসে প্রায় আধঘণ্টা পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন—"খুব বেদনা আছে কি?"

অজামিল কাতর কণ্ঠে বলল—

"না—তবে উঠে দাঁড়াতে পারছি না, আর মাঝে মাঝে এমন চিড়িক্ মারছে যে—উঃ—আঃ—বাবারে—"

ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোগীর মুখের পানে চেয়ে বললেন "ভয় নেই কিছু; দু একদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবেন। আমি একটা মালিশ লিখে দিয়ে যাচ্ছি—সেইটে মালিশ করলেই সব সেরে যাবে।"

দরজার আড়াল থেকে চাপা গলায় নিস্তার বলল—"বড় ভীত হয়ে পড়েছেন উনি, আজ সকালে উঠতে গিয়েছিলেন কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ান দূরের কথা—ভাল করে খেতেই পারলেন না। আমরা গরীব লোক বাবা—ওঁর বাড়ীতে বসে থাকলে কি আমাদের চলবে—?"

"না—না—ভীত হবার কিছু নেই—মুখ চোখ বেশ প্রফুল্ল আছে—"

ডাক্তারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে অজামিল বলল—"আজ্ঞে—আমার আঘাতটা লেগেছে পিঠে—মুখে নয়—"

ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটে বেরুল, তিনি হাসতে হাসতে বললেন—"হাঁ—হাঁ—ও পিঠের ব্যথা পেটে খেলেই সেরে যাবে। কিছু ভয় নেই—"

অজামিল কাতর স্বরে বলল—"আজ্ঞে সেই কথাই বলছিলাম। অক্ষম হয়ে পড়ে থাকলে আমাদের কে খাবে পেট চলে ডাক্তারবাবু—?" অপর লোকটি বলে উঠল। "না—না বাবু সে ব্যবস্থাও করেছেন", বলতে বলতে সে পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে' বলল—"এতে দুশো টাকা আছে—এই টাকা নিয়ে এই কাগজটায় একটা সই করুণ যে আপনার আর কোন দাবী দাওয়া নেই—"

অজামিল যেন একেবারে গাছ থেকে পড়ল। অবাক হয়ে বিস্ফারিত চক্ষে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে বলল—"টাকাই বা কেন আর—সই বা কিসের। আপনারা যখন বলছেন আঘাতটা কিছুই নয়—সামান্যই—দুদিনেই সেরে যাবে, তখন—এই দু চার দিনের জন্যে আমার মত একটা লোকের বসে থাকার দাম—দুশো টাকাই বা কি করে হবে। কিছু না বাবু—গরীব বটে, তাই বলে লোককে ঠকিয়ে নেওয়া আমাদের ব্যবসা নয়—আপনারা আসুন, নমস্কার—গরীবের পিঠের শিরদাড়া—ওর আর দামই বা কি—দু চার দিন—না হয় দুমাস!—দিন আমাদের দুঃখে কষ্টে কেটেই যাবে।—আপনার বাবু চিরজীবি হয়ে বেঁচে থাকুন,

ধনদৌলতে তিনি রাজা হন, দশখানা মোটরগাড়ী হোক। আমাদের টাকার লোভ দেখাবেন না বাবু—আমরা গরীব বটে কিন্তু"—বলতে বলতে অজামিলের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল, তার দুই চক্ষু বয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে গায়ের চাদরখানা দিয়ে চোখ মুছে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—"আসুন আপনারা—নমস্কার—"

ডাক্তার বাবু এবং ভদ্রলোকটি তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু অজামিল কোন কথাই শুনল না। নিরুপায় হয়ে তাঁরা প্রস্থান করলেন।

তাঁরা চলে গেলে অজামিল নিজের মনে গর্জন করতে লাগল, "ভারী আমার দাতা—দুশোটাকা নিয়ে সকল দাবী ছেড়ে দাও—!"

নিস্তার বলল—"কিন্তু দু দুশো টাকা এই দুঃসময়ে—"

"দু দুশো টাকা—! দেখ নিস্তার মুখ বুঁজে বসে থাক—সব কথায় কথা বলতে এসনা বলছি—দুশো টাকার জন্যে আমি আমার পিঠের শিরদাড়া ভাঙতে যাইনি। অজামিল শর্ম্মার একটা কোড়ে আঙুলের দাম দুশো টাকার চের বেশী। একটি হাজার টাকা আদায় না করে অজামিল শর্ম্মা শয্যাত্যাগ করছেন না—বুঝলে ?"

"এক হাজার ?"

"নয়ত' কি!—সেদিন খবরের কাগজে পড়ছিলাম একটা লোকের একখানা পা সামান্য জখম হয়েছিল বলে তাকে একটি হাজার টাকা আদালতে দাঁড়িয়ে গুনে দিতে হয়েছিল,—আর আমার হচ্ছে—শিরদাড়া!—হয়ত বা সারা জীবনই বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে!"

"তুমি কি সারা জীবন বিছনায় শুয়ে কাটাবে না কি ?"

"দাঁড়াও না—টাকাটা আগে হাতে আসুক তারপর সে হিসেব করব—তখন বলব কতদিন শুয়ে থাকব। এত ঘন ঘন আসবার মানে কি ?—দর কসছে বইত নয়। পুলিশে গাড়ীর নম্বর নিয়েছে—গরীব পেয়ে ভেবেছে—ঠকাবে—হুঁ—"

বেদ

পর পর চারদিন কেটে গেল—আর কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে এল না। অজামিল একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল, মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও—মনে মনে সে ভাবছিল—দুশো টাকা ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি—একটু মোচড় দিলে আরও দু একশো টাকা হয়ত বাড়ত! বাইরে কিন্তু সে একটুও দমল' না, বরং নিস্তারকে রোজই বলত—রফা করতে তাদের যত দেরী হবে, তার দাবীও তত বেড়ে চলবে চাই কি শেষ পর্য্যন্ত পাঁচ হাজারেও উঠ্‌তে পারে! সবুরে মেওয়া ফলে।

পাঁচ দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা নিস্তার রোগীর ঘরে ঢুকে দেখল—অজামিল একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গায়ে অলষ্টার, মাথার ওপর দিয়ে আলোয়ান খানা জড়িয়ে মুখের আধখানা ঢাকা! নিস্তার অবাক! তার মুখ দিয়ে কোনকথা বের হবার আগেই অজামিল বলল—"দুটো টাকা দাও দিকি—খালধারটায় একটু বেড়িয়ে আসি, তা ছাড়া—কদিন এক ফোঁটাও পেটে পড়েনি—নাড়ী ভুঁড়ি শুকিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গিয়েছে—"

নিস্তার বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করল কিন্তু সব বৃথা! অজামিল তার ভাঙা শিরদাড়াকে সোজা করে' অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নিস্তার ঘরের কাজকর্ম্ম সেরে—উনুনের ধারে বসে আগুন পোহাচ্ছিল আর ভাবছিল—মিনষে গুলো যেন কি ?—মদের নেশা মাথায় চাপলে—ব্যারামের কথা পর্য্যন্ত তাদের মনে থাকে না—আশ্চর্য্য! একলাটি বসে নানা চিন্তার মধ্যে তার একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ বাইরের কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠে সে অজামিল ফিরে এসেছে মনে করে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল—অজামিল নয়, দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক! সে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে দরজার পাশে সরে দাঁড়াতেই একজন বলল—"আমরা অজামিল বাবুকে একবার দেখতে এসেছি মা—আমার সঙ্গে ইনি হচ্ছেন মেডিকেল কলেজের বড় ডাক্তার।" সর্ব্বনাশ! নিস্তার চোখে আঁধার দেখল! কি বলবে কিছুই স্থির করতে না পেরে অবশেষে বলল—"তিনি এই খানিকক্ষণ হল একটু ঘুমিয়েছেন, সারাদিন পিঠের ব্যাথায়—"

"তা হোক আমরা তাঁকে জাগাবো না—একবার দেখেই চলে যাব—"

"এখন—এখন ত' কিছুতেই দেখা হতে পারে না—তার চেয়ে আপনারা বরং কাল সকালে আসবেন—"

"এখন কি তিনি বাড়ী নেই ?"

নিস্তার তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল—"না—না—বাড়ী আছেন বৈ কি ? তাঁর কি উঠে দাঁড়াবার ক্ষ্যামতা আছে—সারা দিন বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছেন—"

"বেশ আমরা একবার উঁকি মেরে দেখেই চলে যাব—তাতে বোধ হয় আপনার আপত্তি নেই—"

"আছা আপনারা একটু অপেক্ষা করুণ—দেখি তিনি জেগে আছেন কি ঘুমুচ্ছেন—"

উত্তরের অপেক্ষা না করে নিস্তার দ্রুতপদে বাড়ীর পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে পাশের বাড়ীতে জগন্নাথের ঘরে গিয়ে হাজির হল। জগন্নাথ হারিকেন জালিয়ে কি একখানা বই পড়ছিল—নিস্তারকে দেখে সে বলে উঠ্‌ল—"একি বৌদি—তুমি—দাদা কেমন, ভাল আছে ত ?"

"সবই ভাল ভাই, তবে বড় বিপদ—তুমি একবার শিগ্‌গির এস—"

"ব্যাপার কি ?"

"চল যেতে যেতে বলছি"—বলে নিস্তার একরকম জোর করেই জগন্নাথের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল!

বান

"শিগ্‌গির শিগ্‌গির তোমার দাদা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়'—মনে থাকে যেন তুমি খুব ঘুমচ্ছ—নাও—নাও আর দেরী কোর না—"

জগন্নাথ অবাক হয়ে নিস্তারের মুখপানে চেয়ে বলল—"কিন্তু—যদি চিনতে পারে যে আমি দাদা নই—"

"না—না সে ভয় নেই এরা নতুন লোক আজই প্রথম এসেছে—আগে শুয়ে পড় ভাই—ঘুমোও—কোন ভয় নেই, নাও—নাও ওরা আবার কড়া নাড়ছে—মনে থাকে যেন তোমার শিরদাড়া ভাঙ্গা—"

জগন্নাথকে একরকম জোর করে বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে বাইরে গিয়ে আগন্তুকদের বলল—"তিনি একেবারে অঘোরে ঘুমচ্ছেন, কদিনের মধ্যে আজই একটু চোখের পাতা বুজেছেন। যদি দেখেই চলে যান তবে আসুন—দয়া করে গোল ক'রে ওঁর ঘুম ভাঙ্গাবেন না—"

"না—না—আমরা ওঁকে বিরক্ত করব না—শুধু একবার দেখেই চলে যাব—"

নিস্তারের সঙ্গে উভয় আগন্তুক পা টিপে টিপে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল—অজামিল শর্ম্মা বিছানার উপর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তারবাবু বললেন—"আচ্ছা আমরা এখন যাই—অন্য সময় যখন উনি জেগে থাকবেন তখন আসব—এসে সব ব্যবস্থা করে যাব। ইনি জমিদার বাবুর ম্যানেজার—আচ্ছা আসি—নমস্কার—"

উভয়ে মোটরে ক'রে চলে গেল। নিস্তার ঘরে এসে জগন্নাথকে বলল—"ওদের চাউনি ভাল নয় ঠাকুর পো—তুমি শুয়েই থাক—কি জানি যদি চালাকী ক'রে কাছে লুকিয়ে থেকে আবার হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়!"

"বেশ—তাহলে তুমি আমার ঘরটায় চাবি দিয়ে এস।"

জগন্নাথের ঘরে চাবি দিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে নিস্তার ফিরে এসে তার সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

রাত দশটার সময় আবার কড়া নাড়ার শব্দ—নিস্তার তাড়াতাড়ি জগন্নাথকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে গেল। এবার আর ডাক্তার নয়—রোগী স্বয়ং,—বেশ তৈরী অবস্থায় এসে উপস্থিত! অজামিল জড়িত স্বরে বলল—"খবর ভাল ত ? ব্যাপার কি—অমন চোরের মতন চাইছ কেন ?"

নিস্তার তাকে বাড়ীর ভেতর ঢুকিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ম্যানেজার ও ডাক্তারের আসার কথা বলল।

নিস্তারের কাছে সব শুনে, অজামিল একেবারে জ্বলে উঠ্‌ল। সমস্ত ঝালটা গিয়ে পড়ল বেচারী জগন্নাথের উপর। ঘরের ভেতর ঢুকেই অজামিল চীৎকার করে উঠল—"ওঠ্‌ আমার বিছানা থেকে—এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমার বিছানায়—"

"কি হ'ল দাদা—তোমারই ভালর জন্যে—"

"থাক—থাক—আর ভালয় কাজ নেই! খাসা চাল চেলেছ বাবা—একটা পাঁইট মাত্র খেতে যেটুকু সময়—এরই

মধ্যে পাড়ার লোক এসে একেবারে শয্যা দখল! ওঠ্ বলছি শীগ্‌গির—"

জগন্নাথ বিছানার উপর উঠে বসে বলল—"পিঠের ব্যথা কেমন আছে দাদা?"

"নিপাত যাক্ তোর পিঠের ব্যথা, আগে উঠে বাইরে যা—তারপর অন্য কথা—। আধ ঘণ্টার ভেতর শয্যা অধিকার—অঁ্যা—"

জগন্নাথ বেগতিক দেখে ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত হতেই নিস্তার তার হাত চেপে ধরে বলল—"না—না—তোমার কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না ঠাকুরপো! ওগো শুনছো —সেই ম্যানেজারবাবু আর বড় ডাক্তারবাবু আবার যে আসবে ব'লে গিয়েছে—"

"আসুক না—একবার কেন—হাজার বার আসুক—অজামিল শর্ম্মা কারুর এক্তালায় বাস করে না—"

"কিন্তু তারা ঠাকুরপোকেই তুমি বলে দেখে গিয়েছে—তার খোঁজ রাখ কি?"

"কি?" অজামিল গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—"কি? আমি জগা?"

"বলি দেখতে পাচ্ছ না দাদা—তোমার পিঠের ব্যথা নিয়ে আমি যে এখন ভুগছি—"

"উহু তা হতেই পারে না—জগা কিছুতেই আমি হতে পারে না—ঐ ক্যাডাভারাস্ চেহারা নিয়ে জগা হবে অজামিল শর্ম্মা—কভি নেই! জগন্নাথ কিছুতেই অজামিল হতে পারে না। বেটা জগন্নাথ—মুলো—থ্যাবড়া নাকি—দু পাশে দুই কলাগাছ মাঝখানে—আরে ধেৎ—নিস্তারের পছন্দ বটে—"

"মরণ আর কি—! ঠাকুরপো ভালমানুষ তাই তোমার উপকার করতে এসেছে নইলে—মরুণ গে যাক্—যা ভাল বোঝ কর—ওর মন ভাল তাই এখন তোমার গালাগাল হজম করছে—নইলে"—বলে নিস্তার অন্যদিকে মুখ ফেরাল। অজামিল উত্তেজিত ভাবে পদচারণ করতে লাগল।

জগন্নাথ বলল—"আমাদের বাড়ীতে বরং কালকে বলে এস বৌদি যে—যে কদিন দাদার অসুখ না সারবে—আমি এখানেই থাকব। ভাগ্‌গিস্ আমি নিকেজো বাড়ীতে বসে আছি তাই—নইলে কি—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অজামিল গর্জ্জন করে উঠল—"নইলে কি?—আমি মরে যেতাম?"

নিস্তার এবার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলল…"মরতে না, তবে ধরা পড়তে—সব জোচ্চুরী ধরা পড়তো—মোটরের ধাক্কায় বিছানায় শুয়েছিলে, পুলিশের ধাক্কায় জেলখানায় যেতে। কতগুলো লোক কতবার দেখে গেছে তার হিসেব রাখ? কে কখন আসবে তার ঠিক কি! এরা যদি আসে ত' ঠাকুরপোকেই শুতে হবে বিছানায়—নইলে দেখে গেল জগন্নাথকে আর ফিরে এসে দেখবে—বলরাম! খাসা বুদ্ধি! মাতালের ঘটে আর কত বুদ্ধি হবে—। মরগে যাও—যা ইচ্ছা করগে। আমার কি—আমি দাসী বইত নয়"—বলতে বলতে নিস্তারের চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে সে ফোঁপাতে লাগল।

জগন্নাথ বলল—"দাদা তুমি বুঝছ না, উপস্থিত দুজন অজামিল তৈরী ক'রে রাখতেই হবে,—যারা তোমাকে দেখে গিয়েছে তারা যদি আসে তা'হলে তোমাকেই শিরদাড়া ভেঙে শুতে হবে—আর যারা আমাকে দেখে গিয়েছে তারা যদি আসে তবে আমাকেই রোগী সাজতে হবে—উপায় কি?"

নিস্তার বলল—"আর দাঁড়িয়ে কাজ কি—জামা কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়'—নইলে বেশীক্ষণ দাঁড়ালে আবার যদি পিঠে ব্যথাটা চাড়া দিয়ে ওঠে—"

"আচ্ছা—আচ্ছা—তুমি যাও শোওগে"—বলে নিস্তারকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে অজামিল অলষ্টারের পকেট থেকে একটা পাঁইট্ বের করে' বলল—"খাবি একটু—জগা—"

"কি—মদ?"

"না—লেবেনচুস্—ন্যাকা ব্যাটা—মদের বোতলে থাকবে সীতেভোগ—"

"না দাদা ও জিনিষ আমার হজম হয় না—"

"তবে যা"—বলে বোতলে মুখ লাগিয়েই অজামিল দুঢোক্ খেলে, আবার বোতলটা পকেটে রেখে জামা কাপড় ছেড়ে চাদর মুড়ি দিয়ে জগন্নাথের পাশে শুয়ে পড়ল।

ঋতু

পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেউ এল না। সন্ধ্যার পর জগন্নাথ বলল—"দাদা—হয়ত তারা আবার হপ্তা খানেক নাও আসতে পারে। তোমার পক্ষে অবশ্য কোন ভাবনা নেই—যাহোক কিছু পাবে, কিন্তু আমি কি দাদা শুধু শুধুই এই রোগ যন্ত্রণা ভোগ করব ?"

"সে তুই আমার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক জগা,—আমি যদি কুড়ি টাকা পাই তোর দশ—"

"আর যদি বেশী পাও ?"

"সে তখন দেখা যাবে—তোকে ঠকাব না—"

"বেশ। আমার সঙ্গে যদি ভাল ব্যবহার কর, আমিও দাদা অকৃতজ্ঞ নই—ছমাস ঘরে বসে আছি—এক পয়সাও রোজগার নেই! বাড়ীওয়ালার চারমাসের ঘরভাড়া বাকি, তাই—নইলে শুয়ে থেকে তোমার একটু উপকার করব—এর জন্যে আর ভাগাভাগি কি ?"

অজামিল তাকে আশ্বাস দিয়ে পুনরায় বলল—"কুছ পরোয়া নেই, আমি যতক্ষণ আছি তোর কোন ভাবনা নেই—আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাক্—"

রফা হল। দুজনে নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুয়ে থাকে! অজামিল গান গায়, জগন্নাথ তক্তাপোষ বাজিয়ে তাল দেয়!

এক-দুই—তিন—চার দিনের দিন সন্ধ্যার সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। নিস্তার সদরে গিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে, দৌড়ে ভেতরে এসে বলল—"ঠাকুর পো তুমি—তুমি—তোমার লোকেরাই এসেছে"—বলেই সে বাইরে চলে গেল। জগন্নাথ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। অজামিল পুনঃ পুনঃ তাকে পিঠের বেদনা সম্বন্ধে সতর্ক করে' দিয়ে, পাশের ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করল।

ম্যানেজার বাবু ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। নিস্তার দরজার পাশে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার বাবু রোগী দেখে বললেন—"এই যে বেশ সেরে উঠেছেন দেখছি—"

ম্যানেজার বাবুও বললেন—"হ্যাঁ সে দিনের চেয়ে ভালই দেখছি—"

নিস্তার দরজার আড়াল থেকে নিম্নস্বরে বলল—"উঠতে আর কৈ পারছেন—পিঠের ব্যথাটা কিছুতেই ত কমছে না!"

ডাক্তার বললেন "দেখি—"

জগন্নাথ অতিকষ্টে পাশ ফিরল, ডাক্তার পরীক্ষা করে মৃদু হাস্যের সঙ্গে বললেন—"কতদিন হাঁটা হয় নি—"

জগন্নাথ বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলল—"আজ্ঞে সেই ধাক্কা লাগার দিন থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারিনি।"

"হুঁ—আচ্ছা একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর দিকি—"

"দাঁড়াব কি ডাক্তার সাহেব—উঠে বসতেই পারি না—শুয়ে শুয়েই—পায়খানা—"

"হাঁ হাঁ উঠে বসতে পারনা তা জানি—সে কি আর আমি বুঝতে পারছি না। একবার চেষ্টা কর দিকি ছোট ছেলেরা যেমন করে।—আমি সব ব্যথা আরাম করে দিচ্ছি—এখুনি তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেব—"

ডাক্তার সাহেব ম্যানেজারের কানে কানে কি বলতেই তিনি পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে ডাক্তার সাহেবের হাতে দিলেন। ডাক্তার সাহেব বললেন—"এতে আড়াইশো আছে—উঠে বসে গুনতে পারবে এগুলো—গোন দিকি!"

জগন্নাথের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন—"আর যদি উঠে এসে আমার হাত থেকে নিতে পার তা হলে সবগুলো তোমার নাও—দেখি—কেমন পার নিতে—।"

"সত্যি সবগুলো আমার ?"—আনন্দে জগন্নাথের গলা দিয়ে কথাগুলো সব একসঙ্গে বেরিয়ে এল, সে একলাফে বিছানা থেকে নীচেয় পড়ে থপ্ করে ডাক্তার বাবুর হাত থেকে নোটের তাড়া নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গুনতে লাগল। নিস্তার লজ্জা সরম ভুলে হাঁ হাঁ করে ঘরের ভেতর ঢুকে বলে উঠল—"তোমার পিঠ্—তোমার পিঠের ব্যথা—শুয়ে পড়—শুয়ে পড়—"

"আমার সব ব্যথা গিয়েছে—আর একটুও ব্যথা নেই—ডাক্তারবাবুর মন্তরে সব ব্যথা দেশ ছাড়া হয়ে গিয়েছে।"

ডাক্তারবাবু বললেন—"ভয় নেই মা ওঁর শিরদাড়া আবার সোজা হয়ে গিয়েছে আর ভয় নেই—"

ম্যানেজার বাবু একখানা কাগজ এবং একটা ফাউনটেন-পেন বের করে বললেন—"একটা সই করে দিন্—তা হলে।" জগন্নাথ একটানে শ্রীঅজামিল চক্রবর্ত্তী সই করে বলল—"চলুন আপনাদের বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসি—শিরদাড়াটার পরীক্ষাটাও হয়ে যাবে—"

ডাক্তার বাবু সহাস্য বদনে বললেন—"এস এস—যদি কোন দোষ থাকে তাও সেরে দিয়ে যেতে পারব—"

তিনজনে অগ্রসর হলেন, নিস্তার কি করবে ভেবে না পেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অজামিল পাশের ঘরের ভেতর, পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত ছটফট করছিল। জগন্নাথ ঘরের দরজার বাইরে একখানা পা দিয়ে নোটের তাড়া থেকে একখানা দশটাকার নোট নিয়ে অজামিলের দরজার দিকে উড়িয়ে দিয়ে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে গেল। অজামিল ঘরের ভেতর থেকে দৌড়ে বাইরে এসে দেখল—মোটর চলে গিয়েছে—সেই সঙ্গে জগন্নাথও বোধ হয় বেকার সমস্যার সমাধান করতে হারিয়ে গিয়েছে।

—•—

"তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।"

—বিদ্যাপতি

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য বি, এ

গগন মেঘে মেঘে নিবিড় কালো,
হেরিয়া আজি বড় লাগিল ভালো।
তৃষিত মন মোর ছুটিয়া চলে,
চাতক পাখী সম জলদ-তলে।
প্রকৃতি এলায়েছে চিকুর রাশি,
আননে চমকিছে মধুর হাসি।
অসীম জলধি ঐ গগনে আঁকা,
মুকুতা মণি শত অতলে ঢাকা।
আজিকে মন মোর থির না মানে,
নয়নে যেন কেবা নয়ন হানে।
সজল চাহনিটি শীতল লাগে,
মিলন-সুখ-আশা হৃদয়ে জাগে।
জমাট মেঘরাশি নিবিড় কালো,
এলো কি 'কালা' হেথা বাসিতে ভালো!

উদয়তারা

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)

শ্রীসুনীলকুমার ধর

এখন যদি বলা হয় প্রতাপদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নরেন সোজা তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া গেল এবং সে যে মমতার খোঁজে তাহার মামার বাড়ীতে গিয়াছিল কিন্তু দেখা পায় নাই এসব কথার কোন উল্লেখই না করিয়া প্রকাশের সঙ্গে বেশ উৎসাহভরে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া তর্ক আরম্ভ করিল—তাহা হইলে বেশ শুনাইবে, এমন কি উপন্যাসের একেবারে আপ টু-ডেট্ নায়ক হিসাবে অনেকের প্রশংসাও তাহার ভাগ্যে জুটিতে পারে; আরও কবিত্ব হয় যদি বলি প্রকাশের সারা মুখে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, চোখ দুটি সজল, কোন রকমে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর খাটের নীচে হইতে বহুদিনের পরিত্যক্ত ধূলামাখা টিনের বাক্সটি টানিয়া বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে আঁকিবার সরঞ্জাম লইয়া ছবি আঁকিতে বসিল; এবং সে ছবি মমতার। এ মমতার দেহের কা[illegible] জায়গায় এতটুকু খুঁৎ নাই—চাঁপা ফুলের মত গায়ের রঙ, চোখ দুটিতে 'আকাশের উদার গভীরতা' বা 'কালদীঘির ছায়া' হয়ত নাই, কিন্তু সহজ, সরল ও সাধারণ, ঠোঁট দুখানি······

কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা পরে দেখা গেল নরেন একটা প্রকাণ্ড গেটওয়ালা বাড়ীর সামনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেটা মমতাদের বাড়ী। এখানে হয়ত অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিবে, বাংলাদেশে যে কেবলমাত্র পূর্ব্ব-পরিচয় লইয়া কোন অবিবাহিতা তরুণীর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়—কিংবা এদেশের কোন অভি[illegible]কেই যে এ জিনিষটা পছন্দ করেন না—(বিশেষভাবে সাক্ষাৎকারী যখন বিলাত-ফেরৎ কিংবা কোন বড় চাকুরে ন'ন), একথা কি নরেনের জানা ছিল না? কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়—নরেন যে জানিত না, এমনও নয়; কিন্তু সকল জানা এবং সঙ্কোচের চেয়ে বড়ো মমতার সঙ্গে তাহার দেখা করার প্রয়োজন। শোভন-অশোভন, উচিত কি অনুচিত এসব তর্ক করিবার মত মনের অবস্থা বা ইচ্ছা নরেনের ছিলনা এইটুকুই বলিতে পারি।

দারোয়ানের পিছু পিছু একটা বড়ো হল ঘরে প্রবেশ করিয়া নরেন হাসিমুখেই মমতাকে নমস্কার করিল, তাহার পাশের হ্যাটপরা সাহেব-ভদ্রলোকটিকেও নমস্কার ক'রে[illegible] ভুলিল না। আজকের মমতার রূপ বর্ণনা করিতে গেলে শুধু এইটুকু বলা চলে—এই কয়দিনে মমতা অনেক [illegible] গিয়েছে, কিন্তু কতটুকু তাহা বলা কঠিন। ঠোঁটের কিনারে হাসির রেখাটুকু এখনও আছে বটে কিন্তু মাধুর্য্য নাই, এই তফাৎ। বসিবার ভঙ্গীটি একেবারে যাকে বলে—missingly.

মমতা নরেনকে এই সাক্ষাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই, নরেন বেশ বিনয় সহকারে বলিল—আপনাকে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে—

এবং কথা শেষ না করিয়া মমতার পাশের সাহেব ভদ্রলোকটির দিকে ফিরিয়া বলিল—ট্রেণ-কলিশনের বিষয়ে, আমি রিপোর্টার···এবং পুনরায় মমতার দিকে তাকাইয়া বলিল—আপনি যদি দয়া করে আমাকে ১০ মিনিট সময় দেন···

মনে হইল নরেনের কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া মমতা যেন অনেক কষ্টে উচ্ছ্বসিত হাসি সংবরণ করিতেছে এবং একটু আগে পাশের লোকটির সঙ্গে প্রেম গুঞ্জন করা (বোধ হয়) সত্ত্বেও ওর দৃষ্টিতে যে অবসাদের ছায়া ছিল তাহা যেন ইতিমধ্যেই হাসির ঢেউ-এ ভাসিয়া গিয়াছে।

হাসিমুখে পাশের লোকটির দিকে ফিরিয়া মমতা বলিল—if you don't mind, Mr. Sanyal, মাত্র দশ মিনিট...

তাহার পর মিষ্টর সানিয়্যালের হাতের উপর হাত রাখিয়া আর একবার মৃদু হাসিল।

রিষ্ট ওয়াচের দিকে একবার তাকাইয়া মিষ্টর সানিয়্যাল উঠিয়া দাড়াইলেন এবং আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—It's eighteen to nine, that means up to eight to nine, alright…

মিষ্টর সানিয়্যাল পিছন ফিরিতেই মমতা ও নরেন দুইজনই একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া তখনই দৃষ্টি আনত করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল—এবং একটি কথাও না কহিয়া দু'মিনিট কাটিয়া গেল। হঠাৎ সময় সম্বন্ধে সচেতন হইয়া নরেন মমতার দিকে তাকাইয়া বলিল—এরি মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছ ত!

মুখ তুলিয়া মমতা নীরবে নরেনের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ম তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল—এবাড়ীতে এসেই দেখলাম ইনি যেন এতদিন আমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছেন, আই সি-এস্; আজকের বাজারে অনেকের চেয়ে দামও বেশী—তাই না বলার কারণ পাইনি—

—Congratulations, মমতা দেবী!

—ধন্যবাদ, আর কোন কথা আছে কি?

কথা আর কি—তবে তোমাকে যত দেখছি ততই মনে হচ্ছে—এই ত' মাত্র আটদিন, এরি মধ্যে ভালবাসার অত পাহাড় কি কোরে ডিঙিয়ে এলে!

বিরক্তির স্বরে মমতা বলিল—দেখুন, এসব আলোচনা করবার ত সময় আমার নেই, তা ছাড়া—

মমতার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নরেন বলিল—কিন্তু তুমি ত জানতেই, আমি কাগজের রিপোর্টার নই, আমার নাম নরেন, যার কাছে ট্রেণে, হাসপাতালে ভালবাসা জানিয়েছিলে, যাকে হারাবার ভয়ে একদিন তোমার চোখে জল ধোরত না—

অবজ্ঞাভরে নরেনের মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মমতা বলিল—ভিখারীকে ফিরিয়ে না দিয়ে আশ্বাস দেওয়ায় বোকামী হ'য়েছে, কিন্তু আর নয়, আপনি এবার যেতে পারেন—

মমতার ঔদ্ধত্য দেখিয়া নরেন স্তব্ধ হইয়া গেল! এতখানি রূঢ়তার কথা সে ভবিতেও পারে নাই। মমতার মুখের দিকে তাকাইয়া নরেন ভাবিল, এই রূঢ়ভাষিনী মেয়েটিই তাহাকে প্রেমের প্রলোভন দেখাইয়া বিশ্বাসঘাতক করিয়াছে এরই জন্যে সে সকল সঙ্কোচ সকল লজ্জার কথা ভুলিয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে! মাত্র আটদিন পূর্ব্বে যে মেয়েটি করুণ মিনতিভরে তাহাকে প্রেম নিবেদন করিয়াছে—আজ সেই তাহার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেকে অন্যের প্রণয়িনী বলিয়া প্রচার করিতেছে! চমৎকার…

এই ত প্রেম! নরেন তোমার ছেলেবেলাকার সাথী প্রথম যৌবনের প্রিয়াদের মনে পড়ে? নির্ম্মলা, শোভনা, সাধন'—চঞ্চলা হরিণীর মত নির্ম্মলা, রহস্যময়ী শোভনা আর একান্ত সাধারণ সাধনা…

নরেন কে নীরব দেখিয়া মমতা বলিল—আপনি যদি আশা কোরে এসে থাকেন সেদিন আপনার হঠাৎ চলে যাওয়ার যে কোন একটা কৈফিয়ৎ দিলেই আবার আমি আপনার পায় ধরে প্রেম জানাব, তাহ'লে মস্তবড়ো ভুল হয়েছে! আপনার কৈফিয়ৎ শোনার জন্যে আমি এতটুকুও ব্যাকুল নই…

অত্যন্ত ধীরে ধীরে নরেন বলিল—কৈফিয়ৎ দিতে এসেছিলাম একথা মিথ্যা নয় মমতা, কিন্তু তুমি আমার একটা মস্তবড় ভুল শুধরে দিলে। নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয় একথা জেনেও কেন যে এতবড় ভুল কোরলাম—তোমার এখানে এসে সেই কথাটাই কেবল আমি ভাবছি! আচ্ছা, উঠি—

কিন্তু উঠি বলিয়াও নরেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না। বহুদূরে সরিয়া গেলেও একান্ত আপনার জনের প্রতি প্রচ্ছন্ন মমতার মত সেও যেন কি এক অজানা বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সে কাছে নাই শুধু একথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। মমতা ঠিক তেমনি ভাবে বসিয়া আছে। তাহাদের দুজনের মাঝে যে বাঙ্ময় সুনিবিড় স্তব্ধতা—তাহাকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করা যায় না।

দুইজনে যখন এমনি স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে সেই সময়ে

তাহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন মিঃ সানিয়্যাল। মমতা হঠাৎ অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ সানিয়্যালের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তোমাকে রোজ বলি রাত্তির বেলা মোটর কোরে বেড়াতে নিয়ে যেতে কিন্তু রোজই তুমি একটা না একটা ছুতো করো। আজ আর কিন্তু কোন ওজড়-আপত্তি শুনছিনে, চলো—মমতা একরকম জোর করিয়াই মিঃ সানিয়্যালকে ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল।

এখানে আসিবার পূর্ব্বে মমতাকে রূঢ় ও অহঙ্কারী ভাবিতে নরেনের হয়ত বাধিত কিন্তু এখন মমতার কোন ব্যবহারই তাহার নিকট অপ্রত্যাশিত নয়। মমতা যদি মিঃ সানিয়্যালকে পাইয়া সুখী হইয়া থাকে, ভাল, কিন্তু ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়া নরেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঐ ক্রুর হাসিটুকুরও ত কোন মানেই হয় না! সেদিনকার চিরকালের জন্যে চলিয়া যাওয়ার অজুহাতে মমতাকে আরো একটু ভাল করিয়া জানিবার লোভে নরেনের ক্ষতি হয় ত কিছু হইয়াছে কিন্তু সে এই ক্ষণভঙ্গুর প্রেম লইয়া কতদিনই বা মমতার সঙ্গে একঘরে বাস করিতে পারিত!

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নরেন এই কথাই ভাবিল। মমতাকে লইয়া মিঃ সানিয়্যালের মোটর যে গেট পার হইয়া চলিয়া গেল সে শব্দও নরেনের কানে আসিয়াছে, মিনিট খানেকের জন্যে একবার ঘরের চারিপাশে তাকাইয়া দেখিয়া নরেন বাহির হইয়া পড়িল।

নরেন সেই বিকালে বাহির হইয়া গেছে, রাত্রি একটা বাজে এখনও ফেরে নাই। প্রকাশ সন্ধ্যার সময় বাহিরে একটু বেড়াইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া একা একা কোন কাজ না থাকায় অনেক দিন পরে কাগজ কলম লইয়া কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একটি কবিতাও লিখিতে পারে নাই। ঘরের চারিধারে এক লাইন দুলাইন কবিতা লেখা টুকরা কাগজের ছড়াছড়ি।

বাম হাতে একখানা কাগজ এবং দাঁতে দিয়া কলম কামড়াইয়া ধরিয়া প্রকাশ আপন মনে কি যেন ভাবিতেছিল এমনি সময় পিষিমা ঘুম চোখে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—আখ্ ত পেরকাশ, নীচেয় কে যেন ডাকৃছে—

নরেন আসিয়াছে মনে করিয়া প্রকাশ নীচে নামিয়া গিয়া দরজা খুলিতেই একটি হিন্দুস্থানী লোক সেলাম করিয়া আগাইয়া আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—দিদিমণি দিয়া—

প্রকাশ একবার ভাবিল চিঠিখানা না পড়িয়াই ফেরৎ দেয় কিংবা জিজ্ঞাসা করে কাহার নিকট হইতে সে এই চিঠি লইয়া আসিয়াছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লোকটিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে চিঠিখানা পড়িবার জন্যে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিল। খামের উপরকার হাতের লেখা একেবারে অপরিচিত না হইলেও—বরণ যে লেখে নাই সে তাহা বুঝিল, তা ছাড়া চিঠিখানা নরেনের নামে। অপরের বন্ধ চিঠি খুলিয়া পড়িবারও কৌতূহল প্রকাশের নিকট হইতে আমরা হয়ত আশা করি না—সে বয়সও তাহার অনেকদিন আগে চলিয়া গেছে, তবুও কলিকাতায় আসিয়া পৌছাতেই নরেনকে চিঠি লিখতে পারে এমন একটি মেয়ের কথাও সে ভাবিতে পারিল না। অন্ততঃ নরেন তাহাকে এমন কোন কথা বলে নাই। তা ছাড়া ঠিক এমনি ধরণের হাতের লেখা সে যেন কবে কোথায় দেখিয়াছে—অথচ মনে করিতে পারিতেছে না—এই দু'য়ের দ্বন্দ্বে পড়িয়া সে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল।

চিঠিখানা মমতা লিখিয়াছে—

রাত্রি ১১॥০টা

তুমি কি অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যেও আর একবার আসতে পার না!

—মমতা

মামার বাড়ী থেকে ঠিকানা যোগাড় করে এই চিঠি লিখছি।

ছোট চিঠি,

এই দুইটি মাত্র লাইন কিন্তু প্রকাশ তিনবার পড়িল। মমতা, মমতা এতদিন পরে নরেনকে চিঠি লিখিয়াছে, চিঠি

লিখিয়াছে এই নিশীথ রাত্রে তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্যে। একটু মৃদু হাসিয়া চিঠিখানা খামে বন্ধ করিয়া প্রকাশ পকেটে পুরিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল হিন্দুস্থানী চাকরটা শীতে কোন রকমে কুঁকড়ি শুকড়ি মারিয়া দরজার পাশে বসিয়া আছে। প্রকাশকে দেখিয়াই অভ্যাসমত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রকাশ বলিল—বাবু আভিতাক্ নেহি লৌটা, আনেসে হাম্ চিঠি দে দেঙ্গে—

মমতাদের চাকর আর একবার সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

দরজার কপাট ধরিয়া প্রকাশ সেখানে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া তাহার পর পুনরায় নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিন লাইন লেখা একটা কবিতা লইয়া বসিল। কবিতাটি শেষ করিতেই হইবে। এতক্ষণ চেষ্টার পর প্রকাশ হয়ত এই কবিতাটি সম্পূর্ণ করিতে পারিত কিন্তু মমতার ছোট চিঠিখানা তাহার সকল ভাব ও ছন্দকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিতা রাখিয়া প্রকাশ পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িতে লাগিল। মমতা চিঠি লিখিয়াছে, এতদিন পরে মমতা চিঠি লিখিয়াছে নরেনকে! চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কি এক আক্রোশে প্রকাশ খামখানা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িল। তাহার পর চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া আর একবার পড়িল।

এখন কেহ প্রকাশের ঘরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইত প্রকাশের সারা মুখের উপর নিষ্ঠুরতার স্পষ্ট ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার দুটি চোখের দৃষ্টি হইয়াছে অসম্ভব উজ্জ্বল। চিঠিখানাও বার কয়েক এপিঠ্ ওপিঠ উল্টাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং টুকরা কাগজ গুলো মুঠোর ভিতর চাপিয়া ধরিয়া সারাঘরে পায়চারী করিতে লাগিল। প্রকাশ যে একটু পূর্ব্বে কবিতা লিখিতেছিল এবং তিন লাইন লিখিয়াছেও এ যেন বিশ্বাস করা যায় না! বৈশাখী সন্ধ্যায় পথের পাশের ঘুমন্ত সৌখীন সাপটির মাথায় হঠাৎ কে যেন পদাঘাত করিয়াছে! প্রকাশ যখন এমনি অশান্তভাবে সারাঘরে পায়চারী করিতেছে নীচের সদর দরজায় কে যেন আবার করাঘাত করিল। প্রকাশ একবার থমকাইয়া দাঁড়াইয়া সে করাঘাত শুনিল—কিন্তু নীচের দরজা খুলিয়া দিতে না গিয়া সে পুনরায় আপন মনে পায়চারী করিতে লাগিল। কাহার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরও যেন শোনা গেল। নরেন ফিরিয়া আসিয়াছে হয়ত কিংবা মমতাদের চাকরটা হয়ত আর একখানা চিঠি লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রকাশ যেন শুনিতেই পায় নাই এমনিভাবে ঘরময় পায়চারীই করিতে লাগিল!

পিসিমা পুনরায় ঘুম চোখে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—নরেন যে সেই থেকে ডাকাডাকি কোরছে, শুনতে পাচ্ছিস্ নে, পেরকাশ?

অত্যন্ত রুক্ষস্বরে প্রকাশ বলিল—তার জন্যে আমাকে বারবার বিরক্ত কোরতে না এসে, চাকর ব্যাটাদের ডেকে দিলেই ত' হয়। ওরা এত বড়ো নবাব পুত্তুর কবে থেকে হোল?

তাহার পর সে পুনরায় আপন মনে পায়চারী করিতে লাগিল।

পিসিমা কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজেই দরজা খুলিয়া দিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

প্রকাশের মুঠোর ভিতর মমতার চিঠির টুকরো কাগজ-গুলো তখনও রহিয়াছে—সিঁড়ীতে পিসিমা ও নরেনের কথার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে কিন্তু প্রকাশের সে দিকে খেয়াল নাই—

তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে একখানি শান্ত নীড়ের ছবি! মমতা ও নরেনকে লইয়া ছোট একটি সংসার। সংসারটি ছোট কিন্তু তাহার কোন জায়গায় এতটুকু ত্রুটি ও এতটুকু অভাব নাই। নরেন ভুলিয়া গেছে তাহার সমস্ত অতীত পৃথিবীর সীমা ঐ অঙ্গন পর্য্যন্ত, তাহার বাহিরের কোন খবরই সে রাখে না,—তবুও ওর চোখে, মুখে পরিতৃপ্তির কি এক অপরিসীম আভাষ! স্মার্ট মমতাকে আজ আর চেনা যায় না, শান্ত, ধীর। কারণ-অকারণে ওর সেই চটুল হাসি আর নাই, ও আজ আস্তে আস্তে কথা কয়। মমতার হাসিতে সে ধার নাই বটে, কিন্তু আরো মধুর হইয়াছে। ওর প্রতিপদ-পাতে যেন একটি ছন্দ আছে, ও আজ কল্যানী বধূ!

প্রকাশ দেখিল—নরেন বুঝি কোথায় গিয়াছিল, হাতে

বগলে একগাদা কাগজ পত্র, ছবি। দরজার কড়া নাড়িতেই মমতা ব্যস্তভাবে দোতলা হইতে নীচে নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহার পর নরেনের হাত হইতে অর্দ্ধেক কাগজ পত্র লইয়া, নরেনের মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু একটু হাসিতে হাসিতে দুইজনে তাহাদের শোবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নরেন বাকী কাগজ গুলো পাশের একটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া মমতার একখানা হাত ধরিয়া নিজের চেয়ারের একপাশে বসাইল। খানিক পরে দেখা গেল ইতিমধ্যেই নরেনের বুকের উপর মমতা মাথা এলাইয়া দিয়াছে আর নরেন মমতার মাথায় কপালে চুলে হাত বুলাইতেছে। এমনিভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর কাজের ছুতায় মমতা একবার আড় চোখে নরেনের মুখের দিকে তাকাইতেই—নরেন আস্তে আস্তে মমতার মুখখানা নিজের মুখের সামনে তুলিয়া ধরিল, তাহার পর দুই জনেরই ঠোঁটের কিনারে ফুটিয়া উঠিল দুষ্ট হাসির একটি ক্ষীণ রেখা, তাহার পর......

প্রকাশের পদক্ষেপ ক্রমেই দ্রুততর হইতেছে এবং আপনাকে সে এই স্বপ্নের মাঝে এমনিভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছে যে, নরেন প্রায় তিন মিনিট আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে এ তাহার খেয়ালই হয় নাই।

হঠাৎ নরেনের সহিত মুখোমুখি হইতেই প্রকাশ অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মমতার চিঠির টুকরোগুলো তখনও তাহার মুঠার ভিতর!

নরেনের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রকাশ চমকাইয়া উঠিল, মনে হইল নরেনের বুঝি কি এক কঠিন অসুখ করিয়াছে। এমনি মলিন ওর মুখ, এমনি পাণ্ডুর ওর চোখের দৃষ্টি! প্রকাশ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ম্লান হাসিয়া নরেন জিজ্ঞাসা করিল—কবিতার মিল খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি?

এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া প্রকাশ শুধু একবার ঘরের চারিপাশে তাকাইল এবং তাহার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া নরেন বিস্ময়ের স্বরে বলিয়া উঠিল—কোরেছ' কি হে!

এবং প্রকাশ কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই আগাইয়া গিয়া টেবিলের উপর হইতে তিন লাইন লেখা কবিতাটি তুলিয়া লইয়া নরেন পড়িতে লাগিল—

> আমার পৃথিবী মোরে করিয়াছে হীন প্রতারণা,—
> মহাশূন্যে তাই ঝড়; তাই তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের ফণা
> দংশন মাগিছে শুধু—

কবিতার তিনটি লাইন পরপর চারবার আবৃত্তি করিয়া নরেন বলিল—সত্যি, এ কবিতার মিল খুঁজে বার করা সহজ নয়। টেবিলের উপর কবিতার কাগজখানি রাখিয়া দিয়া নরেন নীচু হইয়া সারা ঘরময় ছড়ানো টুকরা কাগজ কুড়াইতে লাগিল। প্রকাশের মুঠোর ভিতর তখনও মমতার চিঠির টুকরোগুলো রহিয়াছে—ফিকে নীলরঙের খামের টুকরোগুলো ঠিক তাহার বসবার চেয়ারটির পাশে ছড়ানো।

নরেন ঘরের মেঝে হইতে প্রত্যেকটি টুকরা কুড়াইয়া কবিতার অর্দ্ধ সমাপ্ত একটি লাইন, কোনটিতে বা মাত্র চারটি কথা কোনটিতে বা দুটি লাইন আছে—সব এক একবার করিয়া আবৃত্তি করিয়া পুনরায় ফেলিয়া দিতে লাগিল। এবং প্রতি টুকরাটি পড়া শেষ হইলে সারা ঘরময় একবার পায়চারা করিয়া প্রকাশের সামনে আসিয়া বলিল—তোমার মনে আবার ঝড় উঠেছে, ভাই—কিন্তু···

প্রকাশ ইতিমধ্যে চিঠির টুকরোগুলো পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়াছে। বলিল—এতগুলো কাগজ হাতড়ে তুমি কি এই একটা 'কিন্তুই' পেলে?

কিছুক্ষণ নরেন কোন কথা কহিল না। তাহার পর বলিল—আমিও আজ সন্ধ্যে থেকে একখানা ছবি আঁকবার কথাই ভাবছি। সেও ঝড়ের ছবি!—মধ্যাহ্নের তৃণহীন প্রান্তরের উপরকার ঝড়ের ছবি, একটি গাছ পর্য্যন্ত নেই—কেবল বহুদূরে দেখা যায় শীর্ণা একটা নদী......

নরেনের উদাস ও তন্ময় দৃষ্টির দিকে তাকাইয়া প্রকাশ তাহার জামার উপর দিয়া পকেটের চিঠির টুকরো গুলো একবার অনুভব করিল।

সাত

বরুণা কলিকাতায় পৌছাইয়া দেখিল সাংবাদিক মহলে তাহাকে লইয়া মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেছে। প্রতি কাগজে তাহার ছবি তাহার বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত। এবং তাহার কলিকাতায় পৌছানো সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র সেই যে সকাল নয়টা হইতে লোকজনের আনাগোনা সুরু হইয়াছে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্তও তাহাদের ভীড় কমিল না। অবশেষে বরুণাকে বাধ্য হইয়াই নিজের শরীরের দোহাই দিয়া অনেককে হতাশ করিতে হইল।

কিন্তু একটি বিষয় বরুণা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছে—এতগুলা কাগজের কোন জায়গায়ই প্রকাশকে লইয়া চাঞ্চল্য নাই এবং নানা রকমের এতগুলা অনুসন্ধিৎসুদের মধ্যে কেহই একবার তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিল না। অথচ বরুণার বক্তৃতার তুলনায় প্রকাশের বক্তৃতা যে অনেক ভাল হইয়াছিল, এবং তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার এবং মানিবার মত কথা ছিল, এ, বরুণাও অস্বীকার করে না। কিন্তু বরুণা এর জন্যে এতটুকু দুঃখিত হইল না, উপরন্তু—ঝড়ের ঢেউ যে আবার তাহার কূলে ফিরিয়া আসিয়াছে এই ভাবিয়া আত্মতৃপ্তি ও আত্মগর্ব্ব অনুভব করিল। বরুণা আরও একটি কথা ভাবিল—এই ঝড়ের মাঝে যে কোন একজন অবিবাহিত দেশমান্য নেতাকে বিবাহ করিয়া নিজের ভবিষ্যতকে কায়েমী করিয়া লইবে। এবং এ বিশ্বাস তাহার হইয়াছে যে, গৃহিণী হইবার মনোভাব প্রকাশ করিলে পাণিপ্রার্থীর অভাব হইবে না। সমাজ বিষয়ে পুরুষের একতরফা বিধিবিধানের প্রতিবাদ করিবার জন্যে এবং ভবিষ্যতে পুরুষ যাতে নারীর প্রতি সমাজ ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কোন অন্যায় বিচার ও অত্যাচার করিতে না পারে তাহার একটা ব্যবস্থা করিবার দুঃসাহসে যে, সে আশ্রমের বাহিরে পালাইয়া আসিয়াছে, একথা আজ তাহার মনেই পড়িল না। মনে না পড়িবারই কথা। বরুণা অন্তত: এইটুকু বুঝিয়াছে—পুরুষের নানা অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার মত দুঃসাহস দূরে থাক, এ কথা ভাবিতেও এদেশের শতকরা নিরনব্বইটি মেয়ে জিভ্ কামড়াইয়া ফেলে। এদেশের কয়টি মেয়ে লেখাপড়া শিখিয়া একেবারে স্বাধীনভাবে এবং ভালভাবে একার জীবন যাপন করিবার কথা ভাবিতে পারে। একথা ভাবিতেও ওরা ভয় পায়—পাপ মনে করে। ছেলেবেলার শিবপূজার মোহ ওদের মজ্জাগত! কিন্তু এ কথা থাক্, ভবিষ্যতে কোনদিন এদেশের নারী যদি পুরুষদের সামনে তাহার এই দাবীর কথা ভয়ে ভয়ে নয়, কেবল কথায় নয়, উদাহরণ দিয়া উপস্থিত করিতে পারে, সেদিনকার ইতিহাসের প্রথম পাতায় যাহার নাম লেখা হইবে, সে এই বরুণা। বরুণা অন্তত: এইটুকু বুঝিয়াছে এবং এই জন্যেই ও যদি আজ কোন 'শাসে-জলে' দেশনেতাকে বিবাহ করে, ওর বিরুদ্ধে কোন কথাই উঠিবে না! বরং আরও ধন্য ধন্য পড়িবে।

এখন একবারের জন্যেও ওর অমরেশকে মনে পড়িল না, মনে পড়িল না প্রকাশ ও নরেনকে। কেবল ভুলিয়া যাওয়া স্মৃতির মত খুব অস্পষ্ট একখানা মুখের ছবি—তাহার মনে পড়িল—সে মুখ অবনীর। সমস্ত মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে না।

—ক্রমশঃ



চাষার ছেলে

শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

চৈত্র সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তখনও পৃথিবীর বুকে তত গাঢ় হইয়া উঠে নাই। নফর তাহার দৈনন্দিন মজুর-জীবনের কর্ম্ম শেষে যেমন করিয়া ঘরে ফেরে আজিও ঠিক তেমনই তাহার দা' খানি বাম বগলে গুঁজিয়া ডান হাতে বলদ দুটীর দড়ি ধরিয়া তাহাদের পিছু পিছু খেদাইয়া আনিতেছিল।

আঙিনায় পা দিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বাড়ীখানি যেন একটা ছাড়া-বাড়ীর মতই খাঁ খাঁ করিতেছে। কোথায়ও কাহাকে দেখিতে পাইল না, শুধু অদূরে তাহার দুই বৎসরের শিশুপুত্র ঝিলু মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে। সাঁঝের কাজগুলো তখনও সবই পড়িয়া আছে। সেই সান্ধ্য বিশৃঙ্খলার মাঝে যাহা কিছুতে তাহার চোখ পড়িল সকলই যেন তাহাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল. গোয়ালে ঢুকিয়া খুঁটীতে গরুর দড়ি দু'গাছা বাঁধিতে বাঁধিতে দেখিল গামলায় একটী ফোঁটাও জল নাই। গরু দুটী চির অভ্যাস মতই জিভ্ লম্বা করিয়া সেই তৃণজলহীন শূন্য আধারটী বারবার চাটিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে নফরের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দাওয়ার এক কোণ সংলগ্ন জল পিঁড়ার উপর মেটে কলসটীতে হাত দিতে সেও যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াই ঠন্ ঠন্ শব্দে নিজের শূন্যতা জ্ঞাপন করিল। নফর মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল। রুক্ষ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, সখি! সখি! কিন্তু স্ত্রী সখিনার কোন উত্তর না পাইয়া নিরুপায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, এই সাঁঝের বেলায় আবার কোথায় গিয়ে মো'ল। দাওয়ায় উঠিয়া খোলা দরজার প্রতি নজর পড়িতেই সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিল অদূরে মেঝের কোণে কিছু মুড়ি দিয়া জড়-সড় অবস্থায় শায়িত মানুষের মত কি একটা পদার্থ দেখা যাইতেছে। ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার উপর হাত বুলাইয়া বুঝিল সখিনাই এই অবস্থায় পড়িয়া আছে। অন্ধকারে কপালে হাত ঠেকিতেই দেখিল যেন জ্বলন্ত আগুনের হল্‌কা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, সখি! সখি! কোন সাড়াই পাইল না। আতঙ্কে তাহার বুকের ভিতর দ্রুত আঘাত করিতে লাগিল। পা কাঁপিতে লাগিল, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া আসিল। একটু সামলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া সম্মুখের মাচার কোণ হইতে একটী দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিল। ক্ষিপ্র হস্তে আলোটী জ্বালিয়া সখিনার শিয়রে আসিয়া বসিল। দেখিল প্রবল জ্বরে একেবারেই তাহার চেতনা লুপ্ত হইয়াছে। নফর স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিল; কি করিবে কিছুই যেন ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিল না। হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া গেল। এবং জলের কলস হইতে এক বাটি ঠাণ্ডা জল আনিয়া তাহার মাথায় ঢালিতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই সখিনা তাহার তন্দ্রাবিষ্ট বিহ্বল রক্ত চক্ষু দুটী ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে কি যেন বলিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঝিলু ইতিমধ্যেই ভাতের জন্য দাওয়ায় বসিয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। নফর উঠিয়া আসিয়া পল গাছা হইতে দুই মুঠা শুষ্ক পল টানিয়া লইল; এবং গরু দুটীর মুখের নিকট ফেলিয়া দিয়াই ছেলেকে কোলে তুলিয়া রান্না ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বাসি ভাত ও তরকারী যাহা হাড়ীতে অবশিষ্ট ছিল ছেলেকে খাওয়াইয়া আনিয়া ঘুম পড়াইয়া রাখিল। নিজের খাওয়া দাওয়ার কথা আজ

আর তাহার মনেই হইল না। ক্লান্তি, অবসাদ ও একটা প্রকট দুশ্চিন্তায় তাহার মাথার মধ্যে যেন শুধু ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

সারা রাত্রি নফরের চোখে ঘুম নাই। পীড়িতা স্ত্রীর শিয়রে বসিয়াই কাটিয়াছে। চৈত্রের প্রখর রৌদ্রের মাঝে সারা দিনব্যাপী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম; তারপর অনাহার অনিদ্রায় সে একেবারে মুশড়াইয়া পড়িয়াছে। সকালে তাহার অবসন্ন পা দু'খানা আর যেন তাহার ক্লান্ত দেহটীকে টানিয়া তুলিতেই পারে না। তবুও উঠিতে হইল। প্রতিবেশীদের একগৃহ হইতে একটী কাঁচের শিশি চাহিয়া সে গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের দিকেই চলিল।

(২)

এই হ্যাট্-কোট-পরা চশমা-আঁটা সরকারী ডাক্তার বাবুটীকে দেখিলে যতই গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হউক না কেন; তাঁহার কোট প্যাণ্টের ভিতর এমন একখানি কোমল হৃদয় লুকান ছিল, যা' যত সব অনাথ আতুরদের সাদরে আমন্ত্রণ করিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ থাকিত। নফরের মুখে তাহার স্ত্রীর রোগের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তিনি চিন্তিত মুখে বলিলেন, ব্যারামটা নেহাৎ সহজ বলে মনে হোচ্ছে না। না দেখে শুনে কি ওষুধই বা দেব। আচ্ছা, রোগীকে তুই একবার দেখাতে পারিস নে? আশার আলোকে নফরের মুখখানা সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল! ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, ডাক্তার বাবু, তোমারাই ত গরীবের মা বাপ। একবার যদি দয়া ক'রে দেখে আসেন তবে গরীবের প্রাণ রক্ষে হয়। তাহার অসীম ব্যাকুলতা ও মিনতিভরা কণ্ঠস্বর ডাক্তারের যুবক হৃদয়ে গভীর আঘাত করিল। বলিল, এই ওষুধটা এখন নিয়ে যা। আমি সময় মত একবার দেখে আসব এখন।

ডাক্তার বাবু সেই দ্বিপ্রহর বেলায়ই নফরের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া উদ্বিগ্ন মুখে বলিলেন, যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে। দুটো পাশই এক সঙ্গে ধরেছে। ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা বলিয়া দিয়া তিনি উঠিতেই নফর কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ডাক্তার বাবু, দুঃখে কষ্টে জীবনে অনেক পড়েছি; কিন্তু এমন দুর্ব্বছোর আর কখন দেখিনি। আমাদের চাষা লোকের আর বাঁচন নেই। ক্ষেতের একটা ফসল যে হাটে তুলে বিক্রি করব; তারও জো' নেই। চার আনার জিনিষটে চার পয়সায় বেচ্‌তে হবে—তারই বা খদ্দের কোথায়? আবার এত যে সস্তা গণ্ডা; তাও ত আমরা দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত পাইনে। ঐ ঘরখানার পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি বাদলা যদি হঠাৎ আসে রোগীটাকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব তার ঠাঁই নেই। এখন জীবনটা যাতে রক্ষে হয় তাই করে দাও। প্রাণে যদি বাঁচি তোমার ঋণ রাখব না। ডাক্তার বাবু হাসি মুখেই উত্তর দিলেন, আমার ঋন টিন্ তোর দিতে হবে না। ওষুধ—ডাক্তারখানা থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে আস্‌বি। শুধু দেখ্‌বি যেন পথ্যাপথ্যি আর সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটী না হয়। আমি সময়মত মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। মনের কৃতজ্ঞতা নফরের চোখে মুখে উছলিয়া উঠিল। সে মাথা নাড়িয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিল।

(৩)

আজ দুই দিন নফর আর জন খাটিতে বাহির হইতে পারে নাই। তাহার সবল দেহের সুকঠোর পরিশ্রমের দৈনিক মূল্য যাহা একদিন বার আনা ছিল; আজ তাহা বার পয়সায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাহাও জোঠান দায়। এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে কয়জনেই বা রোজ রোজ মজুর খাটাইবে। আবার একদিন কাজ জুটাইতে না পারিলেই আর পেট চলিবে না। সগোষ্ঠী উপোস করিতে হইবে। যে কটী ধান এবার ক্ষেতে পাইয়াছিল তাহাত সুদের বাবদ মহাজনের গোলায় তুলিয়া দিয়াছে। ভাগের ভাগ অল্প যে পাট টুকু হইয়াছিল তাহা ত এবৎসর বিক্রয়ই হইল না। এই দুইদিন ধার কর্জ্জ করিয়াই স্ত্রীর পথ্য চালাইয়াছে; কিন্তু রোজ রোজ কেই বা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ধার দিবে? সকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই নফর তাহার প্রতিবেশিনী এক আত্মীয়া ফুফীকে ডাকিয়া, তাঁহার উপরেই পীড়িতা স্ত্রীর ভার অর্পণ করিয়া সে কর্ম্মের সন্ধানে চলিয়া গেল।

প্রভাত কখন মধ্যাহ্নে পরিণত হইয়াছে। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে কে যেন সহসা আগুন ঢালিয়া দিয়াছে। রুক্ষ বিবর্ণ আকাশের বুক চিরিয়া অজস্র ধারায় যে আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে তাহা যেন সারা বিশ্বকে দগ্ধ না করিয়া আর ক্ষান্ত হইবে না। বাহিরের সেই প্রচণ্ড অগ্নি-লীলার প্রতি চাহিলে চোখে ধাঁধা লাগে—যেন অন্ধকার দেখিতে হয়।

এই প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় লইয়াই নফর সারা দুপুর ঘুরিয়াছে; কিন্তু তার কোন ফল হয় নাই। হতাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া চিন্তিতমুখে দাওয়ায় বসিয়া এক ছিলিম তামাক টানিয়া শ্রান্তির অনেকখানি লাঘব করিতেছে; এমন সময় সুমুখের রাস্তা হইতে জমিদারী কাছারীর হিন্দুস্থানী পেয়াদা সহসা যমদূতের মতই আবির্ভূত হইয়া উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল, নফরা বাড়ী আছিস? নায়েব বাবু জলদি ডেকেছে। নফরের প্রাণ উড়িল। মনে পড়িল কাছারীতে খাজনা দেওয়ার দিন ত আজই। সেদিন অনেক লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগের পর; নায়েব মহাশয় তাহাকে দুই দিনের সময় দিয়াছিলেন। আজ আবার সেখানে গিয়া কি বলিয়া দাঁড়াইবে; এবং তাহাতে কি ফল হইবে না হইবে ততদূর চিন্তা করিবার শক্তি তখন আর তাহার ছিল না। নিঃশব্দে দাওয়া হইতে নামিয়া নিতান্ত অভিভূতের মতই সে পেয়াদার অনুসরণ করিয়া চলিল।

নফরকে দেখিয়াই নায়েব মহাশয় আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, ব্যাটারা সব নবাব পুত্তুর হয়েছেন। বারবার লোক পাঠিয়ে সাধ্যি সাধনা করে তবে আনতে হবে। টাকা কড়ি সব এনেছিস্ নফরা? পুরো দুটো সনের খাজনা বাকী। হাল বকেয়া সমস্ত টাকা এখুনি বুঝে দিয়ে যাবি।

নিতান্ত নিরুপায়ের মতই নফর সেই কাছারী ঘরের দরজার সুমুখেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। বার দুই ঢোক গিলিয়া লইয়া ভীত জড়িতকণ্ঠে বলিল, বড্ড লাচারে পড়ে গেছি বড়বাবু। মুনিব মা বাপ, তাই তাঁর কাছে ছাড়া আর কোথায় জানাবো। আপনাদের দয়াতেই ত ভিটেয়...

নফরের মুখের কথা শেষ হইতে পারিল না। নায়েব মহাশয় কণ্ঠ দ্বিগুণ তিক্ত করিয়া বিকৃত মুখে ধমকাইয়া উঠিলেন, রাখ ব্যাটা, এখন তোর ও সব ন্যাকামি রেখে দে। ও সব ঘ্যান্ ঘ্যানানি অনেকই শুনছি। ব্যাটারা পাকা বদমাইস। সব যেন জোট বেঁধেই একটা ষড়যন্ত্র করছে। জমিদারের ও সব মামার বাড়ীর আব্দার শুনে ব'সে থাকলে চলবে না। জমিদার আগে বাঁচুক—তাঁর জমিদারী রক্ষে হোক্ ত পরে তোদের কথা শুনব।

এই তিরস্কার যেন নফরের কাণেই পৌঁছিল না। সে পূর্ব্বানুবৃত্তি করিয়াই বলিতে লাগিল, ভেবেছিলাম পাট যেটুকু পেয়েছি বেচে কিনে মালিকের খাজনা কড়ি শুধরে দেব; কিন্তু এমনি ভাগ্যি যে পাটগুলো এবার বিক্রিই হ'ল না। তা বাবু দয়া করে আর দুটো দিনের সময় দিতে হবে।

নায়েব মহাশয় মুখে এক প্রকার বিশ্রী শব্দ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিলেন, মাণিক আমার! রাত পোহালে তিরিশে চত্তির, আজকেও ওনাকে সময় দাও। শুনে হেসে বাঁচিনে। এ রাম সিং ইস্কো ধুপ্ মে খাড়া করকে রাখ্যো।

রাম সিং নফরের ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতে বলিল, উঠ্ শ্যালা। চল্।

নফর ধুলার মাঝেই সেখানে আড় হইয়া শুইয়া পড়িল। কাতর কণ্ঠে বলিল, দোহাই বড়বাবু! গরীবকে রক্ষে কর। কাল সন্ধ্যের মধ্যেই টাকা এনে দিয়ে যাব।

নায়েব মহাশয়ের মুখের কঠোরতা বিন্দুমাত্রও কমিলনা। তেমনি তীক্ষ্ণস্বরেই বলিলেন, বজ্জাৎ ব্যাটারা সব। তোরা ত রাম রাজত্বেই বাস করছিস্। কোন্ জমিদার এত বকেয়া ফেলে রাখেরে? তারপর কর্ত্তা এবার সুদের টাকাত সব মকুব করে নেওয়ার হুকুম দিয়েছেন। কাল সন্ধ্যের মধ্যেই টাকা চাই, নইলে ভিটে মাটী সব উচ্ছন্ন যাবে; তা বলে দিচ্ছি।

(৪)

বাড়ী ফিরিয়া নফর দেখিল ঝিনু দাওয়ার একপাশে ধুলার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সেই প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা ফুফিই তাকে দয়া করিয়া বাড়ী হইতে

এক মুঠা খাওয়াইয়া আনিয়াছে। নফর যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া ছেলেটাকে কাছে টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। বাহিরের প্রকৃতির মতই আজ তাহার ভিতরটাও শুধু ধুঁ ধুঁ করিয়া পুড়িতে ছিল। ফুফী জিজ্ঞাসা করিল, নফর ভাত না খেয়েই শুয়ে পড়লি যে? চাল ডাল কোথায় আছে দ্যাখায়ে দেনা, আমি না হয় একটা মুঠো ফুটিয়ে দিয়েই যাই।

না—ফুটিয়ে আমিই নিতে পারতাম, তবে শরীর বড্ড অসুখ করেছে, এখন আর কিছু খাব না।

নফর শুইয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু দেখে বলে গেছেন রোগী ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—ভাল বলকারক পথ্যের প্রয়োজন। কিন্তু কি দিয়া সে পথ্য কিনিবে? আজ যে এমন একটা পয়সাও নাই যা দিয়া সে এক পয়সার বার্লি আনিয়া পিড়ীতা স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দিবে। সে আর ভাবিতে পারিল না। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথার রক্ত যেন শুকাইয়া গিয়াছে।

বেলা একটু হেলিয়া আসিতেই নফর গরু দুটীকে মাঠ হইতে বাড়ী আনিল। জল খাওয়াইয়া তাদের গলায় ও পিঠের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, দু'বছর পূর্ব্বে অনেক কষ্টে একটা মুঠা টাকা খরচ করে আমি তোদের কিনে এনেছিলাম; আর এই দুই বছর ধরিয়া তোরাও বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের প্রতিপালন করেছিস; কিন্তু আজ দেনার দায়ে তোদের আর রক্ষে করতে পারলাম না। বলিতে বলিতে নফরের চোখ দিয়া জল আসিল। কিছুক্ষণ পরে দাড় দু'গাছা হাতে ধরিয়া হাটের দিকে লইয়া চলিল। আজ সেই তার শেষ সম্বল ও চাষীজীবনের একমাত্র সম্পদ গরুদুটীকে মাত্র চৌদ্দ টাকায় ঘুচাইয়া আসিল।

সকালে উঠিয়া নফর নিজেই কাছারীতে গিয়া উপস্থিত হইল। টাকা চৌদ্দটী নায়েব মহাশয়ের পায়ের গোড়ায় রাখিয়াই তাঁহার পা দু'খানা দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, বাবু চাষার ছেলের দিন চালানর এক মাত্তর সম্বোল সেই হালের গরু দুটী বেচেই এই নিয়ে এয়েছি। এই নিয়েই এবার রেহাই দিতে হবে। আর খুন করলেও একটা আধ্‌লা দেবার যো নেই।

নায়েব মহাশয় তাঁহার সুকঠোর দণ্ড নীতির প্রভাবেই যে আজিকার মত দুর্ব্বৎসরেও নফরের মত নিঃস্ব প্রজার নিকট হইতে এনগুলি টাকা এক সময়ে আদায় করিতে সক্ষম হইলেন, ইহা ভাবিতেও তিনি মনে মনে নিজের দক্ষতার প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, নে নে পা ছাড়। এ কোথাকার আপদ!

পা ছাড়িয়া বার বার সেলাম করিয়া নফর বাহির হইয়া আসিল। পথের উপর দাঁড়াইয়া সে ঐ খোলা মাঠটার দিকে উদাস নয়নে তাকাইয়া রহিল। ক্ষুব্ধ শিশু হঠাৎ স্নেহের স্পর্শ পাইলে যেমন করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে, নফরের তাপিত ললাটে ভোরের সজল স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া লাগিতেই তাহারও চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিল। মনে মনে বলিল, খোদা আজ এমনি জুলুম করেই যারা আমার পীড়িতা স্ত্রী ও ক্ষুধিত শিশুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে, তাদের কসুর তুমি মাপ করো না! সেদিন আর সে কাজে যাইতে পারিল না।

বৈকালের দিকে রুগ্না স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে শোনা গেল,—নফর মোড়ল! নফর বাহিরে আসিয়া দেখিল কাবুলি রহমৎ খাঁ সশরীরে উপস্থিত। সহসা যমদূতকে সুমুখে দেখিলেও নফরের মুখখানা এমন বিবর্ণ হইত না; যেমন হইল এই চার হাত লম্বা ঢিলে-জামা-পরা লোকটাকে দেখিয়া। গত বৎসর শীতের সময় তাহার নিকট হইতে ছয় টাকা মূল্যের দুইটী গায়ের চাদর ধারে কিনিয়াছিল। ইতিমধ্যেই বহু দিন কাবুলি টাকার জন্য আসিয়া গিয়াছে; শুধু ওয়াদা করিয়াই তাহাকে ফিরাইয়াছে। আজ আবার কি বলিয়া তাহাকে বিদায় দিবে? লজ্জায় অপমানে সে যেন একেবারে মরিয়া গেল। নামিয়া আসিয়া কাবুলির হাত দু'খানি ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, ভাই আজিও টাকার যোগাড় করে উঠ্‌তে পারি নি। আর দুটো দিন পরে এস-নিশ্চয়ই দিয়ে

দেব। কুৎসিৎ ভাষায় অনেক গালিগালাজ পাড়িয়া কাবুলি সেদিনের মতও চলিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কাবুলি আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিস্তর ডাকা হাঁকি করিয়াও কাহার সাক্ষাৎ পাইল না। নফর ঘরের ভিতরেই লুকাইয়াছিল; কিন্তু সেদিন সে আর কোন সাড়া দিল না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কাবুলি নফরের চৌদ্দ পুরুষকে জাহন্নমে পাঠাইয়া উঠিয়া গেল।

(৫)

আজ তিন দিন স্ত্রীর রোগ দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। একয়দিন যে কি ভাবে কাটিয়াছে সে একমাত্র নফরই জানিতেছে।

সেই সন্ধ্যা হইতেই ঝিল্ আজ কান্না জুড়িয়াছে। নফর তাহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেছে না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলে যখন কিছুতেই ঘুমাইল না; ক্রোধে বিরক্তিতে নফর একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল। ঠাস্ করিয়া তার গালে একটা প্রচণ্ড চড় কসাইয়া দিয়া তিক্তকণ্ঠে ধম্‌কাইয়া বলিল, পোড়া ছেলের চোখে আজ ঘুমও নেই। আপদ মরেও না। ফের কাঁদবি ত গলা টিপে একেবারে মেরে ফেলব। শিশু আর্ত্তকণ্ঠে মা মা করিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সখিনা তাহার ক্ষীণ চক্ষুদুটী মেলিয়া একবার চাহিল। অস্পষ্ট আলোকে নফর দেখিল, দু' ফোঁটা অশ্রু তাহার শুষ্ক চোখের কোণ বহিয়া কানের গোড়া পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিল। নফরেরও চোখ দুটী ফাটিয়া জল আসিল। পরক্ষণেই মনে মনে বুঝিল, এই নিরপরাধ ক্ষুদ্র শিশুটী ত আজ অন্যায় জিদ্ ধরিয়া কাঁদিতেছে না। পেট জ্বলিলে ঘুম আসিবে কেন? দুপুর বেলায় পাড়ার কে বুঝি দয়া করিয়া এক মুঠা তাহাকে দিয়াছিল। সারাদিন রৌদ্রে ধুলা মাটির মধ্যে খেলিয়া বেড়াইয়াছে; এখন দারুণ ক্ষুধা পেটে লইয়া ঘুমাইবে কেন? দুঃখে আত্মগ্লানিতে তাহার বুকের মধ্যে পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

গভীর রাত্রি। সারা বিশ্ব সুপ্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। পীড়িতা স্ত্রীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া নফর একাকী। অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে রক্তহীন সাদা মুখ খানার উপর মৃত্যুর ছায়া যেন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে—নিঃসাড় নিস্পন্দ দেহখানা একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। প্রদীপের ক্ষীণ আলোক রশ্মিটী মুমূর্ষু শীর্ণ মুখখানার উপর পড়িয়া কাঁপিতে থাকে; নফর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। ঘর-জোড়া সেই ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ক্ষুধিত শিশু বার বার কাঁদিয়া উঠে, সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যায় তাহাকে শান্ত করিতে। আবার ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর শিয়রে বসে। মনে মনে ভাবে একে তিলে তিলে মরণের দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার জন্য দায়ী কে? ব্যথায় ক্ষোভে বুকখানা তার ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজিয়া কত কি ভাবে—ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার থৈই হারাইয়া ফেলিয়া মনে মনে বলে, উঃ! খোদা! আর ত পারিনে। দুর্দ্দিনের এ বিষম রাত্রি যেন আর শেষ হইয়াও হয় না!

আজ ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসটুকুও নফরের কাছে একেবারে বিস্বাদ ঠেকিতেছে। মুমূর্ষু স্ত্রীকে এরূপ অবস্থায় একাকী ফেলিয়া রাখিয়া বাহির হইতেও তাহার কোন মতেই প্রাণ সরিতেছে না। কিন্তু কচি শিশু যে ক্ষুধার জ্বালায় চোখের সুমুখে এমনি ভাবে শুকাইয়া মরিবে তাহাও আর সহ্য করিতে পারে না, তাই সেদিন ফুফিকে উপলক্ষ্য মাত্র রাখিয়া বস্তুতঃ ভগবানের উপরেই সেই আসন্ন মৃত্যু-পথযাত্রীর ভার অর্পণ করিয়া সে কার্য্যের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

সারাদিন রৌদ্র ও কর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যা বেলায় নফর তিন আনার পয়সা ট্যাকে গুঁজিয়া ঘরে ফিরিল। কাবুলি রহমৎ খাঁ সেই দুপুর হইতেই উঠানে হানা দিয়া আছে। নফরকে আসিতে দেখিয়াই সে ছুটিয়া গিয়া নফরের হাত ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, শালা বেইমান্ এক্ষুনি টাকা ফেল্। মুহূর্ত্তে নফর আত্মবিস্মৃত হইল। সজোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিল, সে টাকা এখন দিতে পারিবে না। আর অবিলম্বে কাবুলি যদি তার বাড়ী ছাড়িয়া না যায় তবে ঝাঁটা পিটিয়া বাহির করিবে। ক্রোধে

কাবুলি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বিপুল বিক্রমে নফরের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া সেই ধুলার মাঝেই তাহাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। চোখের পলক মাত্র পড়িল না। ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নফর হিংস্র পশুর মতই কাবুলির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হস্তস্থিত দা' খানি সজোরে তাহার কাঁধের উপর বসাইয়া দিল। আর্ত্তকণ্ঠে একবার চীৎকার করিয়া উঠিতেই কাবুলির বিপুল দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। রক্তের বন্যা ছুটিল। নফর আর তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেও সাহস করিল না। ক্ষিপ্রপদে দাওয়ায় উঠিতেই আবার তেমনিই নামিয়া আসিল। গোয়ালের বেড়ার গায়ে ঝুলান এক গাছা মোটা গরুর দড়ি টানিয়া লইল; এবং সেই সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকিয়া বাড়ীর পিছনে ঐ ঘোষেদের আম বাগিচার ভিতর প্রবেশ করিল।

* * *

সন্ধ্যার আঁধার ক্রমে ঘন হইয়া উঠিল। পুলিশ ও পাড়ার লোকে শীঘ্রই বাড়ী ভরিয়া গেল। সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিল আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হইলেও কাবুলি প্রাণে মরে নাই! ক্ষত স্থান হইতে অত্যধিক রক্তপাত হওয়ায় তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে। স্থানীয় লোকের সাহায্যে তাহাকে সরকারী ডাক্তার খানায় পাঠাইয়া; পুলিশ সেই রাত্রেই নফরকে খুঁজিতে বাহির হইল... ..।

ভূপর্য্যটক

শ্রীলতাদেবী

হে চঞ্চল, ক্ষণিকের সখা, অশান্ত পথিক,
পায়ে তব নিত্য টুটে, ধরণীর স্নেহের শৃঙ্খল!
চপলার ক্ষণপ্রভা আলেয়ার আলো সে অলীক,
মূর্ত্ত হ'য়ে তোমাতে ফুটিল, ওগো নিঃসম্বল!
পরিয়াছ নিত্য তব আঁখিতে অঞ্জন,
নবরাগে হেরিয়াছ মোহিনী সে ধরিত্রীর মায়া,
পুরাতনে নাহি তব রতি, তুমি অবন্ধন।
বিশ্বে যত অপূর্ণ তিয়াস তুমি তার কায়া!
বাণী তব বিশ্বের বারতা, কণ্ঠে বাজে অসীমের সুর
চরণের প্রতিক্ষেপ বেগে ধায় নিত্য কত নবতীর্থ দূর।
তারুণ্যের হে প্রতীক, হে পান্থ প্রবীণ,
অর্ঘ্য নাও মিলন বেলায়,
কালি যদি ভুলে থাকো, থেকো কালি, আজি শুধু
মধুর মিলন, কালিকে বিদায়॥



শক্তিযোগী পীলস্সুড্স্কী

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান যুগে স্বাধীন পোলাণ্ডের জন্মদাতা জোসেফ পীল্‌সুড্‌স্কী যখন জন্মগ্রহণ করেন, রুশ-অধিকৃত পোলাণ্ডের রাজনৈতিক আকাশ তখন ভয়ানক ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল। ১৮৬৩ সালে পোলাণ্ডকে স্বাধীন করিবার জন্য গুপ্ত বিপ্লবীরা বিপ্লব করিতে যাইয়া যখন নিষাতিত, নির্ব্বাসিত ও পলাতক হইল এবং গৃহস্থগণ উপরের দিকে তাকাইয়া বুকভরা বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল, রুশিয়ার সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মতো কোনো ব্যক্তি কি কোনো শক্তি তখন পোলাণ্ডে ছিল না। এই রকম যখন দেশের অবস্থা সেই দুর্দ্দিনে ১৮৬৭ সালে পীলসুড্‌স্কী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের কালে পোলাণ্ডের আকাশে মাটীতে, গগনে পবনে হয়ত কোনো নূতন ভাব প্রকাশ পায় নাই; হয়ত কোনো আনন্দও কেহ প্রকাশ করে নাই; কিন্তু পোলাণ্ডের জয়লক্ষ্মী-ভাগ্যলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী সেদিন তাঁহার এই শক্তিমান পুত্রকে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে হাসিয়াছিলেন। মনে হয়, স্বাধীনতার জন্য পাগল পোলজাতিকে গৌরবমণ্ডিত করিবার জন্যই তিনি পীলসুড্‌স্কীকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

১৭৯৫ সালে তৃতীয় এবং শেষবারে রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মাণি এই তিন পরাক্রান্ত দেশ যার যার সুবিধা মতো পোলাণ্ডকে নিজেদের ভিতর ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইলেন। একদিনে একমুহূর্ত্তে একদেশ তিনভাগ হইয়া গেল; একজাতি তিনজাতি হইয়া; একভাষা, এক আদর্শ, এক কল্যাণ তিনভাগ হইল, হয়ত পোলাণ্ড জন্মের মতো একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল! পোলাণ্ডের গৌরব,—তার সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম তার ক্ষাত্রবল মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল; তার কবি-চারণ, তার বীরেন্দ্রগণ জন্মের মতো ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। পরাক্রান্ত শক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধে বাটোয়ার মোকদ্দমা করিবার জন্য কোনো আদালত দুর্ব্বলের সে দিন জানা ছিল না। সেই জন্যেই শক্তিমানেরা শক্তির বাহাদুরী দেখাইয়া যার যার ঘরে ফিরিলেন,—পোলাণ্ড দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রু ফেলিল।

অতঃপর জার্ম্মাণি ফন্দী আঁটিল, তার অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, পোলাণ্ডকে জার্ম্মাণ ভাব-ভাষায়, পোষাকে পরিচ্ছদে, আদবে-কায়দায়, হাসিতে কাশিতে একেবারে জার্ম্মাণ করিয়া লইয়া বৃহত্তর জার্ম্মাণি গড়িয়া তুলিবে। অষ্ট্রিয়া, পোলাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীতে, জাতীয় সাহিত্যে, জাতীয় সভ্যতার প্রচারে, তার মাথার উপর আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার, কি পায়ের তলায় মাটী ফাটিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই তার এলাকার তিন বড় বড় সহরে—ক্রাকো, গ্যালিশিয়া এবং লেম্‌বার্গে—পোল-সভ্যতার প্রচার করিবার খোলা অনুমতি দিল। আর রুশিয়া! সে চালাইল তার এলাকায় অত্যাচারের পর অত্যাচার। কি জাতীয় স্বাধীনতা, কি ধর্ম্মের স্বাধীনতা, কি শিক্ষা সব দিক দিয়াই সে দস্যুর হাতে মানুষের যাহা কিছু সম্পদ সবই একেবারে কাড়িয়া লইল। রুশীয় পোলাণ্ডে মরণভয় আর চরম অত্যাচার উলঙ্গ হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতে লাগিল। সিপাহী-শাস্ত্রীকে পোলদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য বেপরোয়া ক্ষমতা দেওয়া হইল। আইন এবং শৃঙ্খলা বলিয়া কোনো বস্তু আর রহিল না; লোকেরা লঘুপাপে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে লাগিল। জন্মভূমির জন্য কোনোরকম দরদ-দেখানোর অর্থ হইল দীর্ঘকালের জন্য 'শ্রীঘর' বাস আর সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন। জাতীয় নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হইল। পোল-সাহিত্যের গ্রন্থকারের জন্য ব্যবস্থা হইল জেলখানা; পোল-ইতিহাসের মালিককে দেখাইয়া দেওয়া হইল সাইবিরিয়ার পথ। ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ইয়োরোপের এক উজ্জ্বল সুন্দর চিত্র।

তারপর ?—মানুষ মরণভয় ভুলিয়া গেল। যুবকেরা মৃত্যুকে ছানিয়া অমৃতের স্বাদ বুঝিবার জন্য রুশীয় পোলাণ্ডে সাগর মন্থনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ভাব ছড়াইয়া পড়িতেই কর্তৃপক্ষ চোখ রাঙাইলেন, নানা রকম ভয় দেখাইতে সুরু করিলেন। জন কতক আপাততঃ ভালো ছেলের মতো ঘরমুখো হইল, আর যাহারা চিরদিনই বেয়াড়া রকমের তাহারা সকল শাসনের হাত এড়াইয়া গোপনে গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিয়া গেল। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হইল পোল-জননীদের দান! তাঁহারা ঘরে থাকিয়া সন্তানদের অন্তরে স্বদেশ প্রেম জাগাইতে লাগিলেন; রূপকথার পরিবর্তে রুশ-অত্যাচারের কথা শুনাইতে লাগিলেন; শিখাইতে লাগিলেন, পোলাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া মরার চেয়ে গৌরবের এবং পুণ্যের কাজ আর নাই।

পোলাণ্ডের স্বাধীনতা ছিল কি স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে,—ইহার যে কোনোটীর সম্বন্ধে বেদনা কি আনন্দ প্রকাশ নিষিদ্ধ বলিয়া আইন জারী হইল। রুশিয়ার গুপ্তচরে গুপ্তচরে পোলাণ্ড ছাইয়া ফেলিল। ইহারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে, অন্ধকারে আলোতে, উঠানে বাড়ীর আনাচে-কানাচে, সদর রাস্তার উপরে, অলিতে গলিতে দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা কান পাতিয়া রহিল, কেহ "স্বাধীনতা" শব্দ উচ্চারণ করে কিনা, শুনিবার জন্য। রুশীয় পোলাণ্ডে সেদিন নিতান্ত ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও গুপ্তচরদিগকে ফাঁকি দিবার জন্য দেশের সম্বন্ধে হেঁয়ালীতে কথা বলিতে এবং কাজে সামাল দিয়া চলিতে বেশ ওস্তাদ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্য, বিশেষভাবে রুশিয়ার অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রে ইহারা কায়মনে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

পোল-বেদনার যৌবনমূর্তি রুশিয়ার বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল ১৮৬৩ সালে। এই বিপ্লবে পোলাণ্ড স্বাধীন হইয়া গেল না বটে, তবে রুশিয়া এবং জগৎ একই সময়ে বুঝিল পোলাণ্ড মরে নাই; এক পোলাণ্ড তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও তাহার রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক ভাবেই প্রবাহিত হইতেছে; এক দেশে তিন তিন রকমের পাস পোর্টের ব্যবহার থাকিলেও পূর্ব্বের এক পোল-আত্মা এখনো ঠিক তেমনই আছে। পোল-শিশুরা বাল্যশিক্ষা লাভ করিতেছিল এই বিপ্লব গ্রন্থের ভিতর দিয়া!

দেশের শিশুরা যখন নানা রকম খেলাধূলায় সময় কাটাইত, পীলসুড্‌স্কী তখন পোল-ইতিহাসের গৌরব, "স্বাধীনতা" "লড়াই" ইত্যাদি বিষয় শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। যে সব খেলা তিনি ভাই বোনদের সহিত খেলিতেন, তাহাই পরিণত হইয়া দেখা দিয়াছিল তাঁহার পরিণত বয়সে পোল-স্বাধীনতার ষড়যন্ত্রের ভিতর। তিনি খেলা-ধূলায় যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন বই লইয়া পড়িতে বসিতেন। যুদ্ধের গল্প, গ্রীক এবং রোমানবীরদের বীরত্ব কাহিনী, এবং নেপোলিয়ন সম্বন্ধে নানারকম সাহিত্যই ছিল তাঁহার মনের প্রধান খোরাক। যে সকল পোল-সৈন্য নেপোলিয়নকে স্পেন-জয়ে সাহায্য করিয়াছিল; সারাগোসা এবং সোমোসীরার চারিদিকে যুদ্ধের আগুন জ্বালাইয়াছিল; যে বীরত্ব ওস্তারলিৎস-এ লড়িয়াছিল, মোস্‌কাউকে পুড়াইয়া ছারখার করিয়াছিল, পীলসুড্‌স্কী সেই সব বার বার পড়িতেন। পোলাণ্ডের যে সকল সন্তান নেপোলিয়নের মার্শালরূপে ফ্রান্সের গৌরব বাড়াইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দিত হইতেন। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের হইলেও পীলসুড্‌স্কী তাঁহাকে পোলাণ্ডের জাতীয় জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তি জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। স্বদেশ-প্রেমিক পীলসুড্‌স্কীর নিকট নেপোলিয়নই ছিলেন একমাত্র আদর্শ পুরুষ।

১৮৭৪ সালে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের ফলে পীল-সুড্‌স্কী-পরিবারের সমুদয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। ঋণগ্রস্ত, দারিদ্র্যপীড়িত পীলসুড্‌স্কী-পরিবার পথের ফকীর হইয়া ভিলনায় চলিয়া গেলেন।

এখানে আসিবার পর জোসেফ্ এবং তাঁহার দাদা ব্রোনিস্‌ল এক রুশ পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। জন্মভূমিকে তিনি সব চেয়ে বেশি ভালোবাসিতেন। রুশ পণ্ডিতের পাঠশালায় তাঁহার সেই ভালবাসাকে অবমানিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। পোলাণ্ডের জন্যই যিনি জন্মিয়াছেন পোলাণ্ডের জন্যই যিনি মরিতে আসিয়াছেন,

পোলাণ্ডের স্বাধীনতা যাঁহার লক্ষ্য, পোলাণ্ডের গৌরবে যাঁহার গৌরব—পোলাণ্ডের অনন্ত আকাশ তাঁহার গৃহছাদ, পোলাণ্ডের বিরাট বক্ষ তাঁহারই উপযুক্ত শয্যা। সেইজন্যই অঘটন ঘটন পটীয়সী পোলাণ্ডের ভাগ্য বিধাত্রী পীলস্‌ড্‌স্কীর অন্তরে দেশের দুঃখদারিদ্র্য অপমানের আগুন জ্বালাইয়া দিবার নিমিত্তই তাঁহার ঘর বাড়ী বিত্তসম্পত্তি পুড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে ভিলনায় টানিয়া আনিয়াছিলেন।

এই সকল রুশ-পাঠশালার আধা জানোয়ার আধা মানুষ পণ্ডিতগুলা, যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যালাভের পর পোলাণ্ডের শিশুদিগকে নিজেদের বাপ-ঠাকুরদাদার নাম, ধর্ম্মকর্ম্ম, স্বদেশী গান-কবিতা এক কথায় যাহা কিছু পোলিশ তাহা ভুলাইয়া দিবার মতো শিক্ষা রুশিয়ার গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ে লাভ করিবার পর, পাঠশালায় পাঠশালায় রপ্তানি হইত। পাঠশালায় তো বটেই রাস্তাঘাটেও স্বদেশী পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান নিষিদ্ধ বলিয়া আইন জারী হইল। পাঠশালায় পাঠশালায় পোলভাষার জবাই চলিল। শিশুমনে তথাকথিত দর্পের বটবৃক্ষ রাতারাতি গজাইয়া দিবার জন্য ছাত্রদের হাতে হাতে রুশভাষায় ছাপানো স্তবের বই দেওয়া হইল। রাস্তা, স্কোয়ার, বাগ-বাগিচা, দীঘি-সরোবর ইত্যাদির কপালে রুশনাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইল; পোল জাতি "নিজ বাসভূমে পরবাসী হইল"। রুশ-অধিকৃত পোলাণ্ডের ইতিহাস হইল পোলদিগের জাতীয় ইতিহাস। অতি সাবধানতার সহিত মাপিয়া জুখিয়া শিক্ষা বিভাগ এমন ইতিহাস রচনা করিলেন যাহাতে রুশিয়ার গৌরব এবং পোলাণ্ডের অধঃপতন মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার আর উপায় রহিল না। কাণ্ড জ্ঞান বর্জ্জিত শিক্ষকরা সেই সকল কথা ছাত্রদিগকে আকণ্ঠ পুরাইয়া দিতেছিলেন।

শিক্ষকদের এই রকম শিক্ষার ফলে ছাত্রদের ভিতরে বিদ্বেষভাব মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। যদি শিক্ষক এবং স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ দেখিতেন কোনো ছাত্রের তাহাদের শিক্ষায় আস্থা নাই তাহা হইলে তাহাকে স্কুল হইতে বিদায় করিয়া দিতেন।

রুশ কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের গাম্ভীর্য্যটাকে দামী পোষাক-পরিচ্ছদের সাহায্যে আরো জাঁকালো করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় শৃঙ্খলা বিধানটা যে খুব বড় জিনিষ এ সবও অনাবশ্যক আওড়াইতে ছাড়িতেন না। পরাধীন পোলদের মনের উপর নানা দিক দিয়া প্রবল পরাক্রান্ত রুশ শক্তির ছাপ মারিয়া দিবার পক্ষে এগুলি খুব বড় উপায় বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এই সব উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাদের জন্য এসব করা হইত সেই ছাত্রদল এসবে মোটেই ভোলে নাই। তাহাদের বিরক্তি বাড়িয়া চলিয়াছিল।

মূর্খের অশেষ দোষ। এই সকল শিক্ষকরা রাতারাতি পোলাণ্ডকে হজম করিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। যে আগুন স্বাভাবিকভাবে জ্বলিতেছিল তাঁহারা সেই আগুনকে আরো উস্কাইয়া দিলেন। যে সকল স্বদেশ-প্রেমিকের ছবি জননীরা শ্রদ্ধা করিতেন; যাঁহাদের কথা বলিতে বলিতে জননীরা অশ্রু ফেলিতেন; নষ্টপ্রায় ছবি-গুলিও যাঁহারা অতি যত্নে গর্ব্বের বস্তু বলিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন; যাঁহাদের আদর্শে জননীরা নিজ সন্তান-দিগকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, সেই সকল পুণ্যশ্লোক বীরদিগকে শিক্ষকগণ শঠ, বদমায়েস, বিশ্বাস ঘাতক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা যে সকল কাজ করিয়া দেশ বিদেশে বরণীয় হইয়াছেন, শিক্ষকরা সেই সকল কাজ কর্ম্মের অকথ্য নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। যে রুশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহারা বিপ্লব ঘটাইয়া কীর্ত্তিমান হইয়াছিলেন, ভাবী যুবকরা আর যাহাতে তাঁহাদের পথে না যায় ভালো ছেলে হয়, লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হয়, সে সম্বন্ধে অপত্যজ্ঞানে চিরহিতাকাঙ্খী পিতার মতো সময় পাইলেই শিক্ষকরা উপদেশ দিতেন।

শিশুরা স্কুলে যাহা শুনিত বাড়ীতে আসিয়া জননীদের নিকট তাহা বলিত। জননীরা ইহাতে ভয়ানক ভয় পাইতেন। কারণ এই সকল শিশুরা যদি দীর্ঘকাল রুশ-শিক্ষার আওতায় থাকে তাহা হইলে পোলাণ্ডের স্বাধীন প্রভাত দেখিবার আর কোনো ভরসা থাকিবে না। জননীরা প্রত্যহ রাত্রিতে একবার ঐ সকল ছবি বাহির করিয়া সন্তানদিগকে দেখাইতেন; সময় এবং সুযোগ পাইলেই স্বদেশী কবিতা ও গান শুনাইতেন। শিক্ষকদের এই রকম চাপাচাপির ভিতর পড়িয়াও একমাত্র জননীদের জন্যই পোল শিশুরা নিজ-দিগকে হারাইয়া ফেলিতে পারে নাই।

——•:•:•——

'গতি মোর পুর্ণতার পানে'

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রতিদিন যাত্রাপথে সহস্র বিচ্যুতি,
ত্রুটি ভেদ করি'
চলিয়াছি পুর্ণ হ'তে পূর্ণতারি পানে
একলক্ষ্য স্মরি'।

নির্ভীক নিষ্ঠুর আমি পশ্চাতে ফিরিনা,
ক্ষোভে নাহি পুড়ি;
ঝড়-ঝঞ্ঝা পিছনে সম্মুখে—আমি হেরি
পূর্ণের মাধুরী।

চলিয়াছি যুগ হ'তে কত যুগান্তর
আমি গৃহহারা
ঊর্দ্ধে মোর আকাশ বেড়িয়া, ধরিত্রী সে
পার্শ্বে চক্রাকারা।

যত দোষ, গুণ যাহা পারাইয়া ক্রমে
চলিয়াছি বেগে,
কত কী আঘাত ক'রে ফিরে যায় পুনঃ
মোর অঙ্গে লেগে।

নূতন উদ্যমে চলি দ্বিধা-সন্দ'হীন
অমর অক্ষয়;
যা-ই করি যাহা ইচ্ছা তবু কণ্ঠ গাহে
পূর্ণতারি জয়।

যদি ভুল ঘিরে ফেলে সুকঠিন জালে,
যদি লাগে ভয়,
উচ্চ-কণ্ঠে কহিব নির্ভয়ে, ' চিরন্তন
এই নয় নয়।"

চিত্ত যাহা চাহে একমনে সেই সত্য
সেই সত্য হ'বে,
ক্ষণেকের ভ্রম-পরমাদ, সে-কি মোরে
জয় ক'রে ল'বে?

প'ড়ে যাই, ঝ'রে যাই যা' হই—ইহারা
পূর্ণতারি হাতে
সমর্পিয়া দিবে মোরে নিশ্চয় সে এক
অজানা প্রভাতে।

আমি যেন বৃক্ষ-শিশু দাঁড়াইয়া আছি
ধ্যান-মৌন সম,
ভ্রূক্ষেপ নাহিক কিসে সম্মুখে পশ্চাতে
যাহা আছে মম।

কাল-বৈশাখীর লীলা ভৈরব তাণ্ডবে
ভেঙ্গে দেবে শাখা,
টুটিবে না, পড়িবে না উচ্চশিরে মোর
দাঁড়াইয়া-থাকা।

বর্ষার বর্ষণ-ধারে স্নান করি' হ'ব
ধৌত পূত-প্রাণ;
যাহা চাই তা'রি ধ্যান, তা'রি একমনে
করিব সন্ধান।

দুর্জ্জয় শীতের কোপে কান্তিভ্রষ্ট আমি,
শুষ্ক মৃত-প্রায়
সশঙ্কিত, ভগ্নচিত্ত, বিক্ষোভিত নহি
তথাপি তাহায়!

সত্য জানি নিশ্চয় সে-বসন্ত আমার
দৈন্য দেবে মুছি'
পরিপূর্ণ নবপত্রে সুসজ্জিত পুনঃ
সুপবিত্র শুচি।

ঝ'রে যা'ব ক্ষণে ক্ষণে এমনি প্রত্যহ
পূর্ণ হ'ব তবু,
গতি মোর পূর্ণতার পানে, জানি—জানি
অন্যে নহে কভু।

নারীসাহিত্যের মর্য্যাদা

শ্রীকালিদাস রায়

আমাদের দেশে নারীজাতির সকল চেষ্টাকেই সাধারণ সার্ব্বজনীন আদর্শে বিচার করা হয় না—নারীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শের মাপ কাঠিতে ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। সাহিত্যে নারীর দান সামান্য নয়—অথচ সে দানের কথা স্বীকার করিবার সময় পুরুষের দানের সহিত তাহাকে একশ্রেণীতে গণ্য করিয়া বিচার করা হয় না—নারীজাতির শক্তিকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর মনে করিয়া প্রশংসাচ্ছলে লেখিকাদিগকে উৎসাহিত ও আশ্বস্ত করা হয়। এই প্রকার বিচারে যে একটা কৃপার ভাব মিশ্রিত আছে তাহাতে লেখিকাদের মর্য্যাদাহানি হয়। এইরূপ কথাই ইদানীং একটি সুলেখিকা একটি প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। লেখিকা এই প্রসঙ্গে যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নয়।

আমার মনে হয়, যদি নারীপুরুষনির্ব্বিশেষে অপক্ষপাত-সাহিত্য-বিচার হয় তাহাতেও মহিলাসাহিত্যের মর্য্যাদা বিশেষ কিছু বাড়িবে না—তাহাতে নারীজাতির প্রতিই অধিকতর শ্রদ্ধাই সূচিত হইবে। এদেশে আবহমান কাল হইতে পুরুষজাতিই সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। পুরাণ ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—ভারতবর্ষে কোন কোন নারীও কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন—কিন্তু তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। পুরুষই সাহিত্যকে জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়া রসজগতে বিরাট সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইদানীং স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচারে নারীজাতির মধ্যে সাহিত্যচেষ্টা উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই যে মহিলা রচিত সাহিত্য ইহার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য কোথা?

অধিকাংশ মহিলাসাহিত্য পুরুষ রচিত সাহিত্যেরই অনুকরণ মাত্র নয় কি? মহিলাদের রচিত সাহিত্য যতই উচ্চশ্রেণীর হউক—পুরুষ রচিত সাহিত্যের অনুবর্ত্তনে তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা কোথায়? এখানে কথা হইতে পারে—সাহিত্যের আদর্শ বিশ্বজনীন—তাহা পুরুষের নিজস্ব হইতে পারে না। নারী পুরুষসাহিত্যের অনুকরণ করে নাই—পুরুষের মত সেও সাহিত্যের বিশ্বজনীন আদর্শেরই অনুসরণ করে। ইহার উত্তরে এই বলিতে চাই—সাহিত্যের আদর্শ কাহারও নিজস্ব নয় সত্য—কিন্তু রসদৃষ্টির একটা স্বাভাবিক তারতম্য আছেই। নারী ও পুরুষের জীবনের বৈচিত্র্যে যে যথেষ্ট বিধিনির্দ্দিষ্ট পার্থক্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। জীবনের এই বিধিনির্দ্দিষ্ট পার্থক্য দৃষ্টির পার্থক্যও সৃষ্টি করিবে ইহা স্বাভাবিক। পুরুষ যে দৃষ্টিতে নারী, পুরুষ, প্রকৃতি, সমাজ ও সংসারকে দেখিয়াছে ঠিক সেই দৃষ্টিতেই নারীরও দেখিবার কথা নয়। প্রত্যাশা করা যায়, নারী তাহার নিজস্ব স্বাভাবিক দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিবে এবং সেই দৃষ্টিই তাহার রচিত সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিবে। পুরুষের দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যকেই অনুসরণ করিয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি তাহাকে পুরুষ রচিত সাহিত্যের অনুবর্ত্তন ছাড়া আর কি বলিব? নারী যদি আপনার নিজস্ব স্বতন্ত্র স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎকে দেখিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করে তবেই তাহার রচিত সাহিত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা জন্মে। পুরুষের আহৃত উপকরণ লইয়া অথবা পুরুষের মতিগতি বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও দৃষ্টি ভঙ্গীর অনুসরণ করিয়া রচিত সাহিত্য কিছুতেই পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করিবে না। পুরুষের মরুব্বিয়ানার হাত হইতে রেহাই পাইবে না। আমি লেখিকাকে অনুরোধ করি তিনি একটি ভাবিয়া দেখুন—আমাদের দেশের লেখিকারা কতটা নারী চিত্তের নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও মতিগতির সহায়তায় সাহিত্য সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করিয়াছেন—একটি প্রবন্ধে তাহাই দেখাইয়া দিন। তাহা হইলে নারী সাহিত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা সূচিত হইবে।

ন্যায়-দর্শন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম, এ

গৌতমের ন্যায়-দর্শন ভারতবর্ষে যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছিল। ন্যায়কে দর্শন না বলিয়া তর্কশাস্ত্র (logic) বলিলে আরো ভালো হয়। এক সময়ে ন্যায় শাস্ত্রের গভীর আলোচনায় বাঙালী মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং কুশাগ্র নৈয়ায়িক বুদ্ধিতে সমস্ত ভারতবর্ষকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। নদীয়া তখন ছিল ন্যায়ালোচনার মূলকেন্দ্র। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে এই নদীয়ার পণ্ডিতদিগের নিকট ন্যায় শিক্ষা করিতে শতশত জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র বাংলা দেশে ছুটিয়া আসিত।

গৌতমের ন্যায়সূত্র ন্যায় দর্শনের আদিম গ্রন্থ। এই পুস্তককে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীকালে অনেক ভাষ্য বর্ত্তিকা এবং টীকা সঙ্কলিত হইয়াছে। ন্যায়ভাষ্য ন্যায়সূত্রের আদিম টীকা। ইহা পক্ষিল স্বামীন (বাৎস্যায়ন) কর্ত্তৃক লিখিত এবং জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। ন্যায় ভাষ্যের আবার ন্যায় বর্ত্তিকা ভাষ্য নামে একখানি টীকা আছে,—ভাষ্যকারের নাম উদ্যতকর আচার্য্য। উদ্যতকর আচার্য্যের টীকা দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় ইহারও একখানি ভাষ্য লিখিত হইয়াছিল। ইহার নাম ন্যায়বর্ত্তিকা তাৎপর্য্য টীকা—লেখক বাচস্পতি মিশ্র। ভাষ্যের ভাষ্য তাহার আবার ভাষ্য এই করিয়া কঠিন ন্যায় শাস্ত্র সহজ এবং প্রাঞ্জল হইয়াছে। উদয়ন আচার্য্য নামে একজন টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র কর্ত্তৃক লিখিত ভাষ্যের ন্যায় বর্ত্তিকা তাৎপর্য্য পরিবধি নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

এতদভিন্ন কেশবমিত্রের তর্কভাষা, মাধবদেবের তর্কভাষা সারমঞ্জরী, গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের ন্যায় সংক্ষেপ প্রভৃতি বহুগ্রন্থ ন্যায় দর্শন বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভাষা-পরিচ্ছেদ নামে ন্যায় বিষয়ে একখানি পুস্তক লেখেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংলাভাষায় ইহার টীকা লিখিয়াছেন।

মুখ্যতঃ ন্যায় অংশের (logical portion) উপর ভিত্তি করিয়া গনেশ উপাধ্যায় তাঁহার চিন্তামনি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ন্যায় দর্শনের ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। নদীয়ার পণ্ডিতগণ ছাত্রদিগকে এই গ্রন্থ হইতেই ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করিতেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মতামত এই পুস্তককেই ভিত্তি করিয়া প্রচারিত হয়। তিনি নিজে এই গ্রন্থের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

অন্যান্য দার্শনিকগণের মত ঋষিগৌতম ও নিশ্রেয়স কি প্রকারে লাভ করা যায়, তাহার অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃতজ্ঞান (perfect Knowledgo) অর্থাৎ সত্যের সম্বন্ধে জ্ঞানকেই (Knowledge of truth) তিনি নিশ্রেয়সেরএকমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অনেক অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হয়, বিশেষতঃ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। যে এই জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সে শোক তাপের অনেক উপরে উঠিয়া যায় এবং পুনর্জন্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। সে নিশ্রেয়স এবং মোক্ষলাভ করে।

মানব জীবনে এতদুঃখ তাপ এইজন্য যে আত্মা জড়দেহের সংস্পর্শে আসে এবং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। মানসিক প্রবৃত্তির জন্য মানবের পুনর্জন্ম হয় এবং এই প্রবৃত্তি হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফলের সৃষ্টি। মানবের স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করিতে হইবে। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির কর্ম্মফলে মানব পরজন্মে সুখ এবং দুষ্কৃতির কর্ম্মফলে পরজন্মে দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

দোষের দ্বারা প্রবৃত্তির জন্ম। মিথ্যা জ্ঞান বা অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিলে দোষ দূর হইবে এবং সংসঙ্গে প্রবৃত্তিও ধ্বংস হইবে। প্রবৃত্তি ধ্বংস হইলে পুনর্জন্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখতাপ লুপ্ত হইয়া যাইবে। দুঃখ তাপ দূর করিয়া

আত্মাকে চরম বিশ্রাম স্থলে আনার নামই নিশ্রেয়স। কি করিয়া আত্মা এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মানুষের মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন্যায়-দর্শনের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য।

গৌতম প্রথমেই তিনটি জিনিষের নামোল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, লক্ষণ, পরীক্ষা—এই তিনটি বিষয়ের সাহায্যে মিথ্যাজ্ঞান দূর করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কোন বস্তুর কি নাম, কি কি লক্ষণ এবং সে বিষয়ে কতদূর কি জানা গিয়াছে বা জানা যাইতে পারে। এই পথ অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিষয়ে ন্যায়ের দ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ করিতে হয়।

প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ষোলটি পদার্থে অভিজ্ঞ হইবার প্রয়োজন হয়। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল জাতি এবং নিগ্রহস্থান এই ষোল প্রকার পদার্থে সম্যকরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি প্রধান এবং অন্যান্য সমস্তগুলি এই প্রথম দুইটি পদার্থের সাহায্যকারী।

ন্যায়ের উদ্দেশ্য প্রমেয়কে প্রমাণ করা। প্রমেয় কি? সর্ব্বশুদ্ধ বারোটি বস্তুকে ন্যায় প্রমাণ করিতে চাহে। এই বারোটি বস্তু কি কি! আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়-নিচয় অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ এবং অপবর্গ।

ইহাদের বিষয়ে সম্যকরূপে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ইহাদিগকে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিতে হয়। এই প্রমাণ চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। দর্শন এবং স্পর্শের দ্বারা যে প্রমাণ তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণের নাম উপমান, কার্য্য কারণ দর্শাইয়া প্রমাণের নাম অনুমান এবং পূর্ব্বমুনি ঋষিদিগের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অথবা পবিত্র বৈদিকবাণীর দ্বারা যে প্রমাণ তাহাকে শাব্দিক প্রমাণ কহে।

"আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ প্রবৃত্তি-দোষ প্রেত্যভাব ফল-দুঃখাপবর্গাস্ত-প্রমেয়ম।"

এই দ্বাদশ বস্তুর প্রথম বস্তু আত্মা। সাংখ্য দর্শনের ন্যায় ন্যায়দর্শন বহু আত্মার অস্তিত্ব মানিয়া লয়। যোগের মতে আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। পরমাত্মা এক—সুখ দুঃখের অতীত এবং অসীম জ্ঞানের অধিকারী। জীবাত্মাও অসীম (Infinite), কারণ যেখানেই জড়দেহের অস্তিত্ব সেখানেই জীবাত্মার উপস্থিতি। জীবাত্মার পক্ষে কর্ম্মফল সুখদুঃখ সমস্তই আছে। ইহা চিরস্থায়ী, কারণ ইহা অসীম। ভিন্ন ভিন্ন জীবের দেহে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। জীবাত্মা চৌদ্দপ্রকার গুণের অধিকারী,—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, পাপ, পুণ্য কল্পনা-শক্তি।

আত্মা সর্ব্বানুভাবী, সর্ব্বভোক্তা এবং সর্ব্ব-দ্রষ্টব্য। সমাধিযোগে পাপ পুণ্যের অতীত হইলে আত্মার ভিতরে সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব স্থান পায় এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ প্রকটিত হইয়া থাকে।

শরীর দ্বিতীয় প্রমেয় বস্তু। কতকগুলি অংশের সমষ্টি লইয়া শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। অণু পরমাণু শরীরকে পুষ্ট করিয়াছে। আত্মা, জ্ঞান এবং অনুপ্রেরণার (sentiment) আশ্রয়স্থল; শরীর কতকগুলি মাংসপেশী এবং ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি। ইহার গঠন পার্থিব এবং যে সমস্ত গুণাবলী পৃথিবীর আছে সে গুলি ইহাতেও উপলক্ষিত হইবে।

মানব শরীর ব্যতীত গৌতম অন্যান্য শরীরের কথাও বলিয়াছেন! ইহারা এই পৃথিবী এবং অন্যান্য সমস্ত জগত ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। উপনিষদের মত গৌতম তাহাদের জলময়, আগ্নেয় এবং বাষ্প এই তিন প্রকারের শরীর বলিয়া উপখ্যাত করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রমেয় বস্তু ইন্দ্রিয়-বর্গ। ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ইহারা জ্ঞান লাভের যন্ত্র বিশেষ। অণু পরমাণু লইয়া গঠিত ইন্দ্রিয় পাঁচটি—আঘ্রাণ, আস্বাদ, দর্শন, স্পর্শ এবং শ্রবণ। "ঘ্রাণ-রসন-চক্ষুস্ত্বক্-শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ"। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের মতে যেমন এই ইন্দ্রিয় নিচয় অন্তর্ব্বুদ্ধির আকার পরিবর্দ্ধিত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে, ন্যায়ের মতে সেরূপ ভাবে ইহারা সৃষ্ট হয় নাই। ন্যায়ের মতে ইহারা জড় পদার্থ—পঞ্চভূতের সমষ্টি।

দর্শনেন্দ্রিয় স্বচ্ছ, শ্রবণেন্দ্রিয় বায়ুময়, আস্বাদেন্দ্রিয় জলময়, স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ব এবং আঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব। চোখের

মনি দর্শনেন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থল, শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিবাস স্থান—কর্ণপটহ, আঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বসতিস্থল—নাসিকা দ্বার অথবা নাসিকার অগ্রভাগ, আস্বাদেন্দ্রিয়ের—জিহ্বার অগ্রভাগ এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের—ত্বক। জ্ঞানেন্দ্রিয়-নিচয়ের দ্বারা গন্ধ, আস্বাদ, বর্ণস্পর্শ এবং শব্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে। বৌদ্ধদিগের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, সাংখ্যের মতে এগারোটি কিন্তু ন্যায়-দর্শনের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় মাত্র ছয়টি—আঘ্রাণ, আস্বাদ, দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ এবং মন।

মন সুখ দুঃখ এবং অন্তর্বুদ্ধি (internal sensation) অনুভব করিবার যন্ত্র বিশেষ। মন যখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে তখনই কেবল বাহ্যবস্তু বিষয়ে সচেতন হয়। আমাদের এক সময়ে কেবল মাত্র একটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়—ইহার দ্বারা মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক আত্মার মাত্র একটি মন আছে। ইহা অসীম—অসীম নহে কিন্তু চিরস্থায়ী (eternal).

বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহারাই অর্থ। এই অর্থই যোগের চতুর্থ প্রমেয় বস্তু। "গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ শব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ।"

প্রমেয় পঞ্চম বস্তু বুদ্ধি। বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান একই অর্থজ্ঞাপন করে। বুদ্ধির দুইটি রূপ—অনুভব এবং স্মরণ। অনুভব সত্য হইতে পারে এবং মিথ্যাও হইতে পারে। স্মরণও সত্য এবং মিথ্যা দুইই হইতে পারে। জাগরণে সাধারণতঃ সত্যস্মরণ আসে এবং ঘুমে মিথ্যা স্মরণের উপলব্ধি হয়।

ষষ্ঠ প্রমেয় বস্তু—মন। ইহা ইন্দ্রিয়-নিচয়ের অন্যতম। বাহ্য বস্তু বিষয়ে ইহার কোন চেতনা না থাকিলেও, অন্তর্বুদ্ধিতে ইহা অচেতন থাকে। আত্মা, শরীর প্রভৃতির ন্যায় মনকেও সপ্রমাণ করিতে হইবে।

"বাক্য, বুদ্ধি এবং দেহ দ্বারা সৃষ্ট গুণ বিষয়কে প্রবৃত্তি বলে। এই স্থলে কিন্তু বুদ্ধি বলিতে মন ধরিয়া লইতে হইবে, এবং প্রবৃত্তি শব্দের প্রকৃত অর্থ হইবে তজ্জনিত পাপ-পুণ্য। প্রবৃত্তির দ্বারাই জীবের পুনর্জ্জন্ম সংঘটিত হয়। প্রবৃত্তি ন্যায়দর্শনের সপ্তম প্রমেয় বস্তু। রাগ, দ্বেষ ও মোহ হইতেই প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে ইহা মৌখিক, মানসিক এবং দৈহিক। মৌখিক প্রবৃত্তি বাক্য, মানসিক প্রবৃত্তি চিন্তা প্রভৃতি, এবং দৈহিক প্রবৃত্তি হাব ভাব চলা ফেরার দ্বারা সৃষ্ট হয়।

অষ্টম প্রমেয় বস্তু দোষ। দোষ কি জানিতে হইবে। বাসনা, ইচ্ছা, দ্বেষ, ভুল, প্রভৃতিই দোষ।

প্রেত্যভাব প্রমেয় নবম বস্তু। মৃত্যুর পরে জীবাত্মা যে অবস্থায় উপনীত হয় তাহাই প্রেত্যভাব। "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ॥" পুনরুৎপত্তিকে প্রেত্যভাব বলে। জন্ম ও মরণের এই যে প্রবাহ ইহাকেই প্রেত্যভাব বলিয়া জানিতে হইবে। এই প্রেত্যভাব সৃষ্টির গোড়া হইতে চলিয়া আসিতেছে।

ফল, ন্যায়দর্শনের প্রমেয় দশম বস্তু। কর্ম্ম করিলেই ফল উৎপন্ন হইবে। ফলকে পূর্ণভাব বলা হইয়া থাকে। শরীর মন এবং ইন্দ্রিয় নিচয়ের সাহায্যে কর্ম্মের পরিণাম স্বরূপ সুখ দুঃখ উপভোগ করিতে হয়।

জগতের প্রত্যেক জীবই অল্প বিস্তর দুঃখ পায়। দুঃখ জগতে চিরন্তনী সত্যরূপে বর্ত্তমান। সাংখ্য যেমন দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, ন্যায়ও দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে বলে নাই। দুঃখ ন্যায়ের প্রমেয় একাদশ বস্তু। এই দুঃখকে দূর করিয়া তবে অপবর্গ লাভ করিতে হয়।

অপবর্গ লাভই ন্যায়দর্শনের চরম উদ্দেশ্য (Summum Bonum). অপবর্গ লাভ করিতে পারিলে কাহারও আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না সুতরাং জীব সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারিবে। ইহাই ন্যায়দর্শনের নিঃশ্রেয়স ইহাই ন্যায়ের মোক্ষ।

—ক্রমশঃ



সঙ্কলন

যোগশক্তি

বা

(আমার যোগ সাধনা)

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

মানুষ এক পরম রহস্য পুরীর অধিবাসী ; কি এক ইন্দ্রজালের কুহক তার জন্ম ও মৃত্যু ঘিরে তাকে অবিরাম ডাক দিচ্ছে, এ অজানার ডাক এড়ান তার সাধ্যাতীত। সে যদি মূল জড় বস্তু হ'তো, তা'হলে পাথরের শালগ্রামটীর মত যেখানে রাখো পরম নিশ্চিন্ত জড়তায় সেইখানে তদবস্থায়ই যুগযুগান্তর ধরে পড়ে থাকতো। সে যদি গাছপালার মত জড়ধর্ম্মী অথচ চেতন হ'তো তা হ'লে তার ঈষৎ পরিস্ফুট স্বভাবজ চেতনা নিয়ে মাটির রস টেনে সূর্য্যের কিরণ পান করেই তুষ্ট থাকতো। সে যদি নিতান্ত অপরিণত মন নিয়ে প্রাণের অন্ধতৃষ্ণা ও আবেগতাড়িত পশু হতো তা'হলেও অজানার হাতছানি তাকে এমন করে ব্যাকুল করতো না, আহার নিদ্রা মৈথুন এই ত্রিবিধ জীবধর্ম্ম পালন ও চরিতার্থ করেই তার সহজে তুষ্ট জীবন সাঙ্গ হতে পারতো। মানুষ গোল করেছে বুদ্ধিজীবী হয়ে। মূক এই জড় বস্তু ক্রমে ক্রমে তরুলতা থেকে কীটপতঙ্গ পশুর স্তর পেরিয়ে ক্রম পরিস্ফুট চেতনা নিয়ে অনির্ব্বচনীয় জটিলতায় যখন পূর্ণচেতন মানুষ হয়ে উঠলো তখনই তার বুদ্ধি বিস্ময়ে মুখর হয়ে প্রশ্ন করে উঠলো "একি"।

এই সবিস্ময় প্রশ্নে এবং অনুসন্ধানেই মানুষের ধর্ম্মের সৃষ্টি। পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় মিলে জড় এবং চেতনে মেশামেশী এই জগতের স্থূলরূপ ও বৈচিত্র্য দেখে দেখে মানুষ যখন এর সঙ্গে পরিচয় সাঙ্গ করে আনলো, তখন তার অতৃপ্ত মন প্রাণ ভাবতে বসে গেল, "এই যে লক্ষ কোটী গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র তারা এই পৃথিবী ও তার প্রাণের হরিত বসন্ত প্লাবন, তার বহু-বিচিত্র জীবজগৎ—এ সবের উৎপত্তি কোথায়, কি ধরে এরা টিকে রয়েছে, অন্তিমে কোথায় যাচ্ছে।" স্থূলের জ্ঞান তাকে তৃপ্ত ও তুষ্ট রাখতে পারলো না স্থূলের পিছনে দুলছে যে সূক্ষ্মের উজ্জ্বল পেলব কল্পলোক তার সন্ধানে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি যাত্রা করলো। ঐ অনির্দ্দিষ্টের খোঁজে যাত্রা না করে তার উপায়ান্তর নেই। অন্নের ক্ষুধা, জলের তৃষ্ণা, মানুষের সঙ্গের লালসার মতই দুর্দ্দমনীয় ও দুর্ব্বার তার এই অচিনের ক্ষুধা, আবাঙ্‌মনসগোচরের টান, নিবিত্তের পরম দুর্গম রহস্যময়ীর প্রেম।

কিন্তু সবার মাঝে এ টান জাগে না, জাগা সম্ভব নয়। মানুষে মানুষে আধার ভেদ আছে, উপাদান ভেদ আছে। মানুষও আছে নানারকম পৃথক পৃথক স্তরের। ছেলেবেলায় প্রথম রঙিন জগতে বিস্ময়াপ্লুত চোক দুটি মেলে মনে হয়েছিল সব মানুষই এক, সবারই দুটি হাত দুটি পা একই রকম নাক মুখ চোক। তারপর বয়েসের সঙ্গে নিকট পরিচয়ে দেখতে পেলাম তারাই আবার সব আলাদা হয়ে দাঁড়ালো, মনের হৃদয়ের ও প্রাণের প্রকৃতিভেদে তাদেরই কতই না বৈচিত্র্য, কতই না শ্রেণী, কতই না প্রকার ভেদ। খুঁটিয়ে তলিয়ে দেখলে শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গও তাদের এক নয় ; কারু নাক উঁচু, ঠোঁট বাদামী ও পাতলা। কারু বা চোক দুটো আয়ত ঢল ঢল, হাতে পায়ে কি এক চারু কমনীয় পদ্মনালের লালিত্য ! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মাঝে কচিৎ দুটি মানুষের নাক মুখ চোখের ছন্দ এক, হাত পা শরীরের গঠনভঙ্গী সমজাতীয়। বয়স ও অভিজ্ঞতা যতই বাড়তে লাগলো, মানুষের সঙ্গে পরিচয় যত অন্তরঙ্গ, নিবিড় ও ব্যাপক হয়ে চললো, ততই মানুষে মানুষে ভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার মানে দেখতে দেখতে দেখবার

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিই প্রখর হয়ে উঠলো, জ্ঞান হয়ে দাঁড়ালো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর।

তারপরে জীবনে এলো গুরুকৃপা—যোগশক্তি। যে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার, নিদ্রিতা রাজকন্যার অঙ্গে যেন সোনার কাঠি রূপার কাঠির পরশ, সহজ মোটা জড়জগৎ থেকে হঠাৎ কি যাদুবলে যেন দুরবীক্ষণের দুনিয়ার জাগরণ, সেখানে স্থূল নিরেট সাদা মাটি জিনিষটির মাঝে জাগিয়ে তোলে সূক্ষ্ম দৃষ্টির কি অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র্য, আগে যেটাকে শূন্য বলে মনে হতো সেই ব্যোম ভরে জেগে উঠলো নব নব জীব-সঙ্কুল কত না জগৎ। গল্পে শোনা গেছিল সন্ন্যাসীকে রাজা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—"আপনি লোকালয় ছেড়ে বনে থাকেন কেন?" সন্ন্যাসী বলেছিল—"লোকালয় কোথায়? এও তো পশুসঙ্কুল বন!" তারপর একটি সরিষা প্রমাণ গুলি খাইয়ে দিতেই বিস্মিত রাজা দেখতে লাগলো, "রাজপথ বেয়ে চলেছে মানুষের বিচিত্র সমারোহ কিন্তু তার দু একজন ছাড়া কেউই মানুষ নয়, কারু মুখে শেয়ালের কারু কপালের কাছটা বাঘের, নীচের মুখ পাঁঠার, কারু সর্ব্বাঙ্গের আকার গরিলা সিপাঞ্জির, সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ মানুষ যাচ্ছে ক্বচিৎ দু' একটা এই বিচিত্র অর্দ্ধপশু অর্দ্ধমানবের শোভাযাত্রায় মিশে। সাধনা নিয়ে আমার হলো তাই।

এতকথা বলছি এই কথাটি সুস্পষ্ট করতে, যে, মানুষ সব এক নয়। ভাসা ভাসা চোকে দেখতে একরকম হলেও তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধাতুতে গড়া। কেউ মোটা জড় মাটির, বুদ্ধি তার কাজেই স্থূল, সে অনেকখানি স্বভাবজ জ্ঞানে চলে, ক্ষুধা তৃষ্ণার বেগে নিতান্তই পশুবৃত্তির প্রয়োজন সেটাতেই সে ব্যস্ত। কাজে সে জগতের কারণ খোঁজে না, সূক্ষ্মরূপ বা কাজের ধার ধারে না; মোটা জগতের স্থূল প্রয়োজন নিয়েই সে তুষ্ট। আর একজন উজ্জ্বল সূক্ষ্ম তেজে গড়া, প্রাণের তরঙ্গে সে গলিত ধাতুর মত জ্বলে উঠে, ভাব রাজ্যের জোয়ার ভাঁটায় আনন্দ উচ্ছল সত্তা তার সঙ্কুচিত ও স্ফীত হয়ে দুলতে থাকে। রূপের, রসের, কল্লোলোকের হাত ছানিতে কবিতার ভাবে, সঙ্গীতের তানলয়ে, চিত্রের লালিত রেখার ছন্দে স্বতই সাড়া দেয় তার উচ্চ গ্রামে বাঁধা মন প্রাণ।

ঐ যে মুটে তোমার মোট বইছে, ঐ যে করিমবক্স তোমার গাড়ী হাঁকায় আর সিধু ময়রা তোমার জন্যে ভেজাল ঘিয়ের খাবার করে, ওদের কাছে কি অবনীন্দ্রের রূপজগৎ, রবীন্দ্রের ছন্দ ও রসজগৎ, দিলীপের সুরের জগতের দুয়ার খোলা আছে? যে গণিতজ্ঞ সে হয়ত কবিতার রসে বঞ্চিত, যে বীণার বাদক তার কাছে আচার্য্য জগদীশের বিজ্ঞান-লোকের কোন সূক্ষ্ম স্পন্দই পৌঁছায় না। এই জগতের জ্ঞান নিয়েই যখন এত পার্থক্য তখন দুর্গম গুহাতীত পরমার্থ জগতের সম্বাদ যে হাজার করা দু' একটী মানুষ পাবে তাতে বিচিত্রতা কি? তাই যখন যোগবলের কথা মানুষ শুনে হাসে তখন রাগ করে লাভ নেই।

যারা হাসে তারা কৃপার পাত্র, রবীন্দ্রের কাছে কাব্য সম্বন্ধে অজ্ঞ পাল্কী বাহক উড়ে বেহারা যেমন কৃপার পাত্র। যে বুঝতে পারে না অথচ জানে যে সে বোঝে না—সে তো তবু জ্ঞানী, কিন্তু যে নিজে বোঝে না বলেই, মনে করে সে বস্তু নেই, সে অজ্ঞানের দম্ভে অন্ধ। তাকে ভগবান কি বস্তু তা বোঝাবার জন্যে আমার সাধন-জীবনের এই রহস্যের আরব্যোপন্যাস লিখছিনে। আমি লিখ্‌ছি প্রথমতঃ যে জানে তারজন্যে, দ্বিতীয়তঃ জিজ্ঞাসুর জন্য, পারমার্থিক অনুসন্ধিৎসুর (research scholar এর) জন্য। যার এবস্তু না খুঁজে উপায় নেই—সে যাতে খোঁজার সত্য পথটি পায়, পথে হোঁচট না খায়, ভুল না করে সেই জন্যই আমার এ কাহিনী লেখা।

আজ অবধি যোগসাধনায় বড় বই বের হয়েছে এখানি তার মধ্যে হবে একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। আমি যে যোগপথের কথা বলবো তা ঠিক শাস্ত্রোক্ত যোগপথ নয় কারণ তাতে, শ্লোকের বাহুল্য পাবে না, জটিল দুরূহ পদ্ধতি ও তার ব্যাখ্যা পাবে না, একটা রহস্যের আলোচনায় রূপকের ছড়াছড়ি ও নানা সিষ্টিমিজমের বকুনি পাবে না। সব রকম ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি বিবর্জ্জিত সরল সহজ এই বই খানিতে পাবে একজন আনাড়ি মানুষের অন্তররাজ্যের খাটি ইতিহাস। ভিতরের একটি অজানা ডাকের হাতছানি পেয়ে পথ খুঁজতে বেরিয়ে তার অজ্ঞান বালকের মত হাতড়ানো এবং পরে অন্ধকারে হঠাৎ জলজ্বলে মণিমুক্তার ভাণ্ডারে প্রবেশ।

এই যোগ শক্তির সন্ধান পেয়ে সেখানে আমি কিছুই অন্ধ বিশ্বাসে ধরে দিইনি। প্রত্যেকটি রত্ন সেখানকার আমি নিজের ও আরও বহু সহসাধকের অভিজ্ঞতায় এবং বারবার প্রত্যক্ষ দর্শনে বাজিয়ে যাচিয়ে নিয়েছি। আমি বহুযত্নে খুঁজে পেতে দেখেছি কোথায় কোন্ দিকে এ রহস্য রাজ্যের প্রবেশের পথ, কোন্‌টি তার চোরাগলি, কোন্‌টি বা কানাগলি—(blind lane leading no where in particular) যেখানে ঢুকলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে যাওয়া ছাড়া আর কিছু কপালে জোটে না। ঐ পথের এবং ঐ অনির্ব্বচনীয় বস্তুর যতটুকু আমি বুঝেছি তাই এই বইয়ে স্থান পাবে, যা বুঝিনি তা সকপটে স্বীকার করবো।

আমি দেখছি এই যোগপথে আছে কত কাঁটা, কত বন্য-জন্তু, কত আলেয়ার প্রতারণা প্রলোভন, কত কুটিল নিশি-ডাকের আয়োজন, দেবতার ছদ্মবেশে কত শঠ প্রবঞ্চকের ভিড়। এ সংসারকে লোকে মায়া বলে কিন্তু এই পরা রাজ্যের মায়ার মত মুনি-মন-ভোলানো মায়া আর কোথায় আছে? আমাদের দেশে কেন যে সাধনা করতে গিয়ে এত মানুষ কপট ভণ্ডে পরিণত হয়, কত পাগল হয়, উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণে মারা যায় তার হেতু ও সমাধান আমার এই বই খানিতে প্রত্যক্ষের নিকষ পাথরে কষে পাবে। যারা অদম্য কৌতুহলের বশে বা পরের দেখাদেখি এই পথ খুঁজতে গিয়ে বিপন্ন হয় আমার বইখানি তাদের হবে Warning post বা বিপদসূচক সিগ্‌নাল—Danger signal.

ভারতে বায়ান্ন লক্ষ্য মানুষ কেন কৌপীন সম্বল হয়ে ঘুরছে, তাদের কজন কি পেয়েছে, কারণ তরী কোন চোরা বালিতে আট্‌কে গেছে, কারা পথের কোন ফাঁকে যাদুকরীর মায়ায় ভুলে সাধু মোহন্ত সেজে বসে পড়েছে, দু'শটাকা পুঁজি করে কারা এরাজ্যে লাখ টাকার কারবারের ভাণ করছে এই পথের চটিতে বসে, এ সবের কিছু কিছু ইঙ্গিত আমার বই খানিতে অনুসন্ধিৎসুরা খুঁজে পাবে। অনেকের বুজরুকির ব্যবসা এবং সাধুগিরির ফাঁপা বেলুন "যোগ শক্তির" আঘাতে ফেঁসে যাবে বলে হয় তো লেখকের উপর তথাকথিত অনেক মহাপুরুষ এবং অবতাররা চটে যাবেন কিন্তু তার আর উপায়ন্তর নেই। ভারতে ধর্ম্মের রাজ্যে ও খাঁটি জিনিসের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও research হওয়া আর একবার দরকার হয়েছে—যত অপশাস্ত্র ও অপধর্ম্মের আবর্জ্জনা ভাগাড়ে টেনে ফেলবার আয়োজন। মানুষের চোককাণ ফুটুক, মেকি ও খাঁটি চিনে নেবার সামর্থ্য হোক, সত্য পিপাসা ভারতের আবার হোক সরল ঋজু ও অনাবিল।

—(বিজলী—১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ১৫ই শ্রাবণ)

গত মাসের ইঙ্গিতে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের ও মীরাদেবীর ছবি দুইখানির জন্য আমরা চিত্রভবনের শ্রীযুত রতিকান্ত পালিত মহাশয়ের নিকট ঋণী।



বিজয়া—ইঙ্গিতের পাঠক পাঠিকাদের আমাদের বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জানাই। সারাবৎসর ধরিয়া এই বিশেষ তিথিটির প্রতি বাংলার নরনারীর মন উন্মুখ আগ্রহে চাহিয়া থাকে। শিক্ষা ও কর্ম্মব্যপদেশে যাঁহারা বৎসরের বারোমাস প্রবাসে থাকেন তাঁহারা কয়টি দিনের জন্য আপন আপন পল্লীভবনে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘ প্রবাসের গ্লানি ভুলিয়া থাকেন। নিরানন্দ মৌন পল্লী কয়েকটি দিনের জন্য মিলনানন্দে আবার মুখর হইয়া উঠে। অভাবে আলস্যে অজ্ঞতায় আমাদের পল্লী-জীবন দিন দিন যেরূপ পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে তাহা মনে করিলে বিষণ্ণ হইতে হয়। সহরের বুকে ব্যস্ততা ও কর্ম্মৈষণার অন্ত নাই। ঐশ্বর্য্য ও চাকচিক্যের খেলাও যে কতকটা সহরে চলিয়া থাকে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে পল্লীতে জাতির যথার্থ জীবনের ভিত্তি সেই খানেই প্রাণের স্পন্দন স্তিমিত হইতে স্তিমিততর হইয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে স্বরাজ হয়ত মিলিবে, কিন্তু ততদিনে পল্লীগুলিতে বুঝি শ্মশানের করাল ছায়া পড়িবে। যাঁহারা সিমূলতলা দার্জ্জিলিঙের মোহ ত্যাগ করিয়া চির-অবহেলিত গ্রামে অবকাশ যাপন করিতেছেন তাঁহারা বাংলার পল্লী-সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হইবেন আমরা এই আশাই করি।

ইঙ্গিতের বর্ষারম্ভ—বন্ধু ও বান্ধবীদিগের স্নেহের আশ্রয়ে এবং প্রশ্রয়ে ইঙ্গিত তাহার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি লইয়া দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করিল।

মানুষের অন্তরঙ্গে সার্থক সুন্দর হইয়া উঠিবার জন্য যে একটা চিরন্তন আকুলি ব্যাকুলি চলিয়া আসিতেছে, সাহিত্য প্রচেষ্টা মাত্রই তাহারই একটা আংশিক প্রকাশ।

ইঙ্গিতকে অবলম্বন করিয়া একবৎসর পূর্ব্বে যে সাহিত্য প্রচেষ্টার সূচনা হইয়াছিল, তাহা যতই ক্ষুদ্র ও নগণ্য হউক না কেন, তাহার বিকাশ ও পরিণতির সম্বন্ধে আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। এই যজ্ঞে যাঁহারা সমিধ যোগাইয়াছেন ও যোগাইতেছেন মামুলী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমরা তাঁহাদের দানকে খর্ব্ব করিতে চাহি না। শুধু বলিতে চাই যে 'ইঙ্গিত' তাঁহাদেরই, তাহাকে ফুটাইয়া ফলাইয়া তুলিবার দায় আমাদেরও যতখানি তাহাদেরও ঠিক ততখানি। তাই বর্ষারম্ভে আবার নূতন করিয়া তাঁহাদের নিকট ইঙ্গিতের দাবী পৌঁছাইয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।

ভেদনাই?—দেখিতে দেখিতে মন্দিরের দ্বার খুলিল। ভাবিলাম মনের দরজাও বুঝি বা সেই অনুস্রোতে খুলিবে, তাই একটু কৌতূহল লইয়াই গ্রামে গিয়াছিলাম! কিন্তু এক আধজন সমাজপতির সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম সংবাদ পত্রের স্তম্ভে ও জীবনে অনেক পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে এখনও! টাউন হলে ও সভাসমিতিতে যাহা চলিতেছে গৃহের চতুঃসীমানায় ও পূজামণ্ডপে তাহা এখনও অচল! কতদিনে এ অসামঞ্জস্যের সমাধান হইবে তাহা জাতির ভাগ্যবিধাতাই জানেন!

মন্থন সুধা—মহাত্মার মৃত্যুপণ ব্যাপারে দেশের আপামর সাধারণের অন্তর কত গভীর ভাবেই না আলোড়িত হইয়াছে! এই মন্থন-সুধা পান করিয়া আজ

উচ্চবর্ণ হিন্দু অসঙ্কোচে তথাকথিত অস্পৃশ্য ভাই এর হাত ধরিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের চিরন্তন কলহ স্বদেশে বিদেশে বহু আলাপ আলোচনায় যাহার মীমাংসা হয় নাই তাহাও বুঝি বা মিটিতে চলিল! কৌপীনধারী কৃশকায় একটি মানুষ কারান্ধকারে বসিয়া জাতির জীবন-খাতে কেমন করিয়া প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিলেন ইহা গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার কথা। কি গুণে বুদ্ধ খ্রীষ্ট চৈতন্য প্রেমের শাসনে লক্ষ লক্ষ নরনারীর চিত্ত মথিত, আকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করিতেন আমরা তাহারই চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া ধন্য হইলাম, তাও আবার এই বস্তুসর্ব্বস্ব যুগে!

কবি ও নবী—রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিলাসী ও স্বপনচারী বলিয়া যাঁহাদের আক্ষেপের অন্ত নাই, কবির পুণ্য অভিযানের পর তাঁহারাও কবিকে অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন "এ কী রূপে দিলে দরশন!" আমরা বলি কবির এ রূপ আমাদের অপরিচিত নয়। যখনই জাতির জীবনে এমনি একটা সঙ্কটকাল বা সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে তখনই তাঁহার আসন টলিয়াছে।

যারবেদার কারা প্রাচীরের অন্তরালে কবি ও নবীতে সেই অপূর্ব্ব সাক্ষাৎ ও আলিঙ্গন—জাতির জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। একদিন অতি দুঃখেই কবি তাঁর অপরূপ ছন্দে 'দুর্ভাগা' দেশ'কে ডাকিয়া বঞ্চিত ও উপেক্ষিতের প্রতি নির্ম্মমতার জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। কে জানিত কবি ও নবীর স্বপ্ন এমন করিয়া সফল হইবে!

শোকসংবাদ—যশোহরের গৌরবস্তম্ভ রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদারের মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়াছি। মনীষা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, দেশাত্মবোধ ও কর্ম্ম-কুশলতায় যদুনাথের চরিত্রে একটি অনন্য সুলভ বিশিষ্টতার ছাপ ছিল। একদিকে জনকতুল্য জ্ঞানের গভীরতা, অপরদিকে অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা—এই দুই গুণের একত্র সমাবেশ সংসারে বিরল। যদুনাথের উভয় গুণই ছিল। যশোহরের জেলাবোর্ডে প্রথম বেসরকারী সভাপতি ছিলেন যদুনাথ। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি এই দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। বাগ্মিতা ও বিচক্ষণতায় যদুনাথের কৃতিত্বের সংবাদ অনেকেই রাখেন। বঙ্গদেশের লুপ্ত নদীগুলির পুনঃ সংস্কারকল্পে তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বিধির নির্ম্মম বিধানে সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমরা তাঁহাকে হারাইলাম। তিনি ছিলেন বেদজ্ঞ, শোক দুঃখের অতীত, কিন্তু মাটির মানুষ আমরা শোকার্ত্ত মনেই তাঁহাকে আমাদের প্রণতি জানাই।

আত্মায় আত্মায়—সুকবি ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির ও শ্রীমতী শান্তি দাস পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। আমরা এই নবদম্পতীর দীর্ঘায়ু ও উন্নতি কামনা করি। প্রেমের মহিমা যে জাতিবর্ণের বৈষম্যকে খর্ব্ব করিয়া দিতে পারে, ইহাঁদের পরিণয়ে সেই সত্যের পরিচয় পাই। শিক্ষা দীক্ষা ও কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী কোথায় যাইয়া থামিবে তাহা সকল সময়ে শাস্ত্রকার বা সমাজপতির নির্দ্দেশে নির্ণীত হয় না। এইরূপ মিলনে উভয় সমাজের কল্যাণ হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।



প্রাপ্তি স্বীকার

বৈতরণী—উড়িষ্যা হইতে প্রকাশিত ইংরাজী মাসিক "বৈতরণী"র এক সংখ্যা পাইয়া আমরা আনন্দিত হই াম। ইহার সম্পাদক কুমার বিদ্যাধর সিংহদেও বি, এ, এম, আর, এ, এস, বি, এল। ঠিকানা—পোঃ চত্তবার, কটক, উড়িষ্যা। উক্ত মাসিকের ঘোষণা অনুসারে পত্রিকাখানিকে উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী মাসিক বলিতে হইবে। তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উহা উড়িষ্যার গৌরব ও সম্পাদকের কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। শুধু উড়িষ্যা বলিব কেন, দিকেদিকে এইরূপ সাহিত্যানুশীলনের প্রেরণা ভারতের নবজন্মের সুপ্রভাতেরই সূচনা করে। তবে একটা ত্রুটী আমাদের চোখে পড়িল। পত্রিকাখানির প্রবন্ধ-সম্ভার খুব প্রশংসাই নয়। আমরা নবীন সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করি।

বিশ্বজনীন—মাসিক পত্রিকা। তত্ত্বমসি মঠের মুখপত্র। সম্পাদক—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বজনীন কার্য্যালয়। ৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲, প্রতি সংখ্যা ৶০

সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন প্রচার—হিন্দুধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসমূহ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের জীবনী ও উপদেশাবলী, শাস্ত্র সমূহের গূঢ় ব্যাখ্যা, শাস্ত্র সমন্বয় তথা বিভিন্ন ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক আলোচনা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প সমূহ ইহাতে প্রকাশিত হয়। কর্ম্মী ইহার মধ্যে কর্ম্মের প্রেরণা, জ্ঞানী ইহার মধ্যে জ্ঞানের আদর্শ ও ভক্ত ইহার মধ্যে ভক্তির উৎস লাভ করিবেন। ভাষা সহজবোধ্য ও সরল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের পাঠের যোগ্য। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

ভক্তিতত্ত্বঃ—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ প্রণীত। প্রকাশক ব্রহ্মচারী নির্ম্মল চৈতন্য। প্রাপ্তিস্থান, বিশ্বজনীন কার্য্যালয়, ৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৵০

অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কালের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সময় পর্য্যন্ত যে আদর্শ ভক্তিতত্ত্ব আমাদের দেশে আলোচিত হইয়াছে গ্রন্থকার সংক্ষেপে সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র সহজ সরল ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় নয়টী অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু জানিতে চান, এ পুস্তকটী পাঠ করিলে তাঁহারা বিশেষ লাভবান হইবেন।

উত্তরা—৪৬ নং ভেলুপুরা, বেনারস সিটি হইতে প্রকাশিত। "উত্তরা"র ভাদ্রসংখ্যা পাওয়া গেল। ইহার সম্পাদক—সুপরিচিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ছাপায় এবং গেট্‌আপে বাংলায় এর সমতুল্য আর একখানি কাগজও নাই। সুদূর বেনারস হইতে প্রকাশিত হইয়াও, কি করিয়া এই পত্রিকাখানি বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র সকলের সমাচার ও পরিচয় লাভ করিল, তাহা এই পত্রিকাখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধটাই সুচিন্তিত এবং চিন্তাশীল সুধী লেখকের দ্বারা লিখিত। সহযোগীর বহুল প্রচার কামনা করি।

অর্চ্চনা—এখানি মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস। ৩০ বি পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা অফিস হইতে প্রকাশিত। দাম বার্ষিক ১৷০—নগদ ৶১০ পয়সা। কাগজ খানিতে সাহিত্যিক সৌষ্টবতা অপেক্ষা ব্যবসাদারী অঙ্গ সজ্জাই বেশী পরীলক্ষিত হয়—কারণ প্রত্যেক প্রবন্ধের মধ্যেই বিজ্ঞাপনের বাহুল্য দেখা গেল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পীড়া দেয় ইহার প্রচ্ছদপটের ছবিখানি। ছবিখানিতে অর্চ্চনার কি অর্থ ফুটিয়া উঠিয়াছে শিল্পের সে সুক্ষ্ম বর্ণমালা আমাদের এ স্থূল চক্ষু বুঝিতে অক্ষম। পত্রিকাখানি ব্যবসাদারী অনুপ্রেরণার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া খাঁটী সাহিত্যের বর্ণেই সমধিক অনুরঞ্জিত হউক ইহাই আমাদের কামনা। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সেদিকে দৃষ্টি ফিরাই তাহা সম্ভব—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

—হিমাদ্রি বসু।

শ্রীসরোজরঞ্জন মিত্র কর্ত্তৃক ৩০নং হরিতকি বাগান লেন, কালিকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত,
ও মেহেরপুর, গোপসেনা পোঃ, জেলা যশোহর হইতে প্রকাশিত।